আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা ॥

Thesis approved by the University of Calcutta
for the Degree of D. Phil. (Arts).
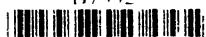
আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা

ডক্টর শ্রীঅধীর দে এম.এ., ডি.ফিল্.

প্রণীত

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য এম.এ., পি-এইচ.ডি.

লিখিত

পরিচায়িকা সংবলিত

সৃষ্টি প্রকাশনী

১৪১বি, ব্রাহ্ম সমাজ রোড,

কলিকাতা-৩৪

গ্রন্থ-পরিকল্পনা ও রচনাকাল : ১৩৬৩—১৩৬৫

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৬৬

প্রকাশক :
শ্রীরূপককুমার দে
সৃষ্টি প্রকাশনী
১৪১বি, ব্রাহ্ম সমাজ রোড্
কলিকাতা-৩৪

একমাত্র পরিবেশক :
বি, এম্, পাব্লিশার্স
৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীমদন সরকার

ব্লক ও প্রচ্ছদ-মুদ্রণ :
দি ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ
১-এ, টেগোর ক্যাসেল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
শ্রীগজেন্দ্রনাথ চৌধুরী
প্রিন্টার্স কর্ণার প্রাইভেট লিঃ
১, গঙ্গাধর বাবু লেন,
কলিকাতা-১২

গ্রন্থনা :
দি নিউ ষ্টার কোং
৭২।৩, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা-৯

মূল্য : বারো টাকা মাত্র

স্বর্গত পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতির

উদ্দেশে

পরিচায়িকা

১

শ্রীমান্ অধীরকুমার দে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাংলায় এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাংলা সাহিত্যের কোন একটি বিষয় লইয়া গবেষণা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং এই বিষয়ে আমার পরামর্শ ও সহায়তা প্রার্থনা করিলেন, তখন আমি বিষয়ের জটিলতা কিংবা গভীরতার কথা বিশেষ কিছু চিন্তা না করিয়াই কেবলমাত্র প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার গবেষণার জন্য 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা' বিষয়টি নির্বাচিত করিয়া দিলাম। ইহার প্রথম এবং প্রধান কারণ এই যে, বাংলায় এই বিষয়ক একটি আনুপূর্বিক আলোচনার একান্ত অভাব, দ্বিতীয়ত বিষয়টির গুরুত্ব। এই কথা সত্য, আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের জন্মের প্রথম মুহূর্ত হইতেই বাঙ্গালী মনীষার চিন্তার ধারা প্রবন্ধ রচনার প্রবাহের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নবজাগরণের ইতিহাসে বাঙ্গালীর চিন্তাধারার যে ক্রমবিকাশ দেখা দিয়াছিল, তাহা বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য যথাযথ অনুসরণ না করিলে সম্যক্ বুঝিতে পারা যায় না।

তবে এই কথা অস্বীকার করা যায় না যে, বিভিন্ন ভাবে বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ লেখকের রচনার সঙ্গে উচ্চতর বাঙ্গালী পাঠকের কিছু কিছু পরিচয় স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাবে আলোচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখকের রচনার মধ্য দিয়া একটি অখণ্ড জাতীয় চিন্তাধারার সন্ধান পাওয়া যায় না; অথচ সামগ্রিক ভাবে জাতীয় মনীষা সেদিন যে কোন্ পথে অগ্রসর হইয়া সমাজ-জীবনে কি ভাবে শক্তি সঞ্চার করিতেছিল, তাহাও উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। রামমোহন—

বিদ্যাসাগর-অক্ষয়-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া চিন্তাধারার যে একটি অখণ্ডতা ছিল, তাহা প্রত্যেকের মনীষা যদি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, তাহা হইলে সুস্পষ্ট অনুভব করিতে পারা যাইবে না। অথচ সামগ্রিক ভাবে জাতির পরিচয় কেবল মাত্র এই অখণ্ডতার উপলব্ধির মধ্যেই পাওয়া সম্ভব, খণ্ডতার মধ্যে সম্ভব নহে। এমন কি, এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে চিন্তার যে উৎকর্ষ দেখা দিল, তাহারও একটি যে পূর্ববর্তী ঐতিহ্যের ধারা জীবন্ত ছিল না, তাহা নহে। উনবিংশ বিংশ শতাব্দীতেই বাঙ্গালীর চিন্তার উৎস যে আকস্মিক ভাবে খুলিয়া গেল, তাহা কখনই হইতে পারে না—তাহা কোন জাতির পক্ষেই কদাচ সম্ভব নহে।

আমরা এ'কথা অনেক সময় বিস্মৃত হইয়া যাই যে, আমাদের দেশেই একদিন ন্যায়শাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা হইয়াছে এবং বাংলা ভাষার মধ্য দিয়াই 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র মত সূক্ষ্ম দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মধ্য যুগে গদ্যভাষার অভাব ছিল বলিয়া বাঙ্গালীর চিন্তাধারা সে' দিন স্তিমিত হইয়া ছিল না, পয়ার ছন্দের বিচিত্র প্রবাহ রচনা করিয়া তাহার মধ্য দিয়াই তাহা সে'দিন প্রবাহিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে এ'দেশে প্রবন্ধের সকল বিষয়ই রচিত হইয়াছে, তবে তাহা পাশ্চাত্ত্য রীতি অনুযায়ী গদ্যে রচিত না হইয়া পদ্যেই রচিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে গদ্যরচনার মূলে জাতির যে চিন্তাশক্তি নিয়োজিত ছিল, তাহার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার প্রেরণা ছিল সত্য, কিন্তু ইহার পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যের মধ্যেও চিন্তার যে শৃঙ্খলা প্রবন্ধ রচনাকে সার্থক করিয়া তুলে, তাহার প্রেরণার অভাব ছিল না; গদ্যরচনার নূতন এক আদর্শ লাভ করিয়া সে'দিন হইতে তাহা গদ্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল, তবে ইহার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য চিন্তা যে নূতন শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এইদিক দিয়া যদি বিচার করিয়া দেখি, তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র সঙ্গে রামমোহন রচিত

বেদান্ত বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার পার্থক্য কেবল মাত্র বহিরঙ্গগত—দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্লেষণগুণ, পরমত খণ্ডন করিয়া নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিবার শক্তি ইত্যাদিতে ইহাদের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। বাঙ্গালীর চিন্তাধারার এই অখণ্ডতার উপলব্ধির মধ্যেই বাঙ্গালী মনীষার বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধি সম্ভব; যুগে যুগে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহা যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। সেইজন্যই সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের ভিতর দিয়া যেমন আমরা একটি অখণ্ড যোগসূত্র সর্বদাই সন্ধান করিয়া থাকি, তেমনই প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্য দিয়াও আমাদের তাহা অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের গবেষকদিগের মধ্যে এই প্রয়াস ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নাই। কারণ, বিষয়টি যেমন জটিল, তেমনই নীরস। বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধানকারিগণ এ পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য এবং সহজ পথে যেমন উৎসাহের সঙ্গে অগ্রসর হইয়াছেন, জটিল এবং নিতান্ত নীরস কার্যে তেমন উৎসাহ বোধ করেন নাই। গবেষকদিগের নিকট যাহা যথার্থ উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে পারে নাই, তাহা সাধারণ পাঠকদিগের নিকট সার্থক আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে, এ'কথাও মনে করা যাইতে পারে না। কিন্তু সাধারণ পাঠকের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাহিত্যের গবেষণা কার্য চলিতে পারে না; সেইজন্য এই তরুণ গবেষককে তাহার ধৈর্য, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পরীক্ষা করিবার জন্য এবং সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের একটি অভাব দূর করিবার জন্য আমি বহু সহজ ও আকর্ষণীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া এই নিতান্ত নীরস এবং জটিল বিষয়টির সম্মুখীন হইবার জন্য আহ্বান জানাইলাম। তিনি এই সুকঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন না এবং তাঁহার সাধ্যমত শক্তি লইয়া এই অনাবিষ্কৃত পথে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। তাহার ফল স্বরূপই বর্তমান গ্রন্থখানি রচিত হইল। বড়ই আনন্দের বিষয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার এই রচনাখানি ডি. ফিলের গবেষণারূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ইহা রচনার জন্য যথোচিত সম্মান দান করিয়া

একদিকে তাঁহার পরিশ্রম এবং অন্যদিকে এই বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে স্বীকৃতি দান করিয়াছেন।

২

বিষয়টির সংজ্ঞা লইয়াই ইহার প্রথম জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ' কথা সকলেই জানেন, কাব্য, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি সাহিত্যরূপের যেমন একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, প্রবন্ধের এই প্রকার একটি সুস্পষ্ট কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না। আকার এবং বিষয়গত যে পার্থক্যই থাকুক না কেন, এক শ্রেণীর যে কোন রচনাকেই সাধারণতঃ প্রবন্ধ বলা হইয়া থাকে—এই বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন আদর্শ অনুসরণ করা হয় না। ইংরেজি সাহিত্যেও essay-শব্দটিকে এমনই শিথিলভাবেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়াই এই বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন ইংরেজি আদর্শও গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই, অথচ ইংরেজি essay-শব্দটিই বাংলায় প্রবন্ধ রূপে সাধারণতঃ গৃহীত হয়। প্রবন্ধের প্রধান ধর্মই হইতেছে এই যে, ইহার মধ্য দিয়া প্রবন্ধ লেখকের কোন বিষয় সম্পর্কে আত্মোপলব্ধির পরিচয় প্রকাশ পায়। সুতরাং যে সকল রচনা কেবলমাত্র তথ্যপরিবেষক, যাহাতে লেখকের ব্যক্তিগত উপলব্ধির কোন বলিষ্ঠ পরিচয় প্রকাশ পায় না, তাহা প্রধানতঃ essay কিংবা প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙ্গালীর এই বলিষ্ঠ আত্মসচেতনতার বিকাশ দেখা যায় না। যে যুগে অনুবাদই সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন বলিয়া গৃহীত হয়, সেই যুগে তাহার মধ্যে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের বিকাশ সম্ভব নহে। সুতরাং সেই যুগ যথার্থ প্রবন্ধ রচনার যুগ ছিল না। তথাপি সেই যুগেই রামমোহন রায়ের মত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হইয়া তাহার মধ্য দিয়া যে আত্মপ্রত্যয় বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহাই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চিন্তার ক্ষেত্র বিস্তৃততর করিয়াছে। রামমোহনের চরিত্রের মধ্যে প্রবন্ধ রচনার গুণ এবং শক্তি ছিল, কিন্তু তথাপি তাহা পরমত খণ্ডন করিতে তাহাকে যে ভাবে ব্যবহার করিতে হইয়াছে, তাহাতে শাস্ত্রীয় তথ্যের উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইয়াছে।

কারণ, রামমোহনের ব্যক্তিত্ব যত বিরাটই হউক, সে'দিন একদিক দিয়া খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক সম্প্রদায় এবং অপর দিক দিয়া দেশীয় রক্ষণশীল পণ্ডিত সমাজ ইহাদের উভয়ের মত খণ্ডন করিতে গিয়া কেবল মাত্র শাস্ত্রীয় তথ্যনিরপেক্ষ আত্মোপলব্ধির উপর নির্ভর করিলে চলিত না, তথ্যের দ্বারা তথ্যের খণ্ডন করিবারই সে'দিন প্রয়োজন ছিল, রামমোহন সেই পথই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ এ'কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, রামমোহন যে শিক্ষা এবং চরিত্রশক্তির অধিকারী ছিলেন, তাহার মধ্যেই উক্ত সংজ্ঞানুযায়ী সার্থক প্রবন্ধ রচনার প্রতিভা ছিল। স্বচ্ছ সত্যবোধ এবং বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় প্রবন্ধ রচনার যত বড় গুণ, তথ্যজ্ঞান তত বড় গুণ নহে। কিন্তু তুইটি বিশিষ্ট প্রতিপক্ষকে সম্মুখে রাখিয়া তাহাদের উত্থাপিত জিজ্ঞাসার প্রশ্ন দিতে গিয়া রামমোহনকে তাঁহার বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়কেও শাস্ত্রীয় তথ্যজ্ঞানের নিকট বলি দিতে হইয়াছে। সুতরাং প্রবন্ধ রচনার যথেষ্ট প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে যে শ্রেণীর রচনা প্রকাশ করিতে হইয়াছে, তাহা বাংলা সাহিত্যের আদর্শ প্রবন্ধরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য ছিল না। অথচ তিনি প্রবন্ধ রচনার যে আদর্শ বাংলা গদ্যের আদি যুগেই স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কিছুকাল অনুসরণ করিবার ফলে বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের যথার্থ রূপ এবং শক্তির উপলব্ধির অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রত্যয় সম্যক্ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই; সেইজন্য তাহা প্রধানতঃ অনুবাদ এবং অনুকরণেই পর্যবসিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে গদ্যভাষায় যে রসই সঞ্চারিত হউক না কেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও আত্মোপলব্ধির বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি ছিল না, বিদ্যাসাগরকেও বহুল শাস্ত্রীয় যুক্তি ও তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাসকে রূপায়িত করিতে হইয়াছে; কারণ, সেদিনও সমাজ ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির উপরে শাস্ত্রের তথ্যকে স্থান দিয়াছিল।

তবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কেবল মাত্র একজনের রচনায়

আত্মোপলব্ধির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছিল, তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানেও একান্তভাবে শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিবার পরিবর্তে 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'কেই ব্রহ্ম বা সত্যের 'পত্তন-ভূমি' করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে রামমোহনের সঙ্গে তুলনায় তাঁহার একটি বিশেষ সুযোগ এই ছিল যে, রামমোহনকে যেমন তাঁহার নৈয়ায়িকসুলভ যুক্তিতর্ক দ্বারা তাঁহার প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিবার প্রয়োজন হইত, দেবেন্দ্রনাথের তাহা প্রয়োজন হইত না, আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতির স্বাধীন অভিব্যক্তিতে তাঁহার কোনদিক হইতেই বাধা ছিল না। সেইজন্য তিনি ধর্ম বিষয়কেও মস্তিষ্কের পরিবর্তে হৃদয় দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; প্রচলিত টীকা ভাষ্য তিনি অনুসরণ করিয়া চলেন নাই। সুতরাং তাঁহার প্রতিভার মধ্যেই সেইযুগে প্রবন্ধ রচনার বিশেষ গুণ প্রকাশ পাইয়াছিল। আরও একটি দিক দিয়া তিনি রামমোহন হইতে এই বিষয়ে একটু অগ্রসর ছিলেন, ইহা তাঁহার ভাষা। প্রবন্ধ একটি বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ, সুতরাং ইহার ভাষাও সাহিত্যের ভাষা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভাষা, রামমোহন হইতে অধিকতর সাহিত্যগুণ-সমৃদ্ধ, সুতরাং প্রবন্ধ রচনার উপযোগিতাও ইহার অনেক বেশি। দেবেন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনাই ব্রাহ্মধর্ম-বিষয়ক, ইহাদের মধ্যে তাঁহার 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' এবং 'আত্মচরিত' গ্রন্থ দুইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানি ধর্মবিষয়ক রচনা হইলেও ইহা রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মত একান্ত শাস্ত্রীয় তথ্য-নির্ভর রচনা ছিল না, বরং তাহার পরিবর্তে ইহাতে তাঁহার আত্মোপলব্ধি একটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছে। তাঁহার'আত্মচরিত' কেবলমাত্র বহির্মুখী তথ্য পরিবেশনেই পর্যবসিত হয় নাই, বরং তাঁহার আত্মিক ও জাগতিক সত্যের আত্মোপলব্ধিতে তাহা সার্থক হইয়াছে। ইহাই প্রবন্ধের প্রকৃষ্ট গুণ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথের এই দুইখানি গ্রন্থকে কেহ প্রবন্ধ পুস্তক বলিয়া গ্রহণ করিবেন না; কারণ, প্রবন্ধের অন্যান্য বহিরঙ্গগত লক্ষণ ইহাদের মধ্যে কিছু নাই।

এইভাবে দেখা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য আদর্শানুযায়ী প্রবন্ধ রচনার প্রেরণা এই দেশের সাহিত্যের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেও নানা কারণে তাহার রূপটি পরিস্ফুট হইতে পারিতেছে না, তবে ইহার মধ্য দিয়াই অনতিকাল ব্যবধানে যে ইহা একটি পরিণত রূপ লাভ করিবে, তাহার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এইজন্যই বর্তমান লেখক বাংলা প্রবন্ধের সুনির্দিষ্ট একটি স্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। কাব্য-নাটক-কথাসাহিত্য ব্যতীত প্রায় সকল শ্রেণীর গদ্যরচনাকেই তাঁহার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইয়াছে। কি অবস্থার মধ্য দিয়া বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য আধুনিক রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা জানিবার যে আবশ্যকতা আছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি তাঁহার এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিতে কিছুটা নিরঙ্কুশ হইয়াছেন। কোন জাতির বিশিষ্ট কোন সাহিত্যরূপের আনুপূর্বিক ধারা অনুসরণ করিলে তাহার মধ্যে কেবল মাত্র যে ইহার সুপরিচ্ছন্ন রূপটিরই সন্ধান পাওয়া যাইবে, তাহা নহে—তাহাতে নানা স্থূল এবং অপরিচ্ছন্ন বস্তুর অস্তিত্বও অনুভব করা যাইবে। সুতরাং এই গ্রন্থে যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হইয়াছে, আধুনিক বিচারে তাহাদের সকলই যে প্রবন্ধ, তাহা নহে, তবে দেখা যাইবে, কোনও রচনার মধ্যে যেমন প্রবন্ধের প্রেরণা দেখা দিয়াছে, অথচ তাহার কোন সুস্পষ্ট রূপ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই, তেমনই আবার দেখা যাইবে, কোনও রচনায় প্রবন্ধের রূপটি প্রকাশ পাইলেও তাহার মধ্যে প্রবন্ধের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইতে পারে নাই। অথচ বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ প্রবন্ধ রচনায় ইহাদের কাহারও স্থান নিতান্ত নগণ্য নহে। রামমোহনের রচনায় যেমন প্রবন্ধের দেহ ছিল, প্রাণ ছিল না, তেমনই দেবেন্দ্রনাথের রচনায় প্রবন্ধের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, অথচ ইহার পরিমাপ মত দেহটি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। অথচ এই বিষয়ের ধারাবাহিক এবং সামগ্রিক আলোচনায় ইহাদের উভয়েরই প্রয়োজন।

৩

প্রধানতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতেই বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল; শুধু তাহাই নহে, তাহা প্রকাশ করিবার মধ্যে ইহার পূর্ববর্তী কালে যেমন শাস্ত্র ও অন্যান্য পুথিলব্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন হইত, তখন হইতে তাহার আর বিশেষ প্রয়োজন হইল না—আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি তখন শাস্ত্রীয় নজীর পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষ ভাবেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই উপলব্ধির মধ্যেই প্রবন্ধের প্রধান গুণ দেখা দিল। বিশেষতঃ এই যুগে প্রবন্ধ ক্রমে একটি সুনির্দিষ্ট আয়তন লাভ করিতে সক্ষম হইল। শাস্ত্রীয় তথ্যকে ভিত্তি করিয়া পূর্ববর্তী কালে প্রবন্ধ রচিত হইত বলিয়া তথ্যের যেমন অন্ত ছিল না, প্রবন্ধের তেমনি কোন সুনির্দিষ্ট আয়তনও ছিল না; কিন্তু শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যে দিন হইতে একান্তভাবে অন্তরের অনুভূতিই প্রবন্ধের আশ্রয় হইল, সে' দিন হইতে ইহা একটি সুনির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিল। বিশেষতঃ এই যুগের প্রায় প্রথম অংশেই প্রবন্ধ রচনার বিশিষ্ট প্রতিভা লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হইল, তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে'র মধ্য দিয়া তিনি বাংলা প্রবন্ধের একটি শিল্পরূপ দিয়া ইহা রচনার একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ স্থাপন করিলেন, বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে তাহা আর কেহই সম্ভব করিতে পারেন নাই। তারপর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেই আদর্শই এই সাহিত্য-কর্মটি নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল। তথাপি এ' কথা সত্য, তথ্য বা বস্তুর ভার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ হইতে একেবারে লাঘব হইল না, পূর্ববর্তী যুগের সংস্কার তাঁহার মধ্য দিয়াও প্রচ্ছন্নভাবে হইলেও অগ্রসর হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এই সংস্কার বাংলা প্রবন্ধ হইতে সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়া গেল না। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়ে যে পথ নির্দেশ করিয়া দিলেন, তাহা অতি সহজেই সকলের অবলম্বন হইল। বিশেষতঃ ইতিপূর্বে সমাজ-সংস্কার মূলক কিংবা আধ্যাত্মিক বিষয় যেমন প্রবন্ধের প্রধান অবলম্বন ছিল, তখন হইতে তাহার পরিবর্তে সাহিত্য ও

দর্শনের শাশ্বত বিষয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইল। পূর্ববর্তী যুগের প্রবন্ধের যেমন একটি সাময়িক মাত্র মূল্য ছিল, তাহার পরিবর্তে এই যুগের প্রবন্ধ-সাহিত্য একটি স্থায়ী মূল্য লাভ করিল।

একদিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, সকল প্রবন্ধেরই একটি স্থায়ী মূল্য আছে ; প্রবন্ধ যদি সাহিত্যেরই একটি বিশিষ্ট রূপ হয়, তবে তাহার স্থায়ী একটি মূল্য থাকিবে, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি দেখা যায়, প্রবন্ধে সর্বদাই যে জীবনের কোন শাশ্বত বিষয় কিংবা সাহিত্যের কোন মৌলিক তত্ত্ব আলোচিত হয়, তাহা নহে—সমসাময়িক অনেক বিষয় অবলম্বন করিয়াও প্রবন্ধ রচিত হইয়া থাকে। তাহাদের মূল্য যে সাময়িক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুধু তাহাই নহে, অনেক সময় শাশ্বত বিষয় প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সমসাময়িক ভাষা ইহার অবলম্বন হইয়া থাকে বলিয়া কালক্রমে তাহাও স্থায়ী আবেদন রক্ষা করিতে পারে না। রামমোহন ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেদান্ত দর্শন অবলম্বন করিয়া যে প্রবন্ধসমূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মূলে শাশ্বত সত্য ছিল না, এ'কথা বলিবার উপায় নাই ; অথচ এ'কথাও সত্য, তাঁহার প্রবন্ধ বর্তমানকালে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বিষয়ের মধ্যে শাশ্বত গুণ থাকিলেও ইহার সাহিত্যরূপ প্রাচীন হইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা অপ্রচলিত হইয়া যায়। ক্লাসিক্‌স্ বা প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেও যে শাশ্বত গুণ থাকে না, তাহা নহে ; তথাপি সমসাময়িক সাহিত্যের সঙ্গে ইহা যে তাল রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না, তাহার কারণই এই যে, ইহার বহির্মুখী পরিচয় ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া যায় ; সেইজন্যই প্রাচীন সাহিত্যকে আধুনিক বা সমসাময়িক সাহিত্যের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিবার প্রয়োজন হয়।

বাংলা সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে শাশ্বত বিষয়ের পরিবর্তে নিতান্ত সমসাময়িক বিষয় অবলম্বন করিয়াও অসংখ্য প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। কারণ, সমাজ-সংস্কার সেই যুগের প্রধান লক্ষ্য ছিল, প্রবন্ধ-সাহিত্যই সেই যুগের সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনের প্রধান অবলম্বন

ছিল। এ' কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর জাতীয় নবজাগরণ যে ভাবে সম্ভব হইয়াছিল, তাহার সর্বস্তরেই প্রবন্ধ-সাহিত্য একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। রামমোহন রায়ের সামাজিক আন্দোলন হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের স্বদেশী আন্দোলন পর্যন্ত এই জাতির কর্ম ও চিন্তার ধারা যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, তাহার মধ্য দিয়া প্রবন্ধ-সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিবার একটি বিশেষ সুযোগ লাভ করিয়াছিল। এ'কথাও অবশ্য সত্য যে, একমাত্র প্রবন্ধ-সাহিত্যই সেই দায়িত্ব পালন করে নাই, বাংলা নাটকও ইহার মধ্যে একটি প্রধান অংশ অধিকার করিয়াছিল। তথাপি দেখা যায়, প্রত্যক্ষ ভাবে জাতির একটি ব্যবহারিক স্বার্থ ইহার লক্ষ্য ছিল বলিয়া নাটকই হউক, কিংবা কাব্য বা কথাসাহিত্যই হউক, ইহাদের প্রত্যেকেরই মধ্য দিয়া প্রবন্ধ-সাহিত্যের গুণই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। সে' যুগের বহু নাটক ও প্রহসন নাটক কিংবা প্রহসনাকারে প্রবন্ধ মাত্র। প্রবন্ধের বিষয়ই প্রকৃতপক্ষে সে'দিন নাটক, প্রহসন, কাব্য কিংবা কথাসাহিত্য এই সকল বিভিন্নধর্মী রচনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। নিতান্ত রোমান্টিকধর্মী কবির রচনা ব্যতীত সেই যুগের অধিকাংশ সাহিত্যের বিষয় প্রবন্ধেরই বিষয় ছিল। এমন কি, বিংশতি শতাব্দীতে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটক সম্পর্কেও একজন বিশিষ্ট সমালোচক বলিয়াছেন যে, ইহা 'নাটক না হইয়া যদি একটি প্রবন্ধ হইত, তবে এইরূপ বাস্তব-সমস্যা-সমাধান-মূলক চিন্তাপূর্ণ রচনা বড়ই উপাদেয় হইত।' উনবিংশ শতাব্দীর কেবলমাত্র অধিকাংশ নাটকই নহে, কাব্য এবং কথাসাহিত্যও এমনি 'বাস্তব-সমস্যা-সমাধানমূলক' রচনা ছিল, সুতরাং বিষয় এবং বিষয়-বিন্যাসের দিক হইতে তাহা অধিকাংশই প্রবন্ধ। সেই যুগের অধিকাংশ নাটকের মধ্য দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, কাহিনীর ধারা পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে সমসাময়িক বিষয়মূলক কোনও সমস্যার আলোচনাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং ইহার নাটকীয় গুণ কিছু নাই, ইহা প্রবন্ধ মাত্র। উপন্যাসের মধ্যে কাহিনীর শৈথিল্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাতে যে কত 'বাস্তব-সমস্যা-

সমাধানমূলক চিন্তাপূর্ণ রচনা' স্থান লাভ করিয়াছে, তাহার অন্ত নাই। এমন কি, কাব্যের ক্ষেত্রও এই সংস্কার হইতে মুক্ত ছিল না। কাব্যেও সে' যুগে যে কত বাস্তব-সমস্যা-সমাধানমূলক আলোচনা স্থান লাভ করিয়াছে, তাহাও পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। সুতরাং আমরা যখন প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা লইয়া আলোচনা করিতে যাই, তখন ইহার অনেকখানি অংশই পরিত্যাগ করি, কেবল মাত্র যাহা বিশিষ্ট একটি রূপ লইয়া আমাদের সম্মুখীন হয়, তাহাই আমাদের নিকট প্রবন্ধ বলিয়া গৃহীত হয়, যাহা প্রবন্ধের প্রাণ লইয়াও অন্য রূপের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়, তাহা আমরা প্রবন্ধ বলিয়া গ্রহণ করি না।

কিন্তু সমসাময়িক বাস্তব-সমস্যা-সমাধানমূলক রচনা কেবল মাত্র বহিরঙ্গের জন্য নহে, বিষয়ের জন্যও সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। বিষয়-বস্তুর মূল্য যেই মুহূর্তে হ্রাস পায়, সেই মুহূর্তেই ইহার প্রয়োজনীয়তা লুপ্ত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রবন্ধের আজ যে বাংলা সাহিত্যে সমাদর নাই, তাহার প্রধান কারণ এই দুইটিই—প্রথমতঃ ভাষার প্রাচীনত্ব, দ্বিতীয়তঃ বিষয়-বস্তুর সমসাময়িকতা। এমন কি, বিষয় যেখানে কেবলমাত্র সমসাময়িকও নহে, সেখানেও ভাষার প্রাচীনত্বের জন্য ইহাদের সমাদর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার আরও যে একটি কারণ নাই, তাহাও নহে। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগতই মানুষের চিন্তা ও কর্মের ধারা এবং তাহার সঙ্গে জীবনের আদর্শ পরিবর্তিত হইতেছে। মননশীলতার ক্রমবিকাশের সূত্রে সমাজ যতই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে, কিংবা তাহার জীবনোপলব্ধির মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা দিতেছে, ততই সে আর প্রাচীন চিন্তার জড়তার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। জীবনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়াই মানুষ প্রবন্ধের তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে; কিন্তু জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার একটি অবিচল আদর্শ নাই, ইহার কোন সুনির্দিষ্ট চিরকালীন মান নাই, সুতরাং তাহার অভিজ্ঞতারও অন্ত নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিংশ

শতাব্দীর মানুষের জীবনাভিজ্ঞতার অনেক বিষয়েই ঐক্য নাই ; সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তি কিংবা সমাজের চিন্তা বিংশ শতাব্দীতে গ্রাহ্য হইতে পারে না। সমাজ যেমন পরিবর্তনশীল, সমাজের আশ্রিত মানুষের মানস-প্রকৃতিও তেমনি চিরপরিবর্তনশীল, সুতরাং প্রবন্ধের মধ্য দিয়াও জীবন কিংবা সমাজ সম্পর্কে কোন স্থির আদর্শ স্থায়ী হইয়া উঠিতে পারে না।

এখানে সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রবন্ধের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। কাব্য-উপন্যাস-নাটকের মধ্যে চিরন্তন জীবন-সত্যের অভিব্যক্তি দেখা যায়, এই গুণেই ইহা শাশ্বত ; প্রবন্ধের মধ্যেও এই জীবনেরই নানা সমস্যার কথা প্রকাশ পায়, কিন্তু এই সমস্যাগুলি চিরন্তন নহে বলিয়াই কালক্রমে ইহাদের মূল্য হ্রাস পায়। তবে দার্শনিক প্রবন্ধের একটি চিরন্তন মূল্য প্রকাশ পায়, এ'কথা সত্য ; কিন্তু তাহা সাহিত্য নহে, তাহা দর্শনই। জীবনের মধ্য দিয়া সত্যকে উপলব্ধি করিবার পরিবর্তে আত্মার মধ্যে ধ্যানদৃষ্টি দ্বারা যেখানে সত্যকে উপলব্ধি করি, সেখানে তাহা দর্শন হইয়া উঠে এবং দর্শন দর্শনই, তাহা সাহিত্য নহে। সুতরাং 'প্রবন্ধ-সাহিত্য' যখন বুঝি, তখন সাহিত্যের যাহা বিশেষ গুণ, তাহাও প্রবন্ধের মধ্যে আশা করি, কিন্তু দর্শনের মধ্যে তাহা পাই না। সেইজন্য প্রবন্ধ দর্শনের অন্তর্গত না হইয়া সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রবন্ধের মধ্যে কতদূর প্রবন্ধের গুণ আছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায়, ইহাতে একদিক দিয়া দর্শন-চিন্তা যে ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তেমনই অন্য দিক দিয়া 'বাস্তব সমস্যা-সমাধানমূলক চিন্তাপূর্ণ' রচনাও স্থান লাভ করিয়াছে। ধর্মের অভ্যুত্থান চিরদিনই সাহিত্যের পরিপোষক, মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যেও তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। সে যুগে চৈতন্যধর্ম অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই জাতির জীবনে এক পরম সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বাংলা

দেশে দুইটি ধর্মচিন্তা বিকাশ লাভ করিয়াছিল; প্রথমতঃ রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম এবং দ্বিতীয়তঃ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সেবাধর্ম। মধ্য যুগের চৈতন্যধর্ম যেমন প্রধানতঃ হৃদয়াবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই সূত্রেই কাব্য ও গীতির মধ্য দিয়া তাহার ভাব অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীতে তাহার পরিবর্তে প্রধানতঃ মস্তিষ্কই ইহাদের আশ্রয় ছিল বলিয়া গদ্য প্রবন্ধ-রচনার মধ্য দিয়া তাহার বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু এ'কথা স্বীকার করিতে হয় যে, সাহিত্যের রস-সৃষ্টিতে হৃদয়াবেগের যে স্থান, মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞান ও চিন্তার সেই স্থান নাই। সেইজন্য চৈতন্যদেবের একক ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করিয়াও বাংলাদেশে যে যুগান্তরকারী সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, রামমোহন এবং রামকৃষ্ণের যুগল ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করিয়াও তাহার একাংশ সাহিত্যও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে রচিত হয় নাই। চৈতন্যধর্ম কেবলমাত্র অধ্যাত্মচিন্তার মধ্য দিয়াই নহে, সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়াও সমগ্র বাঙ্গালীর অন্তর অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু রামমোহন এবং রামকৃষ্ণের আবেদন বাংলার আপামর জনসাধারণের মধ্যে আজ পর্যন্তও পৌঁছিতে পারে নাই। ইহার কারণ, ইঁহারা মস্তিষ্কের পথে যুক্তি-তর্ক বিচার-বিবেচনা দিয়া ধর্মের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্যদেব এই পথ পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে হৃদয়ের পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। হৃদয়ের পথ সহজ পথ, মস্তিষ্কের পথই জটিল। হৃদয়ের পথেই কাব্যের জন্ম, মস্তিষ্কের পথে প্রবন্ধের বিকাশ। হৃদয়ের পথে যেমন সর্বজনীন অধিকার, মস্তিষ্কের পথে তাহা নাই—যুক্তি ও বুদ্ধিবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে মস্তিষ্কের আবেদন। সেইজন্য চৈতন্যধর্মাশ্রিত সাহিত্য যে শক্তি লাভ করিয়াছিল, রামমোহন-রামকৃষ্ণ প্রবর্তিত ধর্ম সাহিত্যের সেই প্রেরণা দান করিতে পারিল না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের একটি নূতন বিষয়কে ইহা জন্মদান করিল, তাহাই প্রবন্ধ। রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের মূলতত্ত্ব বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা লইয়াই বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের যাত্রা সুরু হইয়াছে এবং সে' যুগের বাংলা প্রবন্ধের

একটি বিপুল অংশ এই বিষয় লইয়াই রচিত হইয়াছে। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্র-শিবনাথ শাস্ত্রী-রাজনারায়ণ বসু, ব্রাহ্মসমাজের এই প্রবর্তক এবং প্রচারকদিগের কর্মপ্রচেষ্টায় সেইযুগে বাংলা প্রবন্ধ একটি বিশেষ শক্তি লাভ করিয়াছিল। সুতরাং চৈতন্যধর্মের প্রয়োজনীয়তায় যদি একদিন এই দেশে বাংলা সাহিত্যে জীবনী-কাব্য, পদাবলী-সাহিত্য প্রভৃতির উদ্ভব ও বিকাশ হইয়া থাকে, তবে এ'কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ'দেশে প্রবন্ধ-সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু এ'কথাও সত্য চৈতন্য-সাহিত্য সামগ্রিকভাবে জাতির জীবনে যে বিপুল প্রেরণা সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ব্রাহ্মধর্মাশ্রিত প্রবন্ধ-সাহিত্য দ্বারা তাহা সম্ভব হয় নাই—ইহা সমাজের সকল স্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। ইহার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মস্তিষ্কের আবেদন অপেক্ষা হৃদয়ের আবেদনই ব্যাপকতর হইয়া থাকে, সেই অনুসারে কাব্য অপেক্ষা প্রবন্ধের আবেদন সীমায়িত।

বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম ধর্মচিন্তা রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের সেবাধর্মের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ইহার মধ্যে হৃদয়ের একটু যোগ স্থাপিত হইলেও ইহার সাহিত্যপ্রচেষ্টা আশানুরূপ ব্যাপক হইতে পারে নাই, বরং ব্রাহ্মসমাজের এই বিষয়ক প্রচেষ্টার তুলনায় তাহা আরও অকিঞ্চিৎকর। ইহার প্রধান কারণ, সেবাধর্ম প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ কর্মের পথটিই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল, চিন্তা অপেক্ষা কর্মকেই ইহাতে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। বিশেষতঃ ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রচার করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া এই সম্প্রদায় প্রধানতঃ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই ইহার দর্শন-চিন্তাকে প্রকাশ করিয়াছে। ইহাতে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রত্যক্ষভাবে কোন উপকার হয় নাই সত্য, কিন্তু বাঙ্গালী সন্ন্যাসীদিগের ইংরেজি প্রবন্ধ রচনায় যে দক্ষতা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা পরোক্ষভাবে বাংলা প্রবন্ধ রচনারও আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছে।

তথাপি এ'কথা স্বীকার করিতেই হয়, রামকৃষ্ণসাহিত্য বলিয়া কোন বিষয় বাংলা সাহিত্যে সম্যক্ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, যদি তাহা পারিত, তবে তাহা প্রবন্ধ-সাহিত্যই হইত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতির রচনায় বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য বিংশ শতাব্দীতেও কি ভাবে যে বেদান্ত-চিন্তাকে প্রকাশ করিতে সার্থক হইতে পারে, তাহার নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যভাষার মধ্যে যে চিন্তার বলিষ্ঠতা ও আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা প্রবন্ধের বিশিষ্ট গুণ; বিশেষতঃ তাঁহার গদ্য-ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার একদিকে যে প্রাণশক্তি এবং অন্যদিকে যে সহজ সরলতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও বাংলা গদ্য-রচনার আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে, রামকৃষ্ণ-ধর্মমতকে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্য সে'দিন গড়িয়া উঠিবার অবকাশ সৃষ্টি হইয়াছিল, সে'দিন তাহার সদ্ব্যবহার হয় নাই; বরং সাম্প্রতিক কালে সেই প্রচেষ্টার নূতন করিয়া সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু যে'দিনই তাহা হউক, প্রবন্ধ-সাহিত্যই ইহার অবলম্বন হইয়াছে।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম কিংবা রামকৃষ্ণ-ধর্মমতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত না থাকিয়া অনেকে সে' যুগে ধর্মের বিষয় লইয়া তাঁহাদের নিজস্ব স্বাধীন চিন্তা প্রবন্ধের আকারে কিংবা প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্ব' তাহার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এ' কথা সত্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ-মানস এক অভিনব অধ্যাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। একদিকে ব্রাহ্মধর্মের মধ্য দিয়া যেমন ইহারই অভিব্যক্তি হইয়াছে, আবার অন্যদিক দিয়া রামকৃষ্ণ-ধর্মমতের মধ্য দিয়াও তাহারই অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছে। কিন্তু ধর্মচিন্তার এই দুইটি মূল প্রবাহ ব্যতীতও ব্যক্তি-মানসে এই বিষয়ক যে চিন্তার যখনই স্বাধীনভাবেও উদয় হইয়াছে, তখনই তাহা প্রবন্ধের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সেই যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের মত ব্যক্তিত্ব এই চিন্তার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবার কথা ছিল না, তাহারই নিতান্ত স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শেষ জীবনে তাঁহার উক্ত প্রবন্ধগ্রন্থ দুইটি রচিত হইয়াছে। রামমোহন কিংবা রামকৃষ্ণেব মত বঙ্কিমচন্দ্র কোন নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া তুলেন নাই, তাঁহার ধর্ম-চিন্তার মধ্য দিয়া সেই প্রেরণা ছিল না; কারণ, হিন্দু সনাতন ধর্মের মূল আদর্শের ভিত্তির উপরই তাঁহার ধর্মচিন্তা তিনি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার চিন্তার মধ্য দিয়া হিন্দুধর্মেরই নূতন ব্যাখ্যান শুনিতে পাওয়া যাইবে, কোন নূতন ধর্মমত প্রবর্তনের পরিচয় পাওয়া যাইবে না। হিন্দুধর্মের দিক হইতে তিনি নূতন যে সকল চিন্তার উৎস খুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহার সমসাময়িক এবং পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যে বহু প্রবন্ধ আত্মপ্রকাশ করিল। পাশ্চাত্ত্য বুদ্ধিবাদের প্রভাব বশতঃ সনাতন হিন্দুধর্ম সে'দিন যে পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিল, ইহাদের মধ্য দিয়া তাহারই আলোচনা দেখা গিয়াছে। কেবল গদ্যপ্রবন্ধের মধ্য দিয়াই যে বঙ্কিমের ধর্মবিষয়ক আলোচনার অনুসরণ দেখা গিয়াছিল, তাহাই নহে—নবীন চন্দ্র সেনের 'ত্রয়ী' কাব্যের মধ্য দিয়াও সে'দিন প্রধানতঃ যে বক্তব্য বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও প্রকৃত প্রবন্ধেরই বিষয় ছিল। নবীনচন্দ্রের কেবল মাত্র 'পলাশীর যুদ্ধ' বাদ দিলে তাঁহার মহাভারতের কাহিনীমূলক কাব্য রচনা বঙ্কিমের ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধসমূহেরই প্রভাবজাত রচনা—উভয়ের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকিলেও বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থই যে নবীনচন্দ্রের কাব্যের জন্মদান করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এইজন্য নবীনচন্দ্রের রচনা কাব্য হইয়াও প্রবন্ধধর্মী রচনা হইয়াছে।

সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর বিভিন্নমুখী ধর্মচিন্তা বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টির সহায়ক হইয়াছিল। ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধের একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহার আলোচনা একটি তত্ত্ব বা ভাবকে কেন্দ্র করিয়াই প্রকাশ পায়। ইহা বিশ্লেষণাত্মক

বলিয়াই ইহাতে অন্তর্দৃষ্টির আবশ্যক, কেবলমাত্র বহির্মুখী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ রচিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ ইহাতে অনুভূতি এবং উপলব্ধির (realization) বিশেষ আবশ্যক হয়। প্রবন্ধও আত্মোপলব্ধিরই অভিব্যক্তি। সুতরাং বহির্বিষয়ের বর্ণনাত্মক প্রবন্ধের তুলনায় অন্তর্মুখী অধ্যাত্মবিষয়ক প্রবন্ধের সাহিত্যগুণ অনেক বেশি। সেইজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর বিচিত্র ধর্মচিন্তার মধ্যে সে' যুগের বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বৈচিত্র্যই প্রকাশ পাইয়াছে।

এখানে একটি জটিল বিষয়ের সমাধান আবশ্যক। অবিমিশ্র দর্শন কিংবা ধর্মচিন্তা প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ পাইলেই তাহা প্রবন্ধ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা কতদূর সঙ্গত হয়? যাহা ধর্ম, তাহা সাহিত্যের দাবী কতখানি পূরণ করিতে পারে? 'ধর্ম-সাহিত্য' বলিয়া কোন কথা স্বীকার করা যায় কি না! কারণ, উপরে আমরা যে বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিলাম, ধর্মচেতনাই তাহার অবলম্বন; সুতরাং 'ধর্ম-সাহিত্য' বলিয়া যদি কোন বিষয় থাকে, তবে তাহা ইহাই। অতএব বিষয়টি প্রথমেই বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মধ্য যুগে বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্ত সাহিত্য, নাথ-সাহিত্য ইত্যাদিই বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল প্রাঙ্গণ অধিকার করিয়া আছে; ধর্ম কিংবা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ তাহাতে কিছুই সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু তাহাতে যে ধর্মের আধারেই সাহিত্য-সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আমরা সহজেই অনুভব করিতে পারিয়াছি। বৈষ্ণব কবিতার মধ্য দিয়া প্রচ্ছন্ন যে মানবিক আবেদন আছে, তাহাই বৈষ্ণবধর্মাশ্রিত বিষয়কে সাহিত্যের মর্যাদা দিয়াছে—তাহা একাধারে যেমন বৈষ্ণব, তেমনই সাহিত্যও বটে। শাক্ত সাহিত্যও ইহার ব্যতিক্রম নহে—ইহাতেও শাক্ত সম্প্রদায়ের জীবনবোধ অবলম্বন করিয়াই ইহার ধর্মবোধ বিকাশ লাভ করিয়াছে, পার্থিব জীবন পরিত্যাগ করিয়া ইহার ধর্মবোধ বিকাশ লাভ করে নাই। নাথ-সাহিত্যও ইহার ব্যতিক্রম নহে। ইহাতেও নাথগুরুদিগের

আলৌকিক সাধন-ভজনের অন্তরালে তাহাদের মানবিক সত্তাটিও সর্বদাই জীবন্ত হইয়া ছিল। তাহাতে সন্ন্যাসের কথা আছে, কিন্তু সন্ন্যাসীর মানবিক পরিচয়টিও রক্ষা পাইয়াছে, এই গুণেই নাথ-সাহিত্যও সাহিত্য। এমন কি, ইহার 'গোপীচন্দ্রের গানে'র কাহিনীর মধ্য দিয়া দেখা যায়, মানবিক ধর্মই গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ধর্মকে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্য দিয়াও কি মধ্য যুগের সাহিত্যের এ গুণটি প্রকাশ পাইয়াছে? এ'কথা কি কেহ বলিবেন যে, রামমোহনের বেদান্ত-চিন্তা মানব-জীবনের রসে রসায়িত? কিংবা রামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়বাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনানুভূতির কোন যোগ স্থাপিত হইয়াছে? এমন কি, সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধের ভিতর দিয়া পার্থিব জীবন-রস সুনিবিড় যোগ স্থাপন করিয়াছে? এ'কথা কেহই স্বীকার করিবেন না। সুতরাং যে অর্থে বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্ত সাহিত্য, নাথ-সাহিত্য আমরা স্বীকার করিয়া থাকি, সেই অর্থে ব্রাহ্ম সাহিত্য বলিয়া কোন বিষয় স্বীকার করিতে পারি না। এমন কি, রামপ্রসাদের শাক্ত পদাবলী ও ব্রাহ্মসঙ্গীতে রসগত পার্থক্য আছে। শাক্ত পদাবলীতে শাক্তের ধর্মচেতনার অভিব্যক্তি হইলেও, তাহা জীবনের কথায় পারিবারিক সম্পর্কের অনুভূতিতে সার্থক সাহিত্য, কিন্তু ব্রাহ্মসঙ্গীত তাহা নহে। রামকৃষ্ণের 'কথামৃত' অমৃত হইলেও, কথা নহে—তাহা তত্ত্ব। কথা সাহিত্য, কিন্তু তত্ত্ব দর্শন। রামকৃষ্ণ ঘরোয়া পরিবেশে তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন বলিয়াই তত্ত্বের তত্ত্বমূল্য হ্রাস পায় নাই; তাঁহার বাণী অনুসরণ করিয়া যাঁহারা প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও নীতিবাক্যই শুনাইয়াছেন, সাহিত্যের রস তাহাদের মধ্য দিয়া পরিবেশন করিতে পারেন নাই।

৪

কিন্তু বিংশতি শতাব্দীর প্রথম দশকেই স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে বাংলা সাহিত্যে ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ রচনার প্রেরণা স্তিমিত হইয়া

আসিয়াছিল। তখন দেশাত্মবোধ কিংবা জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ উদ্বুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালী প্রবন্ধকারগণ যে সকল প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করিলেন, তাহাদের মধ্যে তথ্যনিষ্ঠা কিংবা সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধির পরিবর্তে হৃদয়াবেগই প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ ভিত্তি করিয়া যে সকল প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অন্ধ হৃদয়াবেগ প্রকাশের কোন সুযোগ ছিল না; কিন্তু বিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে যে স্বদেশী আন্দোলন দেখা দিয়াছিল, তাহা যে সাহিত্যের প্রেরণা দিল, তাহা প্রধানতঃ হৃদয়াবেগকেই আশ্রয় করিল। তাহাতে তথ্য বিসর্জিত হইল, যুক্তি নির্বাসিত হইল এবং ভাবপ্রবণতার উদ্দাম নৃত্য দেখা দিল। এই যুগের কেবলমাত্র প্রবন্ধই নহে, ঐতিহাসিক নাটক নামেও যে সকল রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও ঐতিহাসিক তথ্যের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়াবেগের বিস্তৃততর ক্ষেত্র হইতে প্রেরণা লাভ করিতে লাগিল। তাহার ফলে ইহা দ্বারা স্বদেশী আন্দোলনের সাময়িক উত্তেজনার প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হইলেও, এই আন্দোলন অবসান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের মূল্য হ্রাস পাইল।

কিন্তু বিংশতি শতাব্দীর পূর্বেও একান্ত জীবনাশ্রিত প্রবন্ধ যে রচিত হয় নাই, তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে দুইটি রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, একটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর', দ্বিতীয়টি সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ'। এই দুইটি রচনারই সাহিত্যধর্মের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে—ইহারা উপন্যাসধর্মী রচনা, অথচ কোনটিই উপন্যাস নহে। 'কমলাকান্তের দপ্তর' জীবন-দর্শন এবং 'পালামৌ' ভ্রমণোপন্যাস। 'কমলাকান্তের দপ্তর' দর্শন হইলেও ইহার প্রকাশ একান্ত বাস্তব জীবনাশ্রিত, সেই গুণেই ইহা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করিয়াছে; 'পালামৌ'র মধ্যেও জীবন এবং প্রকৃতি এক সঙ্গে ভৌগোলিক তথ্যকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। 'পালামৌ' সম্পর্কে এই বিষয়টি একটু গভীরভাবে বুঝিবার প্রয়োজন আছে যে, 'পালামৌ'এ ভৌগোলিক তথ্য পরিবেশন করিবার

সঙ্কল্প লইয়া সঞ্জীবচন্দ্র লেখনী ধারণ করেন নাই। তিনি নিজেও এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'অনেকদিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল স্মরণ হয় না।' 'পালামৌ'র বিবরণ লিখিতে বসিয়া যে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সকল কথা সে'দিন স্মরণ হয় নাই, তাহাই এই রচনাটির সার্থকতার কারণ। যদি প্রতিটি তথ্য তিনি স্মরণ করিয়া তাহা লিখিয়া যাইতেন, তবে তাহা সাহিত্য হইত না, একটি তালিকা মাত্র হইত। সেই তালিকা হয় ত নির্ভুল হইত, কিন্তু তাহা দ্বারা District Gazetteer-এর কাজ হইত, সাহিত্য পাঠকের কাজ হইত না। 'পালামৌ'র বর্ণনার মধ্যে সত্যের সঙ্গে কল্পনা আসিয়া হাত মিলাইয়াছে, স্বপ্নে ও সত্যে ইহা রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, যৌবনের এক বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নের মধ্যে একদিন লেখকের দৃষ্টিতে পালামৌর যে সৌন্দর্য ধরা দিয়াছিল, তাহা তাঁহার বার্ধক্যের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়া এক নূতন রূপ লাভ করিয়াছিল। ইহা লেখকের মনের পালামৌ, বনের পালামৌ নহে; বনের পালামৌ বন-বিভাগের (Forest Department-এর) বিবরণ মাত্র, মনের পালামৌ সাহিত্য। সঞ্জীবচন্দ্রেরও মনের পালামৌই সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে, সেই গুণেই ইহা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধও হইয়াছে। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, তথ্যের ভার অপেক্ষা আত্মোপলব্ধির গভীরতায়ই প্রবন্ধের সার্থকতা অধিকতর প্রকাশ পায়; সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' যদি একান্ত তথ্যনির্ভর রচনা হইত, তবে তাহা ভূগোলের পাঠ্য হইত, কিন্তু তাহা যে তথ্যের পথ যথাসম্ভব পরিহার করিয়া লেখকের বিশিষ্ট জীবন ও সৌন্দর্যবোধকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছে, সে'জন্যই ইহা উৎকৃষ্ট সাহিত্য হইতে পারিয়াছে। অতএব বলিতেছিলাম 'পালামৌ' লিখিবার কালে লেখকের সকল তথ্য যে স্মরণ হয় নাই, তাহাই সাহিত্যের পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছে। কেবলমাত্র তথ্য ও তত্ত্বকে প্রাধান্য দিবার পরিবর্তে মানুষ ও তাহার প্রত্যক্ষ জীবনের খুঁটিনাটিকে প্রাধান্য দিলে প্রবন্ধও যে কত আকর্ষণীয় হইয়া উঠিতে পারে, 'পালামৌ' তাহার নিদর্শন।

কিন্তু এ’ কথাও কেহ মনে করিতে পারেন, মানুষের জীবনকে মুখ্য করিয়া কোন বিষয় রচনা করিলে, তাহা উপন্যাস হইয়া উঠে—তাহাতে প্রবন্ধের গুণ কিছুই থাকে না। সেইজন্যই ‘পালামৌ’ প্রবন্ধ নহে, ইহা উপন্যাস। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে ‘পালামৌ’র মধ্য দিয়া যে জীবন-দর্শন প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা প্রবন্ধেরই গুণ, উপন্যাসের গুণ নহে ; জীবন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তত্ত্ব এখানে খণ্ড খণ্ড পার্থিব জীবনের সহায়তায়ই বর্ণনা করা হইয়াছে ; কোন নৈর্ব্যক্তিক ভাবকে আশ্রয় করিয়া অখণ্ডভাবে প্রকাশ করা হয় নাই। সেইজন্যই ইহার আবেদন এত সার্থক।

সঞ্জীবচন্দ্রের ‘পালামৌ’র সঙ্গে পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত ‘বিচিত্র-প্রবন্ধ’ গ্রন্থে প্রকাশিত ‘ছোট নাগপুর’ নামক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের তুলনা করিলেই সঞ্জীবচন্দ্রের সার্থকতা যে কোথায় এবং রবীন্দ্রনাথের এই বিষয়ে ত্রুটিই যে কিসে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। এ’ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, রবীন্দ্রনাথের ‘ছোট নাগপুর’ প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্রের ‘পালামৌ’র অনুকরণে রচিত। সঞ্জীবচন্দ্র ‘পালামৌ’র মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্য হইতেও মানুষের জীবন-সৌন্দর্যেরই সন্ধান করিয়াছেন—প্রকৃতিকে দিয়া তিনি সেখানে মানুষকে বুঝিয়াছেন ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ‘ছোট নাগপুরে’ কেবল তথ্যানুসারী প্রকৃতির খুঁটিনাটি বৃত্তান্তই আছে, মানুষ সেখানে একেবারেই অনুপস্থিত। সঞ্জীবচন্দ্র মানুষের কথা দিয়াই ‘পালামৌ’ ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সূত্রপাত করিয়াছেন, আর সেই মানুষ নাগরিক জীবনের সুসভ্য এবং কৃত্রিম জীবনের অধিকারী মানুষ নহে, বরং বন্য মানুষ। রবীন্দ্রনাথের ‘ছোট নাগপুরে’ মনুষ্যচরিত্রের নামগন্ধও নাই। প্রকৃতি বর্ণনাই হউক, তত্ত্ববিচারই হউক, তাহা মানুষকে আশ্রয় করিতে না পারিলে কখনও সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে না। প্রবন্ধও তখনই যথার্থ সাহিত্য হইয়া উঠে, যখন তাহাতে কেবলমাত্র নৈর্ব্যক্তিক ভাববিলাসিতার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ মানুষের জীবন তাহার দৃষ্টান্ত স্থল হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কমলাকান্তের

দপ্তরে'র মধ্য দিয়াও ইহারই পরিচয় পাওয়া যায়। 'কমলাকান্তের দপ্তর' মূলতঃ জীবন-দর্শন, কিন্তু তাহা কমলাকান্ত নামক চরিত্রটিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া দর্শন হইয়াও সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। কমলাকান্ত, প্রসন্ন, ভীষ্মদেব ইহারা যদি এই তত্ত্বকথার মধ্যে অনুপস্থিত থাকিত, তবেই তাহা পূর্ণাঙ্গ দর্শন হইয়া উঠিত, তাহারা ইহার মধ্যে আছে বলিয়াই ইহা সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। 'পালামৌ'র মধ্যেও বন্য জীবনের ছায়ারূপটুকুও যদি না থাকিত, তবে তাহাও ভূগোলের বিবরণ হইয়া উঠিত, কিন্তু তাহা আছে বলিয়াই সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং 'পালামৌ'র মত প্রবন্ধধর্মী উপন্যাস আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আরও অনেক রচিত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনোপলব্ধি তাহাদের কাহারও মধ্যে প্রকাশ পায় নাই বলিয়া ইহাদের একাংশ কেবলমাত্র তথ্যসর্বস্ব রচনা এবং আর এক অংশ উপন্যাস মাত্রই হইয়াছে—যথার্থ প্রবন্ধধর্মী উপন্যাস হইতে পারে নাই।

তথাপি প্রবন্ধের মধ্য দিয়াও যে উপন্যাসের মত শাশ্বত সাহিত্যিক আবেদন সৃষ্টি হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' তাহার প্রমাণ। কিন্তু এই সম্পর্কে আরও একটি বিষয় এখানে মনে হইতে পারে যে, উপন্যাসধর্মী প্রবন্ধের প্রবন্ধ হিসাবে মূল্য কি? তথ্য ও তত্ত্ব যে প্রবন্ধের আশ্রয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' তথ্য কিছু নাই, তত্ত্বই তাহার অবলম্বন; কিন্তু 'পালামৌ'র মধ্যে তথ্যের দাবী নাই, কেবলমাত্র জীবন ও সৌন্দর্যতত্ত্বই তাহার অবলম্বন এ'কথা ত বলিতে পারা যায় না! অহিফেনসেবী জীবন-দ্রষ্টা কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমচন্দ্র এবং অতীত-স্মৃতিচারী সঞ্জীবচন্দ্র ইহাদের উভয়ের অবলম্বন যে অভিন্ন ছিল না, তাহা স্পষ্টই অনুভব করা যায়। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এই প্রশ্ন না থাকিলেও 'পালামৌ'কে কি নির্ভুল ভৌগোলিক তথ্যরূপে গ্রহণ করা যায়? কারণ, প্রবন্ধের মধ্যে তথ্যের ভার যত অল্পই থাকুক না কেন, তাহা

অতথ্য দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে না। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র যৌবনে যাহা দেখিয়াছেন, বার্ধক্যে তাহার স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়া যে তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন, তথ্য হিসাবে তাহার মূল্য কতদূর? বিশেষতঃ যাঁহারা পালামৌর বিষয় জানেন, তাঁহারা বলিবেন, সঞ্জীবচন্দ্রের পরিবেশিত বহু তথ্যই নির্ভুল নহে। কিন্তু এ'কথা পূর্বেই বলিয়াছি, 'পালামৌ' ভূগোলের বিবরণ নহে। সুতরাং পালামৌ জিলার ভৌগোলিক তথ্য সন্ধান করিবার জন্য কেহ ইহা পাঠ করিবে না, ইহা ভূগোলের পাঠ্য বিষয় নহে—বরং সাহিত্যের পাঠ্য বিষয়। যৌবনে যে তথ্যগুলি লেখক প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া লেখকের নিজের জীবনে জারিত হইয়া বার্ধক্যে একটি রস-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, যৌবনের সৌন্দর্যানুভূতির ইহা বার্ধক্যের আত্মোপলব্ধি মাত্র। এক হিসাবে 'কমলাকান্তের দপ্তর'ও তাহাই। ইহাতেও বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনে জীবনেব যে অনন্ত সৌন্দর্য ও রহস্যলোকের সন্ধান পাইয়াছিলেন, বার্ধক্যে তাহারই স্মৃতিচারণা করিয়াছেন। দুই সহোদরের রচনার মধ্য দিয়া এখানে এই ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। 'কমলাকান্তের দপ্তর' যেমন প্রৌঢ়ের অতৃপ্ত জীবন-তৃষ্ণার রূপায়ণ, তেমনই 'পালামৌ'ও প্রৌঢ়ের জীবন-স্মৃতিচারণা। উভয় ক্ষেত্রে আত্মোপলব্ধির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে এবং পূর্বেই বলিয়াছি, সত্যের আত্মোপলব্ধিই প্রবন্ধের প্রকৃষ্ট গুণ। সুতরাং এই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং 'পালামৌ' উভয়ের মধ্যেই প্রবন্ধের এক একটি বিশেষ গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, সেইজন্যই ইহারা উপন্যাস হইয়াও প্রবন্ধ হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, বিংশতি শতাব্দীর রচনাতেও উপন্যাসধর্মী প্রবন্ধের সঙ্গে আমাদের পরিচয় স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের রচয়িতাদিগের মধ্যে বঙ্কিম কিংবা সঞ্জীবের দৃষ্টির গভীরতা নাই; সেইজন্যই প্রবন্ধের ধর্ম অপেক্ষা উপন্যাসের ধর্মই ইহাদের মধ্য দিয়া অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতে এ'কথা বুঝিতে পারা গেল,

'কমলাকান্তের দপ্তর' ও 'পালামৌ' শ্রেণীর রচনাও প্রবন্ধ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। অথচ রামমোহনের বেদান্ত বিষয়ক প্রবন্ধ কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধের সঙ্গে ইহাদের কত পার্থক্য! সেইজন্যই পূর্বে বলিয়াছি, প্রবন্ধ বিষয়ক গবেষণার প্রথম জটিলতাই ইহার সংজ্ঞা লইয়া। অথচ কোন বিষয়ের একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা যদি আমরা নির্দেশ করিতে না পারি, তবে বিষয়টি আলোচনার পক্ষেও সহজ হয় না। অথচ এ'কথা আমরা জানি, ইংরেজি সাহিত্যেও এই বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই।

৫

কিন্তু এ'খানেই ইহার শেষ হয় নাই; রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের আর একটি সম্পূর্ণ নূতন পরিচয় প্রকাশ পাইল। এই পরিচয়টি যেমন বিচিত্র, তেমনই বিস্তৃত। ইতিপূর্বে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারায় বিষয় এবং ভাবগত যে বৈচিত্র্যই দেখা যাক না কেন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার ভিতর দিয়া তাহা সহস্র ধারায় পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্র-কবি-মানস কেবলমাত্র কাব্যের ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল না, প্রবন্ধের মধ্য দিয়াও তাহার বিকাশ দেখা দিল; রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি হওয়া সত্ত্বেও প্রবন্ধ রচনার ধারাকে কোন দিক দিয়াই অবহেলা করিলেন না, কাব্যের ভাব প্রবন্ধের ভিতর দিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন; আলোচনা, জীবনী, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, পত্র-রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার প্রবন্ধ রচনার প্রবাহ অবিরাম অগ্রসর হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাহা তাঁহার সকল চিন্তা, কর্ম ও ধ্যান জগতের উপরই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সেইজন্য প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও কবি রবীন্দ্রনাথকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আর কোন লেখকের সম্পর্কেই এ'কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য হইতে পারে না। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র এবং প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র সর্বত্র এক নহে, কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ এবং প্রবন্ধকার

রবীন্দ্রনাথে কোন পার্থক্য নাই; পার্থক্য কেবল প্রকাশভঙ্গিতে, এক ক্ষেত্রে যিনি যে ভাব কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আর এক ক্ষেত্রে তিনিই সেই ভাবই প্রবন্ধের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু কি তাহাই? রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষাই তাঁহার প্রবন্ধের ভাষা; সুতরাং ভাব কিংবা প্রকাশভঙ্গি উভয়ের দিক হইতেই যদি বিচার করিয়া দেখি, তবে বুঝিতে পারি, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও প্রবন্ধের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিতে যেমন প্রত্যক্ষতা গুণের সাহায্য গ্রহণ করা হয়, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না; সেই গুণেই তাঁহার প্রবন্ধ কবিতারই লক্ষণাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'ইহার যদি কোন মূল্য থাকে, তাহা বিষয়-বস্তু গৌরবে নয়, রচনা-রস-সম্ভোগে।' সুতরাং বস্তু অপেক্ষা রসই তাঁহার লক্ষ্য, অতএব, এই গুণেই তাঁহার প্রবন্ধ মাত্রই কবিতা। বাংলা প্রবন্ধকারদিগের মধ্যে এই গুণের পরিচয় আর কোথাও নাই। অথচ কবিতা বলিয়াই যে তাহা প্রবন্ধের গুণ বর্জিত তাহাও নহে; কারণ, প্রবন্ধের যে বিশিষ্ট গুণ আত্ম-প্রত্যয় এবং আত্মোপলব্ধি—তাহা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে যত আছে, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য প্রবন্ধকারদিগের মধ্যে তত নাই। রবীন্দ্রনাথ কবি বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস এবং উপলব্ধির মধ্যে কবির দৃষ্টি সর্বদাই জাগ্রত ছিল, তাঁহার চিন্তা ও সাহিত্যকর্মের কোন ক্ষেত্রেই তিনি তাহা বিসর্জন দেন নাই। সুতরাং বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্পর্কে গৃহীত কোন সাধারণ সংজ্ঞা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উপর আরোপ করা সম্ভব নহে। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল চক্রবর্তীকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন; এমন কি, তাঁহার প্রথম জীবনের কয়েকটি রচনার মধ্যে বিহারীলালের রচনার প্রত্যক্ষ প্রভাবও অনুভব করা যায়, তারপর উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্কিমচন্দ্রকেই আদর্শ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার প্রথম জীবনে রচিত কয়েকটি উপন্যাসের মধ্য দিয়াই সুস্পষ্ট হইয়া

উঠিয়াছে; কিন্তু প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে কোন আদর্শ ছিল না, প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়া চিন্তা ও রচনার যে ধারাটি তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব ও মৌলিক। ইহার কারণ, একদিকে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দৃষ্টির মৌলিকতা, আর একদিক দিয়া তাঁহার গদ্যভাষার অভিনবত্ব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা গভীরভাবে অনুসরণ করিলে দেখা যায়, তাঁহার চিন্তাধারার মধ্য দিয়া একটি অখণ্ড ঐক্য রক্ষা পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনায়, কিংবা তাঁহার নাট্য-রচনায় যেমন একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা অখণ্ড হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার প্রবন্ধ-রচনার মধ্য দিয়াও একটি অখণ্ড ধারা অনুসরণ করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। ইহার কারণ, কাব্যই হউক, নাটকই হউক কিংবা কথাসাহিত্যই হউক, রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট আত্মসচেতনতার জন্যই তাঁহার সকল সৃষ্টির মধ্য দিয়াই একটি অখণ্ড ভাবসূত্রেব সন্ধান পাওয়া যায়; এমন কি, ভাবসূত্রের এই অখণ্ডতা কেবলমাত্র তাঁহার বিশেষ বিশেষ সাহিত্য-রূপের মধ্যেই বর্তমান নাই, তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যেই তাহা বর্তমান; সুতরাং প্রবন্ধ-সাহিত্য তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে কোনদিক দিয়া তাঁহার সাধনার সামগ্রিক পরিচয়ের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। অতএব রবীন্দ্র-মনীষার বৈচিত্র্যের স্বাদ লাভ করিবার জন্যই তাঁহার প্রবন্ধ-সাহিত্যও তাঁহার কাব্য সাহিত্যের মতই গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি লইয়াই অনুশীলন করা কর্তব্য। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগীদিগের মধ্যে তাঁহার প্রবন্ধ-সাহিত্য যথোচিত মর্যাদা লাভের অধিকারী হইয়াছে, এ'কথা বলিতে পারা যায় না।

এমন কোন বিষয় নাই, যাহা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তথাপি তাঁহার সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের যে মূল্য, তাহা অন্য কাহারও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে নাই। কারণ, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের স্রষ্টা, কেবলমাত্র সাধারণভাবে তাঁহাকে যে

সাহিত্যের স্রষ্টা বলিয়া উল্লেখ করা যায়, তাহা নহে—যে বিশেষত্বের গুণে তিনি জগতের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, সেইগুণেই তাঁহার সাহিত্য বিষয়ক মতবাদ কেবলমাত্র সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য রচনায় অনুধাবনযোগ্য, তাহাই নহে—ইহা যেমন সর্বকালীন বাংলা সাহিত্যের আদর্শ, তেমনই বিশ্বসাহিত্যেরও অনুসরণযোগ্য। সাহিত্যের অলঙ্কার শাস্ত্র পাঠ করিয়া সাহিত্য সমালোচনা করা এক বিষয় এবং সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা অন্তরে অনুভব করিয়া সাহিত্যের সমালোচনা করা সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। সুতরাং যাঁহার প্রতিভার মধ্যে মৌলিক সৃষ্টির গুণ আছে, তাঁহার সাহিত্য বিষয়ক মতবাদের যে মূল্য, সাধারণ সাহিত্য-সমালোচকের আলোচনায় সেই মূল্য নাই।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর সৃজনী প্রতিভার অধিকারীদিগের মধ্যে প্রথমই মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য-সমালোচনার কোন আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই, নিজের সৃষ্টিকার্য লইয়া তাঁহাকে সর্বদাই পরীক্ষা নিরীক্ষা করিতে হইয়াছে; সেইজন্য সাহিত্য সৃষ্টির একটি অবিচল আদর্শ সম্পর্কে তিনি নিজেই কোন স্থির ধারণায় আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই; তাঁহার মধ্যে যে আত্মপ্রত্যয় ছিল, তাহার কেবলমাত্র পরীক্ষা করিতে করিতেই তাঁহার জীবনান্ত হইয়াছে। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার একটি নিজস্ব আদর্শ ছিল, এ'কথা সত্য; কিন্তু তাহা স্বাধীন সাহিত্য বিষয়ক রচনার মধ্য দিয়া তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার কোন ব্যগ্রতা দেখা যায় নাই। কেবলমাত্র ঈশ্বর গুপ্ত কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব বিষয়ক দুইটি আলোচনা এবং তদতিরিক্ত সামান্য কয়েকটি সাহিত্য বিষয়ক অন্যান্য মন্তব্যের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য বিষয়ক মতবাদ সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। অথচ সে'যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিষয়ে যে অধিকার ছিল, তাহা অন্য কাহারও ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধ যেমন তাঁহার জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তেমনই তিনি তাঁহার সাহিত্য বিষয়ক মতবাদ জীবনের

প্রারম্ভ হইতেই প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। পরিণত বয়সে তিনি অপরিণত বয়সে প্রচারিত কোন কোন মতবাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেও, তাঁহার মধ্যে যে সাহিত্যবোধ জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহা সর্বদাই সুস্পষ্ট ভাষায় প্রচার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র যে সমসাময়িক সাহিত্যেরই সমালোচক ছিলেন তাহাই নহে, প্রাচীন সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া লোক-সাহিত্য পর্যন্ত সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে তাঁহার স্বচ্ছ দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছিল। এই বিভিন্ন প্রকৃতির ভারতীয় সাহিত্যের বিচিত্র ক্ষেত্র হইতে তিনি রসোপলব্ধি করিয়া নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী তাহাদের মূল্য বিচার করিয়াছিলেন—সাহিত্য-সমালোচনার সনাতন পদ্ধতি তিনি সর্বত্রই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি গতানুগতিক ধারা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র নিজস্ব কবিদৃষ্টিকেই সজাগ রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছেন; এই বিষয়ে আত্মোপলব্ধিকেই তিনি একান্ত ভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাহার সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি এক একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হইয়াছে। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের একটি ঋষির দৃষ্টি ছিল—যে দৃষ্টি দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান হস্তস্থিত আমলকের মত দৃষ্ট হয়, এই দৃষ্টি সেই দৃষ্টি। এই বিষয়ে তাঁহার 'লোক-সাহিত্য' বিষয়ক প্রবন্ধগুলিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। আজ হইতে প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যখন কেবলমাত্র বাংলার পল্লী হইতে কতকগুলি সংগৃহীত উপকরণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার এই প্রবন্ধগুলি রচনা করেন, তখনও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে লোক-সাহিত্য বিষয়ক অনুরূপ আলোচনার সূত্রপাতই হয় নাই। তারপর পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত হইয়া তাহা ক্রমে আরও পুষ্টি লাভ করিয়াছে; কিন্তু তথাপি দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র তাঁহার ঋষি-দৃষ্টি দ্বারা ইহাদের সম্পর্কে বহু পূর্বে যে উপলব্ধি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে শেষ কথা হইয়া রহিয়াছে—দেশ বিদেশের বহু জ্ঞানী গুণীর এই বিষয়ক কোন সাধনাই রবীন্দ্রনাথের

উপলব্ধিকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। রবীন্দ্র-সাধনা সত্যের সাধনা, যে বস্তুই তাঁহার সত্যদৃষ্টি দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহাই এক অনির্বাণ আলোকে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির মধ্যে একটি সন্ধানী গুণ ছিল, তাহা কেবলমাত্র গতানুগতিক উপায়ে পুথির পাতার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত না; যে জীবন আশ্রয় করিয়া সাহিত্যের বিকাশ, সেই জীবনের পরিদৃশ্যমান বিস্তৃত ক্ষেত্র হইতেও তিনি সাহিত্যের উপকরণ সন্ধান করিয়াছেন। পল্লীসাহিত্যও যে সাহিত্য এবং সাহিত্য বলিয়াই যে ইহার মধ্যে জীবনের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাই অনুভব করিয়া বাংলার নিরক্ষর সমাজের এই অকিঞ্চিৎকর রচনাকেও উপেক্ষা করেন নাই। প্রবন্ধ যে কেবলমাত্র গতানুগতিক বিষয় লইয়াই রচিত হয় না, সাহিত্যও যে কেবলমাত্র গতানুগতিক পথেই পদ-চারণা করে না, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সন্ধানী দৃষ্টির ভিতর দিয়া তাহাই প্রমাণিত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও কেবলমাত্র ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে (Classics)র অলঙ্কারসম্মত আলোচনা নহে, তাহা হইলে তাহা প্রবন্ধ না হইয়া 'টীকা' কিংবা 'ভাষ্য' হইত, ইহারা ভারতীয় শ্রেষ্ঠ মনীষার সাহিত্যকীর্তি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের রসোপলব্ধি—সেই গুণেই ইহারা প্রবন্ধ। এমন কি, ইহাদিগকে প্রবন্ধ বলিলেও ইহাদের যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হয় না, ইহা আরও কিছু বেশি। ইহারা মৌলিক রস-সৃষ্টি—প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি বিষয়ে ভারতের আধুনিক একজন শ্রেষ্ঠ কবির রসোপলব্ধি, রচনার গুণে ইহারা প্রবন্ধ হইয়াও কবিতা। সুতরাং পূর্বে যে বলিয়াছি, বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট একটি সংজ্ঞা গ্রহণ করা কঠিন, তাহা কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের যেমন সূক্ষ্ম সাহিত্য রসবোধ বিকাশ লাভ করিয়াছে, তেমনই জীবন-দর্শনমূলক প্রবন্ধ-

গুলির মধ্য দিয়া তাঁহার সুগভীর জীবনবোধের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, আবার তাঁহার শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলির এক একটির ব্যবহারিক মূল্যও প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন ভাব ও কল্পনাবিলাসী ছিলেন, তেমনই ব্যবহারিক বুদ্ধিরও অধিকারী ছিলেন, তাঁহার ভাব-ব্যাকুলতা কখনও অসংযত হইয়া উঠিয়া জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিত না। ইহা যে প্রবন্ধ রচনার একটি বিশিষ্ট গুণ, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই চরিত্রগুণটি তাঁহার মধ্যে ছিল বলিয়াই তিনি কবি হইয়াও প্রবন্ধকার ছিলেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈচিত্র্যের আস্বাদন করিবার জন্যই তাঁহার প্রবন্ধ-সাহিত্যেরও সেইজন্যই সম্যক্ আলোচনার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ইহার বিস্তার এবং বৈচিত্র্য, গভীরতা এবং ভূয়োদর্শিতা বিস্ময়কর বলিয়াই ইহা সহজসাধ্য নহে।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ'কথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্য দিয়া রবীন্দ্র-চিন্তা যে প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও কোনও ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে নাই। সেই ঐতিহ্য তাহার পূর্ববর্তী প্রবন্ধ রচয়িতাদিগের রচনার মধ্যে তিনি সন্ধান না পাইলেও ভারতীয় শাশ্বত আত্মার মধ্য হইতে সন্ধান করিয়া লইয়াছিলেন। যে আত্মা উপনিষদের ঋষিদের চেতনায় স্পন্দিত হইয়াছিল, যে আত্মা ভারতীয় প্রাচীন কবিকুলের রচনার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সূত্র তাহাদের মধ্য হইতেই সন্ধান করিতে হইবে। এই যোগসূত্রটিকে অনুভব করিতে না পারিলে রবীন্দ্র-সাধনা সম্পর্কেও আমরা সম্যক্ জানিতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যেও ভারতীয় সনাতন ধর্মের আচার-আচরণের তাৎপর্য লইয়া আলোচনা করা হয় নাই। যে আত্মা সত্যের আশ্রয়, সেই আত্মার অনুশীলনের মধ্য দিয়া যে ধর্মের উপলব্ধি, তাহার কথাই প্রকাশ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা তাঁহার কাব্যসাধনা হইতে স্বতন্ত্র ছিল না, তাঁহার কবিজীবন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র একটি ধর্মীয় আচার-জীবন ছিল না, বহির্মুখী কোন আচারকেই তিনি ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন নাই ;—তাঁহার ধর্মবোধ তাঁহার জীবনবোধেরই

অন্তর্নিবিষ্ট, সুতরাং তাঁহার ধর্ম বিষয়কও যে সকল প্রবন্ধ আছে, তাহাও সাহিত্যগুণ হইতে ভ্রষ্ট নহে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের কর্ম ও ধ্যান-ধারণা দ্বারাই তাঁহার অখণ্ড কবি-সত্তা গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে কবিতারও যে মূল্য, প্রবন্ধেরও তাহা অপেক্ষা কিছু কম মূল্য নহে—কারণ, তাঁহার প্রতিটি সৃষ্টিই অখণ্ডভাবে তাঁহার কবি-সত্তার সঙ্গে জড়িত। এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনার আবশ্যক আছে। বর্তমান গ্রন্থের লেখকের দ্বারা সেই অভাব কতদূর পূর্ণ হইয়াছে, বিদগ্ধ পাঠক সমাজ তাহা বিচার করিবেন।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক 'সবুজ পত্রে'র যুগ পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা নির্দেশ করিয়াছেন। এই যুগের বলিষ্ঠতম প্রবন্ধ লেখক প্রমথ চৌধুরী। তিনিও পূর্ববর্তী, এমন কি, রবীন্দ্রনাথের ধারাকেও অনুসরণ না করিয়া বাংলা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে এক নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার মধ্য হইতে দূরাশ্রয়ী কল্পনা এবং স্বপ্নাশ্রয়ী ভাব-বিলাসিতা দূর হইয়া গিয়া ব্যবহারিক জীবনের এক বলিষ্ঠ পরিচয় আত্মপ্রকাশ করিল; কিন্তু তাহা তাঁহার নিজস্ব রস-দৃষ্টি এবং বিশিষ্ট বাগ্‌বৈদগ্ধ্যগুণে অপূর্ব সাহিত্য রসোজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তাঁহার প্রবন্ধের জন্যও প্রবন্ধের নূতন সংজ্ঞা রচনার প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থকার ইঁহার পর আর কোন প্রবন্ধ লেখকের উল্লেখ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, ইহার পরবর্তী যুগের প্রবন্ধকারদিগের মধ্যে এখনও অনেকেই জীবিত থাকিয়া বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতেছেন; তাঁহাদের সম্বন্ধে শেষ কথা বলিবার এখনও সময় আসে নাই।

কিন্তু এ'কথা সত্য, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের 'রস-রচনা'র যুগে প্রবন্ধ-সাহিত্যের একটি বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জীবন-দৃষ্টির মধ্যে যে গুরুত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, বিংশতি শতাব্দীতে তাহার অভাব দেখা দিয়াছে। সেইজন্য ঊনবিংশ শতাব্দী প্রবন্ধ রচনার যুগ ছিল, বিংশতি শতাব্দীতে নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে জীবন-দৃষ্টির মধ্যে সেই গুরুত্ব আর নাই, সেইজন্য

এই যুগে প্রবন্ধ-সাহিত্যের পরিবর্তে যাহা রচিত হইতেছে, তাহা প্রধানতঃ 'রস-রচনা' এবং 'সাংবাদিকতা'। অথচ উনবিংশ শতাব্দীতে 'রস-রচনা'র মধ্যেও যে গুরুত্ব ছিল, তাহাও সাম্প্রতিক 'রস-রচনা'র মধ্যে দেখা যায় না। এমন কি, এই যুগের প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ রচনার মধ্যেও প্রবন্ধের অঙ্গিকগত যে বলিষ্ঠতাই প্রকাশ পাক না কেন, জীবন-দৃষ্টির মধ্যে যে গুরুত্বের অভাব ছিল, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। সেইজন্য তিনি প্রবন্ধকার হিসাবে 'বীরবল' বলিয়া পরিচিত। প্রবন্ধের বিষয় লইয়া হাস্যরস সৃষ্টি করিবার মধ্যে বিষয়-বস্তুর গুরুত্ব রক্ষা পায় না, বরং তাহা তরলায়িত হইয়া যায়। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের মধ্যে বিংশতি শতাব্দীর প্রবন্ধ রচনার যে প্রধান ত্রুটি, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছিল—তাহা জীবন-দৃষ্টির গভীরতার অভাব। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এখানেই তাঁহার প্রধান পার্থক্য।

সমাজ-জীবনের চিন্তা এবং কর্মের সূত্র অনুসরণ করিয়াই প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশ হয়। বর্তমান সমাজ-জীবনের সমস্যা আছে, কিন্তু তাহার সমাধান নাই; সেইজন্য এ'যুগের প্রবন্ধেরও কোন বিশেষ রূপ নাই; কেবলমাত্র প্রবন্ধ-সাহিত্যেই নহে, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেকটি বিষয়ের মধ্য দিয়াই, এই ত্রুটি প্রকাশ পাইতেছে। জীবনের গুরুত্ববোধ যখন লুপ্ত হইয়া যায়, তখন প্রবন্ধ-সাহিত্য 'সাংবাদিকতা' কিংবা 'রস-রচনা'র পর্যায়েই নামিয়া আসে—বর্তমানে তাহাই হইয়াছে। তথাপি বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের এই ধারাবাহিক আলোচনাটি সকল শ্রেণীর পাঠকের নিকটই আদরণীয় হইবে বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর শ্রেণীর যখন আমি ছাত্র, সেই সময়েই বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্পর্কিত একখানি উপযুক্ত সমালোচনাগ্রন্থের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করি এবং তখনই মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, যদি কখনও বাংলা সাহিত্যে গবেষণার সুযোগ লাভ করি, তাহা হইলে প্রবন্ধ-সাহিত্যকে আমার গবেষণার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিব। এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট যখন তাঁহার অধীনে গবেষণা-কর্ম করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম, তখন তিনি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বাংলা সাহিত্যের এই অনালোচিত বিষয়টিকেই নির্বাচিত করিলেন। আশ্চর্য হইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ বোধ করিলাম যে, আমার ঈপ্সিত বিষয়টি সম্পর্কে সাহিত্যক্ষেত্রে আলোচনার অভাব তিনিও গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিত ও অনাদৃত বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক যে গভীর অনুরাগ ও আগ্রহ প্রকাশ করিবেন তাহা স্বাভাবিক। কারণ, বাংলা সাহিত্যে প্রয়োজনীয় অথচ উপেক্ষিত বিষয় অবলম্বন করিয়া তাঁহার ন্যায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ রচনার সফল প্রয়াস ইতিপূর্বে কদাচিৎ লক্ষ্য করা গিয়াছে।

বাঙ্গালীর বোধ-বুদ্ধি ও মনন-চিন্তার যথার্থ এবং সম্যক্ পরিচয় প্রবন্ধ-সাহিত্যের মাধ্যমেই প্রকাশ পাইয়াছে। অথচ এই বিষয় সম্পর্কে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত দুই একটি বিক্ষিপ্ত আলোচনা ব্যতীত সুসম্পূর্ণ ধারাবাহিক কোন ঐতিহাসিক আলোচনা অদ্যাপি লিখিত হয় নাই। এই গ্রন্থের কলেবর হইতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অবহেলিত এই বিশিষ্ট সাহিত্যরূপের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে। বাংলা সাহিত্যে এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য সম্পর্কে ইহার 'পরিচায়িকা'য় যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত আমার কোন বক্তব্য নাই। এই গ্রন্থ দ্বারা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অথচ এ যাবৎ উপেক্ষিত বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রকাশ পাইলেও আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

আধুনিক যুগের সূচনা অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় দেড়শত বৎসরের বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারাবাহিক পরিচয় গভীর বিশ্লেষণ সহকারে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্ভবতঃ কোন উল্লেখযোগ্য বা কৃতী প্রবন্ধকার এই ধারাবাহিক আলোচনার বহির্ভূত হয় নাই। চারিটি বিভিন্ন পর্বে বিন্যস্ত হইয়া এই গ্রন্থের আলোচনা অগ্রসর হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রবন্ধকারকে তাঁহাদের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থের প্রকাশকালের ভিত্তিতে ক্রমানুসারে ইহাতে আলোচনা করা হইয়াছে। ফলে, পূর্বাহ্লে গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য কোন কোন বয়ঃকনিষ্ঠ প্রবন্ধকার তাঁহাদের বয়োজ্যেষ্ঠ লেখকগণ হইতে এই আলোচনায় অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে প্রতি পর্বের 'সূচনা'য় দেশের ঐতিহাসিক ঘটনা ও সামাজিক অবস্থার যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া সমকালীন যুগাদর্শের প্রেরণা বা প্রভাবে প্রবন্ধ-সাহিত্যের ভাব ও রূপ নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। ভাব, ভাষা ও ভঙ্গির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্বে প্রবন্ধ-সাহিত্য যে বিচিত্র রূপান্তর লাভ করিয়াছে এবং বিভিন্ন প্রবন্ধকার তাঁহাদের নিজস্ব রচনাগত বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব দ্বারা সাহিত্যক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্য বা অভিনবত্বের পরিচয় দিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই যথাযোগ্য স্থান ও মূল্য নিরূপিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রতি প্রবন্ধকারেরই রচনা হইতে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতির সাহায্যে তাঁহাদের প্রাবন্ধিক পরিচয় অধিকতর অন্তরঙ্গ ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবার প্রয়াস করা হইয়াছে।

এই গবেষণা-গ্রন্থ রচনায় বহু প্রামাণ্য পুস্তক ও পত্র-পত্রিকাদির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি এবং যথাস্থানে পাদটীকায় তাহার উল্লেখ করিয়াছি। গ্রন্থের পরিশেষে একটি গ্রন্থ-তালিকা 'পাঠ-নির্দেশ' নামে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ-সাহিত্যের ন্যায় দুরূহ ও জটিল বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া পদে পদে যখনই নিজের অজ্ঞতা ও অক্ষমতা প্রবলভাবে অনুভব করিয়াছি এবং গবেষণা-কর্মে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি, তখন যিনি ঐকান্তিক উৎসাহ ও মূল্যবান্ নির্দেশ দিয়া আমার সকল অক্ষমতার বাধা অপসারিত করিয়া এক অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অন্তঃপ্রেরণা আমার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন, তিনি আমার পরম পূজ্যপাদ শিক্ষাগুরু ডক্টর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহোদয়। তাঁহার ন্যায় বিদগ্ধ মনীষীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, স্নেহদৃষ্টি ও আনুকূল্য আমার গবেষণা-জীবনের এক দুর্লভ সম্পদ। বিবিধ কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি গভীর স্নেহবশতঃ এই গ্রন্থের

জন্য একটি মূল্যবান্ পরিচায়িকা লিখিয়া দিয়া গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। সর্বাগ্রে তাঁহার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমার এই গবেষণা-গ্রন্থের জন্য আমাকে 'ডক্টর অব ফিলজফি' উপাধি দান করিয়াছেন। আমার গবেষণা-নির্দেশক ডক্টর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য এম-এ, পি-এইচ্-ডি. সহ এই গবেষণা-গ্রন্থের অপর দুইজন পরীক্ষক ছিলেন ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, পি-এইচ্-ডি. ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন এম্-এ, পি-আর-এস। তাঁহারা আমার এই গবেষণা অনুমোদন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের উভয়কেই আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও সহকর্মিগণের নিকট আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার, আনন্দবাজার পত্রিকার গ্রন্থাগার, রামমোহন লাইব্রেরী, রজনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, বেহালা আর্য্য-সমিতির সত্যেন্দ্র-পাঠাগার, বেহালা লাইব্রেরী ইত্যাদি গ্রন্থাগারসমূহে পুস্তক পাঠ ও গ্রহণের সুযোগ লাভ না করিলে এই গ্রন্থ রচনা কোনক্রমেই সম্ভব হইত না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শ্রীযুক্ত অনাদি দাস ও শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত, জাতীয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিকদ্বয় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীযুক্ত আদিত্য ওহদেদার এবং বিশিষ্ট কর্মচারিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সুকবি শ্রীযুক্ত নচিকেতা ভরদ্বাজ ও শ্রীযুক্ত নকুল চট্টোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মিত্র, আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রন্থাগারের শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়, সত্যেন্দ্র-পাঠাগারের শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দত্ত ও শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, বেহালা লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় – ইঁহাদের সকলের নিকট হইতেই আমি সহৃদয় প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার ও আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করিয়াছি।

সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রণজিৎকুমার সেন ও কবি ৺সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অন্যতম অনুজ শ্রীযুক্ত হারীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ হইতে প্রাচীন পত্র-পত্রিকার ফাইল ব্যবহার করিবার সুযোগ দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায়, কবি-সমালোচক শ্রীযুক্ত

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্ত ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য আমাকে গবেষণা-কর্মে সর্বদা উৎসাহিত করিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত স্বর্ণকমল চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত মদনমোহন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুনীল চক্রবর্তী মহাশয়গণের নিকট আমি নিরন্তর উৎসাহ ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রতন সান্ন্যাল, ডক্টর শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত পবিত্র সেন, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলকুমার ঘোষালের নিকট হইতে বহু পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা পাইয়াছি। অধ্যাপিকা শ্রীমতী মীরারাণী চট্টোপাধ্যায় আমার এই গবেষণা-কর্মে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি অপরিসীম ধৈর্য, সতর্কতা ও নৈপুণ্য সহকারে শব্দসূচী সংকলনের দুরূহ কার্যটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন।

আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বিদ্যোৎসাহী মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার দে মহাশয়ের গভীর স্নেহানুকূল্য না পাইলে আমার এই গবেষণা সুষ্ঠুভাবে কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারিত না। তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁহাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

প্রিন্টার্স´ কর্ণারে'র অন্যতম কর্ণধার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মজুমদার ও তাঁহার সহকর্মিগণের প্রীতি-পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত এই গ্রন্থ-প্রকাশনা সম্ভব ছিল না। তাঁহারা প্রত্যেকেই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। ইতি—

'সৃষ্টি'

বেহালা

চৈত্র, ১৩৬৮ সাল।

শ্রীঅধীর দে

॥ সূচীপত্র ॥

বঙ্কিম-পর্ব

(১৮৭২-১৮৯০)

রবীন্দ্র-পর্ব

(১৮৯১-১৯৪৬)

পরিশিষ্ট

আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা

ভূমিকা

প্রবন্ধ

১

আধুনিক বাংলা গদ্যের অন্যতম মুখ্য সাহিত্যরূপ প্রবন্ধ। প্রায় দেড়শত বৎসর ব্যাপী গভীর অনুধ্যান ও অনুশীলনের ফলে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষতঃ কাব্য, উপন্যাস, ছোট গল্প প্রভৃতি সৃষ্টিধর্মী মৌলিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী মনীষার অপূর্ব পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ও অপরিপুষ্ট হইলেও ইহাতে বাঙ্গালী-প্রতিভার যে দান তাহাও যথেষ্ট প্রশংসা লাভের যোগ্য। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিশিষ্ট সাহিত্যশিল্পীও বাংলা প্রবন্ধ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং এই দুই মনীষীর সার্বভৌম প্রতিভার অতি ভাস্বর দীপ্তিতে প্রবন্ধ-সাহিত্য যে অমিত প্রাণশক্তি অর্জন করিয়া সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময় বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বর্তমানে একটি গৌরবময় আসন অধিকার করিয়াছে। এ' কথা স্বীকার্য যে, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় বাংলা প্রবন্ধের মধ্য দিয়াও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির একটি সুস্পষ্ট পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

ইংরাজী সাহিত্যে Essay অর্থে যে বিশেষ সাহিত্যকৃতি বুঝায়—বাংলায় তাহার সমার্থক হিসাবে 'প্রবন্ধ' নাম প্রচলিত হইয়াছে। ইংরাজী Essay যেমন বিস্তৃত ও বিচিত্র, তেমনি বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের পরিধিও ব্যাপক ও বিশাল। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন লেখকের রচনায়, এমন কি, একই যুগে বিভিন্ন লিপিকুশল সাহিত্যিকের সাধনায় উভয় ভাষাতেই Essay বা প্রবন্ধ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বিষয়বস্তু ও রচনারীতির পার্থক্য ও বৈচিত্র্যই ইহার সাধারণ সংজ্ঞা নির্দেশে জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। Cassell-এর *Encyclopaedia of Literature* গ্রন্থে Essay-র পরিচয় প্রসঙ্গে উল্লেখিত হইয়াছে—

'It is now to be found applied to the most diverse forms of writing, from the solemn and learned treatise to the

slightest and most ephemeral effusion of the moment.'[১] এই প্রসঙ্গে একজন আধুনিক ইংরাজ সমালোচকের মন্তব্যও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

'The many subjects, purposes, and manners of treatment make impossible any very narrow and binding definition of the genre'.[২]

ইংরাজী Essay-র বিষয়বস্তুতেই শুধু নহে, রূপবন্ধেও কতক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। মন্‌টেইন্‌ (Montaigne) যে রূপ ও রীতিতে তাঁহার রচনা প্রকাশ করিয়াছেন, বেকনের (Bacon) রচনা-পদ্ধতি সেইরূপ ভাবে সম্পন্ন হয় নাই। জন্‌ লকের (John Locke) *Essay Concerning Human Understanding* নামক গভীর চিন্তাশ্রিত রচনাও যেমন Essay, তেমনি চার্লস্‌ ল্যাম্বের (Charles Lamb) সুকুমার ভাবাশ্রয়ী রচনা *Essays of Elia*ও Essay, অর্থাৎ উভয়ই একই শিরোনামায় সমগোত্রীয় রচনা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; অথচ এই উভয় লেখকের রচনায় এক ইংরাজী ভাষাগত ঐক্য বা সমধর্মিতা ভিন্ন অন্য কোনরূপ সগোত্রতা নাই। ইংরাজী Essay-র বিষয়বস্তু ও রচনাভঙ্গির বিভিন্নতা ও বিচিত্রতার জন্য *The American Peoples Encyclopedia*-তেও উল্লেখিত হইয়াছে—

'An essay may also be critically self-centred, as are those of Macaulay and Matthew Arnold ; it may be closely reasoned and argumentative, like Locke's *Essay Concerning Human Understanding* ; it may penetrate into every aspect of a subject, like Burke's *Essay on the Sublime and Beautiful.*'[৩]

সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের যদিও কতকগুলি বিশেষ গুণানুযায়ী একটি বিশিষ্ট আত্মপরিচয় আছে, অর্থাৎ তাহা হইতে তাহাদের সামান্য লক্ষণ বা স্বরূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়, তথাপি Essay-র নির্ভুল পরিচয়-নির্দেশক

১ *Cassell's Encyclopaedia of Literature*, **Vol. I. (London, 1953), p. 205.**

২ *The Essay*, **ed. John L. Stewart, (New York, 1952), p. xiii.**

৩ *The American Peoples Encyclopedia*, **Vol. 8. (Chicago, 1955), p. 8-092.**

তদ্রূপ কোন স্বরূপ-লক্ষণ নাই। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, গীতিকবিতা, মহাকাব্য প্রভৃতির স্বরূপ-ধর্ম সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, কিন্তু Essay-র সেই জাতীয় কোন লাক্ষণিক পরিচয় নাই। এই প্রসঙ্গে জনৈক পাশ্চাত্ত্য সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

'While, therefore, we know fairly well what to expect of a poem called lyric, and even of one called an epic or a tragedy we have hardly the vaguest idea of what we shall find in a composition entitled an essay.'[১]

ইংরাজী Essay-র ন্যায় বাংলা প্রবন্ধেরও স্বরূপ-লক্ষণ, অর্থাৎ ইহার বিশেষ সংজ্ঞা ও সঠিক ক্ষেত্র নির্দেশ করা সহজ নহে। ইংরাজী Essay-র ন্যায় বাংলা প্রবন্ধেরও বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি হেতু ইহার স্বরূপ-ধর্ম সাধারণের নিকট সুস্পষ্ট হইতে পারে নাই। ইংরাজীর ন্যায় বাংলা প্রবন্ধেও দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের তথ্য ও যুক্তিপ্রধান রচনা 'বঙ্গদেশের কৃষক'ও যেমন প্রবন্ধ অভিধা লাভ করিয়াছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'নববর্ষা', 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা', 'পাগল' প্রভৃতি নিছক আত্মভাবমূলক রচনাও প্রবন্ধ শিরোনামায় ভূষিত হইয়াছে। অতএব ইংরাজী Essay ও বাংলা প্রবন্ধ এই উভয়েরই সংজ্ঞা নির্দেশের ক্ষেত্রে একই জটিলতা বর্তমান। সুতরাং ইংরাজী Essay-র যথাযথ প্রতিশব্দ যে প্রবন্ধ, এই বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে না।

সাহিত্যসমালোচকগণ সাধারণতঃ সাহিত্যের প্রতি বিভাগেরই একটি স্বাতন্ত্র্য ও স্বগুণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। সমালোচনার সুবিধার জন্য তাঁহারা ব্যাপক অর্থপ্রযুক্ত Essay-কেও দুইটি ধারায় বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন। একটি ধারা Formal বা Objective Essay অর্থাৎ জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব বা তথ্যনির্ভর বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ। এই ধারার রচনাসমূহ ইংরাজীতে 'Dissertation', 'Discourse,' 'tract' বা 'Treatise' নামেও অভিহিত হয়। উইলিয়ম্ হেন্‌রি হাড্‌সন্ (William Henry Hudson) লিখিয়াছেন—

'When the so-called essay grows in bulk and comprehensiveness to the proportions, let us say, of Spencer's *Essay on*

১ **Hugh Walker, *The English Essay and Essayists*, (London, 1915), p. 2.**

progress, the proper term for it is rather 'dissertation' or 'treatise'.'[১]

অপর ধারাটি Informal বা Subjective Essay অর্থাৎ আত্মভাবপ্রধান বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। ইংরাজী সাহিত্যে এই ধারার রচনাসমূহ Familiar বা Personal Essay নামেও আখ্যাত হয়। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের ন্যায় বিষয়বস্তুই সর্বস্ব বা মুখ্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। প্রতিপাদ্য প্রমাণের জন্য উপযুক্ত যুক্তি ও তথ্যের উপাদানসমূহের শৃঙ্খলাসাধনে লেখকের ব্যস্ততা প্রকাশ ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। বরং ইহাতে বিষয় বা বক্তব্যই গৌণ হইয়া যায় এবং লেখকের ব্যক্তিস্বরূপই মুখ্যভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে। বিষয় যাহাই হউক না কেন, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে লেখক নিজেকেই মুখ্যতঃ প্রকাশ করেন। এই জাতীয় প্রবন্ধ সম্পর্কে আর্থার ক্রিষ্টোফার্ বেন্‌সনের (Arthur Christopher Benson) উক্তি উল্লেখযোগ্য—

'An essay is a thing which some one does himself ; and the point of the essay is not the subject, for any subject will suffice, but the charm of personality.'[২]

বেনসনের আরও একটি চমৎকার মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য—

'The essay is the reverie, the frame of mind in which a man says, in the words of the old song, "Says I to myself, says I".'[৩]

ইংরাজী Essay-র ন্যায় বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যও মুখ্যতঃ এই দুইটি ধারা অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন শাখায় প্রসারিত হইয়া আপনার সীমারেখা বৃহত্তর করিয়াছে।

ইংরাজী Essay ও বাংলা প্রবন্ধের বাহ্যিক রূপ সাধারণতঃ ইহাদের আবয়বিক ক্ষুদ্রতা (Comparative brevity) ও অল্পপরিসরে স্বয়ংসম্পূর্ণতার

১ **William Henry Hudson,** ***An Introduction to the study of Literature,*** **(London, 1958), p. 332.**

২ ***The Art of the Essayist,*** **ed. C. H. Lockitt, (London, 1954), p. 139.**

৩ ***Ibid,*** **p. 140.**

দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য উভয় দেশেই সাময়িক পত্রিকাই প্রথমদিকে প্রধানতঃ প্রবন্ধ-সাহিত্যের একমাত্র বাহন বা আশ্রয়স্থল হইয়াছে। সাময়িক পত্রিকার অনিবার্য তাগিদেই এইরূপ ক্ষুদ্রাকার তথ্য ও ভাবগর্ভ রচনার সূত্রপাত হয়। পরবর্তীকালে প্রবন্ধ-সাহিত্যের ভাব বা বিষয় বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আবয়বিক ক্ষুদ্রতার আদর্শও পরিবর্তিত হইয়াছে। (প্রবন্ধ সাধারণতঃ ক্ষুদ্রাকৃতি হয়; কিন্তু প্রয়োজনস্থলে ইহা দীর্ঘতর পুস্তকাকৃতির রূপও গ্রহণ করিতে পারে। অতএব প্রবন্ধের আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সাধারণতঃ কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া লেখক যখন কোন ভাব বা বিষয় যুক্তিযুক্ত ও সংযতভাবে বা পরিপাটিরূপে গ্রন্থন করেন এবং প্রধানতঃ সরস গদ্যরীতিতে ও দীর্ঘ বা অনতিদীর্ঘ পরিসরে তাহার প্রকাশভঙ্গি নিয়মিত করেন, তখনই তাহাকে প্রবন্ধ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।)

২

আধুনিক বাংলা গদ্যে ইংরাজী Essay অর্থে প্রবন্ধের যে রূপ ও রীতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহা প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ছিল না। 'প্রবন্ধ' নামধেয় সাহিত্যরূপটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের দান এবং ইংরাজী সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই বাংলা সাহিত্যে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু 'প্রবন্ধ' এই শব্দটি অতি প্রাচীন। কারণ, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বহু গ্রন্থের নামে 'প্রবন্ধ' শব্দটির বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আধুনিক বাংলায় 'প্রবন্ধ' শব্দটি একটি বিশিষ্ট সাহিত্যরূপই নির্দেশ করে অর্থাৎ প্রধানতঃ শৃংখলাবদ্ধ যুক্তি-চিন্তা-ভাবসমৃদ্ধ গদ্য রচনাই বুঝায়। কিন্তু সংস্কৃতে 'প্রবন্ধ' শব্দ এবম্বিধ অর্থের দ্যোতক নহে। 'প্রবন্ধ' শব্দটির সাধারণ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্দেশিত হইয়াছে 'প্রকৃষ্ট বন্ধন' অর্থাৎ যে কোন প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত রচনাই প্রবন্ধ। সংস্কৃতে গদ্যে পদ্যে উভয় রীতিতেই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে—কেবল গদ্যরীতিই ইহার একমাত্র বা আবশ্যিক বাহন ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত রচনার পশ্চাতে বিবিধ অর্থ উপলক্ষিত হইয়াছে। ছন্দোগত বন্ধন, বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু সম্বন্ধ-রূপ বন্ধন, সর্গ-পর্ব-অধ্যায়াদির বন্ধন, রচনা-ক্রমের ধারাবাহিক পারম্পর্য-রূপ বন্ধন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বন্ধনসমন্বিত গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই সংস্কৃতে 'প্রবন্ধ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রবন্ধের এবম্বিধ অর্থসূচক

অভিধা গ্রহণ করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'মালতী-মাধব', 'রত্নাবলী' প্রভৃতি কাব্য-নাটক সকল রচনাই প্রবন্ধ আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ পণ্ডিত বিশ্বনাথ কবিরাজের মন্তব্য উল্লেখ করা যায় —

'বর্ণরচনয়োরুদাহরিষ্যতে। প্রবন্ধে যথা মহাভারতে শান্তঃ। রামায়ণে করুণঃ। মালতী-মাধবরত্নাবল্যাদৌ শৃঙ্গারঃ। এবমন্যত্র।'[১]

সংস্কৃতে বিভিন্ন প্রকারে বন্ধনীকৃত সাহিত্যই যে কেবলমাত্র 'প্রবন্ধ' শব্দের দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে, তাহাই নহে—বিভিন্ন জাতীয় সাহিত্যের রচনা-সৌন্দর্য ও গ্রন্থন-সৌকর্যের প্রসঙ্গেও 'প্রবন্ধ' কথাটির ব্যবহার হইয়াছে। নাটক-কাব্যাদির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গাশ্রয়ী উপাদানের যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বা সুষ্ঠু সঙ্গতি, সেই সঙ্গতি অর্থেও 'প্রবন্ধ' শব্দের বহুল প্রয়োগ ঘটিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'মহাবাক্য' এই শব্দটিরও প্রচলন দেখা যায়। পারস্পরিক সুসংবদ্ধ, সুসংহত বাক্যসমূহই সাধারণতঃ 'মহাবাক্য' নামে কথিত হয়। এই অর্থানুসারে 'মহাভারত' মহাকাব্যগ্রন্থটি একটি মহাবাক্য। এই প্রসঙ্গে 'সাহিত্যদর্পণে' উল্লেখ আছে—

'প্রবন্ধে মহাবাক্যে। অনন্তরোক্তদ্বাদশ ভেদোঽর্থশক্ত্যুত্থঃ।
যথা মহাভারতে গৃধ্রগোমায়ু সংবাদে।'[২]

সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' শব্দটির এইরূপ বিচিত্র প্রয়োগ হেতু ইহা যদিও কোন নির্দিষ্ট সাহিত্য-কর্মের পরিচয় প্রকাশ করে নাই, কিন্তু ইহা দ্বারা যে একটি সুসঙ্গতিপূর্ণ রচনার আভাস পাওয়া যায়, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও 'প্রবন্ধ' শব্দটির বহুল প্রয়োগ আছে। স্বর্গীয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' 'প্রবন্ধ' শব্দের বিভিন্ন অর্থ উদ্ধৃত হইয়াছে। 'প্রকৃষ্ট বন্ধন' এই অর্থ ব্যতীত 'প্রবন্ধ' অর্থে উপায়, কৌশল, চেষ্টা, আরম্ভ, প্রকার, রীতি, চাতুরী, কুমন্ত্রণা প্রভৃতিও বুঝান হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', 'চৈতন্য-

১ পণ্ডিত বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্যদর্পণং' শ্রীযুক্ত রামচরণ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য কৃত টীকয়া শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ কৃত সংক্ষিপ্ত টীকয়া চ সমেতং, (কলিকাতা, ১৩১৮), পৃঃ ২১৯

২ ঐ, পৃঃ ২১৫

মঙ্গল', 'মনসামঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল', 'শিবায়ন', 'পদকল্পতরু', 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'কাশীদাসী মহাভারত', প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থাদিতে বিভিন্ন অর্থে 'প্রবন্ধ' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দুইটি কাব্যগ্রন্থ হইতে 'প্রবন্ধ' শব্দের প্রয়োগগত বিভিন্ন অর্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাংলা ভাষায় 'প্রবন্ধ' শব্দটির প্রাচীনতম অর্থাৎ প্রথম প্রয়োগ হইয়াছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'—

'এ সব কাজের আহ্মে জানিএ প্রবন্ধ।
এতেকেঁ তোহ্মার তার হৈব নেহাবন্ধ॥'[১]

এখানে 'প্রবন্ধ' শব্দের অর্থ 'কৌশল' বা 'উপায়' বুঝান হইয়াছে।

মধ্যযুগের অন্যতম বিশিষ্ট চরিত-কাব্য গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' 'প্রবন্ধ' শব্দে 'আরম্ভ' ও 'পরস্পর অন্বয়যুক্ত বাক্যাবলী' এই দ্বিবিধ অর্থের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়—

'এই সপ্তদশ প্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ মুখবন্ধ॥'[২]

উল্লিখিত শ্লোকে 'পূর্বাপর-সঙ্গতিযুক্ত রচনা' এই অর্থে 'প্রবন্ধ' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

অতএব ইহা হইতে একটি সঙ্গত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয় যে, সংস্কৃত ও প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' শব্দটির দ্বারা সাহিত্যের কোন বিশিষ্ট বিভাগের পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই।

(আধুনিক বাংলা গদ্যেই প্রথম 'প্রবন্ধ' শব্দটির অর্থ-বৈচিত্র্য লুপ্ত হয় এবং ইহা কেবলমাত্র বিষয় বা ভাবশ্বদ্ধ মননশীল গদ্যরচনাই বুঝাইতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে এই জাতীয় রচনার সূত্রপাত হইলেও, তাহা প্রথমে 'প্রবন্ধ' নামে অভিহিত হয় নাই। 'প্রবন্ধ' শব্দের পরিবর্তে 'প্রস্তাব' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনস্বী ব্যক্তিগণ এই জাতীয় রচনা বুঝাইতে 'প্রস্তাব' শব্দই অধিক ব্যবহার করিয়াছেন।

---

১ মহাকবি চণ্ডীদাস, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', তাম্বুলখণ্ড, ৺বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৯), পৃঃ ৬

২ কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', আদিলীলা, শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত, (কলিকাতা, ১৩৫৫), পৃঃ ৭৮৫

আধুনিক বাংলা গদ্যে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাঁহার মনন-চিন্তান্বিত রচনার নামকরণে প্রথম 'প্রবন্ধ' শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'বাংলা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া 'প্রবন্ধ' শব্দের বর্তমান বিশেষিত অর্থ প্রকাশ করে। পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের বহুল প্রয়োগে 'প্রবন্ধ' শব্দের দ্বারা বাংলা গদ্যের বর্তমান বিশিষ্ট সাহিত্যরূপটি একান্তভাবে নির্দেশিত হয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত গম্ভীরভাবে অনুশীলিত গদ্যরীতির সহায়তায় যে বিষয় বা ভাবের অভিব্যক্তি ঘটে, তাহাই সাধারণতঃ প্রবন্ধ নামে অভিহিত হয়। পণ্ডিত ও সাহিত্যরসিক মহলে এই 'প্রবন্ধ' শব্দটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও সমাদৃত হইয়াছে। 'প্রবন্ধ' শব্দের সমার্থক শব্দ হিসাবে 'প্রস্তাব', 'নিবন্ধ', 'সন্দর্ভ', 'রচনা' প্রভৃতিরও প্রয়োগ বাংলায় লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ইংরাজী Essay শব্দের সুষ্ঠুতম প্রতিশব্দ রূপে বিভিন্ন বাঙ্গালী মনীষিগণ 'প্রবন্ধ' শব্দই অধিকতর প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রাচীন এই 'প্রবন্ধ' শব্দটির একটি বনিয়াদী আভিজাত্যও আছে। সেই তুলনায়, অন্যান্য শব্দগুলি অপেক্ষাকৃত ম্লান বলিয়া মনে হয়। 'প্রস্তাব' শব্দটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' অর্থে প্রচলিত ছিল—পরবর্তী সময়ে ইহা সাধারণতঃ গ্রন্থের 'পরিচ্ছেদ' অর্থে বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'নিবন্ধ' শব্দটির বহুল প্রয়োগ বাংলায় নাই। প্রবন্ধ জাতীয় রচনা বুঝাইতে হিন্দী সাহিত্যে ইহার ব্যবহার অধিকতর দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতে 'নিবন্ধ' শব্দটি প্রধানতঃ গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সন্দর্ভ' শব্দটি আধুনিক বাংলায় সাধারণতঃ 'সংগ্রহ' অর্থেই অধিকতর প্রচলিত। তথাপি সংস্কৃতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বগর্ভ আলোচনাও 'সন্দর্ভ' নামে আখ্যাত হইয়াছে। 'প্রবন্ধে'র সমার্থক হিসাবে 'রচনা' শব্দটি ছাত্র-সমাজেই অধিকতর ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'রচনা' শব্দটির অর্থ অতি ব্যাপক। ফলে ইহা কোন বিশিষ্ট সাহিত্য-কর্মের পরিচয় প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। সর্ববিধ নির্মাণ-কর্মই সাধারণতঃ 'রচনা' নামে অভিহিত হয়। অতএব মননিষ্ঠ, সুসংবদ্ধ ও সুকুমার ভাবসমৃদ্ধ গদ্য রচনার ক্ষেত্রে 'প্রবন্ধ' নামই অধিকতর সার্থক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

'প্রবন্ধ' বলিতে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে যে একটি সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র সাহিত্যরূপ বুঝায়, তাহা সংস্কৃত ও প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় না।

গুরুগম্ভীর মনন-চিন্তা সমৃদ্ধ ভাব বা বিষয় সাধারণতঃ গদ্যেই সুষ্ঠু ভাবে প্রকাশিত হয়। অথচ পূর্বে বাংলা সাহিত্যের বাহন হিসাবে গদ্যের প্রচলন ছিল না। সংস্কৃতেও পদ্যের তুলনায় গদ্য রচনা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল; সকল বিষয়ই পদ্যবন্ধে প্রকাশিত হইত। প্রবন্ধগত বিষয় যেমন রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতিরও সাধারণ বাহন ছিল ছন্দ। অতএব প্রবন্ধ জাতীয় রচনা পদ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত ও আধুনিক-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধধর্মী রচনা যে ছিল না, তাহা নহে।

আলোচনা-ভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধধর্মী রচনার অল্পবিস্তর পরিচয় সংস্কৃত ভাষ্যকারগণের যুক্তি-তর্ক ও নিজস্ব সিদ্ধান্ত সমন্বিত গদ্য রচনার মধ্যেও লাভ করা যায়। পতঞ্জলি বিরচিত 'মহাভাষ্যে'র ভূমিকা, শঙ্করাচার্যের 'বেদান্ত ভাষ্যে'র মুখবন্ধ, সায়নের 'ঋগ্বেদ ভাষ্যে'র উপোদঘাত বা প্রস্তাবনা আলোচনাভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ অভিধা লাভের যোগ্য।

সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম মহাকাব্য মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত 'মহাভারতে'র (অষ্টাদশ পর্ব) বিভিন্ন অংশকেও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ নামে আখ্যাত করা যায়। ইহাদের মধ্যে 'অর্জ্জুন-কৃষ্ণ সংবাদ', 'যুধিষ্ঠির-ভীষ্ম যোগ কথন' প্রভৃতি এই জাতীয় বিভিন্ন অংশগুলি সমাজ, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদির প্রসঙ্গ আলোচনায় উৎকৃষ্ট প্রাবন্ধিক গুণ অর্জন করিয়াছে। সংস্কৃত 'ভাগবত' ও বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থাদির কোন কোন অংশেও দার্শনিক ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধের বীজ লক্ষ্য করা যায়।

মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যে বৈষ্ণবধর্ম বা তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া স্বতন্ত্র ব্যাখ্যানিপুণ গ্রন্থও লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সনাতন গোস্বামী বিরচিত 'বৈষ্ণবতোষণী', রূপ গোস্বামী প্রণীত 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু', জীব গোস্বামী রচিত 'ষট্সন্দর্ভ', গোপাল ভট্ট লিখিত 'হরিভক্তিবিলাস' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও পদ্যবন্ধে রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-গুণান্বিত রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগেই প্রবন্ধ জাতীয় রচনার অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য ও প্রচার লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত', নিত্যানন্দ দাস রচিত 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতির

নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থসমূহ প্রধানতঃ চরিতাশ্রয়ী এবং তত্ত্ব ও তথ্য-প্রতিপাদক রচনা। সাধারণতঃ এই জাতীয় প্রতিটি গ্রন্থই পয়ার ছন্দে লিখিত হইয়াছে। পয়ার ছন্দ মুখ্যতঃ আবেগ-নির্ভর কাব্য তথা সঙ্গীতেরই একমাত্র বাহন ছিল। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ পদকর্তৃগণ এই পয়ারে মধুর পদাবলী রচনা করিয়াছেন। অথচ এই পয়ারের মাধ্যমেই ক্রমান্বয়ে যুক্তি-তর্কনিষ্ঠ তত্ত্ব ও তথ্যপ্রধান রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। চৈতন্য-চরিত গ্রন্থসমূহে চৈতন্য-জীবন, চৈতন্যের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও চৈতন্য-ধর্মতত্ত্বের বিস্তৃত বর্ণনা বা ব্যাখ্যা আছে। এই বর্ণনা বা ব্যাখ্যা সমুদয়ের কোন কোন অংশ এমন সার্থক ও সুষ্ঠুভাবে লিখিত যে, মূল গ্রন্থ হইতে ইহাদের বিচ্ছিন্ন করিলে ইহারা এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বিশেষতঃ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র এক একটি বিশিষ্ট অংশ তত্ত্ব-গভীর উৎকৃষ্ট দার্শনিক প্রবন্ধের মর্যাদায় ভূষিত হইবার যোগ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেব, রায় রামানন্দ ও সার্বভৌমের পারস্পরিক প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া বৈষ্ণব প্রেমধর্মের অনন্যসুন্দর তত্ত্ব অনবদ্যভাবে তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। বিবৃত বিষয় তথ্য, যুক্তি ও সিদ্ধান্তের পরস্পর অন্বয়ে সার্থক প্রাবন্ধিক গুণ অর্জন করিয়াছে। পয়ার ছন্দে লিখিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্যগ্রন্থটি বিভিন্ন প্রবন্ধের একটি কোষ-গ্রন্থ হিসাবেও উল্লেখ করা যায়। বাংলা পয়ার ও ত্রিপদীর মধ্যে দার্শনিক তত্ত্ব-ব্যাখ্যারও যে অসামান্য শক্তি আছে, তাহা 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয়। গদ্যই যে প্রবন্ধ রচনায় আবশ্যিক বাহন নহে, তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই গ্রন্থের ভাষা হইতে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। সুতরাং বাংলা পয়ারের স্থিতিস্থাপকতা গুণ ও ইহার যে কোন জটিল দুরূহ তত্ত্বের ব্যাখ্যান ক্ষমতা হেতু সম্ভবতঃ বাঙ্গালী-সমাজ ইংরাজী সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের পূর্বে বাংলা গদ্যের কোনরূপ অভাব অনুভব করে নাই। অতএব ইংরাজী Essay-র আদর্শে আধুনিক বাংলা গদ্যে প্রবন্ধ রচনার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ জাতীয় রচনা-কর্ম এইরূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে।

৩

ইংরাজী Essay কথাটির প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ 'প্রয়াস'। ইহা মূলতঃ একটি ফরাসী শব্দ। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে ফরাসী লেখক মাইকেল দ্য

মন্‌টেইন্ (Michel de Montaigne) ইউরোপীয় সাহিত্যে সর্বপ্রথম তাঁহার আত্মভাবপ্রধান গদ্য রচনাসমূহ 'Essaies' নাম দিয়া প্রকাশ করেন। এই 'Essaies' হইতে ইংরাজী সাহিত্যে Essay শব্দটির বহুল প্রয়োগ প্রচলিত হয়। আত্মভাবনিষ্ঠ কল্পনা ও অভিজ্ঞতাপ্রধান রচনার সহিত যুক্তি-তথ্যসমন্বিত বিষয়-নির্ভর গাঢ়বদ্ধ সংহত আলোচনাও ইংরাজীতে Essay নামে অভিহিত হইতে থাকে। Essay শব্দের অর্থ যে 'প্রয়াস' অর্থাৎ কোন বিষয় বা ভাব আশ্রয় করিয়া লেখকের সে-সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট, সুসংহত ও সুযুক্তিনিষ্ঠ পরিচয় দান করিবার যে প্রয়াস, তাহা উভয়বিধ গদ্য রচনাতেই লক্ষ্য করা যায়। অতএব ইংরাজী সাহিত্যে উভয় শ্রেণীর গদ্য রচনার ক্ষেত্রেই Essay শব্দটির প্রয়োগ ঘটিয়াছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইংরাজী Essay-র দুইটি শ্রেণী—একটি Formal Essay ও অপরটি Informal অর্থাৎ Personal বা Familiar Essay। বাংলায় ইহাদিগের একটি বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ ও অপরটি আত্মভাবনিষ্ঠ বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নামে আখ্যাত করিয়া আলোচনা করা যায়।

সাহিত্য ক্ষেত্রে লেখকের ব্যক্তিগত ভাব বা জ্ঞান প্রকাশের যত প্রকার পন্থা আছে, তাহার মধ্যে Essay বা প্রবন্ধই সর্বোত্তম পন্থা বা মাধ্যম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অন্যান্য সাহিত্য-কর্ম হইতে প্রবন্ধ-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে, ইহাতে লেখক পাঠকসাধারণের সহিত সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষভাবে বা অন্তরঙ্গ হইয়া নিজস্ব ভাব বা যে কোন জ্ঞানগর্ভ বিষয় স্বচ্ছন্দ বা সহজে প্রকাশ করিতে পারেন। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক প্রভৃতি অন্যবিধ সাহিত্যশিল্পের ন্যায় প্রবন্ধে পাঠক-সাধারণের সহিত লেখকের কোনরূপ স্থূল বা সূক্ষ্ম আবরণ রক্ষা করা হয় না। এই বিষয়ে Compton-র *Encyclopedia*-তে উল্লেখিত হইয়াছে—

'......Unlike the novel or the short story or the drama, the essay does not aim primarily to create characters and through them to tell a story. It speaks directly to the reader, giving the author's views on customs or happenings or people, on art, on books, or on life in general. It may teach, argue, persuade, arouse emotion, or merely amuse. Its subject may be almost anything, from 'Easter Bonnets' to 'Grand Opera'.'[১]

১ ***Compton's Pictured Encyclopedia*, Vol. 4. (Chicago, 1594), p. 398.**

বিশ্বসাহিত্যের দরবারে ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্যই সর্বাপেক্ষা অভিজাত ও সমৃদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই উভয় সাহিত্য, বিশেষতঃ ইংরাজী সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধনের ফলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য অধিকতর পরিণতি ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতি অভিনব সাহিত্যরূপের সৃষ্টি প্রধানতঃ ইংরাজী সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে। আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি সাধনের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ইংরাজী Essay-র আদর্শেই অধুনাতন বাংলা প্রবন্ধ গঠিত হইয়াছে। অতএব বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগে ইংরাজী Essay-র বিভাগ-পদ্ধতিই অনুসরণযোগ্য।

বিষয়বস্তুর প্রাধান্য, বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান উপাদান। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের বিষয় সাধারণভাবেই গুরুগম্ভীর হয়। তথ্য ও তত্ত্বের নিপুণ সমাবেশে এই জাতীয় প্রবন্ধ মূল্যবান ও সমৃদ্ধশালী। লেখকের পাণ্ডিত্য, চিন্তা, বিচার-শক্তি ও ভাবুকতার পরিচয় এই শ্রেণীর প্রবন্ধে মুখ্যভাবে প্রকাশিত হয়। যে কোন বিষয় সম্পর্কে নৈয়ায়িক চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্ত প্রদানই সাধারণতঃ বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের উল্লেখজনক বৈশিষ্ট্য।

বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

(ক) বিবৃতিমুখ্য প্রবন্ধ (Narrative Essay): যেমন—ঐতিহাসিক বা সাময়িক ঘটনা প্রসঙ্গ, খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগের জীবন-বৃত্তান্তমূলক রচনা। (খ) বর্ণনা বা তথ্যপ্রধান প্রবন্ধ (Descriptive or Informative Essay): যেমন—বিজ্ঞানের বিচিত্র প্রসঙ্গ, নিসর্গ প্রসঙ্গ, রাষ্ট্র, সমাজ-সংস্কৃতিমূলক রচনা। (গ) তত্ত্ববিচার বা ভাবনাশ্রিত প্রবন্ধ (Argumentative or Reflective Essay): যেমন—ধর্মীয় মতবাদ প্রসঙ্গ, দর্শন-তত্ত্বমূলক রচনা। (ঘ) সমালোচনা বা ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ (Critical or Expository Essay): যেমন—সাহিত্য প্রসঙ্গ এবং বিবিধ শিক্ষামূলক রচনা। এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিলেও ইহা দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ নির্দেশ করাও সম্ভব হয় না। কারণ, প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই অপর শ্রেণীর প্রবন্ধের অল্পবিস্তর গুণ বর্তমান থাকে এবং বিষয়বৈচিত্র্য ও অভিনব রচনাকৌশল হেতু কোন কোন রচনা উল্লিখিত শ্রেণীর কোনটিতেও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে *The Encyclopedia Americana*-তে উল্লেখিত হইয়াছে—

'The freedom allowed in style and method makes it hard to draw lines between the different kinds of essay, and it is perhaps unnecessary that rigid classifications be made'.[১]

ইংরাজী সাহিত্যে বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বেকন (Bacon), ড্রাইডেন (Dryden), লক (Locke), কার্লাইল (Carlyle), মেকলে (Macaulay), নিউম্যান্ (Newman), এমার্সন (Emerson), রাস্কিন (Ruskin), ম্যাথু আর্ণল্ড্ (Matthew Arnold) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বাংলা সাহিত্যে এই প্রসঙ্গে রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

মৌলিক বা নিছক আত্মগত দৃষ্টিভঙ্গি বা ব্যক্তিহৃদয়ের প্রাধান্য, ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বিশিষ্ট উপাদান। বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের ন্যায় তথ্য ও তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ বা যুক্তিমূলক ক্রমশৃঙ্খলা সাধনের দ্বারা কোন সত্য প্রতিষ্ঠা এই জাতীয় প্রবন্ধের মুখ্য লক্ষ্য নহে। প্রবন্ধগত তথ্য ও তত্ত্বের আলোচনার ভিতর লেখকের নিজস্ব এমন একটি ভাবুকতা বর্তমান যে, তাহা সকল বিচার-বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতা ম্লান করিয়া বিষয়বস্তুকে এক অভিনব রূপ দান করে। লেখকের নিজস্ব দৃষ্টি বা আত্মগত ভাব-সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া যে কোন বিষয়াশ্রিত এই জাতীয় প্রবন্ধ বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের ন্যায় নিছক জ্ঞান বা যুক্তিযুক্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বা সিদ্ধান্তের জন্যই মূল্যবান্ হয় না—ইহার এমন একটি মহিমময় আবেদন থাকে, যে আবেদনে পাঠকহৃদয় গভীরভাবে অভিভূত হয়। সেইজন্য, এই শ্রেণীর প্রবন্ধে বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের ন্যায় .লেখকের বিদ্যাবুদ্ধি বা চিন্তাশক্তির কেবল প্রয়াস বা বাহ্যবস্তুকে মননধারার প্রাখর্য ও সঙ্গতির সহায়তায় নিছক আয়ত্ত করাই বুঝায় না; পরিবর্তে, লেখক ইহাতে আপনার ব্যক্তিসত্তাকেই সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেন —'a genuine expression of an original personality—an artful and enduring kind of talk.'

১ *The Encyclopedia Americana*, **Vol. 10. (New York, 1951), p. 508.**

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বিষয় লেখকের অন্তরগত সত্তার নিবিড় স্পর্শে অপরূপ সৌন্দর্যে জীবন্ত হইয়া উঠে। লেখকের মনে ও প্রাণে যতপ্রকার ভাব উদয় হওয়া সম্ভব, তাহাই আশ্রয় করিয়া এই জাতীয় প্রবন্ধ গড়িয়া উঠে। সুতরাং এই শ্রেণীর প্রবন্ধের ভাব বা বিষয় কোন নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ করা সম্ভব নহে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধও যে-কোন উচ্ছ্বাসতারল্য বা উক্তিবাহুল্য সমন্বিত গদ্য রচনা নহে। এই রচনাতেও প্রথম হইতে শেষাবধি একটি ভাবসূত্র বা বক্তব্যের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যও থাকে এবং ইহাতে লেখকের যে আত্মপ্রকাশ ঘটে, তাহা যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি সংযত।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনায় কোন নির্দিষ্ট রীতিও অবলম্বন করা হয় না। লেখকের বিভিন্ন রকমের মানসিক অবস্থা (Mood), বিচিত্র মনের চপল ক্রিয়াকলাপ বা হৃদয়ের সূক্ষ্ম-গভীর অনুভূতির রূপ-চিত্র বিবিধ রূপ ও রীতিতে পরিপাটি ভাবে প্রকাশিত হয়। আত্মচরিত, স্মৃতিচিত্র ও পত্রাকারেও এই জাতীয় রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইংরাজী সাহিত্যেই প্রধানতঃ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনার বিস্ময়কর প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যে সেই তুলনায় এই জাতীয় প্রবন্ধ অল্পই লিখিত হইয়াছে। ইংরাজী সাহিত্যে প্রবন্ধের সূচনা হইতেই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বিভিন্ন রূপ ও রীতিতে প্রকাশিত হইয়া সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর পূর্বে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনার কোনরূপ সার্থক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগও অপেক্ষাকৃত জটিল। এই জাতীয় প্রবন্ধকে সাধারণভাবে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিলে সুবিধা হয়। সমালোচকপ্রবর মোহিতলাল মজুমদার ব্যক্তিগত প্রবন্ধ 'মনঃপ্রধান' ও 'অন্তরানুভূতিপ্রধান' এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া ইহার স্বরূপ-লক্ষণ অধিকতর স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। মনঃপ্রধান ব্যক্তিগত প্রবন্ধে সাধারণতঃ লেখকের বিচিত্র খেয়ালী-চিন্তা, ভাবপ্রকাশের বিবিধ সুচতুর কৌশল, লঘু হাস্যরস-সৃষ্টির মাধ্যমে গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনা প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে 'বীরবল' অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ রচনা এই জাতীয় প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে, ইহাতে লেখকের একটি স্বতন্ত্র মানসিক ভঙ্গি এবং ভাষার বিচিত্র কলাকৃতিই প্রধান হইয়া উঠে—ভাব বা চিন্তার কোন স্থূল আবরণে পাঠকমন আচ্ছন্ন হইয়া যায় না। বরং লেখকের অভিনব মানসিক বিলাস

ও প্রকাশ-চাতুর্য পাঠকের নিকট অতিশয় উপভোগ্য হইয়া উঠে। ইংরাজী সাহিত্যে এডিসন (Addison), স্টিল (Steele), চেস্টারটন (Chesterton), ম্যাকস্‌বিয়ারবম্ (Max Beerbohm) প্রভৃতির অধিকাংশ রচনা এই জাতীয় প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

অন্তরানুভূতিপ্রধান ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সাধারণতঃ লেখকের আত্মগত গভীর অনুভূতির অনিবার্য প্রেরণায় লিখিত হইয়া থাকে। ইহা লেখকের অন্তর বা হৃদয়ের সূক্ষ্ম ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মর্মগত বিচিত্র উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ হইয়া শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় সর্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে এবং উচ্চাঙ্গের সাহিত্যরসে ইহা প্রাণবন্ত হয়। এই জাতীয় প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে বিরলপ্রায়। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কিছুসংখ্যক প্রবন্ধ ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কোন রচনা এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইংরাজী সাহিত্যে চার্লস্ ল্যাম্ব (Charles Lamb), ডি কুইন্সি (De Quincey), হ্যাজলিট্ (Hazlitt), স্টিভেন্‌সন্ (Stevenson) এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক লেখক অস্কার ওয়াইল্ডের (Oscar Wilde) অধিকাংশ রচনাই এই জাতীয় প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

৪

বিগত শতাব্দীতে অর্থাৎ উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে বাঙ্গালী নিজের জীবনে এক নবজাগরণজাত উৎসাহ ও প্রেরণা গভীরভাবে অনুভব করে। সর্বক্ষেত্রে বাঙ্গালীর এই নবজাত উৎসাহ ও প্রেরণা বিবিধ সাহিত্য-রূপবন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য এইরূপ বিবিধ সাহিত্য-রূপবন্ধের অন্যতম।

রাজা রামমোহন রায় প্রথম বাংলা প্রবন্ধ রচনা করিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই নূতন ধারাটির সূত্রপাত করেন। তাহার পর হইতে বাংলা গদ্যের এই বিশিষ্ট রূপটি বিভিন্ন যুগের বিচিত্র প্রেরণা লইয়া ভাব, ভাষা, চিন্তা ও রূপরীতিতে পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীর রচনাকাল পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য বিচিত্র বিষয় ও রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এবং ইহার পরিধিও ব্যাপক ও বিস্তৃততর হইয়াছে।

এই গ্রন্থে ১৮১৫ হইতে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পরলোকগত বাঙ্গালী লেখকগণের প্রণীত প্রবন্ধ গ্রন্থের উপর মুখ্যতঃ ভিত্তি করিয়া আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের গতি, প্রকৃতি ও স্বরূপ-ধর্ম নির্ণীত হইয়াছে এবং প্রতিটি লেখকের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থের তারিখ অনুযায়ী প্রবন্ধকারগণকে বিভিন্ন পর্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিচার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধের ভিত্তিতে তাঁহাদের রচনা-ধর্ম সম্পর্কেও এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, লঘু তরল হাস্যরস বা নিছক শ্লেষ-ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনা এই গ্রন্থান্তর্গত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। 'রসরচনা'র মানদণ্ডে পৃথক্‌ভাবে এই শ্রেণীর রচনার বিচার-বিশ্লেষণ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য-ধারার সুষ্ঠু পরিচয় লাভের জন্য ইহাকে বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করাই অধিকতর সুবিধাজনক। তথাপি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে উপলব্ধি করা যায় যে, সাহিত্যের পর্ব-বিভাগ সম্পূর্ণভাবে সার্থক বা নিখুঁত হয় না। কারণ, এক পর্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সম্পূর্ণ রীতি বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরবর্তী পর্বে লুপ্ত হয় না এবং এক পর্বের লেখক পরবর্তী নূতন পর্বেও তাঁহার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া রচনা-কর্ম সম্পন্ন করিতে পারেন। অতএব পর্ব-বিভাগ করিয়া লেখক ও তাঁহাদের রচনা-কর্ম সম্পূর্ণ পৃথক্ করা সম্ভব নহে ; তথাপি সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্রে একটি মানদণ্ড নির্দিষ্ট করিয়া না লইলে বিচার-বিশ্লেষণে শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এ'কথা সত্য যে, সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন সূক্ষ্মভাবে ঘটিলেও এক এক যুগে বিশিষ্ট চিন্তাধারা ও প্রতিভাবান্ শিল্পীর নিজস্ব রচনারীতির বৈশিষ্ট্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং এইরূপ লক্ষণীয় পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করিয়া পর্ব-বিভাগও সেই কারণে সম্পূর্ণ অসঙ্গত হয় না।

সাধারণতঃ প্রতি দেশেরই সাহিত্যের সহিত সাময়িক পত্রিকার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বিশেষতঃ বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য সাময়িক পত্রিকার অনিবার্য তাগিদে ও উৎসাহে পরিপুষ্ট হইয়াছে। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশিষ্ট সাময়িক পত্রিকার বিস্ময়কর দান বিশেষভাবে স্মরণীয়। নূতন চিন্তাধারা ও প্রতিভাবান শিল্পীর

নূতন রচনারীতির নির্দেশক হিসাবে বাংলাদেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট সাময়িক পত্রিকার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। অতএব বিশিষ্ট কয়েকটি সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ-কাল গ্রহণ করিলে আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের পর্ব-বিভাগ করা সহজ হয় এবং উক্ত সাময়িক পত্রিকাসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকজন প্রতিভাবান্ লেখকের নামানুসারে পর্ব-গুলিও চিহ্নিত করা যায়।

আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যকে সাধারণতঃ চারিটি পর্বে ভাগ করা যায়—প্রথম: রামমোহন-পর্ব, দ্বিতীয়: অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্ব, তৃতীয়: বঙ্কিম-পর্ব ও চতুর্থ: রবীন্দ্র-পর্ব। রামমোহন রায় বেদান্তের আলোচনা করিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অতএব ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাংলা প্রবন্ধের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সুরু হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ইংরাজ-শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বাংলাদেশের সমাজ ও ধর্মবিষয়ে যে পরস্পর-বিরোধী মতদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, সেই উপলক্ষেই নানাবিধ বাদানুবাদ সমন্বিত বিতর্ক-প্রধান প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত হইয়াছে। 'সমাচার দর্পণ', 'ব্রাহ্মণ সেবধি', 'সম্বাদ-কৌমুদী', 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রভৃতি পত্রিকাসমূহ এই জাতীয় প্রবন্ধ প্রকাশের বাহন ছিল। রামমোহনের অধিকাংশ রচনাই তাঁহার পরিচালিত পত্রিকা 'ব্রাহ্মণ সেবধি' ও 'সম্বাদ কৌমুদী'তে প্রকাশিত হয়। রামমোহন বাংলা গদ্য-ভাষারও ক্রমোন্নতি ও সংস্কার সাধনে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার প্রবর্তিত গদ্যরীতি-পদ্ধতির দ্বারা সমসাময়িক লেখকগণকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেন। সাহিত্য ও সমাজের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে রামমোহনের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত হওয়ায় এই সময়টি 'রামমোহন-পর্ব' নামে চিহ্নিত করা হইয়াছে। রামমোহন ও তাঁহার সমকালীন লেখকগণ ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক বাদানুবাদ অবলম্বন করিয়া বাংলা প্রবন্ধের প্রথম কায়া নির্মাণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু আধুনিক অর্থে প্রবন্ধের যে বিশেষ রসাবেদন, তাহা রামমোহন-পর্বের প্রবন্ধসমূহ দ্বারা সম্ভব হয় নাই।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসারের ফলে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা প্রবলভাবে জাগ্রত হয়। এই অনুসন্ধিৎসা বা কৌতূহল বিবিধ প্রবন্ধ রচনার ভিতর দিয়া চরিতার্থতা লাভ করে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বাংলা প্রবন্ধের রীতি-সৌষ্ঠব ও সাহিত্যিক-মর্যাদালাভে বিশেষ

সহায়ক হইয়াছে। এই সময়ে বাংলা প্রবন্ধের রীতি ও বিষয়গত পরিবর্তনের ফলে একটি নূতন পর্বের সূচনা হয়। সমকালীন দুইজন প্রতিভাবান্ মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামে এই নূতন পর্বের নামকরণ করা যায় 'অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্ব'। অক্ষয়কুমার দত্তই সর্বপ্রথম ইংরাজী Essay-র আদর্শে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্রাকারে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে সর্বপ্রথম একটি শিল্পসম্মত রূপ দান করিয়াছেন এবং তাঁহারই অসামান্য অনুশীলন বা সাধনার ফলে বাংলা প্রবন্ধ রচনার উপযোগী প্রথম সুমার্জিত ও সুগঠিত ভাষা-সৃষ্টি সম্ভব হয়। অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বের প্রবন্ধ-সাহিত্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবন্ধকারগণের রচনায় অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়াছে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' প্রভৃতি পত্রিকা আশ্রয় করিয়া এই পর্বে বিবিধ লেখকগণের গুরুগম্ভীর ভাব বা চিন্তা-সমৃদ্ধ প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় এবং প্রতি প্রবন্ধেই লেখকের একটি সুগঠিত বক্তব্য ও প্রকাশের একটা বিশেষ ভঙ্গি বা Style লক্ষ্য করা যায়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা-ভাস্বর দিব্য-দৃষ্টিপাতে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার অভ্যুদয় ঘটে এবং 'অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্ব' শেষ হইয়া 'বঙ্কিম-পর্বে'র সূচনা হয়। রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও সংস্কৃতিমূলক বিবিধ আন্দোলনে এই পর্ব নবসৃষ্টির প্রেরণায় পূর্ববর্তী পর্ব হইতে অধিকতর দীপ্তিময়। বিষয়-বৈচিত্র্যে ও বিষয়োপযোগী সরস রচনাভঙ্গিতে এই সময় বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা-স্পর্শে বাংলা প্রবন্ধ এক নবতর জীবনীশক্তি অর্জন করে এবং জ্ঞানগর্ভ, তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধও আবেগ-স্নিগ্ধ সাহিত্যিক-স্বাদ মণ্ডিত হয়। গভীর পাণ্ডিত্য, মননশীলতা ও বিচার-বিশ্লেষণী দৃষ্টির সহিত সুগভীর ও সমুন্নত রসবোধের সহজ সমন্বয় সাধনই বঙ্কিম-প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যই বঙ্কিম-পর্বের অন্যান্য প্রবন্ধকারগণের রচনায় অল্পবিস্তর পরিস্ফুট হইয়াছে। সাহিত্য-সমালোচনাত্মক বাংলা প্রবন্ধ সর্বপ্রথম বঙ্কিম-পর্বেই একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় প্রবন্ধ-সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন পর্বের প্রবর্তন করিয়াছেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশের পর হইতেই বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে 'রবীন্দ্র-পর্বে'র সূত্রপাত হয় এবং এই পর্বটি বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও গৌরবময় পর্ব।

রবীন্দ্র-প্রবন্ধের অফুরন্ত বৈচিত্র্য ও অপরিমেয় প্রসারে বিশ্ব-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বাংলা প্রবন্ধ এক বিশিষ্ট আসন দাবী করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। কেবলমাত্র রবীন্দ্র-প্রবন্ধই নহে, এই পর্বের অন্যান্য প্রবন্ধ লেখক যেমন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতির প্রবন্ধও গৌরবদীপ্ত এবং মনন বা ভাবের স্পষ্টতা ও বাচনের গাঢ়তায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি প্রবন্ধেই কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। চিন্তার উপাদান ও হৃদয়ের উপাদান উভয়ই যুগপৎ মিশ্রিত হইয়া তাঁহার প্রবন্ধ একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথেই প্রথম বিষয় বা জ্ঞাননিষ্ঠ প্রবন্ধ সার্থক রসসম্মত ভাবপ্রধান প্রবন্ধের রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

রবীন্দ্র-পর্বে প্রবন্ধের রূপবন্ধেও বিবিধ বৈচিত্র্য দেখা যায়। চিন্তারীতি, বিষয়-বিন্যাস ও ভাষাশক্তির নৈপুণ্য বা অভিনবত্বের মধ্য দিয়া বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতি-পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। নির্বিশেষ সংস্কৃতি-সাধনায় বাঙ্গালীর চিন্তা ও বুদ্ধি অধিকতর বিস্তৃতি ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্র-পর্বে 'সবুজ-পত্রে'র (১৯১৪) আত্মপ্রকাশ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রমথ চৌধুরীর ন্যায় প্রগতিশীল, বিদগ্ধ সংস্কৃতিমান্ ব্যক্তি বাংলা প্রবন্ধ রচনায় নিযুক্ত হইয়া এ'ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট মানসভঙ্গির সূত্রপাত করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে প্রধানতঃ প্রমথ চৌধুরীর দ্বারাই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ (Personal Essay) রচনার ক্ষেত্র অধিকতর প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হইয়াছে।

আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যকে বিষয়-বৈচিত্র্য ও দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বের মানদণ্ডে চারি পর্বে বিভক্ত করিয়া বিচার-বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এ'কথা অনস্বীকার্য যে, রামমোহন-পর্ব হইতে রবীন্দ্র-পর্ব পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য বহু বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এক অখণ্ড সমগ্রতা অর্জন করিয়া বর্তমান গৌরবময় পরিণতি লাভ করিয়াছে।

রামমোহন-পর্ব

(১৮১৫—১৮৪২)

সূচনা

অধুনাতন বাংলা গদ্যের একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপ প্রবন্ধ। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বাংলা গদ্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্বাভাবিক ও সঙ্গত। বাংলা সাহিত্যে বাংলা গদ্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সৃষ্টি। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা হইতেই মুখ্যতঃ আধুনিক কালের সূত্রপাত হইয়াছে এবং এই শতাব্দী বাংলাদেশের সমাজ-জীবন ও সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বাঙ্গালীর বিশিষ্ট মনোজীবন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় পাশ্চাত্ত্য জীবনবোধ ও চিন্তাধারা দেশের ধর্ম-সংস্কৃতি, শিক্ষা-সভ্যতা, সমাজ, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল বিষয়ের উপর এক প্রচণ্ড আঘাত করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় এই নবোদ্ভূত আঘাতের দরুণ বাংলাদেশের বিগত শতাব্দীর সামাজিক ও ধর্মীয় দুরবস্থা, নৈতিক অধোগতি এবং মানসিক সঙ্কীর্ণতা ও নিষ্ক্রিয়তার ক্রমশঃ বিলয়প্রাপ্তি ঘটে। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী জীবনাদর্শ ও রস-রুচির প্রেরণায় নবীন অর্থাৎ আধুনিক বাংলার সৃষ্টি হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর এই নবজাগরণ তাহার নূতন সাহিত্যে নব নব রূপের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে এবং এই সাহিত্যই বাংলার আধুনিক সাহিত্য নামে আখ্যাত হইয়াছে। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই আধুনিক রূপটি বিভিন্ন শক্তিমান মনীষীর চিন্তাশক্তি, কর্মপ্রচেষ্টা ও সাহিত্যকৃতির ভিতর দিয়া ক্রমান্বয়ে এক অভিনব অখণ্ড কান্তি লাভ করিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় দশম শতকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হইলেও সাহিত্যে বাংলা গদ্যের প্রচলন তখন হইতেই সুরু হয় নাই। তখন সকল বিষয়ই প্রধানতঃ কাব্যের আকারে লিখিত হইত। কেবল বাঙ্গালীর মুখে মুখেই বাংলা গদ্যের চলিত ছিল, তাহার কোন লিখিত রূপের নিদর্শন পাওয়া যায় না। চতুর্দশ হইতে

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ধীরে ধীরে চিঠি বা দানপত্রে, দলিল-দস্তাবেজে, সাম্প্রদায়িক ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন প্রসঙ্গে বাঙ্গালীর মৌখিক গদ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লিখিত রূপ লইতে সুরু করে এবং বহু রূপান্তরের পর পর্তুগীজ মিশনারীগণের প্রচেষ্টায় তাহা ছাপার হরফে মুদ্রিত হইয়া এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। সপ্তদশ শতকের বাংলা গদ্যের দুইটি বিশিষ্ট নিদর্শন দোম আন্তনিও (Dom Antonio) রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' (১৬৭৫ ?) ও মনোএল দা আস্‌সুম্প্‌সাম্ (Manoel da Assumpsam) প্রণীত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৭৪৩)। এ'দেশে পর্তুগীজ মিশনারীগণের ধর্মপ্রচার-প্রচেষ্টার পরিচয় এই গ্রন্থ দুইটি হইতে লাভ করা যায়। খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য-প্রচার ও হিন্দুধর্মের অপকর্ষ প্রদর্শনই গ্রন্থ দুইটির প্রতিপাদ্য বিষয়। পরবর্তী কালে লিখিত যুক্তি-তথ্য সমন্বিত বিতর্কমূলক প্রবন্ধের বীজ ইহাতে সামান্যভাবে লক্ষ্য করা গেলেও এই জাতীয় রচনার কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পরবর্তীকালের বাংলা বিতর্কাশ্রয়ী প্রবন্ধের মধ্যে অনুভব করা যায় না।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়ম কেরী, টমাস্, মার্শম্যান্ প্রভৃতি মিশনারীগণ এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলোকনাথ শর্মা প্রমুখ বাঙালী পণ্ডিতগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আধুনিক বাংলা গদ্যের গোড়াপত্তন হয়। উইলিয়ম কেরী দুই প্রতিষ্ঠানেরই মধ্যমণি স্বরূপ ছিলেন। শ্রীরামপুর মিশনের খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের উদ্যোগ ও সক্রিয় প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্য রচনার সূত্রপাত হইলেও ইঁহাদের রচনারীতির মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শ ছিল না এবং কোন মৌলিক চিন্তা বা ভাবাশ্রিত গ্রন্থ রচনার সার্থক প্রয়াসও ইঁহাদের দ্বারা সম্ভব হয় নাই। দেশী-বিদেশী প্রচলিত উপকথা, আখ্যায়িকা বা ঐতিহাসিক কাহিনীর অনুবাদ ও তাহাদের সংক্ষিপ্ত সারাংশ সংকলনের মধ্যেই বাংলা গদ্য মুখ্যতঃ সীমায়ত ছিল। শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টীয় ধর্ম-প্রচারকগণ বাংলা ভাষায় প্রধানতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম-গ্রন্থাদির অনুবাদ-কর্মেই ব্যাপৃত ছিলেন। বিদেশী রাজশক্তির স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যকল্পেই প্রথম কয়েক বৎসর নিছক ছাত্র পাঠোপযোগী গ্রন্থ ও খ্রীষ্টীয় ধর্মোপদেশমূলক গদ্য রচনাই এই উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়।

রামমোহন রায়ই প্রথম পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত, প্রয়োজন-নিরপেক্ষ অথচ ভাষ্য-নিপুণ যুক্তিনিষ্ঠ বিচারপ্রধান রচনা প্রকাশ করেন। তিনিই বাংলা গদ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া একটি নূতন বিভাগের প্রবর্তন করিয়াছেন ও বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রেও সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন পর্বের সূচনা হইয়াছে। রামমোহন রায়ের যুগান্তরকারী প্রতিভা-চিহ্নিত রচনাকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিচার-বিতর্কাশ্রয়ী প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। অতএব বাংলা প্রবন্ধের প্রত্যুষ-পর্বকে রামমোহন-পর্ব বলিয়া চিহ্নিত করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নহে। ১৮১৫ হইতে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা গদ্য রচনার ক্ষেত্রে রামমোহনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। রামমোহনের ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত ও প্রতিনিধিত্বমূলক রচনাই এই পর্বের প্রধান ঐশ্বর্য।

দেশে ইংরাজ-শাসন দৃঢ়তর হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মভাব বাঙ্গালীর জীবন ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। ধর্ম, সমাজ ও জীবনের মৌলিক মূল্যবোধের সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধনে সাধারণ জনসমাজের মধ্যে ভাব-সংঘাত তীব্রতর হইয়া উঠে। এইরূপ ভাবদ্বন্দ্ব পূর্ণ অবস্থার মধ্যে রামমোহনের আবির্ভাব হয়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, চিন্তাধারা ও জীবন-দর্শনের সহিত তিনি গভীরভাবে পরিচিত হইয়া এক নূতন দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার এ দৃষ্টি যেমন নিছক পাশ্চাত্ত্য সাংস্কৃতিক দৃষ্টি নহে, তেমনি রক্ষণশীল প্রাচ্য হিন্দুত্বের মধ্যেও রামমোহনের ভাব বা অন্তর্দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয় নাই। তিনি উভয়ের মধ্যে একটি সমন্বয় স্থাপন করিয়া নিজস্ব মতাদর্শ দেশের জনসমাজের মধ্যে প্রচার করিতে সুরু করেন। ইংরাজ-শাসন প্রবর্তিত হইবার পর খ্রীষ্টান মিশনারীগণ যখনখ্রীষ্টধর্ম প্রচারের অনুমোদন লাভ করিয়া ব্যাপকভাবে দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে ধর্ম-প্রচার করিতে সুরু করিলেন, তখন হিন্দুসমাজের মধ্যে একটি বিশেষ আলোড়ন উপস্থিত হয় এবং রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায় ইহার বিরোধিতা করিতে থাকেন। রামমোহন যদিও বেদান্ত গ্রন্থসমূহের অনুবাদ ও আলোচনার মধ্য দিয়া প্রচলিত হিন্দুধর্মের বহু দেববাদ ও সাকারোপাসনার বিরুদ্ধতা করিয়াছেন, তথাপি উপনিষদ-বেদান্ত-আশ্রিত একেশ্বরবাদী হিন্দুধর্মের শাশ্বত সত্য প্রচারে তিনি কোনদিন দ্বিধাগ্রস্ত বা পশ্চাৎপদ হন নাই এবং ফলে খ্রীষ্টান মিশনারীগণের প্রচারিত হিন্দুধর্মের প্রতি বিকৃত মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে তিনি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

অধিকন্তু খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদের অসারতা যুক্তিগর্ভ আলোচনা দ্বারা প্রমাণ করিয়া রামমোহন খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক মিশনারীগণকেও প্রবলভাবে আক্রমণ করেন। এইরূপে উভয় পক্ষই ক্রমান্বয়ে বাদ-প্রতিবাদমূলক রচনা প্রকাশ করেন এবং এই সকল রচনার বাহন হিসাবে কয়েকটি সাময়িক পত্রিকারও উদ্ভব হয়। খ্রীষ্টান মিশনারীগণ 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮) প্রকাশিত করিলেন এবং রামমোহন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১), 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১) প্রভৃতি সাময়িক পত্রও এই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে বহুবিধ বিতণ্ডামূলক প্রবন্ধ এই সকল পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই জাতীয় বিচার-বিতণ্ডাপ্রধান রচনার অধিকাংশই সংকলিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। এ' কথা অনস্বীকার্য যে, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনাসমূহের মধ্যে রামমোহনের রচনারই একটি বিশিষ্ট মূল্য ছিল। কারণ, তাঁহার ন্যায় যুক্তি-তথ্য সমন্বিত ও নিজস্ব একটি রীতিসম্মত অর্থাৎ সরল ও সুষম (balanced) বাক্যভঙ্গিম রচনা তৎকালে রামমোহনের স্বপক্ষ বা প্রতিপক্ষ কাহারও মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। অতএব রামমোহনের যুক্তি-তর্কাশ্রয়ী রচনা একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত হইয়াছে। বিচার-বিতর্কাশ্রয়ী প্রবন্ধ ইংরাজী সাহিত্যে সাধারণতঃ 'Disserttaion' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে রামমোহন-পর্বের রচনা প্রধানত: ইংরাজী 'Dissertation' জাতীয় রচনার অনুরূপ।

ধর্মীয় আন্দোলনের সহিত সামাজিক আন্দোলনও তৎকালে অবিমিশ্র ভাবে জড়িত ছিল। দেশের মধ্যে সামাজিক প্রথা বা আচার-আচরণ, কু-সংস্কার সম্পর্কেও নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক উত্থিত হয়। সতীদাহ-আন্দোলন তৎকালীন বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রামমোহন এই সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনেও প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। সহমরণ প্রথার বিরোধিতা করিয়া তিনি বহু রক্ষণশীল আচারনিষ্ঠ হিন্দুর অপ্রিয়পাত্র হন এবং এমন কি, তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন। 'সম্বাদ কৌমুদী'র অন্যতম পরিচালক ভবানীচরণ রামমোহনের সামাজিক মত নির্বিশেষে গ্রহণ করিতে না পারিয়া রামমোহন ও তৎকর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত পত্রিকার সহিত সম্পর্ক ছেদ করেন এবং স্বয়ং

'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২) নামে একটি নূতন পত্রিকা প্রকাশ করিয়া রামমোহন সমর্থিত মতাদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এইভাবে ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত নানা আলোচনা ব্যাপকভাবে অনুশীলিত, পঠিত ও লিখিত হয়। বহুবিধ সামাজিক কু-প্রথা, বিভিন্ন ধর্মীয় তত্ত্ব অর্থাৎ পৌত্তলিকতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, নাস্তিক্যবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবিধ বিচার মূলক রচনাই প্রধানতঃ রামমোহন-পর্বে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

রামমোহনের ন্যায় মনীষাদীপ্ত, ব্যক্তিত্ব-গম্ভীর পুরুষ সমকালীন বাংলাদেশে কেহ ছিল না। তাঁহার তত্ত্বনিষ্ঠ যুক্তিধর্মী রচনায় স্বীয় মনীষা ও প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্বই এই পর্বে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনিই একমাত্র দেশের সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা সংক্রান্ত প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই প্রধান অংশ গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার স্বপক্ষ ও বিরোধীপক্ষ বা সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। রামমোহনের প্রত্যক্ষ প্রভাবিত স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ লেখকগণের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ব্রজমোহন মজুমদার, গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও ইঁহাদের রচনার মধ্যে বাগ্‌ভঙ্গিমা ও রচনাশৈলীর অভিনবত্বের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন নাই; তথাপি বিতর্কমূলক আলোচনার গতিপ্রবাহ অটুট রাখিয়া ইঁহারা যে এই জাতীয় রচনার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পথ অধিকতর প্রশস্ত করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তী অংশে ইঁহাদের সম্পর্কে পৃথক্‌ভাবে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে।

এ'কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, দেশের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়েই যখন স্থিতিশীলতার (stability) অভাব হয় এবং সাধারণ মানসচিত্তে একটি দ্বান্দ্বিকভাব সর্বদাই বর্তমান থাকে, তখন দেশের সাহিত্য-সাধকগণের পক্ষে সুস্থভাবে, অবসর-বিনোদনের মুহূর্তে স্বতঃস্ফূর্ত শিল্প-প্রেরণায় রসসম্মত সাহিত্য রচনা সম্ভবপর হয় না। রামমোহন-পর্ব বিবিধ আন্দোলন-আলোড়ন মুখর, ভাব-সংঘাত বহুল জটিল একটি পর্ব—এই পর্বে বিশুদ্ধ রসগুণোপেত মৌলিক সাহিত্য রচনার প্রয়াস সম্ভব নহে। সেইহেতু, রামমোহন-পর্বে নিখুঁত সাহিত্য-গুণান্বিত রচনার সাক্ষাৎ লাভ করা যায় না। দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবেশের অনিবার্য প্রভাব বশতঃ এই পর্বের রচনা নিছক উদ্দেশ্য-নির্ভর বিচার-বিতর্কাশ্রয়ী হইয়া উঠিয়াছে।

রেভারেণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের সমসাময়িক অন্যান্য লেখকগণের ন্যায় তাঁহা দ্বারা প্রত্যক্ষ-প্রভাবিত লেখক না হইলেও, তাঁহাকে রামমোহন পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যদিও রামমোহন-পর্বের নির্দিষ্ট কালসীমা অতিক্রান্ত হইলেও তাঁহার বহুমুখী রচনা-কার্য অব্যাহত ছিল এবং পরবর্তী-কালেই তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তথাপি তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ পুস্তিকা এই পর্ব-চিহ্নিত সময়ের মধ্যে লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচনার অধিকাংশই ধর্মতত্ত্ববিষয়ক অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব-বিচার ও মাহাত্ম্য-প্রচারই তাঁহার সকল রচনার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহার বিচার-বিতর্কাশ্রয়ী রচনারীতিতে রামমোহনের রচনাদর্শের অনুস্মৃতি লক্ষ্য করা যায়। অতএব রামমোহন দ্বারা প্রত্যক্ষ-প্রভাবিত না হইলেও কৃষ্ণমোহন যে পরোক্ষভাবে রামমোহনের বিতর্কমূলক প্রবন্ধের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এ'কথা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং রামমোহন-পর্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া কৃষ্ণমোহনের রচনা-কর্মের বিশদ পর্যালোচনা হইয়াছে।

রামমোহন-পর্ব আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রত্যূষ অর্থাৎ শৈশব পর্ব। রামমোহনের নায়কত্বে এই পর্বের লেখকগণ প্রধানতঃ সমস্যামূলক বিষয় অবলম্বন করিয়া ক্রমসংবদ্ধভাবে প্রবন্ধ রচনার যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে সদ্যপ্রসূত বাংলা প্রবন্ধ একটি প্রাথমিক আকৃতি লাভ করিয়াছে মাত্র।

প্রথম অধ্যায়

রামমোহন রায়

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা, শিক্ষা ও ধর্ম-সংস্কৃতি বাঙ্গালীর ধর্মচেতনার প্রতি তীব্র আঘাত করিয়াছিল বলিয়া বাংলাদেশে তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়া ও ধর্ম-আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িক ধর্ম-বিরোধের ফলে বাঙ্গালী হিন্দু স্বধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়াসে সর্বপ্রথম আত্ম-সমালোচনা ও আত্মবিশ্লেষণের পন্থা অনুসন্ধান করিল। বাঙ্গালীর এই আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মচেতনা বর্ধনের অগ্রদূত হইলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনিই বাঙ্গালীর নবজাগৃতির স্রষ্টা। (বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি যুক্তিবাদ ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির প্রবর্তন করিলেন। ভারতীয় বেদ, উপনিষদ ও বিবিধ প্রাচ্য দর্শন শাস্ত্রসমূহ আত্মনির্ভর স্বাধীন দৃষ্টির সহায়তায় নূতন-ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার ধর্ম ও তত্ত্ববিষয়ক রচনার মধ্য দিয়া তাহাদের মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। বাংলা গদ্যে প্রথম বিচার-বিতর্কমূলক মৌলিক রচনার সূত্রপাত হইল। কোন বক্তব্য বিষয় ধারাবাহিকভাবে সুস্পষ্টতার সহিত প্রকাশ করা, যুক্তির পারম্পর্য রক্ষা করিয়া কোন সিদ্ধান্ত প্রদানের প্রয়াসের মধ্যে প্রবন্ধ জাতীয় রচনার সার্থকতা নির্ভর করে। রাম-মোহনের বিচার-বিতর্কাশ্রিত রচনার মধ্যে এই গুণগুলি বহুল পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক বাংলা গদ্যে এই অভিনব, স্বতন্ত্র জাতীয় রচনাই প্রবন্ধ নামে অভিহিত হইয়াছে। রামমোহন হইতেই আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য ধারার গতিপথের সূচনা হয়। তাঁহার লেখনী ধারণের পূর্বে ইউরোপীয় ধর্ম-যাজকগণ ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণের উদ্যোগে বাংলা গদ্য রচনার ব্যাপক অনুশীলন সুরু হয় এবং সেইসময় বাংলা গদ্য প্রধানতঃ পাঠ্যপুস্তক রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।) রামমোহনের পূর্ববর্তী বাংলা গদ্য রচনার মধ্যে প্রবন্ধের সামান্য লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও সুস্পষ্টরূপে তাহা প্রকাশিত হয় নাই এবং আত্মশক্তি ও আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠিত প্রবন্ধের পর্যায়ে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

প্রবন্ধ মাত্রেই গদ্যরচনা, অথচ গদ্যরচনা মাত্রই প্রবন্ধ নহে। রামমোহনই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্য রচনাকে ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা আলোচনার বাহন করিয়া তুলিলেন। তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব যে, তিনিই প্রথম ছাত্রপাঠ্য বহির্ভূত বিষয় অবলম্বন করিয়া বাংলা গদ্যে মৌলিক গ্রন্থ রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন। রামমোহন বাঙ্গালীর চিত্তক্ষেত্রে অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তিনিই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যুক্তিমূলক মৌলিক প্রবন্ধ রচনার অগ্রদূত। পরবর্তী কালে মৌলিক প্রবন্ধ গ্রন্থাদি রচনার যে বহুল প্রয়াস ও প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তাহার মূলে রামমোহনের গ্রন্থ রচনার আদর্শই যে প্রত্যক্ষভাবে বর্তমান ছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আধুনিক বাংলা গদ্যে তর্ক-বিতর্কমূলক রচনা রামমোহন প্রবর্তন করিলেও বাংলা পদ্যে এই জাতীয় আলোচনা অর্থাৎ যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে বিরোধীমত খণ্ডন করিয়া স্বীয় মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারগণের আলোচনাও এই জাতীয়। অতএব রামমোহন যে সম্পূর্ণ নূতন রচনারীতি আকস্মিকভাবে প্রবর্তন করিলেন, এ'কথা সত্য নহে। কারণ, বাংলাদেশের ন্যায় বা তর্কবোধের প্রাচীন ঐতিহ্য যে ইহার পরোক্ষে কোনরূপ প্রেরণা সঞ্চার করে নাই, তাহাও সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহা স্বীকার্য যে, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ ও বাদানুবাদের মধ্য দিয়া রামমোহন আধুনিক বাংলা প্রবন্ধের প্রথম বনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়াছেন।

রামমোহন রায়ের দ্বারা বাংলা গদ্যের একটি সম্পূর্ণ নূতন ধারার বিকাশ হইলেও তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া সাহিত্যিক ও শিল্পগত দাবী সার্থকভাবে পূর্ণ হইতে পারে নাই। রামমোহন মূলতঃ নৈয়ায়িক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন—সাহিত্য বা শিল্প-প্রতিভা তাঁহার ছিল না। সেই কারণে, তাঁহার রচনায় সহজাত রস-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব অনুভূত হয়। তিনি অনুভূতি অপেক্ষা যুক্তিরই অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছেন। রামমোহনের অসাধারণ মনীষা এবং যুক্তি-তর্কের আশ্রয়ে সত্য-প্রতিষ্ঠার অদম্য প্রয়াস তৎকালে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার রচনায় সাহিত্যিক রসপিপাসা যে নিবৃত্ত হয় না, তাহার অনিবার্য কারণও উল্লেখ করা যায়। সহজাত রসপ্রেরণায় শিল্পী যেমন তাঁহার সৃষ্টি-কর্মে প্রণোদিত হইয়া থাকেন এবং সে সৃষ্টি-কর্মও যেমন রসসম্মত হয়; তদনুরূপ সহজ প্রেরণা

রামমোহনের রচনার মূলে ছিল না। প্রধানতঃ ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের প্রেরণার বশেই বাংলাভাষায় তিনি গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এ'কথা অস্বীকার করা যায় না যে, সমাজ ও ধর্মাচার ঘটিত বিক্ষোভের ফলেই রামমোহনের সর্ববিধ রচনার সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব বিক্ষোভজাত রচনা সাধারণতঃ সাত্ত্বিক রসসৃষ্টি সাধনে সমর্থ হয় না। ব্যবহারিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে সকল রচনা প্রকাশিত হয়, তাহা কখনই রসসম্মত সাহিত্য পদবাচ্য হয় না। সেইজন্য রামমোহনের রচনায় সাহিত্যরস দুর্লভ। সুতরাং তাঁহাকে বিশুদ্ধ সাহিত্য-শিল্পীর মর্যাদায় ভূষিত করা যায় না।

রামমোহনের রচনা বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সাহিত্য-শিল্পীর পরিবর্তে তাঁহাকে প্রকৃত বিতর্কমূলক প্রবন্ধ রচনার পথপ্রদর্শক বলিয়া অভিহিত করা যায়। বিবিধ ভাষায় সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রদর্শী রামমোহন মুখ্যতঃ বৈদান্তিক ছিলেন এবং তিনি তাঁহার বিভিন্ন ধর্ম ও তত্ত্বাশ্রিত বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের মধ্য দিয়া একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া তাহা প্রচার করেন। শাস্ত্রগ্রাহ্য বিবিধ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া তিনি হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজার অসারতা প্রমাণ করেন। পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ বা অলৌকিকতত্ত্বের বিরাধী হইলেও রামমোহন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ মৌলিক গুণগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাহারই ভিত্তিতে খ্রীষ্টান ধর্মসম্প্রদায়ের হিন্দুধর্ম-বিরোধী মতামতের কঠোর সমালোচনা করেন। রামমোহনের সকল আলোচনাই যুক্তিভিত্তিক—শূন্যগর্ভ আবেগের বশবর্তী হইয়া তিনি কখনও মত বা সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তাঁহার আলোচনার মধ্যে যেমন বিবিধ শাস্ত্রসংহিতার প্রামাণিক উল্লেখপঞ্জী থাকিত, তেমনি তাঁহার স্বাধীন ও স্বীয় মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় যুক্তির পারম্পর্য ও বক্তব্য বিষয়ের স্পষ্টতার পরিচয়ও প্রকাশ পাইত। ধর্ম ও তত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ ব্যতীত রামমোহন সমাজ-সংস্কার অর্থাৎ সতীদাহ-নিবারণ সম্পর্কিত বিচার-বিতর্কমূলক প্রবন্ধও রচনা করেন। এই সকল রচনাতেও যুক্তিবাদী আত্মপ্রত্যয়শীল রামমোহনের প্রখর ব্যক্তিত্বের স্পর্শ অনুভব করা যায়। সেই কারণে, সমসাময়িক অন্য লেখকদিগের রচনা হইতে রামমোহনের রচনার স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করিতে কোন অসুবিধা হয় না।

[রামমোহনের রচনাসমূহের প্রধানতঃ দুইটি বিভাগ করা যায়। প্রথমতঃ ধর্ম ও তত্ত্বমূলক আলোচনা এবং দ্বিতীয়তঃ সামাজিক আচার বা প্রথা বিষয়ক রচনা

রামমোহনের প্রথম বাংলা গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একচল্লিশ বৎসর এবং মৃত্যু পর্যন্ত মাত্র আঠার বৎসর কাল তিনি বাংলা প্রবন্ধ রচনা-কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার রচনার স্তর-বিভাগ করিবার মত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু ইহা স্বীকার্য যে, তাঁহার শেষ বয়সের রচনাসমূহে চিন্তার সৌষম্য এবং যুক্তিপ্রয়োগের তীক্ষ্ণ নৈপুণ্য অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে। সেই তুলনায় তাঁহার ভাষার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই।

একেশ্বরবাদের স্বপক্ষে রামমোহনের প্রথম রচনা 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫) ও 'বেদান্তসার' (১৮১৫)। পুস্তিকা দুইটি অনুবাদ হইলেও গুরুত্বের দিক হইতে তাঁহার মৌলিক যে কোন রচনা হইতে ন্যূন নহে। বিশেষতঃ 'বেদান্ত গ্রন্থে'র ভূমিকাটি মূল্যবান এবং এই ভূমিকাটিকে রামমোহনের সর্বপ্রথম মৌলিক বিতর্ক-মূলক বাংলা প্রবন্ধ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। নিম্নলিখিত অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থসমূহে রামমোহন প্রধানতঃ ধর্ম বা তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা করিয়াছেন—১। 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' (১৮১৭) ২। 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮) ৩। 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০) ৪। 'ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ' (১৮২১) ৫। 'চারি প্রশ্নের উত্তর' (১৮২২) ৬। 'পাদরি ও শিষ্য সংবাদ' (১৮২৩) ৭। 'গুরুপাদুকা' (১৮২৩) ৮। 'প্রার্থনা পত্র' (১৮২৩) ৯। 'ব্রহ্মোপাসনা' (১৮২৮) ও ১০। 'অনুষ্ঠান' (১৮২৯)।

শাস্ত্র-সমর্থিত সামাজিক আচার-ব্যবহারও অবলম্বন করিয়া লিখিত রামমোহনের কয়েকটি মৌলিক রচনার সন্ধান পাওয়া যায়—

১। 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১৮১৮) ২। 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯) ৩। 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' (১৮২০) ৪। 'পথ্য প্রদান' (১৮২৩) ৫। 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার' (১৮২৬) ৬। 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' (১৮২৬) ও ৭। 'সহমরণ বিষয়' (১৮২৯)।

রামমোহনের গ্রন্থসমূহের প্রায় অধিকাংশই ব্যক্তিবিশেষের প্রশ্নের জবাবে অথবা গ্রন্থের প্রতিবাদ স্বরূপ লিখিত হইয়াছে। তাঁহার কোন কোন রচনায় কল্পিত ব্যক্তিদ্বয়ের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়াও রামমোহন সমাজ বা ধর্ম সম্পর্কিত মতাদর্শ প্রচার করিয়াছেন। রামমোহনের প্রবন্ধ বিচার-প্রসঙ্গে যদিও তাঁহার

অনুবাদমূলক রচনাসমূহের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি তাঁহার গদ্যভাষার বিচার-বিশ্লেষণের জন্য ইহাদের উল্লেখ সম্পূর্ণ অবান্তর নহে। প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রামমোহনের প্রায় অর্ধেক রচনাই অনুবাদ এবং তাঁহার বিতর্ক-মূলক মৌলিক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে তিনি যে বিষয় অবলম্বন করিয়া তর্ক-বিচারে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই অনুবাদমূলক রচনাসমূহ হইতেই তাহার মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। রামমোহন ব্রহ্মবাদী বলিয়া একেশ্বরবাদের আদর্শই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র স্বরূপ ছিল। ব্রহ্মবাদ বা একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যই রামমোহন শাস্ত্রবাণীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং সাধারণের বিশ্বাস সৃষ্টি ও তাহাদের বোধগম্য করিবার উপায়স্বরূপ বাংলা ভাষায় তিনি বেদ, উপনিষদসমূহ মূলতঃ অনুবাদ করিয়াছেন।

রামমোহনের পূর্বে সুষ্ঠুভাবে লিখিত তর্ক-বিতর্কমূলক বাংলা প্রবন্ধ ছিল না। তিনিই প্রধানতঃ দেশীয় রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায় ও বিদেশী খ্রীষ্টান মিশনারীদিগের সহিত বাদ-প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বাংলা ভাষায় বিতর্কমূলক আলোচনার সূত্রপাত করিলেন। তৎকালে বাংলা গদ্য-ভাষারও শৈশবাবস্থা এবং সেই ভাষাও তখন বিবিধ ভাবপ্রকাশের যথাযথ বাহন হইয়া উঠিবার শক্তি অর্জন করে নাই। সুতরাং রামমোহনকে নিজের প্রয়োজনানুসারে অধিকাংশ সময় ভাষাও সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছিল। অপরিণত, অপুষ্ট ভাষার মাধ্যমে নীরস তত্ত্বমূলক বিষয়ের আলোচনা যে কিরূপ দুরূহ, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। তথাপি ভাব-চিন্তাকে স্বচ্ছন্দে ও অকপটে প্রকাশ করিবার দুর্লভ ক্ষমতা রামমোহনের ছিল। ভাষা-প্রয়োগের মধ্য দিয়াও তাঁহার রচনাশক্তির নৈপুণ্যের পরিচয় লাভ করা যায়। মূলানুসরণের অতিনিষ্ঠার ফলে রামমোহনের অনুবাদমূলক সকল রচনাতেই ভাষার প্রাঞ্জলতা বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার মৌলিক প্রবন্ধসমূহে অনুবাদ রচনার ন্যায় নিয়মনিষ্ঠার আদর্শ না থাকিবার দরুণ রামমোহন স্বাধীনভাবে যে ভাষা ও রচনারীতি আশ্রয় করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অনুবাদ রচনায় অনুসৃত ভাষার তুলনায় অধিকতর সহজ এবং প্রাঞ্জল হইয়াছে। এ'কথা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, রামমোহন অধিকতর সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভাবে ভাষা ব্যবহার করিতে পারিতেন; বিষয়-গৌরবের দিকে সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি নিক্ষেপের ফলে তাঁহার সে অভিলাষ যথাযথ ভাবে পূর্ণ করিতে পারেন নাই। রামমোহনের রচনা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ভাষা-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ

অনুবাদাত্মক রচনায় মূলকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অর্থাৎ আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করিবার ফলে রামমোহনের নিজস্ব রচনার যে স্বাভাবিক গতি তাহা ইহাতে ব্যাহত হইয়াছে এবং তাঁহার অনুবাদ-রচনা নিছক সংস্কৃত শব্দ ও ধ্বনিরই একটি বিকল্প আকার ধারণ করিয়াছে। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য বিরচিত 'আত্মানাত্মবিবেক' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'ইহাস্মিন্‌লোকে দেহধারণব্যতিরিক্তবিষয়েষু স্রক্‌চন্দনাদিবনিতাদিষু বান্তাশন মূত্রপুরীষাদৌ যথেচ্ছারাহিত্যমিতি ইহলোকফলভোগবিরাগঃ'।[১]

রামমোহন ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

'ইহ লোকে শরীর ধারণ ব্যতিরিক্ত যে বিষয় মাল্য চন্দন স্ত্রী সম্ভোগাদি তাহাতে যেমন বমনান্ন মূত্র বিষ্ঠাদিতে ইচ্ছা নাই তাদৃশ ইচ্ছার নিবৃত্তি যে তাহার নাম ইহলোকে ফলভোগবিরাগ'॥[২]

মূল সংস্কৃত রচনার যথাযথ অনুসরণ করিবার ফলেই এই অনুবাদমূলক রচনায় তিনি ভাষা-প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীন ও সহজ হইতে পারেন নাই।

(রামমোহনের মৌলিক রচনায় তাঁহার নিজস্ব ভাষার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার 'অনুষ্ঠান' নামক প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়। উপাসনা সম্পর্কে রামমোহন লিখিয়াছেন—

'৯ প্রশ্ন। কি প্রকারে এ উপাসনা কর্ত্তব্য হয়।

৯ উত্তর। এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা পরমেশ্বর হন, শাস্ত্রত ও যুক্তিত এইরূপ যে চিন্তন তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। ইন্দ্রিয় দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয়।'[৩])

এই ভাষার রূপ-বন্ধন সামান্য পরিবর্তন করিলেই অতি আধুনিক ভাষার রূপ পরিগ্রহ করে। তখন ইহা বাংলা গদ্যের প্রত্যূষকালের রচনা বলিয়া মনে হইবে না। এ'কথা স্বীকার্য যে, যেখানে রামমোহন আনুপূর্বিক নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন সেখানেই তাঁহার এই ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সহজবোধ্যতা প্রকাশ

১ 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী'—৪, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), পৃঃ ১৩

২ ঐ, পৃঃ ১৩

৩ ঐ, পৃঃ ৬৯

পাইয়াছে। রামমোহন অধিকাংশ বিতর্কমূলক প্রবন্ধেও সম্পূর্ণভাবে তাঁহার নিজস্ব ভাষার আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই; কারণ, তিনি মূলতঃ শাস্ত্রীয় আলোচনাতেই নিজেকে নিবদ্ধ রাখিয়াছেন এবং তাহা প্রধানতঃ পরমত খণ্ডন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যই করিয়াছেন। সুতরাং প্রতিপদেই তাঁহার একক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রামমোহন শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়াছেন এবং প্রায়ই তাহা বাংলায় ভাষান্তরিত করিয়া তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। ব্যাখ্যার সময় রামমোহন বিষয়-গৌরব হেতু যথেষ্ট পরিমাণে স্বচ্ছন্দ হইতে পারেন নাই এবং রচনাগত ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য শাস্ত্রীয় পারিভাষিক শব্দগুলিকেও তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। যদিও তাঁহার রচনায় খাঁটি বাংলা শব্দের প্রয়োগও কম নাই। অনাবশ্যক শব্দ-বর্জন এবং অর্থ-ভূয়িষ্ঠ শব্দ-চয়ন বিষয়ে সতর্কতা হেতু রামমোহনের রচনা অধিকতর সংযত ও গম্ভীর হইয়াছে। মৌলিক চিন্তার বলিষ্ঠতা, নৈয়ায়িক সুস্পষ্টতা, অনমনীয় দৃঢ়বদ্ধতা প্রভৃতি বিতর্কমূলক প্রবন্ধের বিশিষ্ট গুণসমূহ রামমোহনের রচনায় লক্ষ্য করা যায়। রামমোহন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি সমুদয়ে দশটি ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় বিবিধ ভাষাবিৎ এবং মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বিতীয় কেহ ছিল না। প্রাচীন ভারতবর্ষের বৈদিক ধর্মের সনাতন সুপবিত্র আদর্শ, মধ্যযুগীয় সাধকসম্প্রদায়ের বিবিধ দর্শন-চিন্তা এবং তৎকালীন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-সৃষ্ট জড়বাদী ভাববিপ্লব—এই ত্রিধারার ত্রিবেণীসঙ্গমে রামমোহনের মানসলোক গঠিত হইয়াছিল। সর্ববিষয়ে রামমোহনের মনের কিরূপ বিস্তৃতি, ইতিহাসের গতিপ্রবাহের সহিত তাঁহার পরিচিতি যে কত গভীর, সামাজিক ও রাজ-নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি যে কিরূপ তীক্ষ্ণ ও সুদূরপ্রসারী, বুদ্ধি ও বিচার-বোধ যে কত প্রখর ছিল, তাহা তাঁহার বিভিন্ন রচনা ও বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষ কোন প্রতিপাদ্য বিষয় শাণিত যুক্তি ও প্রমাণ সহযোগে দৃঢ় ও সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশের রীতি রামমোহনই বাংলা গদ্যে প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহার পূর্বে বাংলা গদ্যের এইরূপ দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভের শক্তি ছিল না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

'রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন।'[১]

১ 'আধুনিক সাহিত্য,' (বিশ্বভারতী, ১৩৬৩), পৃঃ

রামমোহনের রচনার সহিত পূর্ববর্তী বঙ্গসাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করিলে ইহার সত্যতা নিরূপণ করা কঠিন হইবে না।

রামমোহন বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই কারণে, রামমোহন তাঁহার বিবিধ রচনায় ব্রহ্ম, ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মোপাসনা, সাকার ও নিরাকার ব্রহ্মের পার্থক্য, নানা দেবতার অর্থ-নির্দেশ ইত্যাদি পারমার্থিক ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনাসমূহের মধ্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কারের বশে বা কাহারও মৌখিক মতামত শুনিয়া রামমোহন কোন বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন নাই। ইহার জন্য তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন ও চিন্তা করিয়াছেন এবং এমন কি, কোন্ তত্ত্ব বা বিষয় মূল ভাষায় লিখিত গ্রন্থে প্রকৃতই কি ভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষভাবে জানিবার জন্য সেই ভাষা পর্যন্ত শিক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। 'বাইবেলে'র অন্তর্নিহিত তত্ত্ব-কথা সঠিকভাবে উপলব্ধির জন্য রামমোহন কেবল মাত্র ইংরাজী বাইবেলেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই—হিব্রু ও গ্রীক্ ভাষায় লিখিত বাইবেলও গভীরভাবে পাঠ করিয়াছিলেন। এইভাবে রামমোহন আরবী, ফার্সী ভাষায় রচিত নানা ধর্মগ্রন্থ, কোরাণ এবং বহু হিন্দু-দর্শনশাস্ত্র, উপনিষদ প্রভৃতি গভীর মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মতামতের ঔচিত্যের পশ্চাতে পঠিত বিদ্যাবুদ্ধিলব্ধ বিচার-বোধের সুদৃঢ় ভিত্তি ছিল। তৎকালীন কোন কোন তথাকথিত পণ্ডিতের ন্যায় রামমোহন কখনও শাস্ত্রযুক্তি বহির্ভূত কোন মতামত কল্পনাবশে বা উচ্ছ্বাসাবেগে প্রকাশ করেন নাই। তিনি বক্ষ্যমান তত্ত্ব বা ধর্মের নিগূঢ় তাৎপর্য অসাধারণ মনীষাবলে সহজ ও সুসংলগ্ন প্রণালীতে প্রকাশ করিয়াছেন। 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' প্রবন্ধে উপাস্য-উপাসনা সম্পর্কে রামমোহনের শাস্ত্রসম্মত যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত সজহ ও সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া রামমোহনের চিন্তার সারবত্তা এবং যথাযথ উপাদান সংযোজনার সৌষ্ঠবতার পরিচয় লাভ করা যায়। একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইল—

জনৈক ভট্টাচার্যের প্রশ্ন—

'যদি মন্দির মস্‌জিদ গিরজা প্রভৃতি যে কোনো স্থানে যে কোনো বিহিত ক্রিয়ার দ্বারা শূন্যস্থানে ঈশ্বর উপাস্য হয়েন তবে কি সুঘটিত

স্বর্ণমৃত্তিকা পাষাণ কাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়।'[১]

ইহার উত্তরে রামমোহন লিখিয়াছেন—

'মস্‌জিদ গিরজাতে ঈশ্বরের উপাসনা আর স্বর্ণমৃত্তিকাদি প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা এই দুয়ের সাদৃশ্য যে ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন সে অত্যন্ত অযুক্ত যেহেতু মস্‌জিদ গিরজাতে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা ঐ মস্‌জিদ গিরজাকে ঈশ্বর কহেন না কিন্তু স্বর্ণমৃত্তিকা পাষাণে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা উহাকে ঈশ্বর কহেন এবং আশ্চর্য্য এই যে তাহাকে ভোগ দান এবং শয়ন করান ও শীত নিবারণার্থে বস্ত্র দেন তাহার গ্রীষ্ম নিবারণার্থে বায়ু ব্যজন করেন এ সকল অর্থাৎ ভোগ শয়নাদি ঈশ্বরধর্মের অত্যন্ত বিপরীত হয় বস্তুত পরমেশ্বরের উপাসনাতে মস্‌জিদ গিরিজা মন্দির ইত্যাদি স্থানের কোন বিশেষ নাই যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানেই উপাসনা করিবেক বেদান্তের ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১১ সূত্র। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ। যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেইখানেই আত্মোপাসনা করিবেক তীর্থাদি স্থানের বিশেষ নাই।'[২]

পরমত খণ্ডনে এইরূপ সংযত ভাব প্রকাশের পরিচয় রামমোহনের প্রায় সকল রচনার মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়। বাক্‌-সংযম এবং চিন্তাধারার সুস্পষ্টতা বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের বিশিষ্ট গুণ—ইহা রামমোহনের রচনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্য দিয়া রামমোহন সর্বদাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, সকল ধর্মেরই সাধারণ ভিত্তি একেশ্বরবাদ। ধর্মের বহিরঙ্গেই শুধু নানা ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু অন্তরঙ্গে সকল ধর্মই সমান।

রামমোহন যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠাকল্পে কেবলমাত্র ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধই রচনা করেন নাই। তাঁহার সমাজ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধও আছে। এই প্রবন্ধসমূহে সহমরণ-প্রথা, নারী-শিক্ষা বিষয়েও রামমোহনের গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সহমরণ-প্রথার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্নকল্পে রামমোহন নানা শাস্ত্র গ্রন্থসমূহ হইতে অনুকূল মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং কোন মিথ্যা সংস্কার বা নিছক

১ 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী'—১, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), পৃঃ ১৮১

২ ঐ, পৃঃ ১৮১-৮২

কল্পনার বশে কোথাও তিনি অপ্রামাণ্য বাণী উদ্গার করেন নাই। ফলে যুক্তি-ধর্মের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগের পরিচয় তাঁহার রচনার সর্বত্র লাভ করা যায়। স্ত্রীজাতির প্রতি গভীর সহানুভূতি, তাহাদের সামাজিক অধিকার সম্পর্কে অপরিসীম আগ্রহ এবং সর্বোপরি উদার মানবিক বোধের পরিচয় রামমোহনের সামাজিক সংস্কারমূলক প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। শাস্ত্র-বাণীর সহিত ক্ষুরধার যুক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে রামমোহনের 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' নামক প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। এই সামাজিক কু-প্রথা বিষয়ক রচনায় তাঁহার হৃদয়ের ঔদার্য, উৎপীড়িত বা লাঞ্ছিত মানবতার প্রতি অকুণ্ঠ সমবেদনা প্রকাশ পাইলেও, তাহা কখনও উচ্ছ্বাসের ভাবাবেগে লঘু ও অসংযত হয় নাই। ইহাতে রামমোহনের শাস্ত্রীয় বিচার বা ব্যাখ্যায় স্থিরতা বা গাম্ভীর্যের কোনরূপ অভাব লক্ষ্য করা যায় না। সহমরণ-প্রথার সমর্থনকারী ব্যক্তি যখন বলেন—

'সহমরণাদির সঙ্কল্প বাক্যে ফলের উল্লেখ না করিয়া কাম্য কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম অন্য২ কর্ম্মের ন্যায় চিত্তশুদ্ধির কারণ হয় কি না।'[১]

উত্তরে, রামমোহন লিখিয়াছেন—

'প্রথমত স্বামীর সহিত স্বর্গভোগ কামনা ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকের আত্মহত্যাতে প্রবৃত্তি কদাপি হইতে পারে না, সুতরাং প্রবৃত্তির অভাবে শরীর দাহ ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়ত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম ব্যতিরেকে আত্মার পীড়া দ্বারা অথবা অন্যের নাশের নিমিত্ত যে তপস্যা তাহাকে তামস করিয়া গীতাতে লেখেন, এবং ঐ তামস কর্ম্মকর্ত্তা অধোগতি প্রাপ্ত হয় ইহাও ঐ ভগবদ্গীতাতেই লেখেন। "মূঢ় গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ। পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতং॥" "জঘন্য-গুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ"॥'[২]

(রামমোহন বিবিধ শাস্ত্র-বিচারের মধ্য দিয়া এক শাশ্বত মানবতার বাণী লাভ করিয়াছিলেন এবং এই গভীর বাণীর দ্বারাই তাঁহার সামাজিক সংস্কারমূলক প্রবন্ধ এক বিশিষ্ট মহিমায় ভূষিত হইয়াছে।) যুক্তি ও তথ্য পরিবেশনের অপূর্ব দক্ষতায় রামমোহনের রচনায় আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তাও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত

১ 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী'—৩, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), পৃঃ ৫৩

২ ঐ, পৃঃ ৫৩

হয়। বিধবা নারীকে বলপূর্বক দাহ করিবার যুক্তিরূপে সহমরণ মতের পক্ষপাতী ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র সম্পর্কে অমূলক কটাক্ষপাত করিয়াছেন এবং নারীজাতি স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা এবং ধর্মজ্ঞান-শূন্যা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। রামমোহন প্রত্যুত্তরে যে মতামত বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যুক্তি, তথ্য এবং প্রকাশভঙ্গির মাত্রাবোধে সমুজ্জ্বল। এই প্রসঙ্গে রামমোহনের 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' হইতে একটি বিশিষ্ট অংশ উদ্ধৃত হইল। এই প্রসঙ্গে রামমোহনের অকাট্য যুক্তি-পারম্পর্য লক্ষণীয়।

'প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে২ বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাতা আছে, বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণপূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।

দ্বিতীয়ত তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্যজ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্যদ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহারদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।

তৃতীয়ত বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক। প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর, যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিতা হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অনুভব করি যে প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক, তবে পুরুষেরা প্রায় লেখাপড়াতে পারগ এবং নানা রাজকর্ম্মে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না। স্ত্রীলোকের

এই এক দোষ আমরা স্বীকার করি যে আপনারদের ন্যায় অন্যকে সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে, যাহার দ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায়, এ পর্য্যন্ত যে কেহ২ প্রতারিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়।'[১]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, এখানে রামমোহন নারী-মাহাত্ম্যের জয়গান করিবার প্রচুর অবকাশ পাইয়াছিলেন; কিন্তু উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হইয়া রচনায় অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটান নাই। উচ্ছ্বাসরাহিত্য এবং সংযত বাক্যবিন্যাসও তাঁহার প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

সুরুচি ও অভিজাত সুলভ শালীনতাবোধ রামমোহনের রচনার সর্বত্র দৃষ্ট হয়। প্রবন্ধের গাঢ়বদ্ধতা লেখকের রুচি-সংযম হেতু কোথাও শিথিল ও লঘু হয় নাই; বরং তাহাতে গাম্ভীর্যগুণই অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে। রামমোহনের সমসাময়িক লেখকগণের মধ্যে এইরূপ সংযম ও সুরুচিবোধের পরিচয় লাভ করা যায় না। তৎকালীন বিশৃঙ্খল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশে জনসাধারণের জীবনযাত্রা এক অরুচিকর বদ্ধ পঙ্ককুণ্ডের মধ্যে সীমায়িত ছিল। স্বৈরাচারী দেশাচার ও কু-সংস্কার মানুষের জীবন যখন অধোগামী করে এবং মনের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয়, সেই সময় অমিত জীবনীশক্তি লইয়া ধর্ম বা সমাজ সংস্কারে যাঁহারা ব্রতী হইয়া থাকেন, তাঁহারা যে দুঃসাহসিক কর্ম-শক্তিধর পুরুষ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বীয় প্রখর ব্যক্তিত্ব ও অদম্য আত্মশক্তি ব্যতীত কোন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ কার্যে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। রামমোহন এক অপরিসীম আত্মশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তদুপরি তাঁহার অসীম সহিষ্ণুতা গুণ ছিল। প্রতিপক্ষ সনাতনপন্থী হিন্দু সম্প্রদায় যখন তাঁহার প্রতি ধর্মনাশী, চণ্ডাল প্রভৃতি অসম্মানজনক উক্তি করিয়াছে, তখনও রামমোহন অবিচল নিষ্ঠায় শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন এবং পরমেশ্বরের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন—

'হে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর তুমি আমাদিগ্যে হিংসা মৎসরতা মিথ্যাপবাদে প্রবর্ত্ত করাইবে না ওঁ তৎসৎ।'[২]

১ 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী'—৩, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), পৃঃ ৪৬-৪৭

২ 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী'—১, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), পৃঃ ১৮৪

হৃদয়ের এই নির্লিপ্ততা ও প্রশস্ততা রামমোহনের চরিত্রে এক দুর্লভ শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। বিরুদ্ধবাদীরা যখন 'পাষণ্ডপীড়ন' গ্রন্থে নিন্দা, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও কটূক্তি দ্বারা রামমোহনকে জর্জরিত করিয়াছিল, তখনও তিনি তাহার প্রত্যুত্তরে লিখিত 'পথ্যপ্রদান' প্রবন্ধেও কোন অশোভন অসংযমের পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। এ'কথা সত্য যে, রামমোহনও প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিয়াছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গোক্তিও করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে সাধারণ একটি সৌজন্যবোধ ছিল। এই সৌজন্য বা ভব্যতাবোধ রামমোহনের প্রতিপক্ষ কাহারও মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

রামমোহনের রচনার অংশ বিশেষে হাস্যরসের স্ফূর্তিও বিরল নহে। কিন্তু তাঁহার হাস্যরস অশ্লীল বাক্য বা শব্দ-প্রয়োগজাত নহে—বচন-চাতুর্য এবং পরিবেশন-নৈপুণ্যের ফলেই তাহার সৃষ্টি হইয়াছে। 'পাদরি ও শিষ্য সম্বাদে' খ্রীষ্টীয় একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদের দ্বন্দ্ববহুল পরিচয় হাস্যকর অথচ সরসভাবে রামমোহন পরিবেশন করিয়াছেন; কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তাঁহার কোন অশ্রদ্ধেয় মনোভাব প্রকাশিত হয় নাই। খ্রীষ্টান মিশনারীগণ হিন্দুধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব এবং পুরাণ-কথিত বহু দেববাদ সম্পর্কে যেরূপ কঠোর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও অশালীন মন্তব্য করিয়াছেন, তদনুরূপ রামমোহনও অনায়াসেই যুক্তি-তর্ক এড়াইয়া উপহাস বা কটূক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার উক্ত প্রবন্ধে কোনরূপ অসংযমের পরিচয় প্রকাশ পায় নাই।

ব্রহ্মবাদীর নিকট জীবপ্রেম শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং জীবহিংসা ও মাংস ভোজন গর্হিত ও অমার্জনীয় অপরাধ। ব্রহ্মনিষ্ঠ রামমোহনকে আমিষভোজী জানিয়া বিরোধী সম্প্রদায় তাঁহাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছে। যথাযথ শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করিয়া অত্যন্ত সহিষ্ণুতার সহিত রামমোহন তাহার উত্তরও দিয়াছেন। ইহা তাঁহার কোন প্রতিশোধমূলক দ্বেষোক্তি নহে—মাংস ভোজনের স্বপক্ষে সাধারণ সুবিবেচনাপ্রসূত যুক্তি মাত্র। 'চারি প্রশ্নের উত্তর' প্রবন্ধের তৃতীয় প্রশ্নোত্তরে রামমোহন লিখিয়াছেন—

'মৎসরতা কি দারুণ দুঃখের কারণ হয়। লোকে কেন খায় কেন সুখে কাল যাপন করে ইহাই মৎসরের মনে সর্ব্বদা উদয় হইয়া তাহাকে ক্লেশ দেয়। মাংসভোজন শাস্ত্রে অবিহিত ইহা যদি না কহিতে পারে অন্ততও লোকের নিন্দা করিবার উদ্দেশে কহিবেক যে নিবেদন করিয়া খায় না কিম্বা আচমনে

অধিক জল কি অল্প জল লইয়াছিল কিন্তু মৎসরের তুষ্টির নিমিত্তে কে আপন শাস্ত্রবিহিত আহার ও প্রারব্ধ নির্ম্মিত ভোগ পরিত্যাগ করে ইহাতে মৎসরের অদৃষ্টে যে দুঃখ তা কে নিবারণ করিতে পারিবেক ইতি ॥'[১]

রামমোহন তাঁহার প্রতিপক্ষের মন্তব্যে উত্তেজিত না হইয়া হাস্যকর অথচ সংযত বাচনিক কৌশলে যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই সকল রচনা হইতে প্রমাণিত হয়।

(রামমোহনের প্রবন্ধ প্রধানতঃ বিবৃতিমুখ্য—সাহিত্যরসার্দ্র নহে। অবশ্যই এ'কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিষয়বস্তুর জন্যই তাহা রসসম্মত হয় নাই।) পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রামমোহন সাহিত্যশিল্পী ছিলেন না—তিনি তর্কমূলক বিষয়ের মীমাংসাকারী। তিনি মুখ্যতঃ ন্যায়বেত্তা, পণ্ডিতাগ্রগণ্য পুরুষ ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য মনীষী বেকন্ এবং স্বদেশী তার্কিক পণ্ডিত শঙ্করাচার্যের যুক্তিমূলক বিচার-পদ্ধতির আদর্শই যেন রামমোহনের প্রবন্ধ রচনায় অধিকতর অনুভব করা যায়। বেকন্ এবং শঙ্করাচার্যের রচনা প্রধানতঃ বিষয়-গৌরবের জন্যই সরস হইতে পারে নাই, রামমোহনের প্রবন্ধও তদনুরূপ – রসসৃষ্টির বা কোন আবেগ প্রকাশের অবকাশ তাহাতে ঘটে নাই এবং অবকাশ ঘটিবার কথাও নহে; কারণ, যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করাই রামমোহনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সুযোগ ঘটিলে রামমোহন যে কখনও সাহিত্যশিল্পী হইতে পারিতেন না, তাহা নহে। কারণ তাঁহার আবেগপ্রবণ মনের পরিচয় তাঁহার প্রণীত বহু প্রশংসিত 'ব্রহ্ম-সঙ্গীতে'র ভিতর হইতে লাভ করা যায়। রামমোহনের সঙ্গীতসমূহ গভীর ভাব-দ্যোতক এবং রস-ব্যঞ্জক। এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম আদি ঐতিহাসিক রামগতি ন্যায়রত্নের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

'তিনি অত্যুৎকৃষ্ট গান রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার ব্রহ্ম-সঙ্গীত বোধ হয় পাষাণকেও আর্দ্র, পাষণ্ডকেও ঈশ্বরানুরক্ত ও বিষয় নিমগ্ন মনকেও উদাসীন করিয়া তুলিতে পারে। ঐ সকল গীত যেরূপ প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ, সেইরূপ বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী সমন্বিত।'[২]

ইহা হইতে অনুমান করা অস্বাভাবিক নহে যে, রামমোহন শিল্পিজনোচিত প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি যে জাতীয় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন,

১ 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী'—৬, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), পৃঃ ১৬-১৭

২, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', (কলিকাতা, ১৩৪২), পৃঃ ১৮৭

তাহাতে সাহিত্য-গুণ বিকাশের ক্ষেত্র ছিল না। সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধ পর্যালোচনা করিয়া তাঁহাকে সাহিত্যশিল্পী আখ্যায় ভূষিত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু রামমোহন যে বিচার-বিতর্কমূলক প্রবন্ধের আদি ভগীরথ এ'কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়। সাহিত্যরসার্দ্র না হইলেও প্রকাশভঙ্গির গুরুত্ব, দৃঢ়তা ও মননশীলতায় রামমোহনের প্রবন্ধ ঐশ্বর্যময়।

রামমোহন বাংলা গদ্য-ভাষারও অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিপোষক ছিলেন। তাঁহার পূর্বে বাংলা গদ্যের কেবল সূচনা হইয়াছিল মাত্র; কিন্তু তাহা কোন স্থিতিশীল আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা অর্জন করে নাই। রামমোহনের রচনা বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে, তিনি নিজস্ব একটি রীতিসম্মত আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাঁহার রচনা-কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বাংলা গদ্যের ধ্রুব আদর্শের আবিষ্কার রামমোহনের পক্ষে দুরূহ ছিল না। কারণ, বাংলা ভাষার স্বরূপ-প্রকৃতির সহিত তাঁহার একটি নিবিড় পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রচনার মধ্য দিয়া তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত ইংরাজী, ফার্সী প্রভৃতি বিদেশী ভাষায় লিখিত গদ্য অনুশীলন করিবার ফলে রামমোহনের বাংলা গদ্যের আদর্শ আবিষ্কার করিতে অসুবিধা হয় নাই। তিনিই প্রথম জটিল সমাসবদ্ধ পদের বহুল প্রয়োগ, অনাবশ্যক শব্দালঙ্কারের অবতারণা, লঘু প্রাকৃত শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার পরিহার করিয়াছেন এবং বাক্য মধ্যে পদসমূহের দূরান্বয় দোষ-ত্রুটি মুক্ত হইবার ফলে বাক্যের অর্থবোধ অধিকতর সহজসাধ্য হইয়াছে। রামমোহনের প্রচারিত মতবাদ ও রচনাদর্শ তৎকালীন জনমানসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি লেখকগোষ্ঠীও গড়িয়া উঠিয়াছিল; অথচ রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি অন্য কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া তাহা সম্ভব হয় নাই। রামমোহনের প্রত্যক্ষ শিষ্য ও 'আত্মীয় সভা'র একনিষ্ঠ সদস্য ব্রজমোহন মজুমদার রামমোহনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারই রচনাদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন এবং 'আত্মীয় সভা'র সম্পাদক বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। রামমোহনের প্রত্যক্ষ প্রভাবপুষ্ট তাঁহার সর্বপ্রধান অন্তরঙ্গ শিষ্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নামও এ'ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন গদ্যের তুলনায় তাঁহার গদ্য-ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং গতি-স্বাচ্ছন্দ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

রামমোহন 'ব্রাহ্মণ সেবধি', সম্বাদ কৌমুদী' প্রভৃতি একাধিক সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়া সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও একটি উচ্চতর মান (standard) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার পরিচালিত পত্রিকাগুলির প্রভাবে তৎকালে অপর কয়েকটি সাময়িক পত্রও প্রকাশিত হয়।

রামমোহনকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার অনুগামী বা স্বপক্ষীয় লেখকগণ তাঁহার আদর্শে যেমন গ্রন্থ রচনা করিবার প্রেরণা পাইয়াছেন, তেমনি রামমোহনের প্রতিপক্ষ তাঁহার মতাদর্শের প্রভাব খর্ব করিবার জন্য বিরুদ্ধ-মত সম্বলিত বিভিন্ন প্রবন্ধ গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। এইরূপে রামমোহনের মতাদর্শের প্রতিক্রিয়া হিসাবে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্তচন্দ্রিকা', কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ', 'পাষণ্ডপীড়ন', বেনামী প্রণীত 'চারিপ্রশ্ন', গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের 'জ্ঞানাঞ্জন' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রামমোহন পরিচালিত 'সম্বাদ কৌমুদী'র সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একটি পত্রিকাও বিরোধী দল প্রকাশ করেন। ইহা হইতে উপলব্ধি করা যায় যে, রামমোহনের প্রচারিত আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে বাংলা গদ্য যেভাবে প্রচার ও অনুশীলিত হইয়াছে, তৎকালীন অন্য কাহারও দ্বারা তাহা সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য রামমোহনের অনতিপরবর্তী কালের সমালোচক হইতে আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত রামমোহন যে বাংলা গদ্যের অন্যতম প্রবর্তক, তাহা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'বাঙ্গলা ভাষা' সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

'১৭৫২ অব্দে 'অন্নদা মঙ্গল' গ্রন্থ শেষ হয়; ১৭৫৭ অব্দে পলাশীর বিপর্য্যয়; তারপর পঞ্চাশ বৎসর ভাষাতে উন্নতি অবনতি প্রায় কিছুই হয় নাই। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সকল বিরাজ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষা মুখ-বদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় স্থিরভাবে ছিল। উপপ্লব কর্ত্তা মহাত্মা রামমোহন রায় আসিয়া তাহার মুখ খুলিয়া দিলেন।'[১]

অতএব বাংলা গদ্য-ভাষার ক্ষেত্রেও রামমোহনের দান অস্বীকার করা যায় না।

১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন', (১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১২৭৯), পৃঃ ৩৪৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

রামমোহনের সমসাময়িক প্রবন্ধকারগণ

রামমোহনের বিচার-বিতর্কমূলক আলোচনা প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ নূতন সাহিত্যরূপ প্রবর্তিত হইয়াছে। এ'কথা স্বীকার্য যে, রচনা মধ্যে পণ্ডিতজনসুলভ বিষয়-গৌরব, চিন্তাধারার সুস্পষ্টতা, ভাবপ্রকাশে বিজ্ঞানীজনোচিত বাক্-সংযম এবং উচ্ছ্বাস-আবেগহীন বিশুদ্ধ যুক্তির অবতারণা বাংলা গদ্যে রামমোহনের এক অসামান্য দান। এইরূপ প্রকৃষ্ট বন্ধনে গ্রথিত রচনা-কর্মই বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই রচনা-কর্মের ভিতর দিয়া রামমোহন একদিকে যেমন বাংলা ভাষাকে শব্দৈশ্বর্যে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে তাঁহার আদর্শ বা মতবাদ দ্বারা সমকালীন বাঙ্গালীর কর্ম ও চিন্তার যুগসঞ্চিত সংস্কারে আঘাত করিয়া জাতির মেধা ও বুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়াছেন।

রামমোহন ব্রহ্মবাদী ছিলেন এবং তিনি প্রধানতঃ প্রতীকোপাসনার বিরোধিতা করিয়াছেন। ব্রহ্মই কেবলমাত্র উপাস্য এবং বেদান্তই ভারতীয় দর্শনের একমাত্র প্রামাণ্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ—ইহাই তাঁহার সর্ববিধ ধর্ম ও তত্ত্বমূলক প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রচারিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দেশ মধ্যে প্রচলিত সহমরণ প্রভৃতি বিবিধ কুসংস্কারজাত সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধেও রামমোহন লেখনী ধারণ করিয়া দেশের মধ্যে সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছেন। দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক অন্দোলনের অধিনায়ক হইবার ফলে রামমোহনকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার মতাদর্শের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই সকল সংস্থার পক্ষ হইতে বিভিন্ন লেখকের রচনাও প্রকাশিত হইয়াছে। রামমোহনের অনুসরণকারিগণ তাঁহাদের রচনায় তাঁহার অবলম্বিত আদর্শই মুখ্যতঃ প্রচার করিয়াছেন; অন্যদিকে রামমোহনের বিরোধী পক্ষ সেই আদশের প্রভাব খর্ব করিয়া বিরুদ্ধ-মত সম্বলিত পুস্তকসমূহ রচনা করিয়াছেন। এইভাবে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় সম্প্রদায়ের লেখকগণের মধ্যে রামমোহনের রচনাদর্শ, বিষয়-গৌরব এবং ভাষার প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছে। সমকালীন কয়েকজন লেখকের প্রবন্ধ

বিচার করিলে ইহার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। ধর্ম, সমাজ বা শিক্ষাবিধি বিষয়ক আলোচনায় যে সকল লেখক রামমোহনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবজাত, তাঁহাদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ব্রজমোহন মজুমদার, গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের স্বনামখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। রামমোহনের পূর্বেই তিনি বাংলা গদ্যে কলেজ ছাত্রদের উপযোগী গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে রামমোহন-প্রবর্তিত রীতিসম্মত কোন প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয়ের বিতর্কমূলক পুস্তিকা 'বেদান্তচন্দ্রিকা' মুদ্রিত হয়। ইহা রামমোহনের বেদান্ত বিষয়ক আলোচনা প্রকাশিত হইবার পরে রচিত এবং রামমোহনের আলোচনার প্রতিবাদ স্বরূপ লিখিত হইয়াছিল। অতএব মৃত্যুঞ্জয়ের বিতর্কমূলক প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস রামমোহনের পর হইতেই লক্ষ্য করা যায়।

মৃত্যুঞ্জয় প্রণীত 'রাজাবলী' (১৮০৮) পুস্তিকাটিকে কেহ কেহ ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ রচনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই পুস্তিকাটি রামমোহনের প্রথম বাংলা গ্রন্থ রচনার প্রায় সাত বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু 'রাজাবলী'তে প্রবন্ধ জাতীয় রচনার লক্ষণ বা গুণ যথাযথভাবে সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই। প্রকৃত তথ্য বা ঘটনা নিজস্ব বিচার-বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে বিবৃত করাই ঐতিহাসিক প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়; কিন্তু 'রাজাবলী'তে হিন্দুযুগের যে বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ঐতিহাসিক সত্য হইতে বিচ্যুত। গল্প ও কিংবদন্তী ব্যতীত বহু নৃপতির যে নাম ও বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও প্রকৃত ইতিহাসবিরুদ্ধ। বহু বিবরণই লেখকের স্বকপোলকল্পিত। রচনা মধ্যে লেখকের ঐকান্তিক ইতিহাসনিষ্ঠা, অনুসন্ধিৎসা বা সংযম পরিলক্ষিত হয় না। বর্তমানে 'রাজাবলী' যে মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক কোন রচনা নহে, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে কোথাও ইহার মূল উৎস সম্পর্কে উল্লেখ করেন নাই বলিয়া এই গ্রন্থটি এযাবৎ কাল তাঁহার মৌলিক রচনা হিসাবেই প্রচার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত পুঁথির মধ্য হইতে 'রাজাবলী' নামক একটি সংস্কৃত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার

একটি প্রবন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

'বাংলা "রাজাবলী"তে প্রদত্ত রাজবিবরণ ও এই গ্রন্থোক্ত সংক্ষিপ্ত রাজ-বংশাবলী, এ দুয়ের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বর্তমান ..... ।'[১]

'বেদান্তচন্দ্রিকা'ই মৃত্যুঞ্জয়ের একমাত্র মৌলিক বিতর্কমূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ। ইহার পরবর্তী রচনা 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র (১৮৩৩) কোন কোন অংশে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা আছে। কিন্তু তাহাতে সমগ্রভাবে 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র ন্যায় প্রকাশ বা পরিবেশননৈপুণ্য এবং সুসংলগ্ন ক্রমবদ্ধ ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয় না।

রামমোহন রায় তাঁহার প্রবন্ধের মধ্য দিয়া যে বিষয়ের অবতারণা করেন অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনা ও বেদান্তচর্চা, তাহারই প্রতিবাদ স্বরূপ বা বিচারসূত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্তচন্দ্রিকা' পুস্তিকাটি লিখিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞান, যুক্তিবাদ, বিচার-বৈচিত্র্য এবং তত্ত্ব-নির্দেশে রামমোহনের রচনার ন্যায় ইহা পূর্ণাঙ্গ না হইলেও তদানীন্তন অন্যান্য লেখকগণের আলোচনা-ভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধের তুলনায় ইহার গুণগত উৎকর্ষ অস্বীকার করা যায় না। 'বেদান্তচন্দ্রিকা'য় মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্মোপাসনা সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, গৃহস্থের ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার নাই এবং নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাও সম্ভবপর নহে। অতএব প্রতিমাদি পূজাই সাধারণ সাংসারিক মানুষের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। তাঁহার বক্তব্য যে বেদান্তসিদ্ধ, তাহা তিনি শাস্ত্রীয় যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। ঈশ্বরের উপাসনায় প্রতিমা পূজা যে বিধিসম্মত এবং অবশ্য পালনীয়, সে-সম্পর্কে মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'আর শুন ব্রহ্ম অলৌকিক বস্তু ঘটপটাদিবৎ লৌকিক বস্তু নয় কেবল শাস্ত্রেতে ব্রহ্ম জানা যান কায়িক বাচিক মানসিক ব্যাপাররূপ যে তাঁহার উপাসনা সেও কেবল শাস্ত্রীয়। শয়নাসন ভোজনাদির ন্যায় লৌকিক নয় যে যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনি করিবে কিন্তু যার যে শাস্ত্র যে শাস্ত্রেতে যেরূপ ঈশ্বরোপাসনা বিহিত আছে তার সেইরূপ করিলেই ঈশ্বরোপাসনা সিদ্ধ হয় অন্যথা হয় না যেমন শাস্ত্রীয় যজ্ঞকর্ম্মের সাধনসামগ্রী যে যূপ স্রুক্ স্রুব্ চমসাদি তাহা শাস্ত্রবিহিত প্রকারে করিলেই হয় অন্যথা আপন আপন অভিপ্রায়মত প্রকারে করিলে সে যূপাদি হয় না অতএব হিন্দুমুসলমান ইঙ্‌রাজেরা স্বস্ব শাস্ত্রানুসারে জপ পূজাদিদ্বারা ও রোজা

[১] 'সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ', (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪৬), পৃঃ ২৩৩-৩৪

নমাজাদিদ্বারা ও গিরিজাদিদ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করেন অন্যথা কেহ করে না যদি করে তবে সে ঈশ্বরোপাসনা হয় না কেবল উৎপাত হয়। অতএব শ্রুতিস্মৃতি বিধানানি পঞ্চরাত্রবিধিংবিনা। আত্যন্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ শ্রুতি স্মৃতী মমৈবাজ্ঞে ইত্যাদি প্রমাণতঃ শ্রুতি স্মৃতি বিধানরূপ উপাস্যেশ্বরাজ্ঞা না মানিয়া স্বেচ্ছানুসারে ঈশ্বরোপাসনা করে যে উপাসকেরা তাহারদের সে উপাসনা উপাসনা হয় না প্রত্যুত সর্ব্বনাশিনী হয় রাজাজ্ঞাতিক্রমীর রাজোপাসনার ন্যায় ঈশ্বরাজ্ঞা-বিরুদ্ধ তদুপাসকেরদের সেবা করা তদাজ্ঞাবিরোধে স্বেচ্ছানুসারে যাহা করিবে তাহাতেই কি তাহারা উপাসিত হইয়া সেবক ভৃত্যাদিকে বেতন দিবে তাহা নয় কিন্তু তাহারদের আজ্ঞার্পিত সমস্ত কর্ম্মকারিসেবকেরদিগ্‌কেই নিয়মিত বেতন দিবে বরং পারিতোষিকও কিছু অধিক দিবে আজ্ঞাবিপরীত সেবাকারী সেবক-দিগ্‌কে দণ্ড দিয়া দূর করিয়া দিবে। উপচারার্পণ দ্বারা প্রতিমাদিতে ঈশ্বর পূজাদি কি ঈশ্বরাজ্ঞাপ্ত নয় অতএব সকল বেদান্তসিদ্ধ ঈশ্বরোপাসনার্থ প্রতিমাদি পূজা। এই কারণে প্রাচীন যবনাদি শাস্ত্রেও প্রতিমাদি পূজা ও যাগাদি কর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে।"[১]

যুক্তিনৈপুণ্যে, যথাযথ শাস্ত্রীয় বাক্য উদ্ধৃতি দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ের বক্তব্য পরিস্ফুট বা প্রমাণ করিবার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেলেও রামমোহনের ন্যায় তাঁহার রচনায় আত্মপ্রত্যয়নির্ভর প্রশান্তগম্ভীর ব্যক্তিত্বের কোন স্পর্শ পাওয়া যায় না।

'বেদান্তচন্দ্রিকা' রচনায় মৃত্যুঞ্জয় প্রভূত পরিমাণে তৎসম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাঁহার বাক্যরচনা-পদ্ধতিও সহজ ও সরল হয় নাই। রচনার অধিকাংশ স্থলেই বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ ও বেদান্তসূত্র-ভাষ্যাদির যথাযথ অনুবাদ করিবার ফলে মৃত্যুঞ্জয়ের স্বাধীন বা নিজস্ব রচনার সাবলীল গতি ইহাতে বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে। সেইহেতু প্রতিপাদ্য বিষয়ও পাঠকসাধারণের নিকট যথাযথভাবে স্বচ্ছ বা সুস্পষ্ট হইতে পারে নাই।

বিতর্কশ্রেণী প্রবন্ধ হিসাবে 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র একটি বিশেষ ত্রুটি যে, ইহাতে লেখক প্রতিপক্ষের যুক্তি-তর্ক খণ্ডন করিতে গিয়া যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও নিম্নস্তরের পরিহাসরসিকতার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রাবন্ধিক সংযমের মাত্রা অতিক্রান্ত হইয়াছে। বিতর্কমূলক প্রবন্ধে বিষয় বহির্ভূত প্রসঙ্গ বা অনাবশ্যক

১ 'বেদান্তচন্দ্রিকা', (কলিকাতা, ১৮১৭), পৃঃ ৫৩-৫৪

কটূক্তি প্রয়োগ বক্তব্যের গুরুত্ব বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করে। এই জাতীয় ত্রুটির ফলে 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র বিষয়গত গাম্ভীর্য যথাযথভাবে রক্ষিত হয নাই। এই রচনার সূচনাতেই অনাবশ্যকভাবে মৃত্যুঞ্জয় কলিকালীয় তাবৎ ব্রহ্মবাদীকে উপহাস করিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন—

ব্রহ্ম সর্ব্বে বদিষ্যন্তি সমায়াতে কলৌ যুগে। নানুতিষ্ঠন্তি কৌন্তেয় শিশ্নোদর পরায়ণাঃ ॥'[১]

ইহা ব্যতীত অশ্বচিকিৎসা ও গোপের শ্বশুরালয়ে গমন ইত্যাদি বিবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া নিছক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা কটূক্তিতে মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার রচনা ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন—

'অতএব শ্রুতিস্মৃতিতে কহিয়াছেন তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা ও শ্রোতা ও শুনিয়া বোদ্ধা এমন পুরুষ দুর্লভ কিন্তু কাপটিক তত্ত্বজ্ঞানীই অনেক। তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীরদের হাটের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান এই লৌকিক গাথার ন্যায় যে অসদুপদেশ তাহাতে আস্থা করিয়া অন্ধ গোলাঙ্গূল ন্যায়ে নষ্ট হইয় না। যেমন স্ব শ্বশুরগৃহে সুখপ্রাপ্ত্যর্থে শ্বশুরাগারগমনেচ্ছু কোন অন্ধ ব্যক্তি শ্বশুরগ্রামপ্রান্তে দৃষ্ট কোন গোপকে শ্বশুরগৃহ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার বাক্যে দৃঢ়তরাস্থাতে স্বশ্বশুর গোপুচ্ছ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া শ্বশুরগৃহে গন্তকাম হইয়া আকর্ষণ ও পথিগত কণ্টকশর্করাদিবেধ ও পাদপ্রহারেতে ছিন্নভিন্ন ভঙ্গাঙ্গ হইয়াও তৎসুখপ্রত্যাশাতে গোপোপদিষ্ট গোপুচ্ছধারণ ত্যাগ না করিয়া রাত্রি প্রথমভাগে শ্বশুরবহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইয়া গোচৌরজ্ঞানে শ্বশুর-শ্যালকাদি কর্তৃক মুষ্টিযষ্টি প্রহারে চূর্ণাঙ্গ হইয়াছিল।'[২]

এইরূপ অনাবশ্যক প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া মৃত্যুঞ্জয় মূল বিষয়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন এবং ফলে তাঁহার প্রবন্ধগত গুণোৎকর্ষের মানও অধিকতর হ্রাস পাইয়াছে।

'প্রবোধচন্দ্রিকা' মৃত্যুঞ্জয়ের লিখিত শেষ মৌলিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের নামপত্রে নিম্নোক্তরূপ উল্লেখিত হইয়াছে—

'ইহা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রেরদের নিমিত্তে রচিত।'

এই গ্রন্থে সাহিত্য, শিক্ষা, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা বিভিন্ন উপাখ্যানের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে। গ্রন্থ মধ্যে বিবিধ রচনারীতি অনুসৃত

১ 'বেদান্তচন্দ্রিকা', (কলিকাতা, ১৮১৭), পৃঃ ১

২ ঐ, পৃঃ ২-৩

হইয়াছে অথণ্ড কোন প্রবন্ধের ন্যায় একটি সুনির্দিষ্ট রীতি বা ধারাবাহিকতা ইহাতে অবলম্বন করা হয় নাই। কিন্তু এ'কথা সত্য যে, বাহ্যিক এক একটি আখ্যায়িকার আবরণ থাকিলেও 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সুষ্ঠু আলোচনা আছে এবং ইহাদের স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিলে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। বৈজপাল ভূপাল তাঁহার পুত্রগণকে বিদ্যা বিষয়ক যে উপদেশসমূহ দান করিয়াছেন এবং আচার্য প্রভাকর শর্মা রাজপুত্রগণের নিকট যে বিবিধ বিষয় সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা খণ্ড খণ্ড বিভিন্ন প্রবন্ধের রূপ ধারণ করিয়াছে। যে কোন প্রতিপাদ্য বিষয় অবলম্বন করিয়া আলোচনা এবং তথ্য ও যুক্তির সুসঙ্গত সমাবেশে বক্তব্য বিষয়কে প্রস্ফুট করিবার যে প্রয়াস, ইহা দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ের উপর রামমোহনের রচনারীতির প্রভাব উপলব্ধি করা যায়।

'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় শ্রীমান বৈজপাল ভূপাল যে স্থলে নিজ পুত্রকে শাস্ত্রানুশীলন সম্পর্কে উপদেশ দিয়াছেন, সেই অংশটি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিলে একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। এই জাতীয় বহু অংশই উদ্ধৃত করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীমান বৈজপাল ভূপাল প্রদত্ত উপদেশের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'হে পুত্র স্ববুদ্ধির স্থূলত্ব দোষ পরিহারার্থে শাস্ত্ররূপি শানে সতত অনুশীলনরূপে ঘর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণতা সম্পাদন কর। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্র প্রদেশ স্পর্শন করত অভ্যন্তর প্রবিষ্ট হয়। স্থূলবুদ্ধি প্রস্তরপ্রায় বিষয়ের যাবৎ প্রদেশ স্পর্শন করিয়াও বাহিরেই থাকে। এতাদৃশ যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সেই বুদ্ধি তাদৃশ বুদ্ধি যার সেই বুদ্ধিমান্ সেই বলবান্ যে বলবান্ তাহারই রাজ্য অতএব লোকেতে লৌকিক বুদ্ধি থাকিতেও শাস্ত্রীয় বুদ্ধিরহিতকে নির্ব্বুদ্ধি বলে। * * * কোন পণ্ডিতেরা বুদ্ধি তিনপ্রকার হয় ইহা বর্ণনা করেন। তৈলবৎ বুদ্ধি প্রথমা উত্তমা যেমন তৈলবিন্দু জলের একদেশ স্পর্শ করা মাত্রেই তাবদ্দেশব্যাপে তেমনি যে বুদ্ধি শাস্ত্রৈকদেশ স্পর্শ করতই যাবদর্থ গ্রহণ করে সেই উত্তমা প্রথমা। চর্ম্মবৎ বুদ্ধি দ্বিতীয়া মধ্যমা যেমন চর্ম্ম সূচ্যাদিকরণক যৎ প্রদেশে বিদ্ধ হয় তাবন্মাত্রপ্রদেশে সচ্ছিদ্র হয় আর২ প্রদেশে পূর্ব্বের মতই থাকে তেমনি যে বুদ্ধি যাবন্মাত্র শাস্ত্রার্থকরণক সংস্পৃষ্ট হয় তাবন্মাত্রার্থ গ্রহণ করে অধিকার্থ গ্রহণ করিতে পারে না সেই বুদ্ধি দ্বিতীয়া মধ্যমা। নমদা নামক বস্ত্রবিশেষবৎ বুদ্ধি তৃতীয়া অধমা যেমন নমদা নামক বস্ত্র সূচ্যাদিবিদ্ধপ্রদেশেতে সূচ্যাদিতে অবিদ্ধপ্রদেশের ন্যায় থাকে

তেমনি যে বুদ্ধি পঠিত শাস্ত্রার্থে অপঠিত শাস্ত্রার্থের ন্যায় থাকে সেই বুদ্ধি তৃতীয়া অধমা।'[১]

এই জাতীয় রচনায় সংস্কৃতের ন্যায় সুদীর্ঘ সমাসনিবদ্ধ পদবিন্যাস ও দুরূহ বাক্য যোজনার ফলে ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে ইহাতে ভাষার স্বাভাবিক প্রাঞ্জলতা লক্ষিত হয় না। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবন্ধধর্মী রচনায় সাধারণতঃ এইরূপ জটিল রচনারীতি অবলম্বিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ-লেখক হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের কোন পরিচয় নাই। তিনি প্রধানতঃ শিশুদের পাঠোপযোগী আখ্যায়িকা গ্রন্থ রচনার জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮) প্রভৃতি আখ্যানধর্মী রচনায় মৃত্যুঞ্জয় মূল সংস্কৃত আখ্যান-সমূহ হইতে ভাব অবলম্বন করিলেও ভাষা ও রচনারীতির ক্ষেত্রে তাঁহার মৌলিকত্বের পরিচয় লাভ করা যায়। সাহিত্যের কোন কোন ঐতিহাসিক মৃত্যুঞ্জয়কে বাংলা গদ্যের প্রথম 'সক্ষম শিল্পী' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। এ'কথা স্বীকার করা যায় যে, মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে শিল্পিজনোচিত প্রতিভার অভাব ছিল না। কারণ, তাঁহার ভাষার সরসতা মুখ্যতঃ আখ্যায়িকামূলক রচনাসমূহে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবন্ধের ভাষা নীরস, তাহা বহুল সংস্কৃত শব্দ ও সমাসে সমাচ্ছন্ন হইয়া আড়ষ্ট ও মন্থরগতি হইয়াছে। প্রবন্ধের ভাষা ও রচনাদর্শের ক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয় মূলতঃ রামমোহনকে অনুসরণ করিয়াছেন। পৌরাণিক আখ্যান-মূলক বা ঐতিহাসিক কাহিনীধর্মী রচনাতেই তিনি নিজস্ব রচনারীতি ও ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন এবং এ'ক্ষেত্রে তাঁহার সহজাত নৈপুণ্যও প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের পক্ষে তাঁহার ভাষার বা রচনারীতির স্বকীয় ধর্ম রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবন্ধের ভাষা হইতে তাঁহার শিশুপাঠ্য আখ্যায়িকা গ্রন্থের ভাষার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'বত্রিশ সিংহাসন' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্ত মাংস মলমূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিক প্রীতি করা জ্ঞানীজনের উপযুক্ত নয় প্রীতি

১ 'প্রবোধচন্দ্রিকা', (শ্রীরামপুর, ১৮৪৫), পৃঃ ৪-৫

যেমন সুখদায়ক বিচ্ছেদে ততোধিক দুঃখদায়ক হন অতএব নিত্যবস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। নিত্যবস্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরম পুরুষ ব্যতিরেক কেহ নয় তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার কারাগার হইতে মুক্ত হন।'[১]

প্রধানতঃ আখ্যানধর্মী রচনার ভাষায় মৃত্যুঞ্জয়ের সাহিত্যিক সরসতা বা শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় লাভ করা যায়। কিন্তু সেই তুলনায় তাঁহার প্রবন্ধের ভাষা এবংবিধ সরস হইতে পারে নাই। মৃত্যুঞ্জয় প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে মুখ্যতঃ রামমোহনেরই অনুগামী ছিলেন।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—কাশীনাথ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী পণ্ডিত ছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। কাশীনাথের ন্যায় বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিতও ব্রাহ্মনেতা রামমোহনের মতাদর্শের বিরোধী ছিলেন এবং পাশ্চাত্ত্য প্রেরণাজাত বাঙ্গালীর নবজাগরণ তাঁহার দৃষ্টিতে উপেক্ষিত হইয়াছিল। রামমোহনের ধর্ম ও সামাজিক মতের তিনি অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং রামমোহনের সহমরণ-প্রথা বিষয়ক রচনার বিরোধিতা করিয়া কাশীনাথ 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' (১৮১৯) নামক একটি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তিনৈপুণ্যে তাঁহার রচনাও তৎকালীন পাঠকসমাজকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল।

কাশীনাথের সর্বাপেক্ষা বহুল প্রচারিত বিতর্কাশ্রয়ী রচনা 'পাষণ্ডপীড়ন' (১৮২৩)। রামমোহনের 'চারিপ্রশ্নের উত্তরে'র প্রত্যুত্তর স্বরূপ ইহা লিখিত। ছদ্মনামে লিখিত এই গ্রন্থটিতে কাশীনাথ এ'রূপ তীব্রভাবে রামমোহনকে আক্রমণ করিয়াছিলেন যে, সাধারণ পাঠকসমাজের অদম্য কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসায় তাঁহার প্রকৃত নাম প্রকাশিত হইয়া যায়। বাক্-সংযম বা সুরুচিবোধের কোন পরিচয় 'পাষণ্ডপীড়ন' গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায় না। কাশীনাথ অতি নির্মমভাবে মাত্রাতিরিক্ত কটূক্তি বর্ষণ করিয়া রচনার বিষয়গত গুরুত্ব বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। গ্রন্থের নামকরণের মধ্য হইতেও লেখকের আক্রমণাত্মক মনোভাবের পরিচয় লাভ করা যায়।

'পাষণ্ডপীড়ন' গ্রন্থে বিচার-বিতর্ক যথেষ্ট পরিমাণে আছে, অর্থাৎ কর্মীর ভাক্তত্ব খণ্ডন, নিস্বার্থবাদ যথার্থবাদের বিচার, সদাচার সদ্ব্যবহারের বিশিষ্ট লক্ষণ, নিগূঢ়

১ 'বত্রিশ সিংহাসন', (কলিকাতা, ১৮০২), পৃঃ ২৭

শাস্ত্রদর্শন-তত্ত্ব, হিংসা বিচার, সৌত্রামনী যাগে সুরাপান খণ্ডন ইত্যাদি বহু বিচার-বিতর্কের মীমাংসা শাস্ত্রীয় যুক্তি ও তথ্যের সমাবেশে সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই বিচার-বিতর্কসমূহ-ব্যঙ্গ ও অশালীন মন্তব্যসহ এমন ভাবে পরিবেশিত হইয়াছে যে, ইহার গুরুত্বপূর্ণ অংশের শ্রেষ্ঠত্ব সাধারণের নিকট স্বীকৃতি লাভ করে নাই। ক্ষুরধার যুক্তি-তর্কের কৌশল, বিষয়-বিচারে শাস্ত্রজ্ঞান, ঔচিত্যবোধ প্রভৃতি বিতর্কপ্রধান প্রবন্ধের বিশিষ্ট গুণগুলি কাশীনাথের রচনার কোন কোন অংশে লক্ষ্য করা গেলেও বাক্-সংযম, সুরুচিজ্ঞান এবং ভাবপ্রকাশে মাত্রাবোধের অধিকতর অভাব হেতু তাঁহার প্রবন্ধ কোন বিশিষ্ট গৌরব দাবী করিতে সক্ষম হয় নাই।

কাশীনাথ 'পাষণ্ডপীড়ন' গ্রন্থে প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিতে গিয়া বিরোধী ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রের প্রতিও কটাক্ষপাত করিয়াছেন এবং অনাবশ্যকভাবে অশ্লীল বাক্য-প্রয়োগ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার 'পাষণ্ডপীড়ন' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'নগরান্তবাসীর অদ্যাপি যবনীগমনের চিহ্ন প্রকাশ হইতেছে, যেহেতু, নিজ বাসস্থানের প্রান্তেই যবনীগমনের ধ্বজপতাকা রোপণ করিয়াছেন। সম্বিদাপান সুরাপানতুল্য হয় কি কারণে ও কি প্রমাণে তাহা জানিতে বাসনা করি? এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের মধ্যে কোন২ ব্যক্তির যৌবনাবস্থাতেও কেশের শুক্লতা দৃষ্টি হইতেছে, যদি তাঁহারা যবনের কৃত কলপের দ্বারা কেশের কৃষ্ণতা করিতেন, তবে শুক্লতার প্রত্যক্ষ, কি স্বপক্ষ, কি বিপক্ষ, কাহারো হইত না, দেখ, ভাক্তত্তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগের বৃদ্ধাবস্থার চিহ্ন, কেবল দন্তভঙ্গ, তাহাও কোন২ মহাত্মা কৃত্রিম দন্তের দ্বারা আচ্ছন্ন করেন, কেহ২ বার্দ্ধক্যের প্রত্যক্ষ ভয়ে মেষের ন্যায় বক্ষঃস্থলেরো লোম কর্ত্তন করিয়া থাকেন, এবং কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেই মুণ্ডিত মুণ্ড, তাহাতে বৃদ্ধদিগেরো সেই মুণ্ডিত মুণ্ডের ও কৃষ্ণতুণ্ডের কেশেরো শুক্লতাদৃষ্টি কখন কাহারো হয় না, ইহাতে বুঝি ঐ মহাত্মারা গৃহজাত কলপ কিম্বা কালির দ্বারাই ঐ মুণ্ডিত মুণ্ডের ও কৃষ্ণতুণ্ডের অপূর্ব্ব শোভা করিয়া থাকেন। ভাক্তত্তত্ত্বজ্ঞানীদিগের এও একপ্রকার বিধিকৃত দণ্ড, এবং তাঁহারদিগের অবিরত অবিহিত আচরণ নিমিত্ত অপরাধের মস্তকমুণ্ডন ও মুখে মসীলেপন, এই দণ্ড উপযুক্তও বটে, অতএব সম্প্রতি তাদৃশ অপরাধে রাজশাসনাভাব প্রযুক্ত বিধাতা তাঁহারদিগের দ্বারাই তাঁহারদিগের দণ্ড করিতেছেন।'[১]

[১] 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী',—৬ এর অন্তর্ভুক্ত 'পাষণ্ডপীড়ন', (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), পৃঃ ৬৫

রামমোহনের বিচার-বিতর্কমূলক আলোচনা-পদ্ধতির প্রভাব হইতে কাশীনাথও মুক্ত হইতে পারেন নাই। তিনিও এই শ্রেণীর রচনায় রামমোহন-প্রদর্শিত সংলাপাত্মক ভঙ্গি অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে কাশীনাথের একটি স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত প্রবচন ও বাক্যবিধির সফল প্রয়োগেও তাঁহার রচনা অধিকতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়াছে।

ব্রজমোহন মজুমদার—উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলাদেশের ধর্ম-সংস্কার কার্যে রামমোহনকে যাঁহারা বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন, ব্রজমোহন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি রামমোহন প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'র একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। রামমোহনের পৌত্তলিকতা-বিরোধী মতবাদকে তিনি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতেন এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় আলোচনায় ব্রজমোহন একান্তভাবে রামমোহনকেই অনুসরণ করিয়াছেন। রামমোহনের ধর্মাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রজমোহন ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া 'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ' নামে একটি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ পুস্তিকা রচনা করেন। এই রচনাটি পরবর্তী কালে 'পৌত্তলিক প্রবোধ' নামে 'তত্ত্ববোধনী সভা' হইতে পুনরায় প্রকাশিত হয়। 'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ' পুস্তকটি খ্রীষ্টীয় সমাজেও সমাদৃত হইয়াছিল এবং ইহা পাদরি ডবলিউ মর্টন কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হয়। ব্রজমোহন তাঁহার রচনায় রামমোহন প্রবর্তিত মতবাদ বিষয়রূপেই কেবলমাত্র গ্রহণ করেন নাই, রামমোহনের রচনাদর্শ ও ভাষা পর্যন্ত অনুকরণ করিয়াছেন।

'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ' পুস্তিকাটি সংলাপাত্মক অর্থাৎ উক্তিপ্রত্যুক্তিমূলক আঙ্গিকে রচিত হইয়াছে। প্রাজ্ঞ ও পৌত্তলিক এই দুইটি কাল্পনিক চরিত্রের কথোপকথনের ভিতর দিয়া ব্রহ্মের একত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে। শাস্ত্রবচনের সহায়তায় ব্রজমোহন লোকপ্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে বহু সারগর্ভ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলে তাঁহার রচনা তথ্য-যুক্তি সমন্বিত একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। চিন্তার স্বচ্ছতা এবং ন্যায়বোধের তীক্ষ্ণতায় ব্রজমোহনের রচনা অধিকতর বলিষ্ঠ হইয়াছে।

সংযত মার্জিত রুচি ও সৌজন্যবোধ ব্রজমোহনের বিতর্কমূলক প্রবন্ধের একটি বিশিষ্ট গুণ। এ'ক্ষেত্রেও তিনি রামমোহনের নিকট বহুলাংশে ঋণী। প্রতিপক্ষের প্রচারিত মতবাদ খণ্ডন করিতে ব্রজমোহন তাঁহার রচনার বহু স্থলে তীব্র শ্লেষাত্মক বাক্যও প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা পরিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও

ব্রজমোহন তাঁহার রচনার কোথাও শোভন সংযমের মাত্রা অতিক্রম করেন নাই। প্রবন্ধ রচনায় এই সকল বিশিষ্ট গুণের জন্য ব্রজমোহনের রচনা একান্তভাবে রামমোহনেরই সমধর্মী।

'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ'ই ব্রজমোহনের একমাত্র লিখিত পুস্তিকা। ব্রজমোহন রামমোহনকে অনুসরণ করিলেও তাঁহার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য যে একেবারে ছিল না, তাহা নহে। একটি মাত্র গ্রন্থের মধ্য দিয়া তিনি যে রচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দ্বারাই তিনি সমকালীন প্রবন্ধকারগণের অন্যতম হিসাবে আসন পাইবার যোগ্য। যথাযথ শব্দ-চয়ন, পদ-প্রয়োগকৌশল এবং তথ্য ও যুক্তির সুনিপুণ সংযোজনায় ব্রজমোহনের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্রজমোহনের প্রশ্নোত্তরমূলক রচনা হইতে একটি বিশিষ্ট অংশ উদ্ধৃত হইল—

'পৌত্তলিক—সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের উপাসনা বেদান্তসম্মত হয় কিন্তু ইহার অধিকার গৃহস্থের প্রতি নহে।

প্রাজ্ঞ—তোমার এ কথা অত্যন্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয়, যেহেতু বেদে মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিতে এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রতি পরমেশ্বরের উপাসনার বিধি সর্ব্বপ্রকারে আছে, সিদ্ধ পরম্পরা দ্বারা কেননা দেখ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইন্দ্র ও বিরোচন জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং মুণ্ডকোপনিষদে দেখ মহাগৃহস্থ যে শৌণক তিনি অঙ্গিরার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন এবং ছান্দোগ্যে শ্রুতি-রাজা ও শ্বেতকেতু গৌতম জনক প্রভৃতি এ সকলেই গৃহস্থ হইয়া পরমেশ্বরের উপাসনাতে তৎপর ছিলেন এবং যুক্তিদ্বারাতেও অনুভব করহ যে অন্য অন্য আশ্রমে যেমন সুবোধ এবং নির্ব্বোধ আছে, সেইরূপ গৃহস্থের মধ্যেও বুদ্ধিমান এবং জড় আছে ঐ সকল জড়কে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত পুত্তলিকা খেলার অনুমতি দিয়াছেন, আর বুদ্ধিমানের জন্য পরমেশ্বরের উপাসনার বিধি দিয়াছেন, অতএব গৃহস্থ সকল বিশেষ মতে পরমেশ্বরের উপাসনাতে অধিকার রাখেন, তবে এ যথার্থ বটে যে, লাভার্থী ব্যক্তি-সকল এ কথা কহিয়া থাকেন, যে পরমেশ্বরের উপাসনাতে গৃহস্থের অধিকার নাই, ইহার কারণ স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে গৃহস্থেরা ধনবান্ প্রায় হইয়া থাকেন, অতএব তাহারদিগের পুত্তলিকা উপাসনা করাতে ঐ সকল পণ্ডিতদেরদিগের অধিক লাভ আছে, পরমেশ্বরের উপাসনায় সে লাভ নাই যেহেতু পুত্তলিকার অলঙ্কার বস্ত্রাদি প্রদান ও আহারের নৈবেদ্য ও বৈকালী শীতল ও বাল্যভোগ ইত্যাদি তাহারদিগের লাভের জন্য হইয়া থাকে এবং

উৎসবাদি দিবসে বিশেষ উপচার পুত্তলিকার উদ্দেশে দিতে হয়, এবং ব্রত মহোৎসব যাত্রা ও স্বস্ত্যয়ন পুরশ্চরণ প্রভৃতি কর্ম্মেতে পুত্তলিকা সংক্রান্ত অনেক ব্যয় হয়, ঐ সকল তাবৎ সামগ্রী ঐ লাভার্থী পণ্ডিতে পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং গৃহস্থেরা যত পুত্তলিকার উপাসনাতে মগ্ন থাকে, তাহারদিগের তত লাভের আধিক্য হয়।'[১]

শ্রীরামপুরের বিশিষ্ট মিশনারী ও বাংলাভাষাপ্রেমিক জে. সি. মার্শম্যান্ ব্রজমোহনের রচনার উচ্চ প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন—

'The style of the work was idomatic and attractive, combining great simplicity and ease with great vigour and strength ; but its chief power lay in the pungency of its satire.'[২]

ব্রজমোহনের রচনা সম্পর্কে উল্লিখিত মন্তব্য যে সার্থকভাবে প্রয়োগযোগ্য, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য—গৌরীকান্ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং রামমোহনের মতাদর্শের বিরোধী ছিলেন। রামমোহন যখন নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা-পদ্ধতি ও প্রচলিত সামাজিক প্রথাবিরুদ্ধ মতামত প্রচার করিয়া হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও চিরাচরিত প্রথাসিদ্ধ আচার-ব্যবহারের মূলে কুঠারাঘাত করেন, তখন বিরোধী-সম্প্রদায় তাহার প্রতিবাদ করিয়া সাকার উপাসনার শাস্ত্রীয়তা ও সামাজিক প্রথাসমূহের যথাসম্ভব ঔচিত্য প্রদর্শন করিয়া বিবিধ বিতর্কমূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের 'জ্ঞানাঞ্জন' গ্রন্থটি এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনা।

'জ্ঞানাঞ্জন' গ্রন্থটি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা রামমোহনের ধর্মমতের প্রতিকূলে লিখিত একটি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ। গৌরীকান্ত তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে ধর্মীয় তত্ত্বনিষ্ঠ যুক্তিভিত্তিক আলোচনার সহিত অতি তরল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও পরিবেশন করিয়াছেন। অনাবশ্যক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও দুর্বাক্য প্রয়োগহেতু গৌরীকান্ত তাঁহার রচনায় প্রাবন্ধিক সংযম যথাযথভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই।

১ 'পৌত্তলিক প্রবোধ' (তত্ত্ববোধিনী সভা, ১৭৬৮ শকাব্দ), পৃঃ ২৭-২৮

২ *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward,* 1859, ii. p. 239.

'জ্ঞানাঞ্জনে'ও বক্ষ্যমান বিষয় উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে পরিবেশিত হইয়াছে। মহাবিজ্ঞ ও অবহুজ্ঞ এই দুইজন কাল্পনিক পাত্রের যুক্তি-তর্কমূলক পারস্পরিক আলোচনা অস্মদ্বচনং নামক তৃতীয় মুখপাত্রের মধ্যস্থতায় সম্পন্ন হইয়াছে। অস্মদবচনং-এর ভাষণ মহাবিজ্ঞের প্রতি নিছক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মাত্র। এ'স্থলে মহাবিজ্ঞ পাত্রটি রামমোহনকে উপলক্ষ্য করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থ মধ্যে লেখক হিন্দুধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে মুখ্যতঃ মহাবিজ্ঞ ও অবহুজ্ঞের কথোপকথনের মাধ্যমে রামমোহন প্রবর্তিত মতবাদকে খণ্ডন করিয়া হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। গৌরীকান্ত মহাবিজ্ঞ ও অবহুজ্ঞ এই উভয় পাত্রের মধ্যেই যদি তাঁহার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ব বা তথ্যনিষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে 'জ্ঞানাঞ্জনে'র মর্যাদা অস্বীকার করা সম্ভব হইত না। কিন্তু মহাবিজ্ঞ ও অবহুজ্ঞের প্রতিটি আলোচনার সমাপ্তিতে অস্মদবচনং-এর কটূক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত থাকায় ইহার বিষয়গত গুরুত্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। অস্মদবচনংকে মূলতঃ রামমোহনের প্রতি অশ্লীল বাক্য নিক্ষেপের আধার হিসাবেই ব্যবহার করা হইয়াছে।

এ'কথা স্বীকার্য যে, 'জ্ঞানাঞ্জন' গ্রন্থে অবহুজ্ঞের অলোচনা চিন্তার সুস্পষ্টতা এবং শাস্ত্র-পাণ্ডিত্যে মূল্যবান্। ইহার ভাষা সংস্কৃতশব্দ বাহুল্যহেতু অংশতঃ দুর্বোধ্য হইয়াছে। গ্রন্থ মধ্যে আস্তিক্যবাদ অর্থাৎ ঈশ্বরাস্তিত্বের সিদ্ধান্ত-বিচার, অদৃষ্টবাদ, সৃষ্টিতত্ত্ব, পূজোপাসনার বিধি, ব্রহ্মাণ্ড-জীবভেদতত্ত্ব, সুখদুঃখকর্মবাদ, সগুণনির্গুণোপাসনা, প্রতিমাপূজা, দেবতার বহুত্ব বিচার, আচার ও বর্ণ বিচার, বেদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার, মৃত্যুর পরে আত্মার গতি-প্রকৃতিতত্ত্ব ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রীয় দৃষ্টি ও চিন্তাশীল দার্শনিকের পাণ্ডিত্যসুলভ স্থির সিদ্ধান্তের আলোকে বিচার-বিশ্লেষিত হইয়াছে।

'জ্ঞানাঞ্জন' গ্রন্থের একটি বিশেষ ত্রুটি যে, ইহার অধিকাংশ স্থলেই এত অধিক শাস্ত্রশ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে যে, লেখকের নিজস্ব বক্তব্য বিষয় অগ্রসর না হইয়া একস্থানে দাঁড়াইয়া আবর্ত সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'৩। মহাবিজ্ঞ কহেন যে ঈশ্বর যদ্যপি মানি তথাপি তাঁহার সেবার প্রয়োজন নাই কেননা ঐ সেবা না করিলে আমার শারীরিক কার্য্যের বাধা হয় না।

৩। অবহুজ্ঞ কহেন যে নৈককারণাৎ কার্য্যনিষ্পন্নং এই ন্যায়মতে ঈশ্বরের অতিরিক্ত অনুকূল অদৃষ্ট এক বস্তু অবশ্য মানিতে হইবে যেহেতুক ঈশ্বর সৃষ্টি করেন তাহাতে আমরা সুখী ও দুঃখী হই অথচ ঈশ্বরের কেহ সুহৃৎ কেহ বহিরঙ্গ নাই তথাচ। ন রাগো ন দ্বেষঃ ক্বচিদপি জনে তস্য ভবতি। অগত্যা সুখদুঃখের কারণ অদৃষ্টই হয় এই অভিপ্রায়ে কুসুমাঞ্জলিতে কহিয়াছেন যে। একস্য ন ক্রমঃ ক্বাপি বৈচিত্র্যঞ্চ সমস্য ন। শক্তিভেদো ন চা ভিন্নঃ স্বভাবোদুরতিক্রমঃ। অতএব স্ব স্বাদৃষ্ট প্রমেয় বটে সে অদৃষ্ট বশাৎ ঈশ্বর সুখী দুঃখী করেন তথাহি মনুঃ॥ ১।২৮ যন্তু কর্ম্মণি যস্মিন্ স ন্যযুঙ্‌ক্ত প্রথমং প্রভুঃ। স তদেব স্বয়ং ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥ কর্ম্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ব্যবেচয়ৎ। দ্বন্দ্বৈর যো জয়চ্চেমারঃ সুখ দুঃখাদিভিঃ প্রজাঃ॥'[১]

এইভাবে লেখক অবহুজ্ঞের আলোচনার মধ্য দিয়া যোগবাশিষ্ঠ, বেদান্ত ইত্যাদি হইতে কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী কেবল শাস্ত্রশ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। ইহার শেষাংশটি এইরূপ—

'পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে এই সংসার আমার রূপ দ্বারা প্রভুর ঐশ্বর্য্যবিস্তার। আর মনুষ্যজাতিরূপে প্রকৃত প্রভুত্ব সংস্থান প্রয়োজন হয় অতএব সর্ব্বমতেই অদৃষ্টের কারণতা আর পুণ্য পাপ সেই অদৃষ্ট জন্মায় সুতরাং ঈশ্বর সেবাদি ব্যতীত পুণ্য নাই তথাচ গীতা। ১৮ অধ্যায়ে। যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা কি শৃঙ্খলার লঙ্ঘন অথবা পরস্পর দ্রোহাদিতে পাপ হইল যথা ব্রহ্মখণ্ডে। ২৪ অধ্যায়ে। বেদ প্রণিহিতো ধর্ম্মোহ্য ধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। একারণ ঈশ্বর সেবার কর্ত্তব্যতা সিদ্ধ হইল।'[২]

মহাবিজ্ঞ ও অবহুজ্ঞ এই উভয়ের বিবিধ প্রশ্নোত্তরের শেষে সিদ্ধান্তস্বরূপ অস্মদবচনং-এর বক্তব্য বিবৃত হইয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, এই গ্রন্থের সকল আলোচনার গুরুত্ব ইহা দ্বারা বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ন হইয়াছে। কোনরূপ যুক্তি-তর্কের অবতারণা না করিয়া কেবলমাত্র মহাবিজ্ঞকে অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করাই অস্মদবচনং-এর একমাত্র উদ্দেশ্য। উল্লিখিত আলোচনার শেষে অস্মদবচনং-এ এইরূপ বিবৃত হইয়াছে—

১ 'জ্ঞানাঞ্জন', (কলিকাতা, ১৮৩৮), পৃঃ ৭-৮

২ ঐ, পৃঃ ১৪

'হে অবহুজ্ঞ তুমি কি কিছুই বুঝ না যে মহাবিজ্ঞ বিষয়তৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয় বিষয়-ভোগে এমত ব্যগ্র ও আসক্ত যে তাহার ঈশ্বর সেবার অবকাশমাত্র নাহি। অধিকন্তু তিনি বুঝিলেন যে গবাদি পশুর ন্যায় আহারাদি কার্য্য না করিলেই হয় না তাহাতে মনুষ্যের বিশেষ কার্য্য স্বীকারে প্রয়োজন কি বরং তাহাতে বিষয়ভোগের অল্পতাই ঘটে। সেত মহাবিজ্ঞের মত নহে কেননা অন্য পশু হইতে তাহার বিশেষ কি।'১

এ'কথা স্বীকার করিতে হয় যে, নিম্নস্তরের কটূক্তি বর্ষণ দ্বারা গ্রন্থটির পণ্ডিতজনোচিত আলোচনার সামগ্রিক মহিমা লুপ্ত হইয়াছে।

গৌরীকান্তের পরবর্তী কালে লিখিত 'কর্মাঞ্জন' (১৮৪৭) নামে আরও একটি প্রবন্ধ গ্রন্থের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটি 'জ্ঞানাঞ্জনে'র ন্যায় ধর্ম বিষয়ক বিতর্কশ্রেয়ী আলোচনা নহে। ইহাতে শিক্ষা, সমাজ এবং বিশেষতঃ পরিবার বা গার্হস্থ্য জীবন সম্পর্কে নীতিগর্ভ আলোচনা আছে। পরিবার বা গার্হস্থ্য-বিষয়ক রচনা পরবর্তী কালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা গভীর চিন্তাসহকারে ও বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে গার্হস্থ্য বা পরিবার বিষয়ক আলোচনার পূর্বাভাষ হিসাবে গৌরীকান্তের 'কর্মাঞ্জন' গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য।

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার—গৌরমোহন একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং রামমোহন-বিরোধী সম্প্রদায়ের অন্যতম লেখক ছিলেন। তিনি রামমোহনের ধর্মাদর্শ ও সামাজিক মতামতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিজাত প্রগতিশীল মনোভাব গৌরমোহনের ছিল না। হিন্দুর সনাতন রক্ষণশীল ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-ব্যবহারেরই তিনি পরিপোষক ছিলেন। সর্ববিধ ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে রক্ষণশীলতার পরিচয় দিলেও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক সমর্থন ও উৎসাহ ছিল। আশ্চর্যের বিষয় যে, এ'ক্ষেত্রে তিনি তথাকথিত রক্ষণশীল হিন্দু-মনোভাব বর্জন করিয়াছিলেন। তৎকালীন স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারে রামমোহন ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ও একান্ত উৎসাহী ব্যক্তি। যদিও এ'বিষয়ে গৌরমোহন রামমোহনকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেন নাই; কিন্তু তথাপি পরোক্ষভাবে তিনি যে রামমোহনের শিক্ষাবিষয়ক মতবাদকে সমর্থন করিয়াছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১ 'জ্ঞানাঞ্জন', (কলিকাতা, ১৮৩৮), পৃঃ ১৭

গৌরমোহন তৎকালীন স্কুলবুক সোসাইটী ও স্কুল সোসাইটী নামক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং এই দুই সোসাইটীর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি গ্রন্থ রচনা-কর্মেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রামমোহন স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারে উৎসাহ প্রদর্শন করিলেও এ' বিষয়ে তাঁহার কোন রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। গৌরমোহনের কৃতিত্ব যে, তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পুস্তিকা রচনা করেন।

গৌরমোহন প্রণীত 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' (১৮২২) পুস্তিকাটি তৎকালীন জন-সাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার পুনর্মুদ্রণ ও বহু সংস্করণ দ্বারা পুস্তিকাটির জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' গ্রন্থে গৌরমোহন দুইটি পরিচ্ছেদে শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা সমাপ্ত করিয়াছেন। প্রথমভাগে 'দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন' এই শিরোনামায় স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়ভাগে লেখক 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসের প্রমাণ' এই শিরোনামে ভারতবর্ষে নারী-শিক্ষার ধারা অর্থাৎ মৈত্রেয়ী, শকুন্তলা, অনুসূয়া, দ্রৌপদী, ভগবতী, রুক্মিণী, লীলাবতী, খনা এবং রাণী ভবানী, হঠী বিদ্যালঙ্কার, শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি ভারতীয় বিদুষী রমণীগণের পরিচয় দান করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষ যে নারী-শিক্ষার বিরোধী ছিল না, সেই ঐতিহ্য-চেতনা জাগ্রত করিবার প্রয়াসই গৌরমোহনের রচনার মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

গুরুগম্ভীর নীরস বিষয়কে সাধারণের নিকট উপভোগ্য বা আকর্ষণীয় করিবার জন্যই রামমোহন মুখ্যতঃ সংলাপাত্মক রচনাভঙ্গি অর্থাৎ কথোপকথনের মধ্য দিয়া তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সমকালীন অধিকাংশ লেখকই রামমোহন প্রবর্তিত এই রচনারীতি অনুসরণ করেন। গৌরমোহনও তাঁহার পুস্তিকার প্রথমাংশে এই রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, রামমোহনের ভাব ও ভাষার প্রভাবও গৌরমোহনের রচনায় অনুভব করা যায়। উভয়ের রচনা হইতে দুইটি অংশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত হইল। রামমোহন স্ত্রীজাতির মেধা বা বুদ্ধি সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

'প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন

তাহাকে অল্প-বুদ্ধি কহা সম্ভব হয় ; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন ?'[১]

গৌরমোহন লিখিয়াছেন—

'যদি বল স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অল্প এ কারণ তাহাদের বিদ্যা হয় না, অতএব পিতা মাতা ও তাহাদের বিদ্যার জন্যে উদ্বেগ করেন না, এ কথা অতি অনুপযুক্ত। যেহেতুক নীতিশাস্ত্রে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বুদ্ধি চতুর্গুণ ও ব্যবসায় ছয়গুণ কহিয়াছেন। এবং এদেশের স্ত্রীলোকেদের পড়াশুনার বিষয়ে বুদ্ধি পরীক্ষা সংপ্রতি কেহই করেন নাই। এবং শাস্ত্রবিদ্যা ও জ্ঞান ও শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করাইলে যদি তাঁহারা বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে না পারেন তবে তাঁহারদিগকে নির্বোধ কহা উচিত হয়।'[২]

অতএব. ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নহে যে, প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে গৌরমোহনও রামমোহনের প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন নাই।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—রামমোহনের স্বপক্ষীয় লেখকগণের মধ্যে রামচন্দ্র অন্যতম। তিনি সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃতজ্ঞ হইলেও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহার গভীর মমত্ববোধ ছিল এবং তিনি সর্ববিধ প্রগতিশীল মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। বিবিধ সামাজিক কু-প্রথাদির তিনি বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। সমাজ ও ধর্মাদর্শের ক্ষেত্রে রামচন্দ্র রামমোহনেরই অন্তরঙ্গ সহযোগী ছিলেন।

মূর্তিপূজা-বিরোধী রামমোহনের ধর্মীয় মতবাদ দেশের মধ্যে প্রচারিত হইলে সাকার-উপাসকদিগের সহিত তাঁহার বিচার-বিতর্ক এবং গভীর শাস্ত্রীয় আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। এই তর্ক-বিতর্কে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রামমোহনের অন্যতম প্রধান সমর্থক ছিলেন। তিনি রামমোহনের মতাদর্শের কেবল সমর্থকই ছিলেন না—তাঁহার সর্বপ্রধান শিষ্য এবং 'আত্মীয় সভা'র অন্যতম আচার্য হিসাবেও রামচন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। উপনিষদ ও বেদান্ত-

১ 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ', রামমোহন-গ্রন্থাবলী—৩, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), পৃ ৪৬

২ 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক', (কলিকাতা, ১৮২৪), পৃঃ ২২

দর্শনাদিতে রামচন্দ্রের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং দার্শনিক তত্ত্ব-বিচার-বিশ্লেষণে তিনি রামমোহনকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। রামচন্দ্রের পাণ্ডিত্য এবং মননশীলতার সম্যক্ পরিচয় তাঁহার ব্রহ্ম বিষয়ক ব্যাখ্যানসমূহ হইতে লাভ করা যায়। বিরোধী পক্ষের লেখকগণ যখন বিবিধ তর্ক-যুক্তি বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে রামমোহনের বক্তব্য খণ্ডন বা ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সেই সময়ে রামচন্দ্র তাঁহার এই জাতীয় ব্যাখ্যানিপুণ রচনা দ্বারা রামমোহনকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করিয়াছেন। পরবর্তী কালে রামচন্দ্রের পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ক খণ্ড খণ্ড ব্যাখ্যানগুলি গ্রন্থাকারে সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের ব্রহ্মোপাসনার স্বচ্ছ, সরল ব্যাখ্যায় তৎকালীন জনসমাজ বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। তিনি এইরূপে তাঁহার ধর্মতত্ত্বমূলক রচনার ভিতর দিয়া রামমোহন-পরিচালিত ধর্মান্দোলনে সহযোগিতা করিয়াছেন।

রামচন্দ্র প্রণীত ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক ব্যাখ্যানসমূহ ১৭৫১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথমাবধি সপ্তদশ ব্যাখ্যান' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রতিটি ব্যাখ্যানই চিন্তার গভীরতায় এবং প্রকাশের স্বচ্ছতায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে। রামচন্দ্রের মানসলোক প্রধানতঃ রামমোহনের ভাবধারায় গঠিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার ব্যাখ্যানিপুণ রচনার মধ্য দিয়া মুখ্যতঃ রামমোহনেরই ধর্মাদর্শ প্রচার করিয়াছেন। শাস্ত্রীয় উপাদানের ভিত্তিতে স্বকীয় চিন্তাধারার যুক্তিসম্মত অবতারণার মধ্যে রামচন্দ্রের রচনা-দক্ষতা অনস্বীকার্য। যুক্তিনিষ্ঠ, সারগর্ভ, ভাবসম্পদে ভূয়িষ্ঠ অথচ উচ্ছ্বাসহীন রচনার জন্য রামচন্দ্র যে রামমোহনেরই একান্তভাবে প্রভাবপুষ্ট, এ'কথা অস্বীকার করা যায় না। বিচারনিষ্ঠ প্রবন্ধের বিশিষ্ট গুণসমূহ রামচন্দ্রের রচনার মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার খণ্ড খণ্ড ধর্ম-ব্যাখ্যানগুলি এক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের রূপ ধারণ করিয়াছে। রামচন্দ্রের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিও প্রশংসনীয়। তাঁহার ভাষার স্বাভাবিক সারল্য ও গতি-স্বাচ্ছন্দ্য রচনার প্রতিপাদ্য ভাব-চিন্তা পাঠকের নিকট অধিকতর সহজবোধ্য ও আবেদনগ্রাহ্য করিয়া তুলিয়াছে। রামচন্দ্র প্রণীত চতুর্দশ ব্যাখ্যানের কিয়দংশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত হইল—

'এ উপাসনার প্রত্যক্ষ উপকার এই যে বহু পাপের মূল ও লোকের দ্বেষ্য হইবার কারণ যে অভিমান তাহা এ উপাসনায় অবশ্যই খর্ব্ব হয়, যেহেতু যখন

ব্যক্তি বিশ্বকারণের চিন্তার অন্তঃপাতি যে অপরিমিত বিশ্ব তাহার চিন্তন করিবেক, তৎকালে এই পৃথিবী যাহা অত্যন্ত বৃহদাকার দৃষ্ট হইতেছে ইহাকে সমুদ্রের বালুকাচয়ের এক বালুকা হইতেও ক্ষুদ্রজ্ঞান করিবেক। সুতরাং পৃথিবীর অত্যন্ত ক্ষুদ্রভাগ যে আপন শরীর তাহা কি পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ও অগণ্য বোধ হইবেক তাহা বক্তব্য হইতে পারে না, অতএব শরীর সম্পর্ক অভিমানের হ্রাস হইবার বিশেষ সম্ভাবনা হইল সেইরূপ এই অনাদি অনন্তকালের আলোচনাতে আপনার আয়ুঃ ক্ষণমাত্রের কোটি অংশের এক অংশ বোধ হইতে পারে না। সেই প্রকার ঐ কারণের অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি রচনার শক্তিতে ও তাঁহার প্রত্যক্ষ কার্য্য চন্দ্রসূর্য্যাদিতে আলোচনা করিলে আপনার ক্ষমতামাত্র আছে এ মত বোধও হইতে পারে না, সুতরাং আত্মাভিমান হ্রাস হইলে লোকের প্রিয় হইবেক ও যে যৎকিঞ্চিৎ কাল জীবনধারণ করিবেক তাহাতে বৈরাগ্যাধীন অন্যের উদ্বেগকারী প্রায় হইবেক না।'[১]

কেবলমাত্র ধর্ম ব্যাখ্যাতেই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। পরবর্তী কালে তাঁহার বক্তৃতাকারে লিখিত 'হিন্দু কালেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা' (১৮৪০) নামক প্রবন্ধের মধ্যে রামচন্দ্রের দেশীয় ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ ও উক্ত ভাষা শিক্ষার প্রতি ব্যাপক প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়। সারগর্ভ যুক্তি ও প্রকাশভঙ্গির আন্তরিকতায় তাঁহার এই রচনাটিও সমাদরযোগ্য।

এ'কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, দেশের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে রামমোহন প্রবর্তিত যে আন্দোলন ও বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে রামমোহনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং উভয় পক্ষই যুগাধিককাল তুমুল মতবিরোধ, বিচার-বিতর্কে আত্মনিয়োগ করিয়া যে সকল রচনা-কর্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা বাংলা প্রবন্ধ রচনার প্রত্যুষ-পর্বে ইহার জীবনীশক্তি-সঞ্চারে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে।

১ 'পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথমাবধি সপ্তদশ ব্যাখ্যান', (তত্ত্ববোধিনী সভা, ১৭১৭ শকাব্দ), পৃঃ ৭৬

তৃতীয় অধ্যায়

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রামমোহনের রচনার প্রভাব তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও সমকালীন প্রতিপক্ষ লেখকগণের উপর যেরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, পরবর্তী কালে তাহা ক্রমান্বয়ে ক্ষীণপ্রায় হইয়া অসিয়াছিল। কারণ, বিষয়-বৈচিত্র্যানুসারে তখন বাংলা প্রবন্ধের ভাব, ভাষা ও রচনারীতির মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। বাংলা প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন অক্ষয়কুমার দত্ত হইতেই সূচিত হয়। অক্ষয়কুমারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী লেখক হইলেন রেভারেণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামমোহন-পর্বের অন্যতম প্রবন্ধকার হিসাবে কৃষ্ণমোহনের পরিচয় প্রদান করিলেও এই পর্বের অন্যান্য প্রবন্ধকারগণ হইতে তাঁহার রচনার স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্য ছিল। প্রধানতঃ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য তৎকালীন দেশীয় সমাজ হইতে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ফলে দেশীয় সাময়িক পত্রসমূহ বা তৎকালীন লেখক সম্প্রদায়ের সহিত কৃষ্ণমোহনের ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তথাপি সমকালীন যুগ-প্রভাব অর্থাৎ, রামমোহনের প্রখর ব্যক্তিত্ব বা রচনার প্রভাব হইতে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না।

কৃষ্ণমোহন ধর্ম ও তত্ত্ববিষয়ক কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। এই ধর্ম বা তত্ত্ব বিষয়ক রচনায় প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও কৃষ্ণমোহন যে পরোক্ষভাবে তাঁহার পূর্বসূরী রামমোহনের রচনারীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এ'কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। কৃষ্ণমোহন ছিলেন বাঙ্গালী খ্রীষ্টান এবং পরবর্তী কালে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি এ'দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে অগ্রণী হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম সুষ্ঠুভাবে প্রচারের জন্য তিনি যীশু-মাহাত্ম্য বিষয়ক বিবিধ উপদেশ ও নীতিগর্ভ শিক্ষা তাঁহার ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্য দিয়া পরিবেশন করেন। কৃষ্ণমোহনের ধর্ম বা তত্ত্ব বিষয়ক প্রতিটি রচনাই যুক্তি ও বুদ্ধি প্রণোদিত—অনাবশ্যক ভাবাবেগ অপেক্ষা পাণ্ডিত্যের সংযমই এই সকল রচনার প্রধান উপাদান। তাঁহার প্রবন্ধও রামমোহনের রচনার ন্যায় অপেক্ষাকৃত নীরস। তত্ত্বোপদেশের বাহুল্যে কৃষ্ণমোহনের প্রবন্ধও সাহিত্য-গুণে ভূষিত হইতে পারে নাই।

কৃষ্ণমোহন বহুভাষাবিৎ একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তৎকালে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তির জন্যও তিনি সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ ব্যতীত তিনি কয়েকটি ইংরাজী পুস্তকও রচনা করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষার প্রতি কৃষ্ণমোহনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং ইংরাজী গদ্য রচনারীতির সহিত সম্যক্‌ভাবে পরিচিত হইয়াও তিনি কখনও তাঁহার বাংলা রচনার মধ্যে ইংরাজী বাগ্‌বিধি বা রীতি প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পান নাই। দেশীয় ভাষার নিজস্ব ধারাই কৃষ্ণমোহন শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণমোহনের প্রধান কৃতিত্ব যে, তিনি ইংরাজী *Encyclopædia*-র ন্যায় বাংলা ভাষায় 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' বা *Encyclopædia Bengalensis* (১৮৪৬-৫১) নামে বিশ্বকোষতুল্য গ্রন্থ সংকলন ও সম্পাদনা করিয়াছেন। এই বৃহৎ সংগ্রহ-গ্রন্থ তের খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই সংকলনের অধিকাংশ রচনাই বিভিন্ন বিশিষ্ট গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। ইহার মধ্যে কোন কোন রচনা কৃষ্ণমোহনের লিখিত হইলেও তাহা তাঁহার মৌলিক প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। কারণ, এই সকল রচনায় তিনি প্রধানতঃ বিদেশী লেখকের চিন্তা বা ভাবধারাই সর্বত্র অনুসরণ করিয়াছেন। আবার তাঁহার কোন কোন রচনায় নিজস্ব শক্তির পরিচয়ও প্রকাশ পাইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে 'রোমরাজ্যের পুরাবৃত্তে'র (১ম খণ্ড) ভূমিকাটি উল্লেখ করা যায়। পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন বা অনুশীলনের অনুকূলে কৃষ্ণমোহন বিবিধ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যুক্তি-তথ্য সমন্বিত এই সারগর্ভ ভূমিকাটিকে পৃথক্‌ভাবে কৃষ্ণমোহনের একটি পূর্ণাঙ্গ মৌলিক প্রবন্ধ হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

ধর্ম বা তত্ত্ব বিষয়ক নিম্নলিখিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলিই কৃষ্ণমোহনের মৌলিক বা নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত রচনা। তাঁহার এই জাতীয় কয়েকটি গ্রন্থে প্রতিপাদ্য বিষয়ের ইংরাজী অনুবাদও যুক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণমোহনের প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'উপদেশ কথা' (১৮৪০) ২। 'সত্য স্থাপন ও মিথ্যা নাশন' (১৮৪১) ৩। 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসুদের শিক্ষার্থ প্রশ্নোত্তর' (১৮৪২) ৪। *A Preservative against Romanism*—(১৮৪৬), ইংরাজী নাম হইলেও এই রচনাটি বাংলা

ভাষায় লিখিত। ৫। 'ধর্ম্মপোষক বক্তৃতা' (১৮৪৭) ও ৬। 'ষড়দর্শন সংবাদ' (১৮৬৭)। এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি ধর্ম বা তত্ত্বাশ্রিত বিতর্কমূলক আলোচনা।

কৃষ্ণমোহন প্রণীত 'উপদেশ কথা' মোট দ্বাদশটি খ্রীষ্ট-মাহাত্ম্যোপদেশের সমষ্টি। ধর্মযাজক পদে অধিষ্ঠিত হইয়া গীর্জায় উপাসনার প্রাক্কালে কৃষ্ণমোহন যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সংকলিত হইয়া 'উপদেশ কথা' পুস্তিকাটি প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণমোহন ইহাতে খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ও যাথার্থ্য সম্যক্‌ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং হিন্দু শাস্ত্রসমূহ যে অবিশ্বাস্ত ও বেদান্তমত গ্রহণযোগ্য নহে, তাহাও ইহাতে বিস্তৃতভাবে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কৃষ্ণমোহনের প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় মূলতঃ খ্রীষ্টধর্ম বা তত্ত্ব। স্বীয় ধর্মের মহিমা প্রচারের জন্ত তিনি ইহার অনুকূলে বিবিধ যুক্তি-তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন। এই জাতীয় প্রবন্ধের মধ্য দিয়া কৃষ্ণমোহন অনেক স্থলে হিন্দু শাস্ত্রের বা ধর্মের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন এবং বেদান্তমত খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বিরোধী পক্ষের মতাদর্শ হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য কৃষ্ণমোহনকে অনেক সময় লঘু শ্লেষ-বিদ্রূপেরও আশ্রয় লইতে হইয়াছিল বটে; কিন্তু কখনও কোথাও অশোভনতা বা অশ্লীলতা প্রকাশ করিয়া তিনি অমার্জিত রুচিবোধের পরিচয় দেন নাই। কৃষ্ণমোহন সর্বক্ষেত্রেই বুদ্ধি বা যুক্তির দ্বারা নিজস্ব তত্ত্ব বা ধর্মকথা প্রতিষ্ঠা করিয়া সুরুচি ও সংযমবোধের পরিচয় দিয়াছেন। তৎকালীন প্রতিপক্ষ লেখকদিগের রচনায় ইহা ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণমোহন বেদান্তশাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া 'উপদেশ কথা'র এক অংশে লিখিয়াছেন—

'যদি বল যে আমরা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি পাইব উত্তর বেদান্ত মতের ব্রহ্মজ্ঞানে কোন উপকার হইতে পারে না, বেদান্তশাস্ত্রের মূল কথাই অগ্রাহ্য কেন না ইহার বচনানুসারে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম, কেবল ব্রহ্মই বর্ত্তমান আছেন আর সকলি মিথ্যা ও বাস্তবিক বর্ত্তমান নহে মনুষ্যের দেহের মধ্যে যে আত্মা আছে সেও ব্রহ্ম সুতরাং মনুষ্য ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন যথার্থ প্রভেদ নাই, কিন্তু এ সকল কথা কখনো গ্রাহ্য হইতে পারে না ইহাতে জগদীশ্বরের ঘোরতর নিন্দা হয় কেন না সমস্ত জগৎকে ব্রহ্ম কহিলে ঈশ্বরকে প্রজা কহা হয় এবং প্রজাকে ঈশ্বর কহা হয় অত্যন্ত অভিমান না হইলে এরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে না আর ইহা জন্মিতে পারিলেও কোন উপকার নাই

বরং অনেক অপকার আছে, যাহারা আপনাকে ব্রহ্ম মনে করিয়া ঈশ্বরত্ব পাইতে বাসনা করে তাহারা অন্তলোকে আপনাদের অহঙ্কারের প্রতিফল উপযুক্তরূপে পাইবে আর পাপের ক্ষমা না পাইয়া বরং উপপ্লবকারি প্রজাস্বরূপ গণিত হইয়া ভয়ঙ্কর দণ্ডগ্রস্ত হইবে।'[১]

'সত্য স্থাপন ও মিথ্যা নাশন' প্রবন্ধ পুস্তিকায় কৃষ্ণমোহন মিয়ুর সাহেবের গ্রন্থে প্রচারিত খ্রীষ্টীয় মতাদর্শের সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হরচন্দ্র তর্কপঞ্চানন ইহার প্রতি যে বিরোধী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। কৃষ্ণমোহনের এই প্রবন্ধটি মুখ্যতঃ প্রতিবাদ স্বরূপে লিখিত হইয়াছে। নিছক প্রতিবাদমূলক রচনা হইলেও ইহার মধ্য দিয়া কৃষ্ণমোহন অনাবশ্যকভাবে প্রতিপক্ষের প্রতি কোনরূপ বিষোদ্গার করেন নাই; বরং সহিষ্ণুতার সহিত তিনি বিরোধী মতামত খণ্ডন করিয়া নিজস্ব বক্তব্য প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্মের সত্যতা স্থাপন করিয়াছেন।

এ'কথা স্বীকার্য যে, কৃষ্ণমোহনের প্রতিটি রচনাই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তাঁহার রচনারীতিতে একটি স্বতন্ত্র মহিমা দান করিয়াছে। স্বীয় খ্রীষ্টীয় মতাদর্শ প্রচার করিতে গিয়া কৃষ্ণমোহন বহুবিধ বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইয়াছেন এবং বিরোধী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে বহু লাঞ্ছনাও পাইয়াছেন; কিন্তু তথাপি কখনও তাঁহার আত্মপ্রত্যয় শিথিল বা সংশয়াচ্ছন্ন হয় নাই। কৃষ্ণমোহন কতকগুলি বহির্মুখী কারণেই যে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে—অন্তর্মুখী হৃদয়-সত্যের উপর তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই জন্য ধর্ম ও জীবন তাঁহার নিকট একাকার হইয়া গিয়াছিল 'ধর্ম্মপোষক বক্তৃতা'র মধ্য দিয়া তাঁহার ধর্ম ও জীবনের সম্মিলিত রূপেরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। খ্রীষ্টধর্মের তাৎপর্যমূলক ব্যাখ্যানগুলি কৃষ্ণমোহনের স্থিতধী ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণমোহন লিখিয়াছেন—

'ধর্ম্মের প্রধান তাৎপর্য্য এই যে পরমেশ্বরের তত্ত্ব নিরূপণ এবং তাঁহার শাসনানুযায়ি মনুষ্যবর্গের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করেন, ঐ নিরূপণ সত্যানুযায়ি না হইলে কোন জাতির বিশ্বাস্য নহে সত্যানুযায়ি হইলে সকল জাতির গ্রাহ্য অতএব বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইলে কেবল এক প্রকারই সত্য হইতে

১ 'উপদেশ কথা', (কলিকাতা, ১৮৪০), পৃঃ ১০৫

পারে কেন না সত্য বহুরূপী নহে, মিথ্যাই বহুরূপ ধারণ করে সুতরাং এক সত্য ধর্ম্মই সকল বিবেকি লোকের গ্রহণীয়। যাঁহারা দেশ-দেশান্তরে ভিন্ন২ ধর্ম্ম প্রচলিত করিতে চাহেন তাঁহারদের দ্বারা ভূরি লোকের বিড়ম্বনা সম্ভাবনা। ধর্ম্ম সত্য না হইলে কুত্রাপি তাহার সূচনা করা কর্ত্তব্য নহে আর তাহা সর্বত্র হেয়, সত্য হইলে কাহারও উপেক্ষণীয় নহে, লোকালয় মাত্রে তাহার স্থাপন করা উচিত, এ কারণ খ্রীষ্টীয় মত সর্ব্বত্র প্রচার করা বিহিত কেননা সকল মনুষ্যই বস্তুতঃ এক জাতি এবং সকলের স্বভাবও একপ্রকার, সকলেই রাগদ্বেষের বশতাপন্ন হইয়া পাপ সাগরে মগ্ন হইয়াছে সুতরাং সকলেরি উদ্ধারের অপেক্ষা আছে। সকলেই পাপরোগে পীড়িত সুতরাং সকলেরি যিশুখ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন আছে, সেই বিশ্বাসই পাপরোগ নাশার্থমহৌষধি।'[১]

বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে যে বিশিষ্ট গুণগুলি অবশ্যই প্রয়োজন, তাহা কৃষ্ণমোহনের রচনায় বর্তমান ছিল; তাঁহার প্রবন্ধের বিচার-বিশ্লেষণ করিলে ইহা প্রমাণিত হয়। যুক্তি-তথ্য সমন্বিত, ভাবগর্ভ অথচ সংযত প্রকাশভঙ্গিযুক্ত রচনাই যথার্থ প্রবন্ধ নামের যোগ্য। এ'ক্ষেত্রে কৃষ্ণমোহনের ধর্ম বা তত্ত্বাশ্রিত প্রতিটি রচনাই প্রবন্ধ লক্ষণাক্রান্ত। চিন্তাধারার স্বচ্ছতায় এবং যুক্তি-তর্কের সুনিপুণ সমাবেশে তাঁহার জটিল বিষয়াত্মক রচনাও সহজ ও বোধগম্য হইয়াছে। বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী যথাযথ শব্দ-নির্বাচন করিয়া কৃষ্ণমোহন তাহার সুনিপুণ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রবন্ধের ভাষাও অধিকতর প্রাঞ্জল করিয়া তুলিয়াছেন। 'ষড়দর্শন সংবাদে'র ন্যায় তত্ত্বনির্ভর প্রবন্ধগ্রন্থে সত্যকাম ও কাপিলের উক্তি-প্রত্যুক্তির ভিতর দিয়া কৃষ্ণমোহন সাংখ্য-দর্শনের জটিল তত্ত্বগর্ভ আলোচনাও অতি সহজ ও সুকৌশলে পরিবেশন করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'সত্যকাম। "তোমারদের মতে ঈশ্বর নাই তবে ধ্যেয়ই বা কে, বিজ্ঞেয়ই বা কে ?"

কাপিল। "ধ্যানের অর্থ মনকে সকল পদার্থ হইতে নিরস্ত করা"

সত্যকাম। "তবে কি ধ্যানকালে মনের মধ্যে কোন বৃত্তি থাকে না অর্থাৎ ধ্যানের লক্ষণ ধ্যেয় ব্যতিরেকে ধ্যান, কোন পদার্থ ধ্যান না করা, সকল বিষয় হইতে নিরস্তি।"

১ 'ধর্ম্মপোষক বক্তৃতা', (কলিকাতা, ১৮৭৪), পৃঃ ১৩

কাপিল। "বটে—তাহাই বটে। ভাষ্যকার ধ্যেয় শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন বটে কিন্তু সূত্রের মধ্যে ধ্যেয় শব্দ নাই আর কপিল স্পষ্টই উপদেশ করিয়াছেন ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ।"

সত্যকাম। "এমত ধ্যানের অর্থাৎ অ-ধ্যানের ফল কি?"

কাপিল। "অহো কপিল কেমন অন্তর্য্যামী! তোমরা এইরূপ প্রশ্ন করিবা আশঙ্কা করিয়া তিনি কহিয়াছেন যে উপরাগ নিরোধ ধ্যানের ফল। * * মনকে নির্বিষয় করিলে সুতরাং উপরাগ দমন হইবে।

সত্যকাম। "তবে ধ্যানের অর্থ কোন বিষয় ধ্যান না করা। মনঃ সংযোগকে তবে ধ্যান বলা যায় না; কিন্তু মনকে শূন্য করাই ধ্যান। তোমারদের ধ্যান যেমন ধ্যেয় বিরহে অকর্ম্মক বিজ্ঞানও তদ্রূপ বিজ্ঞেয় বিরহে অকর্ম্মক। কারিকার উক্তি এই যে কিছুই নাই আমিও নাই আমারও কিছু নাই। * * অতএব তোমারদের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নাস্তিক্য।"[১]

কৃষ্ণমোহনের 'ষড়দর্শন সংবাদ' ধর্ম ও দর্শন-তত্ত্বনিষ্ঠ দশটি সংবাদের সমষ্টি। ইহাতে বিবিধ ধর্ম বা দর্শনের মুখপাত্র স্বরূপ কল্পিত ব্যাখ্যাতৃগণের পারস্পরিক উক্তি-প্রত্যুক্তিচ্ছলে ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন এবং বৈদিক, বৌদ্ধ ও ভাগবত ধর্মের সত্যতা বা প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যুক্তিমার্গীয় বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। বিভিন্ন দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে কৃষ্ণমোহনের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু সহৃদয় পণ্ডিতজনোচিত উদার মনোভাবের দ্বারা সর্ববিধ ধর্ম বা দর্শন-তত্ত্ব আলোচনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাঁহার ধর্মমূলক আলোচনা বা ব্যাখ্যায় খ্রীষ্টীয় ভাবই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কৃষ্ণমোহনের সর্ববিধ আলোচনার শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, বাইবেলই "বিমলা সুবর্ণময়ী যথার্থ রাজমুদ্রা"। নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ না হইবার ফলে কৃষ্ণমোহনের 'ষড়দর্শন সংবাদে'র সমগ্র আলোচনা পক্ষপাতদুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু চিন্তার বলিষ্ঠতায় ও নৈয়ায়িক তীক্ষ্ণতায় কৃষ্ণমোহনের রচনা সবিশেষ সমুজ্জ্বল এবং এ'কথা স্বীকার্য যে, একটি বিশেষ গাম্ভীর্যও তাঁহার রচনাকে মহিমান্বিত করিয়াছে। কৃষ্ণমোহনের প্রবন্ধের অধিকাংশই বিচারনিষ্ঠ ও বাদানুবাদমূলক। সংলাপাত্মক এই বিশেষ রচনা-পদ্ধতির জন্য কৃষ্ণমোহন যে রামমোহনের নিকট বিশেষভাবে ঋণী, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

১ 'ষড়দর্শন সংবাদ', (কলিকাতা, ১৮৬৭), পৃঃ ২৭৭-৭৮

কৃষ্ণমোহনের প্রথম ও শেষ প্রবন্ধ রচনার মধ্যে দীর্ঘ সাতাশ বৎসরের ব্যবধান ছিল। ইতিমধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনস্বী লেখকগণের বিশিষ্ট রচনাও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণমোহনের ভাব বা ভাষায় কোনরূপ লক্ষণীয় পরিবর্তন সংসাধিত হয় নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণমোহন তাঁহার নিজস্ব ভাষা ও রচনারীতিই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণমোহনের প্রবন্ধ পর্যালোচনা শেষে নিঃসন্দেহে এ'রূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসঙ্গত নহে যে, তাঁহার ভাষা ও রচনারীতি অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল এবং সমাসাড়ম্বরহীন, অথচ উন্নত গাম্ভীর্য-গুণ মণ্ডিত; কিন্তু বিষয়গৌরবহেতু অর্থাৎ ধর্ম ও তত্ত্ব বিষয়ক জটিল তর্কসাপেক্ষ আলোচনার জন্য, তাহা রসে ও ব্যঞ্জনায় সাহিত্য পদবাচ্য হইবার যোগ্যতা অর্জন করে নাই। এ'কথা সত্য যে, রামমোহন-পর্বে বিচার-বিতর্কপ্রধান রচনা হিসাবে কৃষ্ণমোহনের প্রবন্ধ সমাদৃত আসনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্ব

(১৮৪৩—১৮৭১)

সূচনা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রামমোহন-পর্বে প্রধানতঃ ধর্ম বা তত্ত্ব বিষয়ক বিচার-বিতর্কপ্রধান প্রবন্ধই অধিকতর লিখিত হইয়াছে। এই জাতীয় রচনার ধারা পরবর্তী কালে হ্রাস পাইলেও ইহা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। কিন্তু উত্তরোত্তর ইহার আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম বা তত্ত্বমূলক রচনা ব্যতীত পরবর্তী সময়ে অন্য বহুবিধ বিষয় অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন মনস্বী ব্যক্তি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত তৎকালীন বিশিষ্ট সাময়িক পত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এইরূপ বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়। সমকালীন অন্যান্য পত্রিকা হইতে এই মাসিক পত্রটির একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। উদার মতাবলম্বী, জ্ঞান-তপস্বী অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। বিশেষ কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া অক্ষয়কুমার এই পত্রিকাটিকে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক ধর্মমত প্রচারের বাহন করিয়া তুলেন নাই। সর্ববিধ সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত এই সাময়িক পত্রিকায় বিভিন্ন মতাদর্শের লেখকগণের উৎকৃষ্ট রচনাই প্রকাশিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসারের ফলে তৎকালীন দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে বিবিধ বিষয়ে কৌতূহলবোধ এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নানাপ্রকার জিজ্ঞাসা জাগ্রত হইয়াছিল। বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাই চিন্তাপ্রবণ ব্যক্তিকে সাধারণতঃ বিচিত্র প্রবন্ধ রচনা-কর্মে প্রেরণা সঞ্চার করে এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সেই সময় বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। এই পত্রিকায় বিভিন্ন লেখকের বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং সংস্কারাবদ্ধ বাঙ্গালীর প্রচ্ছন্ন মনন বা ধীশক্তি যাহাতে স্বচ্ছ ও মোহমুক্ত হইয়া পুনর্জাগ্রত হইতে পারে, এবংবিধ জ্ঞানগর্ভ বিষয়ই এই পত্রিকার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য গঠন-কর্মে এই পত্রিকার বিপুল সহায়তার তুলনা নাই। তৎকালীন অন্যান্য সাময়িক পত্রিকা বাঙ্গালীর যে অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' দ্বারা সম্ভব হইয়াছে। এই পত্রিকাটি সমসাময়িক প্রধান প্রধান সাহিত্যরথিগণের রচনা

দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইত। অক্ষয়কুমার দত্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ কৃতবিদ্য মনীষিগণের সাহিত্য-সাধনা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে কেন্দ্র করিয়াই সার্থকতা লাভ করে। প্রধানতঃ অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিবিধ রচনা বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী সমাজকে সুগঠিত ও সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হইতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। এই দুইজন মনীষীর লেখনীশক্তি ও কর্মপ্রচেষ্টাই ছিল তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের একমাত্র মূলধন-স্বরূপ। অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হন নাই, এমন ব্যক্তি তখন বাংলাদেশে ছিল না। অতএব এই মনস্বী ব্যক্তিদ্বয়কেই তৎকালীন বাংলাদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক বলিয়া অভিহিত করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। বিবিধ ও বিচিত্র বিষয়ে এবং অভিনব প্রকাশ-পদ্ধতি দ্বারা প্রবন্ধ রচনার প্রয়াসের ফলে এই সময় হইতে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি নূতন পর্বেরও সূচনা হইয়াছে। অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্রের নামানুসারে এই পর্বটির 'অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্ব' নামকরণ করা কোনভাবেই অসঙ্গত হয় না।

অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বে বাংলা প্রবন্ধে যেমন বিষয়-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, তেমনি বিবিধ লেখকগণের সহায়তায় প্রবন্ধের উপযোগী সংযত ও রুচিসম্মত ভাষা-সৃষ্টির কার্যও সম্পন্ন হয়। অপরিণত, অপুষ্ট বাংলা গদ্য-ভাষা এই পর্বেই সর্বপ্রথম সকল প্রকার ভাব ও বিষয় প্রকাশোপযোগী যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। রামমোহন-পর্বে বাদানুবাদপ্রধান ধর্ম ও তত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত হইলেও সে-পর্বের গদ্যরীতি ও ভাষার মধ্যে যথার্থ সাহিত্যরস ছিল না। বাংলা গদ্য শিল্প-সুষমামণ্ডিত রসরূপ লাভ করিবার পূর্বেই রামমোহন-পর্বের প্রবন্ধসমূহ লিখিত হইয়াছে এবং সেইহেতু, তাহা যথাযথ সাহিত্যিক সার্থকতা লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। অক্ষয়কুমার দত্ত এবং মুখ্যতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বারা ভাষার মধ্য দিয়া যখন সত্যকার শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হইল, তখন হইতেই বাংলা প্রবন্ধ একটি সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে। অতএব রামমোহন-পর্ব হইতে অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বের প্রবন্ধের ভাষাগত পার্থক্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূল্যবান্ রচনা-সম্পদ ব্যতীত এই পর্ব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দ্বারাও বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্যরস-গুণোপেত ও নূতন রূপাঙ্গিকে লিখিত ধর্মীয় ব্যাখ্যানসমূহ এবং ভূদেবের অভিনব বিষয়াশ্রিত চিন্তাগভীর প্রবন্ধ রচনা সম্পর্কে

পরবর্তী অধ্যায়সমূহে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট প্রবন্ধই অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বের প্রধান ঐশ্বর্য। এই পর্বেই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের পর কয়েক বৎসরের ব্যবধানে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ', 'এডুকেশন গেজেট', 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি বিশিষ্ট পত্রিকাসমূহেরও উদ্ভব হয় এবং এই সকল সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র করিয়া অসংখ্য প্রবন্ধকারেরও আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কয়েকজন লেখক সম্পর্কে 'বিবিধ প্রবন্ধকার' অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রামমোহন-পর্ব সীমায়িতকালের সুপ্রতিষ্ঠিত কবি ও সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে প্রবন্ধকার হিসাবে অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কবিবর্ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শেষজীবনে কয়েকটি পল্লী-কবির জীবন অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ তিনি অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বে বিচিত্র বিষয়াশ্রিত প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন বিস্মৃতপ্রায় বাঙ্গালী কবিওয়ালা ও তাঁহাদের কাব্যকৃতি সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ 'অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্ব' চিহ্নিত কাল-সীমার মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে।

অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বের 'বিবিধ প্রবন্ধকার' অধ্যায়ে আলোচিত প্রবন্ধকারদ্বয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ পরবর্তী বঙ্কিম-পর্বেই মুখ্যতঃ খ্যাতি-লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ এই পর্বের মধ্যে প্রকাশিত হইবার ফলে এই দুইজন লেখককে অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই উভয় প্রবন্ধকারের রচনারীতি ও ভাষার মধ্যে অন্যতম পর্ব-নায়ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রভাব অনুভব করা যায়। সুতরাং এই পর্বে তাঁহাদের অন্তর্ভুক্তি সম্পূর্ণ অসঙ্গত হয় নাই।

অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বে বিবিধ বিষয়াশ্রিত প্রবন্ধ রচনার বহুল প্রয়াসের পশ্চাতে দেশের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত ঘটনাদির প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াও সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা যায় না। ইংরাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বাংলা-দেশ তথা ভারতবর্ষের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে যে ভাব-বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা তখনও কোনরূপ সুশৃঙ্খল রূপ বা সুদৃঢ় স্থিরতা লাভ করে নাই। পাশ্চাত্ত্য জীবন-চেতনা ও চিন্তাধারার ক্রম প্রসারের ফলে দেশের জনসমাজের

মধ্যে জ্ঞান-জিজ্ঞাসা, ধর্ম-সংস্কার, সমাজ ও রাজনৈতিকবোধ ক্রমান্বয়ে জাগ্রত হয়। রাজা রামমোহন রায় খ্রীষ্টধর্ম ও সর্বগ্রাসপ্রবণ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতিরোধকল্পে দেশীয় ধর্ম বা সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনের যে সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ শেষ বা স্তিমিত হইয়া যায় নাই। রামমোহন প্রবর্তিত ব্রহ্মোপাসনারই নূতনভাবে পুনরুদ্ধার বা ব্যাখ্যা করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার পরিচালিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' নব্য বাঙ্গালীর ধর্ম-চিন্তায় এক নূতন শক্তি সঞ্চারিত করেন। অমূলক প্রথাসর্বস্ব হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধন ও তাহার উৎকর্ষ-খ্যাপনকল্পে বহু তত্ত্বনিষ্ঠ, ধর্ম ও দর্শনমূলক সরস প্রবন্ধ 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। ধর্ম, সমাজ ও বিবিধ দর্শন-তত্ত্ব প্রসঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষিগণ সুচিন্তিত ও সারগর্ভ রচনার দ্বারা তৎকালীন ধর্ম-বিপর্যস্ত বাঙ্গালী-সমাজকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা দান করিয়াছেন। সমকালীন সমাজ বা ধর্মান্দোলনের ফলেই যে অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বে বিবিধ ধর্ম ও সামাজিক আচারমূলক প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

রাজা রামমোহন রায় বাংলাদেশে ধর্ম-সংস্কারের সহিত সমাজ-সংস্কারেও ব্রতী হইয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কারে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি সহমরণ-বিরোধী আন্দোলনের প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রচেষ্টায় ও পরবর্তী কালে সরকারী সহযোগিতায় বাংলাদেশে সহমরণ-প্রথা বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনেরও একটি দৃঢ় সঙ্কল্প বীজাকারে হয়ত রামমোহনের মধ্যে সুপ্ত ছিল। তাঁহার এক অলক্ষ্য প্রেরণাই যেন পরবর্তী কালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে এবং অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বে ঈশ্বরচন্দ্রের নায়কত্বে বিধবা-বিবাহ সমর্থন ও বহু বিবাহ নিবারণমূলক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পাশ্চাত্ত্য মানবতাবাদের (Humanism) আদর্শে অনুপ্রাণিত মানবহিতনিষ্ঠ জীবন-জিজ্ঞাসা ও কর্মপ্রেরণায় অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষিগণ কুসংস্কার ও মানবতাবিরোধী প্রাচীন কু-প্রথার বিলোপ সাধনকল্পে বহু সামাজিক প্রবন্ধ রচনা করেন। বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ ও বাঙ্গালী হিন্দুর বিবিধ সামাজিক আচার-আচরণ অবলম্বন করিয়া এই সময়ে যে প্রবন্ধসমূহ লিখিত হয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত সামাজিক আন্দোলনই যে তাহার মুখ্য প্রেরণারূপে কার্যকরী হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বে নবজাগ্রত বাঙ্গালীর মানসক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও রাজনৈতিক চৈতন্যবোধও ক্রমান্বয়ে জাগ্রত হয়। এই পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রগত ঘটনা 'সিপাহী বিদ্রোহ'। কিন্তু এ'কথাও সত্য যে, সিপাহী যুদ্ধের কোনরূপ গুরুতর প্রতিক্রিয়া বাঙ্গালীর জীবনে প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয় নাই। বরং এই সময়ে সংঘটিত নীল-চাষীগণের প্রকাশ্য বিক্ষোভ বা বিদ্রোহের দ্বারাই বাঙ্গালীর রাজনৈতিক চেতনা অধিকতর পরিপুষ্টি লাভ করে। এবং ইহার ফলে বাঙ্গালী সমাজে রাষ্ট্রীয় চিন্তার প্রসার অধিক ক্ষিপ্রতর হইয়াছে। এই আন্দোলন সুরু হইবার পর হইতে রাজনীতি বিষয়ক বহুবিধ রচনা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ লেখকগণের রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনার পটভূমিকায় এই নীল-চাষীগণের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

বাংলাদেশে ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পর হইতেই দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। সরকারী প্রচেষ্টায় ও বিভিন্ন বিদ্যানুরাগী ধনী ব্যক্তিগণের সহায়তায় বিবিধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাঙ্গালী সমাজের নিকট বিবিধ জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তৃত ক্ষেত্র উদ্‌ঘাটিত হয়। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসের সহিত গভীরভাবে পরিচয় লাভের পর বাঙ্গালী এক নূতন চেতনা ও অভিনব শক্তি লাভ করিয়াছে। স্বদেশীয় ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির নূতন মূল্যায়নে বা বিচার-বিশ্লেষণে বাঙ্গালী এই সময়ে দ্রুত অগ্রসর হইবার প্রেরণা লাভ করে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বহু কৃতবিদ্য মনীষীর সাধনায় বাংলা সাহিত্যেও তখন এক বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যধর্ম, প্রাচীন কাব্য ও কবি-চরিত, বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ অথচ পরিচ্ছন্ন প্রবন্ধ একটি সুগঠিত রূপ লইয়া এই পর্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

অতএব অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বেই প্রধানতঃ ব্যাপকভাবে বিচিত্র বিষয়াশ্রিত প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত হয় এবং এ'কথা অনস্বীকার্য যে, এই পর্ব-চিহ্নিত কাল-সীমার মধ্যে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য তাহার কৈশোর অতিক্রম করিয়া পূর্ণ যৌবনের সিংহদ্বারে উপনীত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়

অক্ষয়কুমার দত্ত

রামমোহন-পর্বে অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায় হইতে রেভারেণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধ যে রূপ ও রীতি আশ্রয় করিয়া লিখিত হইয়াছে, অক্ষয়কুমার হইতেই তাহার সেই রূপ ও রীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। জ্ঞান-তপস্বী অক্ষয়কুমার প্রাচ্যের নৈয়ায়িক মনীষা ও পাশ্চাত্ত্যের বৈজ্ঞানিক চেতনা লইয়া বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহার নূতন দৃষ্টিভঙ্গিসম্মত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ তৎকালীন বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালীর চিন্তাধারায় এক বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে।

অক্ষয়কুমারের পূর্ববর্তী প্রবন্ধকারগণের রচনা হইতে তাঁহার রচনা মধ্যে কয়েকটি বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অক্ষয়কুমার হইতেই প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য-সাধন পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী লেখকগণের প্রায় সকল প্রবন্ধই ধর্ম বা তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে—ধর্ম বা তত্ত্ব ব্যতীত প্রবন্ধগত বিষয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন বৈচিত্র্য ছিল না। যদিও সমকালীন কোন কোন সাময়িকপত্রে অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে রচনা প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা প্রধানতঃ মৌলিক নহে ও সংকলিত হইয়া তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই এবং যথার্থ প্রবন্ধ হিসাবেও তাহা গ্রাহ্য করা যায় না। অক্ষয়কুমারই প্রথম বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবন-চরিত, রাজনীতি, সমাজ-দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করিয়া বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর বিস্তার ও বৈচিত্র্য সাধন করিলেন। দ্বিতীয়তঃ অক্ষয়কুমারের পূর্বে প্রবন্ধ বিশেষভাবে বাদ-প্রতিবাদমূলক বা সংলাপাত্মক আকারে রচিত হইয়াছে। অক্ষয়কুমার হইতেই যথার্থভাবে একোক্তিমূলক প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত হয়। স্বল্প পরিসরের মধ্যে যুক্তি বা তথ্য সমন্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ এই সময় হইতেই পূর্ণাঙ্গ রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তৃতীয়তঃ বাংলা প্রবন্ধের ভাষাগত পরিবর্তনও, বিশেষতঃ অক্ষয়কুমার হইতেই লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববর্তী লেখকগণের গদ্য-ভাষা ও রীতিতে যে অনাবশ্যক সমাস-বাহুল্য বা জড়তাদোষ দৃষ্ট হয়, অক্ষয়কুমারের রচনা

তাহা হইতে বহুল পরিমাণে নির্মুক্ত ছিল। যদিও তাঁহার রচনার কোন কোন স্থলে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য থাকিলেও, তাহা দ্বারা রচনা জটিল বা দুর্বোধ্য হয় নাই। বরং ইহাতে ভাষার মধ্যে একটি শ্রুতিসুখকর গম্ভীর দ্যোতনার সৃষ্টি হইয়াছে। (বিশুদ্ধ গদ্যরূপ অর্থাৎ Product of intellect অর্থে যাহা বুঝায়, অক্ষয়কুমারের গদ্য তাহা সম্পূর্ণভাবে না হইলেও অনেকটা সেই জাতীয়। তাঁহার প্রবন্ধে রস-ব্যঞ্জনা অপেক্ষা যুক্তি-তথ্যের আধিক্যই অধিকতর লক্ষ্য করা যায়; তথাপি অক্ষয়কুমারের কোনকোন প্রবন্ধে যে সাহিত্যিক কল্পনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা অনিবার্যভাবে তাঁহার বিশুদ্ধ গদ্য-ভাষাও কাব্য-ধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।) ভাষার মধ্যে আবেগের অনুপ্রবেশ বা কাব্যধর্মিতা অক্ষয়কুমারের পূর্ববর্তী বাংলা প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায় না। বাংলা গদ্যরূপ ও রীতির যে পরিবর্তন এবং তাহার গতি-প্রকৃতির মধ্যে যে অনিবার্য কাব্যধর্ম-প্রবণতা, তাহার পশ্চাতে বাঙ্গালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্যই বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছে। খাঁটি বা বিশুদ্ধ গদ্যরূপের জন্য সাধারণতঃ গভীর চিন্তাশীলতা, যুক্তিনিষ্ঠ তীক্ষ্ম মননশীলতা এবং বৈজ্ঞানিক তৎপরতা বা মেধার প্রয়োজন এবং তাহা প্রধানতঃ বাঙ্গালীর স্বভাবগত ভাব-কল্পনার বিরোধী। আবেগপ্রবণ বাঙ্গালীর পক্ষে গদ্য অপেক্ষা কাব্যেই ভাব প্রকাশ অধিকতর সার্থক হইয়া থাকে। সেই-হেতু, পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যপ্রবাহ যে ধারায় অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, অক্ষয়কুমার হইতে সেই ধারা রস-ব্যঞ্জনার অভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। (বাংলা প্রবন্ধের ভাষা যে পরবর্তী কালে সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহার প্রথম সূচনা অক্ষয়কুমার হইতেই লক্ষ্য করা যায়। এইরূপ বিবিধ পরিবর্তনের ফলে অক্ষয়কুমারকে পূর্ববর্তী প্রবন্ধকারগণ হইতে পৃথক্ করিয়া বাংলা প্রবন্ধের এই নূতন ধারার প্রবর্তক বলিয়া অভিহিত করা অসঙ্গত নহে।) এবং পরবর্তী কালে বিভিন্ন লেখক এই ধারা অনুসরণ করিয়াই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

অক্ষয়কুমার একজন চিন্তাশীল মনীষী, তত্ত্বানুসন্ধানকারী গবেষক এবং তর্ক-নিপুণ লেখক ছিলেন। সংস্কৃত, ফার্সী ও ইংরাজী ভাষায় তিনি সুদক্ষ ছিলেন এবং ইহা ব্যতীত গ্রীক্, ল্যাটিন, হিব্রু ও জার্মান ভাষাতেও তাঁহার অল্পবিস্তর অধিকার ছিল। অক্ষয়কুমারের অপরিসীম জ্ঞান-স্পৃহা ছিল এবং এই অদম্য জ্ঞানান্বেষণের প্রেরণায় তিনি কখনও তাঁহার সাহিত্য-সাধনায় ক্লান্তি বোধ করেন নাই। তাঁহার অক্লান্ত জ্ঞান-সাধনার প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁহার গবেষণা-সিদ্ধ রচনা

সমূহ হইতে লাভ করা যায়। শেষ বয়সে দুরারোগ্য শিরোরোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অক্ষয়কুমারের জ্ঞান-পিপাসা কিছুমাত্র নিবৃত্ত হয় নাই। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বুদ্ধি-চাতুর্যে, গবেষণা-কৌশলে, যুক্তি-নৈপুণ্যে এবং ভাষাগত ওজস্বিতা ও আনুপাতিক প্রাঞ্জলতার গুণে অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিবিধ শাস্ত্রে তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং অপূর্ব অনুশীলন-ক্ষমতার পরিচয় তাঁহার সকল প্রকার রচনা হইতে লাভ করা যায়। বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত, রাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয় অবলম্বন করিয়া অক্ষয়কুমার প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং প্রতিটি বিষয়েই তাঁহার অসামান্য পারদর্শিতা, ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং লিপি-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষয়কুমারের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির ফলে যে কোন বিষয় সম্পর্কিত তাঁহার মতামত বা সিদ্ধান্ত পরবর্তী কালে বহুলাংশে সত্য ও সার্থক হইয়াছে।

দেশের বিবিধ সমস্যা-কণ্টকিত পরিস্থিতির মধ্যে অক্ষয়কুমারের আবির্ভাব ইয়াছে। বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘাতে বাংলাদেশের সমাজ ও ধর্মীয় ীবনে তখন একটা ভাঙ্গা-গড়া, উদয়-বিলয়ের সন্ধিক্ষণ চলিয়াছিল। এইরূপ ারিবেশে দেশ ও সমাজকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশ করা কান মনস্বী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর হয় না। অক্ষয়কুমার ও সমকালীন সকল ানীষীরই জ্ঞান বা হৃদয়বৃত্তির সহিত স্বদেশ বা স্বজাতির কল্যাণাদর্শ ওতপ্রোতভাবে দড়িত ছিল। সামাজিক কুসংস্কার বা ধর্মান্ধতা হইতে নির্মুক্ত করিয়া দেশের দনসাধারণের সর্ববিষয়ক কল্যাণ-সাধনাই তৎকালীন মনীষী ব্যক্তিগণের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সমসাময়িক যুগের একটি বিশিষ্ট সাময়িক পত্র এবং এই পত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রবন্ধ দ্বার বাঙ্গালীর কুসংস্কারী মনোবৃত্তি ও বুদ্ধির দড়তার প্রতি আঘাত করা হয় ও তাহার পরিবর্তে বিশুদ্ধ জ্ঞান বা প্রগতিশীল মনোভাব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ইহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। অক্ষয়কুমার এই ার্বজনবিদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁহার প্রায় সকল প্রবন্ধই এই পত্রিকার মাধ্যমেই প্রচারিত হইয়াছে। অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ বিশুদ্ধ জ্ঞান-স্পৃহার প্রেরণায় লিখিত হইলেও, তাহা দেশের বাস্তব জীবনযাত্রা এবং সমস্যার াঙ্গে অবিমিশ্রভাবে জড়িত ছিল। দেশ ও জাতির সুন্দর, সুস্থ ও মহৎ জীবনাদর্শের পরিকল্পনা তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। অতএব অক্ষয়কুমারের নিরলস সাহিত্য-সাধনার পশ্চাতে তাঁহার জাতীয় কল্যাণবোধের প্রেরণা সবিশেষ সক্রিয়

ছিল। অক্ষয়কুমার লিখিত সমাজ-কল্যাণকর বিবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ হইতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।)

(অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ পর্যালোচনা করিয়া যে সকল গুণের জন্য তাঁহাকে বিশিষ্ট উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহাদের মধ্যে তাঁহার উদার সুমার্জিত সংস্কৃতিবোধ ও মাত্রাসচেতন সংযম-জ্ঞানই প্রধান। সংস্কারমুক্ত চিত্ত ও যুক্তিসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় অক্ষয়কুমারের রচনায় এক বিরল গাম্ভীর্যের মহিমা দান করিয়াছে। বিজ্ঞান-দর্শনের তথ্য বা তত্ত্বনিষ্ঠ আলোচনাতেই অক্ষয়কুমারের মনীষা বিশেষভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ বিজ্ঞানের আলোচনায় তিনি ইংরাজ বৈজ্ঞানিক প্রণীত গ্রন্থসমূহকে আদর্শ করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনায় স্বকীয়ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় অক্ষয়কুমারের ক্রমপ্রকাশ্য বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তৎকালীন বিশিষ্ট অধ্যাপক রেভারেণ্ড্ জন্ এণ্ডারসন্ মন্তব্য করিয়াছিলেন—'Akshaya Kumar is Indianishing European Science' অর্থাৎ অক্ষয়কুমার ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে ভারতীয় করিয়া তুলিতেছেন। এই মন্তব্যটি অক্ষয়কুমার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সঙ্গত ও সার্থক হইয়াছে।)

অক্ষয়কুমার অসাধারণ অনুধ্যানশীল পণ্ডিত ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় সাহিত্যের সহিত তাঁহার গভীর পরিচয় ঘটিয়াছিল। একদিকে তিনি যেমন ইলিয়ড্, এনিড্, জয়সের *Scientific Dialogoue* প্রভৃতির সহিত পরিচিত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রসমূহ তাঁহার নখদর্পণে ছিল। শৈশব হইতেই অক্ষয়কুমার অসীম কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা লইয়া প্রাচ্যের বিবিধ শাস্ত্র-জ্ঞানলোকে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ভাব ও চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার এক অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ছিল বলিয়াই অক্ষয়কুমার এবংবিধ বিক্ষিপ্ত ও সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় চিন্তাধারার মধ্যে সার্থক সামঞ্জস্য দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শুভ মিলন-সাধনের মধ্যে তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার ভাষায়। ভাষার ওজস্বিতা ও সেই অনুপাতে প্রাঞ্জলতাগুণে সমৃদ্ধ হইয়া তাঁহার রচনা ভাব-প্রকাশের ক্ষেত্রে কোথাও অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য হয় নাই।) অক্ষয়কুমার বহু পারিভাষিক শব্দ উদ্ভাবন করিয়া তাঁহার বহুবিধ রচনার মাধ্যমে তাহা ব্যাপকভাবে প্রচার এবং

ব্যবহার করিয়াছেন। শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধির দ্বারা বাংলা গদ্যকে অক্ষয়কুমার সর্ববিধ ভাব ও বিষয় প্রকাশের উপযোগী শক্তিও দান করিয়াছেন। আধুনিক বাংলা গদ্য যে বহুমুখী বিতর্ক বা আলোচনার সার্থক আশ্রয়স্থল হইয়াছে এবং ইহার ভিত্তি যে অন্যান্য শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্ত্য ভাষার ন্যায় দৃঢ়তর হইয়াছে, তাহার মূলে অক্ষয়কুমারের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধ রচনার বিশিষ্ট গুণ অর্থাৎ ভাব-প্রকাশে মাত্রাগত সংযম এবং বিষয়োপযোগী ভাষা-প্রয়োগ অক্ষয়কুমারের রচনায় দুর্লভ নহে। সমসাময়িক চিন্তাশীল লেখক রাজনারায়ণ বসু অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

'তাঁহার স্ব-কপোল রচিত প্রস্তাবই তাঁহার সর্ব্বোত্তম রচনা।'১

প্রকৃতপক্ষে অক্ষয়কুমারের মৌলিক প্রবন্ধগুলি তাঁহার অন্যান্য রচনা হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহা সংক্ষিপ্ত, সারগর্ভ, যথাযথ ভাব-ভূয়িষ্ঠ এবং অনাবশ্যক বাহুল্য-বর্জিত। অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ বাংলা গদ্যরীতিরও অন্যতম সার্থক নিদর্শন।

বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধকার হিসাবে খ্যাতিমান্ হইলেও অক্ষয়কুমার প্রথমে কাব্য রচনা দ্বারাই তাঁহার সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত করেন। পরবর্তী কালে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও নির্দেশে এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরণায় অক্ষয়কুমার বাংলা প্রবন্ধ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের এই বিশিষ্ট বিভাগটি পরিপুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ডেবিড হেয়ার সাহেবের তৃতীয় সাম্বৎসরিক স্মারক-সভায় অক্ষয়কুমার একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং পুস্তিকাকারে তাঁহার প্রণীত এই প্রথম প্রবন্ধ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাংলা গদ্যে ব্যক্তিবিশেষের কর্মকৃতি বিষয়ক প্রথম রচনা হিসাবে ইহা উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ডেবিড হেয়ার সাহেবের যে প্রভাব, তাহা বর্ণনা করিয়া অক্ষয়কুমার হেয়ার সম্পর্কে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছেন, তাহা একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধেরই রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

অক্ষয়কুমারের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১ম ভাগ, ১৮৫১ ও ২য় ভাগ, ১৮৫৩) নামক গ্রন্থটি বিখ্যাত নরকরোটি বিদ্যাবিশারদ স্কচ্ লেখক জর্জ কুম্বের (George Combe) *The Constitution of Man*

১ 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা', (কলিকাতা, সম্বৎ ১৯৩৫), পৃঃ ২৫

Considered in Relation to External Objects—গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। এ'কথা সত্য যে, মানব স্বভাব বা প্রকৃতির সহিত বাহ্যবস্তু জগতের একটি নিগূঢ় বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। বাহ্যবস্তু প্রকৃতির পটভূমিকায় মানব প্রকৃতি-তত্ত্ব জর্জ কুম্ব্‌ তাঁহার গ্রন্থে সুনিপুণ যুক্তিসহকারে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই বিশদ আলোচিত তত্ত্ব তৎকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন যুক্তিবাদী মনীষিদিগের নিকট ইহা একটি বিতর্কমূলক তত্ত্ব ছিল এবং তৎকালে তাঁহাদের দৃষ্টি ইহাতে বিশেষভাবে নিবদ্ধ হয়।

অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবাদী লেখক ছিলেন। তৎকালীন ইউরোপীয় বিজ্ঞানের এই বিশিষ্ট তত্ত্বটি নির্বাচন করিয়া ইহার ভিত্তিতে গ্রন্থ রচনার প্রয়াস তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। জর্জ কুম্ব্‌ তাঁহার গ্রন্থে স্বাস্থ্যবিধি, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ববিধ উপায় বা নিয়মসমূহ অর্থাৎ মানব জীবন ধারণের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বা জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদরূপে বর্ণনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা শেষে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নিয়ম প্রতিপালন ও লঙ্ঘনের উপর মানুষের সুখ ও দুঃখ ভোগ নির্ভর করে। অক্ষয়কুমারের গ্রন্থটি মূলতঃ জর্জ কুম্বের ইংরাজী গ্রন্থেরই ভাব অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অক্ষয়কুমারের স্বাভাবিক লিপি-কৌশল ও সুনিপুণ সংযোজনার গুণে 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থটি মৌলিক রচনারই মর্যাদা লাভ করিয়াছে। অক্ষয়কুমার তাঁহার রচনায় মূল গ্রন্থ বহির্ভূত বহু উদাহরণ বা নির্দেশ দিয়াছেন, যাহা এ'দেশীয় জনসাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক ও শুভদায়ক। এতদ্ব্যতীত, এ'দেশের পরম্পরাগত কু-প্রথাসমূহের অনিষ্টকারিতা মধ্যে মধ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপস্থাপনা করিয়া তাহা প্রগতিশীলতার বিরোধী হিসাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার তাঁহার গ্রন্থের ১ম ভাগে, আমিষ ভক্ষণের বিপক্ষে বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া নিরামিষ ভোজনের শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈধতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার এই বক্তব্য জর্জ কুম্ব্‌ প্রচারিত মতের বিরোধী। কারণ, জর্জ কুম্ব্‌ তাঁহার রচনায় কেবলমাত্র আমিষ ভক্ষণের স্বপক্ষে বা অনুকূলেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এইভাবে অক্ষয়কুমার তাঁহার গ্রন্থের ২য় ভাগে, মদ্যপানের অবৈধতা বা অনিষ্টকারিতার বিষয় উল্লেখ করিয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার বিদেশী লেখকের চিন্তাধারা এমনভাবে

সার্দ্দীকরণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা জাতীয়-স্বভাব সম্মত হইয়াছে এবং ফলে 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থটি জর্জ কুম্ব্ প্রণীত *The Constitution of Man Considered in Relation to External Objects* পুস্তকের যথাযথ বা আক্ষরিক অনুবাদ হয় নাই। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য যে, যদিও অক্ষয়কুমার তাঁহার রচনা মধ্যে যথেষ্ট স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি কোন কোন অংশে তাঁহার আক্ষরিক অনুবাদও লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জর্জ কুম্ব্ প্রণীত মূল ইংরাজী গ্রন্থ ও অক্ষয়কুমার লিখিত বাংলা পুস্তক হইতে অংশ বিশেষ যুগপৎ উদ্ধৃত হইল। জর্জ কুম্ব্ লিখিয়াছেন—

'Every law prescribed to intelligent beings presupposes a superior, who establishes it, and subjects who are called on to obey. The superior may be supposed to act under the dictates of the animal faculties, or under those of the moral sentiments. The former being selfish, whatever they desire is for selfish gratification. Hence laws instituted by a superior inspired by the animal powers, would have for their leading object the individual advantage of the law-giver, with no systematic regard to the enjoyment or welfare of his subjects. The moral sentiments, on the other hand, are altogether generous, disinterested, and just; they delight in the happiness of others, and do not seek individual advantage as their supreme end. Laws instituted by a law-giver inspired by them, would have for their grand object the advantage and enjoyment of those who were required to yield obedience. The story of William Tell will illustrate my meaning. Gessler, an Austrian Governor of the Canton of Uri, placed his hat upon a Pole, and required the swiss peasants to pay the same honours to it that were due to himself. The object of this requisition was obviously the gratification of the Austrian's Self-Esteem, in witnessing the humiliation of the swiss. It was framed

without the least regard to their happiness; because such object slavery could gratify no faculty in their minds, and ameliorate no principle of their nature, but, on the contrary, was calculated to cause the greatest pain to their feelings.'[১]

উল্লিখিত অংশটির অক্ষয়কুমার এই প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন—

'নিয়ম থাকিলে সুতরাং একজন নিয়ন্তা ও তাঁহার কতকগুলি প্রজা থাকে। নিয়ন্তার সংস্থাপিত নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা প্রজাদিগের কর্ত্তব্য। নিয়ন্তার স্বভাব দুই প্রকার হইতে পারে; হয়, তিনি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া প্রজার উপর উপদ্রব করেন, নয়, ধর্ম্ম প্রবৃত্তির দ্বারা প্রযোজিত হইয়া রাজ্য পালন করেন। যিনি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া চলেন, কেবল স্বার্থসাধনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। তিনি প্রজাদিগের কল্যাণ-চিন্তায় তাদৃশ মনোযোগী হন না, সুতরাং তাহারদিগের মঙ্গলমাত্র উদ্দেশ করিয়া কোন নিয়ম প্রচার করেন না। লবণ ও অহিফেণাদি মাদকদ্রব্য বিষয়ক একচেটিয়া বাণিজ্যে ইংরেজদিগের যথেষ্ট লাভ আছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে প্রজার অপকার ভিন্ন কিছুমাত্র উপকার নাই। তাঁহারদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল না থাকিলে, এ প্রকার ন্যায়-বিরুদ্ধ নিয়ম সংস্থাপিত করিতে ও অদ্যাপি প্রচলিত রাখিতে কোন ক্রমেই প্রবৃত্ত হইত না। সুইৰ্জ্জলণ্ড দেশের অন্তঃপাতী উরি প্রদেশের এক শাসনকর্ত্তা একটা স্তম্ভের উপর আপনার টুপি নিবদ্ধ করিয়া প্রজাদিগকে কহিয়াছিলেন, "তোমরা আমাকে যেরূপ সমাদর কর, এই টুপিকেও সেইরূপ করিও।" এই অন্যায় অনুমতি তাঁহার দুর্জ্জয় আত্মাদরের কার্য্য, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুগত নহে। প্রজাদিগের অধীনত্ব ও দাসত্ব দেখিয়া আত্মগরিমা প্রকাশ করা, ইহার একমাত্র প্রয়োজন। ইহাতে প্রজাদিগের কিছুমাত্র কল্যাণ নাই, কেবল লাঘব ও অপমান।'[২]

১ *The Constitution of Man Considered in Relation to External Objects,* **(Edinburgh, sixth edition, 1855), p. 73**

২ **'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', ২য় ভাগ, (কলিকাতা, ১৭৭৪ শকাব্দ), পৃঃ ৯৯-১০০**

'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থটির পরিপূরক হিসাবে অক্ষয়কুমারের পরবর্তী রচনা 'ধর্মনীতি' পুস্তকটির উল্লেখ করা যায়। স্বয়ং অক্ষয়কুমার এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন—

'যে অভিপ্রায় লইয়া "বাহ্যবস্তু" রচিত হইয়াছিল, "ধর্ম্মনীতি" পুস্তক তাহারই

ইহাতে উদ্বাহ বিষয়ক নিয়ম, বালকগণের শিক্ষাবিধি, বিবিধ সামাজিক কর্তব্য এবং ধর্মাধর্ম বিষয়ক নির্দেশনামা অতীব নৈপুণ্য সহকারে লিখিত হইয়াছে। প্রতিটি প্রবন্ধই সারগর্ভ ও যুক্তিসম্মত এবং অক্ষয়কুমারের সহজ রচনা-পরিবেশন কৌশলের জন্য চিত্তগ্রাহী। 'ধর্ম্মনীতি'র কোন কোন প্রবন্ধ হিন্দু রক্ষণশীল সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে নাই। কারণ, অক্ষয়কুমার তাঁহার রচনায় বহু-বিবাহ, বাল্যবিবাহের অপকারিতা, বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের আবশ্যকতা সম্পর্কে যুক্তি-তথ্যের ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রচলিত দেশাচারের প্রতি এরূপ তীব্র বিরুদ্ধাচরণ অক্ষয়কুমারের নির্ভীক ব্যক্তিত্ব ও প্রগতিশীল মনোভাবেরই পরিচয় বহন করে। দাম্পত্য জীবন অর্থাৎ স্বামি-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি যে মতামত বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর চিরাচরিত ধারা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শতাব্দী পূর্বেই ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা অক্ষয়কুমারের মানসচক্ষে আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার একটি চিত্র উদ্ভাসিত হইয়াছিল। স্বামি-স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তব্য প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন—

'পত্নীকে আপনার ইন্দ্রিয় সেবার সাধন জ্ঞান করা মূঢ়তা ও অসভ্যতার লক্ষণ। রীতিমত শিক্ষা দান দ্বারা তাহার বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত, ধর্মপ্রবৃত্তি উন্নত ও কুসংস্কার সকল নিরাকৃত করিয়া তাহাকে পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায়ের উপদেশ দেওয়া উচিত, এবং যাহাতে সেই সমুদায় নিয়ম প্রতিপালনে তাহার যত্ন ও অনুরাগ হয় ও করুণাকর পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহার চেষ্টা করা স্বামীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।'[১]

অক্ষয়কুমার বিজ্ঞানসম্মত সত্যসন্ধানী মনের অধিকারী ছিলেন। যুক্তিবাদ ও বস্তুধর্মই তাঁহার মনকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপরই অক্ষয়কুমারের অধিকতর আস্থা ছিল। পূর্বে প্রধানতঃ

১ 'ধর্ম্মনীতি', ১ম ভাগ, (কলিকাতা, ১৮৯৪), পৃঃ ৭৭

বেদান্ত-দর্শনের আদর্শই ব্রাহ্ম সমাজের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অর্থাৎ 'একমাত্র পরম ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।' কিন্তু এই আদর্শ বা মতবাদ অক্ষয়কুমারের জড়বাদী মনে কোনরূপ আবেদন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই এবং তিনি তাহা সর্বতোভাবে অস্বীকার করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বেদের একাধিপত্য খর্ব করিয়া তিনি ইহার অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ততা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুজগত ও তদনুযায়ী মানব-স্বভাবই তাঁহার নিকট ধর্ম পুস্তক হিসাবে সমাদৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম যে স্বাভাবিক ধর্ম এবং ইহা যে কোন নির্দিষ্ট বা কৃত্রিম শাস্ত্র-প্রণীত নহে, অক্ষয়কুমার তাঁহার ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধে তাহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মীয় আদর্শ প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমারের এই জাতীয় বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তাঁহার জ্ঞানবাদের প্রতি অধিকতর অনুরক্তির পরিচয়ই প্রকাশ করে। 'ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫) নামক প্রবন্ধ পুস্তিকায় যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথাযথ অনুশীলন অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানই একমাত্র ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

'অখিল সংসারই আমাদের ধর্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য্য। ভাস্কর ও আর্য্যভট্ট এবং নিউটন ও লাপ্লাস যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ এবং বেকন্ ও কোম্ত্ যে কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। কঠ ও তলবকার, মুষা ও মহম্মদ এবং যিশু ও চৈতন্য পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম।'[১]

অক্ষয়কুমার প্রণীত তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 'চারুপাঠ' (১ম ভাগ, ১৮৫৩, ২য় ভাগ, ১৮৫৪ ও ৩য় ভাগ, ১৮৫৯) তাঁহার অতি জনপ্রিয় প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ। হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাতেও এই প্রবন্ধগুলি অনূদিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্যালয়-নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছিল বলিয়াই 'চারুপাঠ' অধিকতর পঠিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এই তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 'চারুপাঠ' বহু সংখ্যক প্রস্তাব বা প্রবন্ধের সমষ্টি। তৎকালে 'প্রস্তাব' শব্দটি 'প্রবন্ধ' অর্থেই ব্যবহৃত হইত। 'চারুপাঠে'র প্রবন্ধসমূহ বিভিন্ন বিষয়ক : যেমন, বারি-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, প্রাণি-বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান প্রভৃতি সম্পর্কে লিখিত।

১ 'ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব', (কলিকাতা, ১৮৫৫), পৃঃ ১৪

প্রতিটি প্রবন্ধই সংক্ষিপ্ত ও সরস এবং ওজস্বী ও জ্ঞানগর্ভ। অক্ষয়কুমারের নিজস্ব রচনা-মাধুর্যে নীরস বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধও অপেক্ষাকৃত সরস ও উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বর্ণনা-কৌশলের এমনই কৃতিত্ব যে, গুরুত্বপূর্ণ জটিল বিষয়াত্মক রচনাও পাঠক হৃদয়ে অতি সহজেই গ্রথিত হইয়া যায়।

'চারুপাঠে'র প্রবন্ধগুলি বিচিত্র বিষয়ক। ইহাতে যেমন সদাচার ও উন্নত ধর্মভাব সংক্রান্ত প্রবন্ধ আছে, তেমনি জাগতিক বিচিত্র কলাকৌশল বা সৌর-জগতের বিস্ময়কর বিধি-বিধান সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাও সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রবন্ধ-সংগ্রহের অধিকাংশই বিভিন্ন ইংরাজী লেখকের রচনার অনুকরণে লিখিত হইলেও অক্ষয়কুমারের নিজস্ব রচনা-বৈশিষ্ট্যে, তাহা মৌলিক প্রবন্ধেরই রূপ গ্রহণ করিয়াছে। পাণ্ডিত্যের সহিত ভাবুকতার সহজ মিলনের ফলে অক্ষয়কুমারের কোন রচনাই কেবল পরানুসৃতিমাত্রেই পরিণতি লাভ করে নাই। বিজ্ঞানের বিবিধ শাখা অবলম্বন করিয়া সুপ্রণালীসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম অক্ষয়কুমারের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়।

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির আলোকেই প্রধানতঃ অক্ষয়কুমারের মানসিক চেতনা পরিপুষ্ট হইয়াছে। তাঁহার বিজ্ঞান-বুদ্ধিসর্বস্ব রচনা কখনই রস-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। এ'কথা স্বীকার্য যে, বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তর্ক ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের বাহুল্য হেতু অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ বিশুদ্ধ সাহিত্য-রসগুণে মণ্ডিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সহজাত মানস প্রকৃতির অন্তরালে যে কল্পনা বা ভাবাবেগের সম্পূর্ণ অভাব ছিল, এ'কথা স্বীকার করা যায় না। অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ' গ্রন্থে 'স্বপ্নদর্শন' পর্যায়ে যে 'বিদ্যা বিষয়ক', 'কীর্তি বিষয়ক' ও 'ন্যায় বিষয়ক' প্রবন্ধত্রয় আছে, তাহা তাঁহার সহজাত রসবোধ ও সাহিত্যিক কৃতিত্বের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। 'স্বপ্নদর্শনে'র গঠন-সৌকর্য যেমন অভিনব, তেমনি ভাষার সহজ সাবলীল গতি ও গাম্ভীর্যে ইহা অধিকতর মহিমান্বিত হইয়াছে। সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ প্রবন্ধ রচনার ক্ষমতা যে অক্ষয়কুমারের ছিল, তাহা তাঁহার 'স্বপ্নদর্শন' পর্যায়ের প্রবন্ধসমূহ হইতে প্রমাণিত হয়। 'স্বপ্নদর্শন' ব্যতীত অন্য কোন কোন প্রবন্ধেও তাঁহার সাহিত্যিক রসবোধের পরিচয় লাভ করা যায়। অতএব অক্ষয়কুমারের মধ্যে সাহিত্য-শিল্প-বোধ সম্পূর্ণ দুর্লভ ছিল না। অক্ষয়কুমার মুখ্যতঃ স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ-চিন্তায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নীতি-ধর্মের ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ প্রবন্ধ

রচনা করিয়াছেন। নিছক শিল্পগত প্রেরণায় বা বিশুদ্ধ কল্পনা ও ভাবাবেগে উদ্বুদ্ধ হইয়া সাহিত্য-কর্মে আত্মনিয়োগ করা তাঁহার পক্ষে কদাচিৎ সম্ভব হইয়াছে।

অক্ষয়কুমার সাহিত্য-গুণবর্জিত, শুষ্ক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধই অধিক রচনা করিয়াছেন, তাঁহার রসাত্মক প্রবন্ধের সংখ্যা সেই পরিমাণে অল্প। অক্ষয়কুমারের শিল্প-রসিক মনের সম্যক্ পরিচয় প্রধানতঃ তাঁহার 'স্বপ্নদর্শন' পর্যায়ের প্রবন্ধগুলিতেই সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। অক্ষয়কুমার 'স্বপ্নদর্শন' পর্যায়ের প্রবন্ধ রচনার মুখ্য প্রেরণা ইংরাজ লেখক এডিসনের (Addison) *Vision of Mirza* নামক রচনা হইতে লাভ করিয়াছেন। অভিনব বিষয়ের উপস্থাপনায় এবং মৌলিক উদ্ভাবনা গুণে ইহা উচ্চতর সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এডিসনের তুলনায় অক্ষয়কুমারের কল্পনা-শক্তি অধিকতর প্রখর ও উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। কেবল মাত্র কল্পনা-শক্তিতেই নহে, মীর্জার স্বপ্ন-চিত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতীয় এক অভিনব চিত্র অক্ষয়কুমার তাঁহার প্রবন্ধের মধ্য দিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। রচনারীতি অর্থাৎ বাচনভঙ্গির ক্ষেত্রে এডিসনের সহিত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলেও বিষয়বস্তুগত ঐক্য বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার তাঁহার বিশিষ্ট চিন্তাশক্তির পরিচয়ও দান করিয়াছেন। সুতরাং 'স্বপ্নদর্শন' পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি ইংরাজ লেখক এডিসন-কৃত রচনার অন্ধ অনুসরণ মাত্র নহে।

অক্ষয়কুমারের 'স্বপ্নদর্শন' পর্যায়ে তিনটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ আছে অর্থাৎ 'বিদ্যা বিষয়ক', 'কীর্ত্তি বিষয়ক' ও 'ন্যায় বিষয়ক'। তাহাদের মধ্যে 'কীর্ত্তি বিষয়ক' প্রবন্ধটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। 'ন্যায় বিষয়ক' প্রবন্ধটি তীক্ষ্ণ শ্লেষপ্রধান রচনা—ইহার মধ্য দিয়া লেখকের বহুদর্শিতা ও অধিকতর সংস্কার প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'কীর্ত্তি বিষয়ক' প্রবন্ধটিতে লেখকের বক্তব্য রূপকের মাধ্যমে বিবৃত হইয়াছে। অক্ষয়কুমারের সহজাত স্বভাব ও রূপচেতনার সম্যক্ পরিচয় ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রবন্ধটির ভাষাও সরস এবং প্রসাদগুণ মণ্ডিত। জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক তত্ত্ব কেবলমাত্র নীরস ব্যাখ্যানের মাধ্যমে পরিবেশিত হইলে, তাহ সাধারণতঃ রসসম্মত হয় না। অন্যবিধ উপায় দ্বারা ইহাকে রসগ্রাহ্য করিতে হয়। অক্ষয়কুমার তাঁহার দর্শন-তত্ত্বসুলভ, মননগ্রাহ্য 'কীর্ত্তি বিষয়ক' প্রবন্ধটি রসগ্রাহ্য করিবার অভিপ্রায়ে আত্মকথার অন্তরঙ্গ ভঙ্গি এবং রূপকধর্মী সরস ঘটনার আশ্রয় লইয়াছেন এবং ইহার দ্বারা অরূপ, অপ্রত্যক্ষ ভাব বা বস্তু চিত্রবৎ

প্রত্যক্ষ হইয়া পাঠক মনে রসের সংবেদনা সঞ্চার করিয়াছে। অক্ষয়কুমারের নিপুণ রচনা-কৌশলে বিমূর্ত কীর্তিসুন্দরী জীবন্ত নারীমূর্তি গ্রহণ করিয়া যেন স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার মধুর বংশীধ্বনিতে জগৎবাসী স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিতেছেন। প্রজ্ঞা দেবীমূর্তি ধারণ করিয়া লেখকের চিন্তাগ্রস্ত ললাট দেশ বিদীর্ণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। মৃত্যু, দ্বেষ, আলস্য, আমোদ, অজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন মায়ারূপ গ্রহণ করিয়া কখনও ভীষণাকৃতি যক্ষমূর্তিতে ত্রাসের সঞ্চার করিতেছে, কখনও বা বিচিত্র পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া ছলনার আশ্রয়ে মানবজাতিকে কীর্তি সাধনালোক হইতে বিচ্যুত করিতেছে। এইভাবে অক্ষয়কুমার তাঁহার সুনিপুণ তুলিকায় বিভিন্ন চিত্রের পর চিত্র অঙ্কন করিয়া প্রতিপাদ্য নীরস তত্ত্ব সুস্পষ্ট ও মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ দেশী ও বিদেশী মনীষিগণের কীর্তিবহুল পরিচয়ও প্রদত্ত হইয়াছে। অক্ষয়কুমার তাঁহার প্রবন্ধে ভারতীয় ও ইউরোপীয় কাব্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াও তাঁহার রচনার গৌরব অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছেন। অভিনব পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু সংযত পরিবেশন-গুণে অক্ষয়কুমারের দর্শন-তত্ত্ব সরস সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। রূপকের আবরণ থাকিলেও লেখকের বক্তব্য বিষয় কোথাও অস্পষ্ট হয় নাই। অক্ষয়কুমারের 'বিদ্যা বিষয়ক' প্রবন্ধটিও এই জাতীয়। বক্তব্য বিষয়ের সুস্পষ্টতা ও একমুখীনতার জন্য এই প্রবন্ধটিও সমুজ্জ্বল। জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধও কবিত্বশক্তি ও বর্ণনানৈপুণ্যে কিরূপ সরস হইয়াছে, তাহার পরিচয় প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'অবশেষে যখন পর্ব্বতোপরি উত্তীর্ণ হইলাম, তখন কি অনির্ব্বচনীয় অনুপম সুখানুভবই হইল। তথাকার সুশীতল মারুত-হিল্লোলে শরীর পুলকিত হইতে লাগিল। তথায় দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, বিসংবাদ, চৌর্য্য, অত্যাচার এ সকলের কিছুই নাই, কেবল আরোগ্য ও আনন্দ অবিরত বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল। বোধ হইল, বিশ্ব-সংসারে এমন রম্য স্থান আর দ্বিতীয় নাই। কিছুকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণান্তর দূর হইতে এক অপূর্ব্ব সরোবর দেখিতে পাইলাম এবং তদ্দর্শনার্থে আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, কতকগুলি পরম-পবিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা সরোবর-তটে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের অসামান্য রূপ-লাবণ্য, প্রফুল্ল পবিত্র মুখশ্রী এবং সারল্য ও বাৎসল্য স্বভাব

অবলোকন করিয়া অপরিমেয় প্রতীতি লাভ করিলাম। আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাদিগের শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, অথচ অনলঙ্কারই তাঁহাদের অলঙ্কার হইয়াছে। বোধ হইল যেন আনন্দ প্রতিমাগুলি ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে।'[১]

অক্ষয়কুমার প্রণীত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১ম ভাগ, ১৮৭০, ২য় ভাগ, ১৮৮৩) গ্রন্থটি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক হোরেস হেম্যান্ উইলসনের গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের দুই ভাগে প্রগাঢ় তত্ত্বানুসন্ধিৎসু লেখক যে গভীর অনুশীলন ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। কেবলমাত্র পঠিত গ্রন্থসমূহের উপর নির্ভর করিয়া গৃহে বসিয়াই অক্ষয়কুমার এই গবেষণা-নির্ভর গ্রন্থ রচনা করেন নাই—ইহার জন্য অক্ষয়কুমারকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। প্রয়োজনবোধে তিনি বহু বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের সাধকগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনা করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে নানা দুজ্ঞেয় তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন। পাণ্ডিত্য ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—এই উভয়ের সমন্বয়-সিদ্ধ রচনা 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থটি বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে অক্ষয়কুমারের একটি মূল্যবান্ সংযোজনা। এই সারগর্ভ গ্রন্থে যেমন অক্ষয়কুমারের অনুসন্ধিৎসা, সারগ্রাহিতা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় আছে, তেমনি ইহাতে তাঁহার প্রখর বিদ্যাবুদ্ধি, বিচার-বিন্যাস চাতুর্য, অসামান্য শাস্ত্র-জ্ঞান এবং গভীর স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের পরিচয়ও লাভ করা যায়।

অক্ষয়কুমার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থ রচনায় হোরেস হেম্যান্ উইলসন্ প্রণীত *Sketch On the Religious Sects of the Hindus* পুস্তকটিকে আদর্শ করিয়াছেন। উইলসনের প্রবর্তিত পন্থা অনুসরণ করিলেও অক্ষয়কুমার তাঁহার গ্রন্থে বহু নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়া তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন এবং সে' ক্ষেত্রে তাঁহার মৌলিক চিন্তাশক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ভাগেরই দীর্ঘ উপক্রমাণকা অংশটি স্বতন্ত্রভাবে অক্ষয়কুমারের দুইটি মৌলিক পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে যেমন তাঁহার যুক্তির সুতীক্ষ্ণতা ও সূক্ষ্মদর্শিতা প্রকাশ

১ 'চারুপাঠ' ৩য় ভাগ, (কলিকাতা, ১৯০৭), পৃঃ ১০-১১

পাইয়াছে, তেমনি ইহার কোন কোন অংশে অক্ষয়কুমারের শিল্পসম্মত কবিত্বেরও বিকাশ হইয়াছে। এই দুইটি উপক্রমণিকা হইতে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের একটি সামগ্রিক চিত্র লাভ করা যায়। অক্ষয়কুমারের এই উপক্রমণিকা অংশদ্বয় নিঃসন্দেহে তাঁহার মূল গ্রন্থের গৌরব অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহাতে আপেক্ষিক শব্দবিদ্যার অর্থাৎ ভাষাতত্ত্বের সারমর্ম, প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে বৈদিক ধর্মের প্রচলন, বৈদিক ধর্মের পর হিন্দু সম্প্রদায়ে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রসার, বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের উপাসনা-প্রণালী প্রভৃতি এই জাতীয় সকল প্রকার বিবরণ অতি নৈপুণ্য সহকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অক্ষয়কুমারের তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি এবং বহুমুখী পাণ্ডিত্যের পরিচয় তাঁহার এই দুই ভাগে লিখিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় হইতে লাভ করা যায়। প্রধানতঃ উপক্রমণিকা ভাগে তাঁহার ধর্মবিষয়ক আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য। ইহাতে তিনি সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি ষড়্দর্শন, বৌদ্ধধর্ম বা তত্ত্ব, তন্ত্র এবং বিবিধ পুরাণ ও উপপুরাণের বিশিষ্ট মতবাদসমূহের নিখুঁত পরিচয় দান করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং ভারতীয় ও গ্রীক্ দর্শনেরও তুলনামূলক আলোচনা সুচারুভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। উপক্রমণিকার কোন কোন অংশে কল্পনা ও আবেগপ্রবণ অক্ষয়কুমারের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। যুক্তিবাদী ও আবেগ-সংযত লেখক অক্ষয়কুমার অনাবশ্যকভাবে কোথাও তরল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে তাঁহার ভাবাবেগ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার পশ্চাতে অক্ষয়কুমারের গভীর স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যাভিমানের সক্রিয় প্রেরণা ছিল। 'আর্য্যগণের ভারতবর্ষে প্রবেশ', 'ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ও অধুনাতন অবস্থা' এবং 'রামমোহন' প্রসঙ্গেই প্রধানতঃ অক্ষয়কুমারের ভাবাবেগের আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এ'কথা স্বীকার্য যে, অক্ষয়কুমারের ভাবাবেগ সম্পূর্ণ শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাসে পর্যবসিত হয় নাই।

এ'কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়া অক্ষয়কুমার বাংলা ভাষায় এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনার ধারা প্রবর্তন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের রচনাও তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অক্ষয়কুমারের মৃত্যুর পর 'হিতৈষী', 'সাহিত্য', 'প্রবাসী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার লিখিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র তৃতীয় ভাগের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি হইতে

কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 'জৈন', 'বাবালালি উপাসক সম্প্রদায়', 'শিবনারায়ণী সম্প্রদায়', 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি তাহাদের অন্যতম।

অক্ষয়কুমারের সম্পূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধগুলির মধ্যেই তাঁহার বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। কোন বিশিষ্ট লেখকের ভাব বা রচনাদর্শ অনুসরণ না করিবার ফলেই তাঁহার নিজস্ব রচনা-সৌষ্ঠব এই প্রবন্ধসমূহের মধ্য দিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে। অক্ষয়কুমারের এই প্রবন্ধগুলিও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত অক্ষয়কুমারের বহু প্রবন্ধই অদ্যাপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর বহুকাল পরে কতকগুলি প্রবন্ধ একত্র সংকলিত হইয়া 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার' (১৯০১) নামে প্রকাশিত হয়। ঋগ্বেদ সংহিতা, বিবিধ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থগুলির বহুতর অংশে সমুদ্রযাত্রা এবং হিন্দু বণিক ও বাণিজ্য সম্পর্কিত প্রসঙ্গ আছে। মূল গ্রন্থসমূহ হইতে প্রমাণপঞ্জী উল্লেখ করিয়া অক্ষয়কুমার ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে এ'সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তথ্য-যুক্তিনিষ্ঠ এই প্রবন্ধগুলিও অক্ষয়কুমারের বিশিষ্ট রচনা-ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত অথচ গ্রন্থাকারে অমুদ্রিত অক্ষয়কুমারের কয়েকটি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সমস্যামূলক প্রবন্ধেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মৌলিক চিন্তাসম্পন্ন ও তথ্য-প্রতিপাদক এই সকল প্রবন্ধেও অক্ষয়কুমারের উচ্চাঙ্গের রচনা-শক্তির পরিচয় লাভ করা যায়। ভাষার গাম্ভীর্য, ওজস্বিতা অথচ সহজবোধ্য গুণে তাঁহার প্রতিটি প্রবন্ধই সমুজ্জ্বল হইয়াছে। 'কলিকাতার বর্ত্তমান দুরবস্থা', 'বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা', 'পল্লী-গ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা' প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

'বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা' নামক প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার সংস্কার-মুক্ত মনোভাব লইয়া বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে বিবিধ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। প্রচলিত সমাজ-অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহায়তায় তিনি যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যেমন তাঁহার নির্ভীক ব্যক্তিত্বের নিদর্শন, তেমনি সহৃদয় মানবতাবোধের পরিচায়ক। অক্ষয়কুমার তাঁহার প্রবন্ধে বিধবা বিবাহের বৈধতা সপ্রমাণ করিয়া যে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন, তাহার

মধ্যে তাঁহার নিজস্ব চিন্তা-স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। অক্ষয়কুমারের এই জাতীয় প্রবন্ধ দ্বারা সমকালীন সমাজসেবী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আন্দোলনে যে সমধিক প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন এবং এই শ্রেণীর সমস্যামূলক প্রবন্ধ রচনায় অধিকতর উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অক্ষয়কুমার প্রণীত 'পল্লী-গ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা' নামক প্রবন্ধটি নীলকর, চা-কর প্রভৃতি ভূ-স্বামিদিগের নিষ্ঠুর অত্যাচার অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ দেশীয় প্রজাদিগের উপর বিদেশী নীলকর সাহেবদিগের অমানুষিক ব্যবহার ও উপদ্রবের বিবরণ অক্ষয়কুমার তাঁহার প্রবন্ধে নগ্নভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তৎকালীন পরাধীন দেশের লেখকের পক্ষে এবংবিধ বিদ্রোহাত্মক রচনা সহজ ছিল না। অক্ষয়কুমারের নির্ভীক ব্যক্তিত্ব, ন্যায়-বুদ্ধি ও সত্যনিষ্ঠাই তাঁহাকে এই প্রবন্ধ রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, নীলকর সাহেবদিগের অভাবনীয় অত্যাচার, অবিচারকে ভিত্তি করিয়া নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার বিদ্রোহমূলক নাটক 'নীল-দর্পণ' রচনা করেন এবং তাঁহার এই নাটকটি অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধের প্রায় দশ বৎসর পরে লিখিত হয়। এ'কথা অস্বীকার করা যায় না যে, নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচার সেই যুগে দেশের মধ্যে যে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল, অক্ষয়কুমারের এই প্রবন্ধেই তাহার প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রকাশ ঘটিয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে বাস্তব সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া নিখুঁত পরিচয় প্রদানের বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। নিপীড়িত, নির্যাতিত কৃষক সম্প্রদায়ের স্বপক্ষে অক্ষয়কুমারের যে বলিষ্ঠ বক্তব্য ছিল, তাহা দ্বারা তাঁহার গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। অক্ষয়কুমার তাঁহার প্রবন্ধের কোন কোন অংশে নির্মম অত্যাচারকারী, অমানুষ নীলকর সাহেবদিগের নিষ্ঠুর কর্মকৃতির প্রতি তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপ সহকারে বিশেষ কটাক্ষপাতও করিয়াছেন। বিদ্রোহাত্মক রচনা হিসাবে অক্ষয়কুমারের এই প্রবন্ধটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

অক্ষয়কুমার প্রধানতঃ গুরুগম্ভীর, জ্ঞানগর্ভ তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধেরই খ্যাতিমান লেখক হিসাবে পরিচিত হইয়াছেন। বিজ্ঞাননিষ্ঠ বিষয়গৌরবের জন্যই তাঁহার বক্তব্য ও বাক্য-রীতি ততোধিক সহজ ও রসসম্মত হয় নাই। কিন্তু যে রচনায় ক্রমসংবদ্ধ নিছক তথ্য-যুক্তি বা তর্কের গুরুভার নাই, আন্তরিক সহজাত আবেগে যেখানে প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্য বাস্তব অনুভূতির ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে,

অক্ষয়কুমারের সেই জাতীয় রচনাই একান্ত হৃদয়গ্রাহী ও সর্বাধিক শক্তিশালী হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অক্ষয়কুমার লিখিত প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'হায়! যাহারা কেবল দণ্ডভয়ে আপনার অনভিমত কার্য্যে এইরূপ নিয়োজিত থাকে,—গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্র ও বর্ষা ঋতুর অজস্র বারিবর্ষণ সহ্য করে, তাহারদিগের কি বিজাতীয় যন্ত্রণা! তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া হল চালনা করুক, হস্তদ্বারা নীলভূমির তৃণ উৎপাটন করুক, নীলপত্রচ্ছেদন করুক, তৎপূর্ণ নৌকাই বা বাহন করুক, তাহারদের অন্তঃকরণ কদাপি সে স্থানেও সে কার্য্যে নিবিষ্ট থাকে না। যখন কৃষকেরা নীলকরের নীলক্ষেত্র কর্ষণ করে, তখন তাহারা আপনার ভূমি ও আপনার শস্য স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হয়!—স্বসন্তানবৎ স্নেহাস্পদ শস্য বৃক্ষগুলি স্বচক্ষে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। যে সময়ে তাহারদের স্বীয় ভূমি কর্ষণ পূর্ব্বক সম্বৎসরের অন্ন সংস্থান করা আবশ্যক, যে সময়ে তাহারা স্বকীয় কার্য্য সমাধা করিতেই সাবকাশ পায় না, সেই সময় তাহারদিগকে অযথোচিত বেতন স্বীকারপূর্ব্বক অন্যের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া শরীর ক্ষয় হয়।'[১]

বাংলা সাহিত্যে ইংরাজী Essay-র আদর্শে প্রবন্ধ রচনার প্রথম সার্থক প্রয়াস অক্ষয়কুমারের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। প্রবন্ধের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁহার রচনায় সর্বপ্রথম পূর্ণ পরিস্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। অতএব অক্ষয়কুমার হইতেই আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের যথার্থ বিকাশ সুরু হইয়াছে।

১ 'পল্লী-গ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা', (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ, ৮১ সংখ্যা, ১৭৭২ শকাব্দ), পৃঃ ১১৭-১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

।সমাজবিপ্লবী ও দয়ার সাগর হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরর যে বিপুল খ্যাতি, তাহা দ্বারা তাঁহার সাহিত্যিক পরিচয় বহুল পরিমাণে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।। বিদ্যাসাগর যে প্রকৃতই বাংলা ভাষার প্রথম শিল্পী ছিলেন, এ'কথা প্রায় সাধারণের নিকট অজ্ঞাত। কারণ, বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকীর্তি অপেক্ষা তাঁহার পর্বত প্রমাণ চরিত্র-মাহাত্ম্য সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যে অধিকতর বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে।

ভাষাই মানুষের ভাবপ্রকাশের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম। উন্নত ভাষা দ্বারাই জাতির সমুন্নত সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালী জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ-সাধনে বাংলা ভাষার অসামান্য দানও অস্বীকার করা যায় না। এই ভাষা-গঠনে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিল্প-প্রতিভা ও সৃষ্টি-নৈপুণ্যের অনন্যসাধারণ পরিচয় লাভ করা যায়। উন্নত ভাষা-সৃষ্টির জন্য যে পরিণত শিল্পবোধের প্রয়োজন, বিদ্যাসাগর সেই শিল্পগুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পরিমিত শিল্পজ্ঞান ও রসরুচি বাংলা সাহিত্যে পূর্ববর্তী লেখকগণের মধ্যে দুর্লভ ছিল। বিদ্যাসাগরের গদ্য-ভাষা বিশুদ্ধ, সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য গুণে সমৃদ্ধ। পূর্ববর্তী বাংলা গদ্য-ভাষার উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহার লেখনী-স্পর্শে সুবিন্যস্ত ও সুসংযত হইয়া সহজ ও সাবলীল গতি লাভ করিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যেই বাংলা প্রবন্ধ রচনার ভাষা এক নূতন শক্তি অর্জন করিয়া যথার্থ সাহিত্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনা সম্পর্কে কোন কোন সমালোচক মন্তব্য করিয়াছেন যে, বিদ্যাসাগরের রচনায় নৈপুণ্য আছে, শিল্প-চাতুর্য আছে সত্য, কিন্তু তাঁহার নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তি বা মৌলিকতা নাই। কারণ, বিদ্যাসাগরের প্রায় সকল রচনাই আক্ষরিক বা ভাবানুবাদ মাত্র।। (যদিও এ'কথা স্বীকার করা যায় যে, বিদ্যাসাগর তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই ইংরাজী, সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির অনুসরণে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছেন বটে, 'কিন্তু

সেই সঙ্গে মৌলিক রচনা-কর্মেও সম্পূর্ণ নিরস্ত থাকেন নাই। যদিও অনূদিত গ্রন্থের তুলনায় তাঁহার মৌলিক রচনার সংখ্যা নগণ্য, তথাপি তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নহে। এ'কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মৌলিক সাহিত্য-সৃষ্টি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আন্তরিক অভিপ্রায় বা লক্ষ্য ছিল না। তিনি যখন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন বাংলা গদ্য-ভাষার প্রাথমিক যুগ অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্ব—সাহিত্যোপযোগী ভাষা তখনও সম্পূর্ণ সার্থকভাবে গঠিত হয় নাই। সুতরাং প্রথমেই বিদ্যাসাগরকে নূতন করিয়া বাংলা গদ্য-ভাষার পরিণত রূপ-বিধানকল্পে গভীরভাবে মনোনিবেশ করিতে হইয়াছিল। মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষায় জাতির মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার সাধনাই তাঁহার জীবনের একমাত্র মূলধন স্বরূপ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রায় সকল রচনার মধ্য দিয়া জাতীয় শিক্ষা ও নৈতিক আদর্শ ই প্রচারিত হইয়াছে। তিনি মুখ্যতঃ ছাত্রদের পাঠোপযোগী বিষয় নির্বাচন করিয়া সেই শ্রেণীর পুস্তিকাই অধিকতর রচনা করিয়াছেন।

অনুবাদ গ্রন্থসমূহের তুলনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা পরিমাণে অল্প। কারণ, নিছক সাহিত্য-সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি কোনরূপ সচেতন ছিলেন না। মাতৃভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তৃতি সাধনের জন্য পাঠ্য-পুস্তক রচনা-কার্যেই বিদ্যাসাগর অধিকতর সময় ব্যয় করিতেন এবং তাঁহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের এমনই অনিবার্য প্রেরণা ছিল যে, তাঁহাকে একান্তভাবে বাধ্য হইয়াই অনুবাদমূলক রচনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছে। মৌলিক গ্রন্থ রচনায় যে প্রকার দীর্ঘসূত্র চিন্তা ও সাবকাশের প্রয়োজন হয়, তাহার কোনটাই বিদ্যাসাগরের ছিল না। সেইজন্য, তাঁহার নিজস্ব মৌলিক চিন্তাপ্রসূত রচনার সংখ্যা পরিমাণে অতি অল্প হইয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মৌলিক রচনা অপেক্ষা অনুবাদের ক্ষেত্রেই অধিকতর সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার অনূদিত রচনার মধ্যে বাংলা ভাষার নিজস্ব রীতি ও বাগ্‌ভঙ্গি অনুসৃত হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের অনুবাদমূলক রচনার ইহা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতেই বাংলা সাহিত্যে প্রথম অনুবাদ ও মৌলিক প্রবন্ধ রচনার ভাষাগত পার্থক্য বিলুপ্ত হয়। বিদ্যাসাগরের পূর্বে রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ লেখকগণের অনুবাদমূলক ও মৌলিক রচনার মধ্যে ভাষাগত প্রভূত ব্যবধান ছিল এবং বিশেষতঃ, মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদের ভাষা যেরূপ সরস ও সহজবোধ্য ছিল, তাঁহার

প্রবন্ধের ভাষা তেমন ছিল না, তাহা অধিকতর সংস্কৃত শব্দবহুল ও দুর্বোধ্য হইয়াছে। বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম অনুবাদ ও মৌলিক প্রবন্ধ রচনা-কর্মে ভাবাগত বৈসাদৃশ্যের বিলোপ সাধন করিয়াছেন। বিষয়গৌরব অনুসারে ভাষায় বৈচিত্র্য দৃষ্ট হইলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুবাদমূলক রচনা ও মৌলিক প্রবন্ধে একই ভাষা ও রচনারীতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত মৌলিক প্রবন্ধ গ্রন্থ যথাক্রমে—১। 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩), ২। 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫), ৩। 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব' (১৮৫৫), ৪। 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (১৮৭১), ৫। 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার, দ্বিতীয় পুস্তক, (১৮৭৩) ও ৬। 'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)' (১৮৯১)। এতদ্ব্যতীত, তাঁহার অন্যান্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধাদি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী' (১ম-৩য় খণ্ড) তে সংগৃহীত হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্রের বিবিধ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধাদির মধ্যে 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামক রচনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্য বিষয়ক একমাত্র সমালোচনা পুস্তক 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব'। ইহা তৎকালীন একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'বীটন সোসাইটি'তে বিদ্যাসাগর কর্তৃক পঠিত হয়। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের যে একজন রসগ্রাহী পণ্ডিত ছিলেন, তাহা এই প্রবন্ধ পুস্তিকা হইতে প্রমাণিত হয়। বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রথম এই প্রবন্ধ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের লেখক ও তাঁহাদের সাহিত্যকৃতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ভারতবাসী অপেক্ষা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণই অধিকতর অনুরাগ ও কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছেন। উইলিয়ম্ জোন্‌স্, ম্যাক্‌স্‌ম্যুলর, উইলসন্ প্রমুখ মনস্বী ব্যক্তিগণ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থসমূহ হইতে ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য বিষয়ে এ'দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম ইহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হন এবং সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হইবার ফলে তাঁহার এ'সম্পর্কে অধিকতর অনুরাগের সৃষ্টি হইয়াছিল।

বাংলা ভাষায় তিনি যে প্রবন্ধ রচনা করিলেন, তাহাতে উল্লিখিত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের আলোচনার প্রেরণাই সমধিক কার্যকরী ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার প্রবন্ধে সংস্কৃত মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গদ্যকাব্য, চম্পূকাব্য, দৃশ্যকাব্য ও উপাখ্যানের সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়াছেন এবং তৎসহ সংস্কৃত ভাষায় এই সকল বিষয়ক যে প্রসিদ্ধ কাব্য ও নীতি গ্রন্থসমূহ আছে, সেই গ্রন্থ সমুদয়ের সংক্ষিপ্ত সাহিত্য-বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের এই প্রবন্ধটি বিষয়ের ব্যাপ্তি অনুযায়ী তেমন দীর্ঘ হয় নাই এবং অতি সংক্ষিপ্ততার দরুন তাঁহার রচনাটি একটি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য-সমালোচনার মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ততা সম্পর্কে বিদ্যাসাগর স্বয়ং সচেতন ছিলেন এবং ইহার কারণ স্বরূপ তিনি তাঁহার গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন—

'বীটন সোসাইটিতে এক ঘণ্টা মাত্র সময় প্রস্তাব পাঠের নিমিত্ত নিরূপিত আছে ; সেই সময়ের মধ্যে যাহাতে পাঠ সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়েই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া, এরূপ সংক্ষিপ্ত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।'

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধটি পঠিত বক্তৃতা হইলেও তিনি কয়েকজন কবি ও তাঁহাদের কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে অল্প পরিসরেও যে বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যেমন সারগর্ভ তেমনি তাঁহার পরিণত রসজ্ঞ মনের পরিচায়ক। 'রঘুবংশ' 'কুমারসম্ভব', 'শিশুপাল-বধ', 'নৈষধ চরিত', 'ভট্টিকাব্য', 'গীতগোবিন্দ' সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের আলোচনা উল্লেখযোগ্য। তিনি অতি সংক্ষেপে উক্ত কাব্য গ্রন্থ-সমূহের প্রাথমিক পরিচয় দান করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তাহা দ্বারাই কবিগণের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর তাঁহার প্রবন্ধে সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে ভাবাবেগে কেবলমাত্র যে ইহার গুণকীর্তন করিয়াছেন, তাহা নহে, নিরপেক্ষ সাহিত্য বিচার-বুদ্ধির সহায়তায় কোন কোন রচনা সম্পর্কে তাঁহার বিরূপ অভিমতও প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্র' প্রভৃতি নীতিগর্ভ গ্রন্থের অশ্লীলতা প্রসঙ্গে তিনি কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন। কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে তাঁহার বিচার-বিশ্লেষণ হইতে গভীর রসবোধের পরিচয় লাভ করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শিশুপাল-বধ' কাব্য প্রসঙ্গে আলোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'মাঘ অতি অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও অতি অদ্ভুত বর্ণনাশক্তি পাইয়াছিলেন। যদি তাঁহার, কালিদাস ও ভারবির ন্যায়, সহৃদয়তা থাকিত, তাহা হইলে তদীয়

শিশুপাল-বধ সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য হইত, সন্দেহ নাই। তিনি সকল বিষয়েরই বহু বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা সকল আরম্ভে একান্ত মনোহর, কিন্তু অবসানে নিতান্ত নীরস। মাঘ অধিক বর্ণনা এত অধিক ভালবাসিতেন যে, শেষাংশ নিতান্ত অশক্তিকৃত হইতেছে দেখিয়াও, ক্ষান্ত হইতে পারিতেন না। কখন কখন ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, একটি শ্লিষ্ট অথবা সুশ্রাব্য শব্দের অনুরোধে একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। সেই শ্লোকের সেই শব্দটি ভিন্ন আর কোন অংশেই কোন চমৎকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, ওজস্বী ও গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক, কিন্তু কালিদাসের অথবা ভারবির ন্যায় পরিপক্ব নহে।'[১]

বিদ্যাসাগরের এই 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তাবোধ ও কাব্য-বিচার নৈপুণ্যের সম্যক্ পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। বিদ্যাসাগর এই সমালোচনামূলক প্রবন্ধে কোন কোন সংস্কৃত কাব্য সম্পর্কে এমন সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথায় তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহা রসসম্মত কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পর্যায়ে উন্নীত হয় নাই। 'মেঘদূত', 'ঋতুসংহার', 'সূর্য্যশতক', 'অমরুশতক', 'শান্তিশতক' প্রভৃতি কাব্যসমূহের তিনি কেবল নামোল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, কোনরূপ বিচার-বিশ্লেষণে নিয়োজিত হন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কয়েকটি সমাজ-সংস্কারমূলক প্রবন্ধ গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং একজন বিশিষ্ট সমাজ-সংস্কারক ব্যক্তি ছিলেন। বাংলা দেশে প্রচলিত বহু কু-প্রথার অপসারণ বা বিলোপ সাধনকল্পে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় এক বিরাট সামাজিক আন্দোলন গড়িয়া উঠে এবং এই আন্দোলনে বিদ্যাসাগর স্বয়ং নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় যেখানে অন্যায়, অবিচার, দোষ-ত্রুটি দেখিয়াছেন, সেইখানেই তিনি কঠোরভাবে তাঁহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর অসঙ্গত, অন্যায় সামাজিক অনাচার বা প্রথা কোনদিনই নীরবে সহ্য করেন নাই—নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও তিনি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। হিন্দু সমাজের

---

১ 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব', বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী [শিক্ষা ও বিবিধ], (কলিকাতা, ১৩৪৬), পৃঃ ৩১৬

স্বেচ্ছাচারিতা, নিষ্ঠুর বিধি-ব্যবস্থার চক্রান্তে যে নারী-নিগ্রহ চলিতেছিল, তাহার প্রতিরোধে বিদ্যাসাগর আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ প্রভৃতি কু-প্রথাসমূহের প্রচলন পরবর্তী কালে অধিকতর হ্রাস পাইয়াছে। সামাজিক আচার-ব্যবহারে তিনি কোনদিন সংকীর্ণ-চিত্ততার পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। শাস্ত্র প্রতিপাদিত হইলেও মনুষ্যত্ববিরোধী কোন আচার বা সংস্কারের কোনরূপ মূল্য তাঁহার নিকট ছিল না। স্বীয় বিচার-বুদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে সকল সমস্যাই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার-বিবেচনা করিয়া বিদ্যাসাগর নিজস্ব সিদ্ধান্ত বা মতামত প্রকাশ করিতেন। আধুনিক যুগধর্ম অর্থাৎ মানবতাবাদের (Humanism) তিনি একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন এবং মানবপ্রেমীর সর্ববিধ গুণের সম্যক্ পরিস্ফূর্তি তাঁহার চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং হিন্দু রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হইয়াও বিদ্যাসাগর সর্বপ্রকার প্রগতিশীল মনোভাবেরই অধিকারী ছিলেন। যে সমুদয় সামাজিক প্রথা মনুষ্য সমাজের মেরুদণ্ড দুর্বল বা পঙ্গু করিয়া দেয়, শাস্ত্রসম্মত হইলেও মানবতাবাদী বিদ্যাসাগর সেই প্রথাসমূহ সমর্থন করেন নাই। সামাজিক বিবিধ সমস্যা ও সংস্কারমূলক প্রবন্ধের মধ্য দিয়া একদিকে যেমন তাঁহার প্রগতিশীল যুক্তিবাদী মনের সম্যক্ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে মানব-প্রেমমুগ্ধ স্পর্শকাতর হৃদয়াবেগে বিহ্বল এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সহিত পরিচয় ঘটিয়াছে।

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সামাজিক সমস্যামূলক প্রথম প্রবন্ধ পুস্তক 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'। এই গ্রন্থে তিনি বিধবা-বিবাহের শাস্ত্র-সম্মতি সম্পর্কে বহুতর প্রমাণপঞ্জী উদ্ধার করিয়া তাঁহার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণ অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধে তাঁহার সহজাত মানব-প্রেম বা উদার হৃদয়ধর্মই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। দেশের সামাজিক জীবনের গভীর মর্মমূলে প্রবেশ করিবার ফলে দেশীয় সমাজের সহিত বিদ্যাসাগরের একটি অন্তরঙ্গ যোগ স্থাপিত হইয়াছিল এবং প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বাংলার সামাজিক জীবন হইতে বিদ্যাসাগর যে গভীর দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার শাস্ত্রসম্মত দৃষ্টি হইতে অধিকতর শক্তিশালী, প্রখর ও তীক্ষ্ন ছিল। 'পরাশর সংহিতা'য় সুস্পষ্টভাবে বিধবা বিবাহের অনুকূলে বিধি-ব্যবস্থা প্রদর্শন করিয়াই বিদ্যাসাগর তাঁহার প্রবন্ধগত বক্তব্য শেষ করিয়া নিরস্ত হন নাই—বিধবা বিবাহ

প্রচলিত না থাকিবার ফলে সমাজের বিবিধ কার্যকলাপে যে শৈথিল্য বা ব্যাপক ব্যভিচারিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার প্রতিও তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন—

'বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কত শত বিধবারা, ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া, ব্যভিচার দোষে দূষিত ও ভ্রূণ হত্যা পাপে লিপ্ত হইতেছে; এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা, ব্যভিচার দোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ ও তিন কুলের কলঙ্ক নিবারণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবেক।'[১]

বিদ্যাসাগরের সমস্যামূলক প্রবন্ধ হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি করা সম্ভব হয় যে, শাস্ত্রগ্রাহ্য প্রমাণসমূহ তাঁহার নিকট মুখ্য ছিল না, মনুষ্যত্বের প্রতি সহৃদয় আন্তরিকতাই তিনি অধিকতর অনুভব করিয়াছেন। ফলে, বিদ্যাসাগরের জটিল সমস্যামূলক প্রবন্ধও তাঁহার মর্মকাতর হৃদয়ধর্মে সাহিত্যিক মর্যাদায় ভূষিত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগরের সত্যধর্ম ও ন্যায়াদর্শের প্রতি অটল নিষ্ঠা ছিল। তিনি মানবিক সত্য হিসাবে যাহা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইতে কোনদিন মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হইতেন না। সমস্যাকণ্টকিত এবং গভীর চিন্তামূলক বিষয়েও বিদ্যাসাগর অভাবনীয় দৃঢ়তা ও অসামান্য সত্যনিষ্ঠা এবং দক্ষতার পরিচয় দান করিয়াছেন। 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামক দ্বিতীয় বিতর্কমূলক প্রবন্ধ গ্রন্থে তাঁহার মানসিক দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও মননশীলতার সম্যক্ পরিচয় লাভ করা যায়। বিধবা বিবাহ সম্পর্কীয় প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থে বিদ্যাসাগর মুখ্যতঃ বিধবা বিবাহ বিধি যে শাস্ত্র অনুমোদিত, তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাব বা রচনা

১ 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী [সমাজ], (কলিকাতা, ১৩৪৫), পৃঃ ৩৬

প্রকাশিত হইয়া প্রচারিত হইলে তৎকালীন হিন্দু রক্ষণশীল সমাজে এক বিপুল আলোড়ন উপস্থিত হয়। সংস্কারাচ্ছন্ন, অনুদার প্রাচীনপন্থী হিন্দু ব্রাহ্মণগণ বিধবা বিবাহ নিষেধক প্রমাণপঞ্জী অন্য বহুবিধ শাস্ত্র হইতে সংকলন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রচারিত ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা বিদ্যাসাগর সংগৃহীত শাস্ত্রীয় বচনের বিকৃত ব্যাখ্যা ও বিকল্প অর্থ করিয়াও প্রচার করেন। বিরুদ্ধ পক্ষীয় পণ্ডিতগণের কেহ কেহ নিছক ক্রোধের বশবর্তী হইয়া বিদ্যাসাগরকে অশ্লীল ভাষায় লিখিত রচনা দ্বারা আক্রমণ করেন—কটূক্তিতেই তাঁহাদের রচনা অধিকতর ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। সত্যাশ্রয়ী বা যুক্তিনিষ্ঠ কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ উক্ত রচনাসমূহে লক্ষ্য করা যায় না। বিদ্যাসাগর দেশীয় পণ্ডিতগণের এইরূপ আক্রমণাত্মক রচনা ও তাঁহাদের সৃষ্ট প্রতিকূল সামাজিক বিক্ষোভ দ্বারা কোন সময়েই বিচলিত হইয়া পড়েন নাই। বিরোধী পক্ষের নিষ্ঠুরাচরণ তিনি অবিচলিতভাবে সহ্য করিয়াছেন এবং অবিকৃত চিত্তে সংযতভাবেই বিরোধী পণ্ডিতদিগের সর্ববিধ শাস্ত্রীয় যুক্তির অসারতা নিজস্ব শাস্ত্র-জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই জাতীয় বাদ-প্রতিবাদমূলক অর্থাৎ বিতর্কবহুল প্রবন্ধের একটি বিশিষ্ট গুণ যে, ইহাতে তরল উচ্ছ্বাস বা অমূলক বাদ-বিতণ্ডা নাই এবং কোনরূপ কটূক্তি বা অশালীন মন্তব্যে লেখকের অসংযত ও অসংস্কৃত মনোভাব কোথাও প্রকাশ পায় নাই। বিদ্যাসাগর তাঁহার প্রবন্ধে শাস্ত্র-বচন যথাযথ উদ্ধার করিয়া পরাশরসম্মত বিধবা বিবাহের বৈধতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া রচিত বিধবা বিবাহ বিষয়ক তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তকের সর্বত্র এক বিরল গাম্ভীর্য ও সৌজন্যবোধের উদার পরিচয়ও লাভ করা যায়। জ্ঞান ও সত্যে অবিচল নিষ্ঠা ও অনুরাগ, চিত্তের অসীম ঔদার্য ও বিনয় এবং সুদৃঢ় চারিত্রিক সততা ও একাগ্রতায় বিদ্যাসাগর দুর্লভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রবন্ধও এক বিরলগোচর পরিশুদ্ধ পরিচ্ছন্নতায় সমৃদ্ধ হইয়াছে।

বিধবা বিবাহ বিষয়ক বিতর্কবহুল প্রবন্ধ গ্রন্থের ন্যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার' নামক দুইটি প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকদ্বয়েও বিদ্যাসাগরের সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল চিন্তা, শাস্ত্র-জ্ঞানানুশীলিত গভীর প্রজ্ঞা এবং স্বাধীন যুক্তি-বিচারের প্রতি একাগ্র নিষ্ঠার পরিচয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাস্তববাদী সমাজ-সচেতন লেখক ছিলেন। বাংলাদেশে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বহুল প্রচলিত বহুবিবাহ প্রথা বাংলার সামাজিক জীবন কি ভাবে পঙ্গু ও ক্ষয়গ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে, সেই সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল এবং এই নিষ্ঠুর পাশবিক কৌলিন্য প্রথা যে শাস্ত্রানুমত ও ধর্মানুগত কোন প্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠান নহে, তাহা শাস্ত্র-শাসিত, অনুশাসনসর্বস্ব হিন্দু সমাজে তিনি শাস্ত্রসম্মত যুক্তি সহকারে সর্বপ্রথম প্রমাণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার লিখিত 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' গ্রন্থটি অধিকতর কার্যকরী হইয়াছিল) বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তকে বিদ্যাসাগর প্রধানতঃ বহুবিবাহ নিরোধ সম্পর্কে যে সকল বিরুদ্ধ মত উত্থাপিত হওয়া সম্ভব, তাহাদের নিরাকরণকল্পে শাস্ত্রসম্মত যুক্তিসমূহ যথাযথভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধে জাতির এই নিন্দিত প্রথা দ্বারা সমাজ জীবন ক্রমান্বয়ে যেভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত ও কলুষিত হইতেছে, তাহার প্রমাণ স্বরূপে বহু অনাচার ও ব্যভিচারমূলক সত্য ঘটনাও বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর বহুবিবাহকারী ব্যক্তিদিগের একটি তালিকা পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার এই তথ্যভিত্তিক রচনাটিকে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। কৌলিন্য প্রথা এবং দেবীবর ঘটকের মেল বন্ধনের ফলে তখন হিন্দু সমাজে নারী নির্যাতন অধিকতর চরম পর্যায়ে উপনীত হইয়াছিল। এই সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল—

'কুলীন ভগিনী ও কুলীন ভাগিনেয়ীদের বড় দুর্গতি। তাহাদিগকে, পিত্রালয়ে অথবা মাতুলালয়ে থাকিয়া, পাচিকা ও পরিচারিকা উভয়ের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়। * * * প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ, রাত্রিতে নিদ্রাগমন, এ উভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী দীর্ঘকাল, উৎকট পরিশ্রম সহকারে সংসারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াও, তাঁহারা সুশীলা ভ্রাতৃভার্য্যাদের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহাদের উপর খড়্গহস্ত। তাঁহাদের অশ্রুপাতের বিশ্রাম নাই বলিলে, বোধহয়, অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না। * * * উত্তর সাধকের সংযোগ ঘটিলে, অনেকানেক বয়স্থা কুলীন মহিলা ও কুলীন দুহিতা, যন্ত্রণাময় পিত্রালয় ও মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া, বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করেন।

ফলতঃ কুলীন মহিলা ও কুলীন তনয়াদিগের যন্ত্রণার পরিসীমা নাই। * * * তাঁহাদের যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, এবং যে হেতুতে

তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত দুঃসহ ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যজাতির উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে।'[১]

বিদ্যাসাগর এই কুপ্রথাশ্রিত সামাজিক চিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া স্বয়ং বেদনাবিহ্বল হইয়া পড়িলেও তাঁহার বক্তব্যের মধ্যে কেবল আবেগোচ্ছ্বাসই প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার প্রবন্ধে কুলীন মহিলাদিগের প্রতি গভীর মর্মবেদনা অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের জীবনের পশ্চাতে যে নির্মম সামাজিক বিধানের অযৌক্তিকতা, তাহাও তিনি অত্যন্ত সততার সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বিচার-বিতর্কমূলক প্রবন্ধে তথ্য সমাবেশের বাহুল্য যদিও প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজন হয়, তথাপি তাহাই একান্তভাবে প্রধান হইয়া উঠিলে প্রবন্ধ নিছক নীরস তথ্যপঞ্জীতে পরিণতি লাভ করে, তাহা সাহিত্যস্বাদী হয় না। বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধে বিবিধ তথ্য সমাবেশের অন্তরালে তাঁহার সহবেদনা-কাতর হৃদয়ের সুগভীর আর্তি প্রকাশ পাইয়াছে। অবহেলিত মানবতার প্রতি বিদ্যাসাগরের আবেগচঞ্চল হৃদয়ের অনাবৃত প্রকাশে নীরস তথ্য প্রতিপাদক প্রবন্ধও স্বতঃস্ফূর্ত শিল্প-রসে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার পরে বিরুদ্ধবাদিগণ বিভিন্ন ভাবে তাঁহার আলোচনার বিরোধিতা করেন। প্রতি-পক্ষের প্রতিবাদের উত্তর স্বরূপে বিদ্যাসাগর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' নামক তাঁহার এই পূর্ববর্তী গ্রন্থেরই শিরোনামে 'দ্বিতীয় পুস্তক' প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে বিদ্যাসাগর 'দক্ষসংহিতা', 'মনুসংহিতা', 'বিষ্ণু-সংহিতা' 'নারদসংহিতা' প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে গৃহীত বিভিন্ন উদ্ধৃতির স্পষ্টতম ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং প্রতিপক্ষ প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক মত বা যুক্তি খণ্ডন করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম শাস্ত্র-বিচার নৈপুণ্যের পরিচয় দান করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের এই দীর্ঘ রচনাটি আনুপূর্বিক শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় সমাচ্ছন্ন হইলেও মধ্যে মধ্যে লেখকের চাতুর্যময় অথচ সংযত পরিহাসরসিকতায় উপভোগ্য হইয়াছে।

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সামাজিক কু-প্রথা বিষয়ক অপর একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ 'বাল্যবিবাহের দোষ') এই প্রবন্ধটি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক 'সর্ব্বশুভকরী' পত্রিকায়

১ 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১ম), বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী [সমাজ], (কলিকাতা, ১৩৪৫), পৃঃ ২২৪

প্রথম প্রকাশিত হয়—গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়া ইহা স্বতন্ত্রভাবে প্রচার লাভ করে নাই। বিদ্যাসাগর তাঁহার রচনায় বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বাল্যবিবাহের বহুবিধ ত্রুটি ও অপকারিতার উল্লেখ করিয়াছেন। আত্মশক্তিতে দৃঢ়নির্ভর এই আলোচনা-ভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধটি বিদ্যাসাগরের অন্যান্য সামাজিক সংস্কার বিষয়ক প্রবন্ধের ন্যায় সমভাবে উল্লেখযোগ্য।

(সামাজিক কু-প্রথামূলক প্রবন্ধ ব্যতীত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়া লিখিত বহু ক্ষুদ্র নীতিগর্ভ প্রবন্ধেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এই জাতীয় প্রবন্ধের অধিকাংশই তাঁহার বিভিন্ন শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'জীবন চরিত' (১৮৪৯), 'বোধোদয়' (১৮৫১), 'চরিতাবলী' (১৮৫৬) প্রভৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধ রচনার পশ্চাতে বিদ্যাসাগরের তরলমতি শিশুদের বোধোপযোগিতার প্রতি একান্তভাবে লক্ষ্য ছিল এবং তাহারই ফলে, উক্ত রচনা-সমূহের বিষয় ও বিন্যাস-রীতিতে তাঁহার পরিণত চিন্তা ও রচনা-শক্তির কোনরূপ পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই।)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে মুখ্যতঃ ধর্ম বা তত্ত্ববিষয়ক বাদ-বিতণ্ডাপ্রধান প্রবন্ধই অধিকতর পরিমাণে লিখিত হইয়াছে। একমাত্র রাজা রামমোহন রায় ধর্ম বা তত্ত্ব বিষয়ক রচনা ব্যতীত সামাজিক কু-প্রথামূলক বিষয় অবলম্বন করিয়াও কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহমরণ-প্রথা বিষয়ক বিচার-বিতর্কবহুল প্রবন্ধগুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগরেরর সমাজ-সংস্কারমূলক বিচার-বিতর্কপ্রধান রচনাগুলিতে রামমোহনের আলোচনা-পদ্ধতির সাদৃশ্য অধিকতর লক্ষ্য করা যায়। ইংরাজীতে এই জাতীয় রচনাই 'Dissertation' নামে পরিচিত।

রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উভয় কৃতবিদ্য লেখকেরই প্রবন্ধগত ভাব বা বিষয় বিশেষভাবে শাস্ত্রসম্মত যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুক্তি ও তথ্যের নিপুণ সমাবেশে উভয়ের রচনাই সবিশেষ মূল্যবান্ ও স্ব স্ব মহিমান্বিত বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। রামমোহনের পূর্বে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনার কোন প্রকার আদর্শ ছিল না এবং বাংলা গদ্য-ভাষাও তৎকালে গুরুত্বপূর্ণ ভাব বা বিষয় প্রকাশের উপযুক্ত বাহন হইয়া উঠে নাই। রামমোহন তাঁহার রচনায় প্রধানতঃ নিজস্ব রীতিতে নিছক যুক্তিধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং ফলে, তাঁহার প্রবন্ধ প্রধানতঃ নীরস ও বিবৃতি-

সর্বস্ব হইয়াছে। ভাষা বা আঙ্গিকগত সৌষ্ঠব ও সুদৃঢ়তা রামমোহনের রচনায় লক্ষ্য করা যায় না এবং তাহা সম্ভবও ছিল না। রামমোহনের তুলনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ছিল এবং তিনি অধিকতর অনুকূল পরিবেশেরও সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার সম্মুখে রামমোহন প্রমুখ লেখকবর্গের রচনার একটি আদর্শ (Model) ছিল ও বাংলা ভাষাও ব্যবহারোপযোগী প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিল। রামমোহনের ন্যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও তাঁহার প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে মুখ্যতঃ সামাজিক সমস্যামূলক বিষয় নির্বাচন করিয়াছিলেন এবং রামমোহনের আলোচনা-পদ্ধতির ন্যায় নিজস্ব বক্তব্য প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি শাস্ত্রনির্ভর যুক্তিসমূহের অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু রামমোহনের সহিত তাঁহার পার্থক্য এই যে, বিদ্যাসাগর মূলতঃ হৃদয়ধর্মী আবেগপ্রবণ লেখক ছিলেন এবং তিনি রচনায় শাস্ত্রসম্মত যুক্তি গ্রহণ করিলেও তাহাই কেবল একমাত্র অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন নাই। যুক্তিধর্মের সহিত হৃদয়ধর্মের সংযোগ ঘটায় রামমোহন অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত সরস ও আবেগ মণ্ডিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষাগত মণ্ডন-শিল্পেও অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন এবং সেই কারণে, রামমোহন অপেক্ষা তাঁহার প্রবন্ধের ভাষায় যথার্থ শিল্প-সুষমা অধিকতর পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছে।

'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মচরিতাশ্রিত একটি সংক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত প্রবন্ধ পুস্তিকা। ইহা তাঁহার অসম্পূর্ণ রচনা। বিদ্যাসাগর মাত্র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ইহার রচনা-কর্ম নির্বাহ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সংবলিত এই পুস্তিকাটি বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এই অনতিদীর্ঘ, অসম্পূর্ণ আত্মচরিতমূলক রচনার ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি ও রচনা-কৌশল বিদ্যাসাগরের পরিণত লেখনী-শক্তির স্বাক্ষর বহন করে। গ্রন্থের দুই পরিচ্ছেদে বিদ্যাসাগরের আত্মকথার অতি সামান্য অংশই বিবৃত হইয়াছে—আত্মকথা অপেক্ষা তিনি তাঁহার পিতৃমাতৃকুলেরই বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর তাঁহার পূর্ববর্তী বংশধরগণের ত্যাগ, দৃঢ়তা, ঔদার্য, সদাচার প্রভৃতি গুণাবলীর পরিচয় বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে অতি সরসভাবে প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিজের চারিত্রিক সততা বা মহত্ত্বের ভিত্তিমূলে এই সকল কৃতী পূর্বপুরুষগণের গভীর প্রভাব কিরূপ কার্যকরী হইয়াছিল, তাহা এই আত্মকথায় বিবৃত পরিচয় হইতে

সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। বিদ্যাসাগর অতি অল্প কথায় সুষ্ঠুভাবে এক একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের রেখা-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহার পিতামহদেবের চরিত্র-পরিচিতি হইতে বিদ্যাসাগরের চরিত্র চিত্রণ-কর্মে অপূর্ব দক্ষতা প্রমাণিত হয়।) পিতামহদেবের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন—

'তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি, কখনও কোন বিষয়ে অযথা নির্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন, আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান, ধনবান্, ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।'[১]

বিদ্যাসাগর তাঁহার পিতামহদেবের চরিত্র-চিত্র ব্যতীত পিতৃদেব, মাতৃদেবী ও তাঁহার আশ্রয়দাত্রী রাইমণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও অতি সংক্ষেপে অথচ সার্থকভাবে প্রদান করিয়াছেন। রাইমণির স্নেহপ্রবণ মাতৃহৃদয়ের মহত্ত্ব বিদ্যাসাগর অতি সামান্য রেখাপাতেই পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। শৈশবকালীন দরিদ্র অবস্থায় রাইমণির ন্যায় মহীয়সী নারীর দরদী প্রাণের কোমল স্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে পরবর্তী কালে নারীজাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিশীল হইয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বিদ্যাসাগরের নিজস্ব চরিত্র-গঠনে এই জাতীয় বিভিন্ন নারী ও পুরুষের সক্রিয় প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং বিদ্যাসাগরের আত্মচরিত গ্রন্থের এই দুই পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়া মুখ্যতঃ ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাঁহার আত্মচরিতের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে, রচনার সর্বত্র একটি পরিহাসসরস নির্মল প্রসন্নতা ও স্নিগ্ধ গম্ভীর মাধুর্য বর্তমান।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৯২) তাঁহার শেষ জীবনের একটি শোকব্যঞ্জক মৌলিক রচনা। ইহা সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর তাঁহার অন্যতম সুহৃৎ রাজকৃষ্ণ

১ 'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)', বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী [সাহিত্য], (কলিকাতা, ১৩৪৪), পৃঃ ৪৬৮

বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের শিশুকন্যা প্রভাবতীকে অপত্যনির্বিশেষে ভালবাসিতেন। শিশু প্রভাবতীর অকাল বিয়োগ ঘটিলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছিলেন এবং এই নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক শিশুকন্যা প্রভাবতীর স্মরণে বিদ্যাসাগরের শোকোচ্ছ্বাসই 'প্রভাবতী সম্ভাষণে' প্রকাশ পাইয়াছে। শেষ জীবনে বিদ্যাসাগর মানুষের প্রবঞ্চনা, দুর্নীতি ও অনাচারে অতিষ্ঠ হইয়া মানুষের প্রতি অবিশ্বাসী ও অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিরঞ্জন, সরলপ্রাণ শিশুই তাঁহার শেষ জীবনে একমাত্র সান্ত্বনার আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। প্রভাবতীকে উপলক্ষ্য করিয়া বিদ্যাসাগর তাঁহার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের মর্মরহস্যই ইহাতে অধিকতর উন্মোচন করিয়াছেন। শোকাহত প্রাণের দৌর্বল্যে লিখিত বিদ্যাসাগরের এই শোকোচ্ছ্বাসমূলক রচনায় গীতিধর্মের লক্ষণই সুপরিস্ফুট হইয়াছে, প্রবন্ধের সংহত গুণ ইহাতে বিকাশ-লাভের সুযোগ পায় নাই। অতএব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখিত 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' নামক রচনাটিকে প্রবন্ধ অপেক্ষা করুণ রসাত্মক গদ্য-কাব্য আখ্যা দেওয়াই অধিকতর সঙ্গত।

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধ পর্যালোচনা করিয়া এ'কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধকার রূপেও তাঁহার একটি স্বতন্ত্র পরিচয় আছে এবং বাংলা বিতর্কমূলক প্রবন্ধের ভাষারূপের মধ্যে যে বলিষ্ঠ সাহিত্যিক সম্ভাবনা রহিয়াছে, বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধ হইতেই তাহা সর্বপ্রথম প্রমাণিত হইয়াছে।)

তৃতীয় অধ্যায়

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুভ্রকান্তি হিমালয়ের ন্যায় ধ্যানগম্ভীর, ভাব-সমাহিত পুরুষ ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অধ্যাত্মযোগযুক্ত, ব্রহ্মাভিমুখী এই সাধু পুরুষ তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধন-বৈশিষ্ট্যের জন্যই দেশবাসীর নিকট অধিকতর সুপরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু সৌন্দর্য-সাধক, সাহিত্যবোদ্ধা এবং সুরসিক প্রবন্ধকার হিসাবেও দেবেন্দ্রনাথের অতিরিক্ত একটি পরিচয় আছে। দেবেন্দ্রনাথ যে কেবলমাত্র ব্রাহ্ম সমাজেরই একজন বিশিষ্ট নেতা ও আচার্য ছিলেন তাহাই নহে, সে-যুগের সাহিত্য-সাধকগণেরও তিনি অন্যতম পরিচালক ও পরিপোষক ছিলেন। তাঁহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনপ্রিয় বহুখ্যাত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'রও তিনি প্রবর্তক ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে কেন্দ্র করিয়া সেই সময়ে একটি শক্তিশালী লেখক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী সাহিত্যগোষ্ঠীরই সার্থক লেখকদ্বয় হইলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই দুইজন তীক্ষ্ণধী লেখকের গ্রন্থাদি দেবেন্দ্রনাথ লিখিত গ্রন্থের পূর্বে প্রকাশিত হইলেও তাঁহাদের রচনার উপর দেবেন্দ্র নাথের প্রেরণা ও প্রভাব বহুল পরিমাণে কার্যকরী হইয়াছিল। সৃজ্যমান নবীন বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহিত্যকৃতিও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় না।

সংযত ধর্ম-প্রবর্তক হইলেও দেবেন্দ্রনাথ একটি সুপরিণত কবি-মনের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার সৌন্দর্যোপলব্ধি ও সাহিত্যবোধ এরূপ প্রখর ছিল যে, তিনি যদি একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র সাহিত্যচর্চা করিতেন, তাহা হইলে সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের মর্যাদা লাভ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না।) কারণ, ব্রাহ্ম সমাজে বিবৃত দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশনামা ও ব্যাখ্যানসমূহ এবং তাঁহার অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী রচনার মধ্যে যে সুমার্জিত ভাষা, সংযত ভাব ও মুক্ত-শুদ্ধ রস-রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই জাতীয় ধারণা অমূলক নহে। বাংলা গদ্যের সর্বোৎকৃষ্ট রচনারীতির অনুসন্ধান-কর্মেও তিনি অন্যতম

উৎসাহী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের ভাষা ও রচনা-পদ্ধতির অন্তর্নিহিত শক্তি অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধতা এবং সুসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'নূতন ইংরেজি শিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গভাষাকে বহু যত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন'।[১]

দেবেন্দ্রনাথের রচনার সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় সাধন হইলে রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত মন্তব্যের সার্থকতা উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে।

আত্মজীবনচরিত ব্যতীত দেবেন্দ্রনাথের সর্ববিধ রচনাই ব্রাহ্মধর্মের বিবিধ প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজে প্রধান আচার্যের আসন হইতে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম বা তত্ত্ব প্রসঙ্গে নিজস্ব অনুভূতিসঞ্জাত বা চিন্তাপ্রসূত যে সমুদয় বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ সাহিত্য সম্পর্কিত কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করেন নাই এবং এই জাতীয় রচনার কোন প্রয়াসও তাঁহার ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজে বিবৃত তাঁহার ধর্ম বা তত্ত্ব বিষয়ক বক্তৃতা ও উপদেশাবলীর মধ্যে সাহিত্য-রসের অভাব নাই। ধর্মীয় প্রসঙ্গ ক্রমসংবদ্ধভাবে ব্যাখ্যাত হইলেও ইহার মধ্য দিয়া তাঁহার মনোজ্ঞ কল্পনা ও স্বতঃস্ফূর্তদীপ্ত রচনাভঙ্গিজাত মাধুর্যের আস্বাদ লাভ করা যায়। দেবেন্দ্রনাথ বিবৃত ব্যাখ্যানসমূহ ধর্ম বা তত্ত্ব সংক্রান্ত মূল্যবান্ প্রবন্ধের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের বিবৃত ধর্ম ব্যাখ্যাসমূহ তাঁহার বিভিন্ন অনুরাগী ব্যক্তিগণের দ্বারা অনুলিখিত হইলেও মুদ্রণের পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ এই সকল রচনা সুষ্ঠুভাবে পরিমার্জন বা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং ফলে, ধর্ম বিষয়ক রচনার কোথাও তাঁহার সুললিত ভাষা-মাধুর্য বা ভাব-গাম্ভীর্য অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্ম বা তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থসমূহ যথাক্রমে : ১। 'ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ' (১৮৫১-৫২), ২। 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' (১৮৫২), ৩। 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস' (১৮৬০), ৪। 'কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা' (১৮৬২), ৫। 'মাসিক ব্রাহ্ম সমাজের উপদেশ' (১৮৬০-৬৭), ৬। 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' (১ম প্রকরণ, ১৮৬১, ২য় প্রকরণ, ১৮৬৬, ব্যাখ্যানের পরিশিষ্ট, ১৮৮৫) ৭। 'জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি' (১৮৯৩ ও ৮। 'পরলোক ও মুক্তি' (১৮৯৫)। দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম বা তত্ত্ব

১ 'চারিত্রপূজা', (বিশ্বভারতী, ১৩৬১), পৃঃ ৮৭

বিষয়ক রচনাসমূহের মধ্যে 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' (১ম ও ২য় প্রকরণ—পরিশিষ্ট সহ) নামক গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটি দেবেন্দ্রনাথের কেবলমাত্র ধর্মতত্ত্ব বা নীতিধর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ বা ধর্মচিন্তাপ্রসূত মীমাংসামূলক কোন রচনা নহে— ইহা তাঁহার সত্যসাধনার গম্ভীর উপলব্ধির ঐকান্তিকতায় এক অপরূপ ধর্ম-ভাষ্য হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে ধর্ম বা তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ দেবেন্দ্রনাথের পূর্বে রামমোহন রায়, ব্রজমোহন মজুমদার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকগণ রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই রচনায় ভাবানুভূতি অপেক্ষা যুক্তিবোধেরই অধিক প্রাধান্য ছিল। সেইহেতু, তাঁহাদের প্রবন্ধে যে'রূপ সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ও শাস্ত্রীয় যুক্তি-তর্ক ছিল, সেই অনুপাতে তাহাতে রস-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের এই জাতীয় প্রবন্ধে নীরস তত্ত্ব বা তথ্যই একমাত্র মুখ্য হইয়া পরিবেশিত হয় নাই। তাঁহার সহজাত সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পিসুলভ রসচেতনা অনুপ্রবিষ্ট হইবার ফলে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মীয় প্রবন্ধসমূহ নিছক তত্ত্বগন্ধী হয় নাই, বরং স্থানে স্থানে সাহিত্য পদবাচ্য হইয়া উঠিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী প্রবন্ধকারগণ ধর্ম বা তত্ত্ব বিষয়ে বিরুদ্ধমত খণ্ডনকল্পে কেবলমাত্র স্থির আত্মবিশ্বাস ও আবেগ-অনুভূতি নিরপেক্ষ শাস্ত্র-বিদ্যার উপর অধিকতর নির্ভর করিয়াছেন এবং ফলে, স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাদের প্রবন্ধ নীরস তত্ত্ব বা তথ্য প্রতিপাদক রচনায় পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম বা তত্ত্ব সম্পর্কিত কোন আলোচনা বা মীমাংসায় কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় মহাবাক্যের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন না। তাঁহার ভাব-সমাহিত চিত্তের বিদ্যুৎ-স্পর্শে ধর্ম বা তত্ত্বকথাও রস-নিষিক্ত সাহিত্যগুণ অর্জন করিয়াছে। ধর্ম বা তত্ত্বালোচনায় দেবেন্দ্রনাথ শুদ্ধ অন্তরের সার্বিক প্রস্তুতিকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়াছেন। সংশয়যুক্ত শাস্ত্রজ্ঞান লইয়া ধর্মালোচনায় অবতীর্ণ হওয়া নিরর্থক। তাঁহার মতে, সংশয়মুক্ত জ্ঞান অর্জন করা তখনই সম্ভব, যখন হৃদয় একান্তভাবে পূতস্নিগ্ধ হইবে। পূতস্নিগ্ধ চিত্তে ধ্যাননেত্র দ্বারা পরমেশ্বর দর্শন করিয়া যে অনুভূতি ব্যক্তিহৃদয়ে জাগ্রত হইবে ও সেই লব্ধ অনুভূতির সহিত শাস্ত্র-নির্গলিত যে সকল বাক্যসমূহের সহজ একাত্মতা অনুভূত হইবে, দেবেন্দ্রনাথের মতে, তাহাই ধর্মালোচনায় একমাত্র প্রামাণ্য বাক্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'ই প্রকৃত ব্রহ্মের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র—এই বক্তব্যই দেবেন্দ্রনাথের রচনায় প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এই স্বতন্ত্র অনুভূতি বা

সুমহান্ ব্যক্তিত্বগুণের জন্যই ধর্ম বা তত্ত্বালোচনায় পূর্ববর্ত্তী প্রবন্ধকারগণ হইতে দেবেন্দ্রনাথের রচনার মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

দেবেন্দ্রনাথ প্রণীত 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে' হৃদয়ধর্মের সহিত তাঁহার ঈশ্বরবাদের অন্তরঙ্গ যোগের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তব্য বিষয় ষোলটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করিয়া বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের নূতনতর ব্যাখ্যায় আলোচনাটি অধিকতর মূল্যবান হইয়া উঠিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার হৃদয়ে অনুভূত পরমেশ্বর প্রেরিত সত্যের ভিত্তিতেই আনুপূর্বিক ধর্ম-ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইহাই তাঁহার ধর্মীয় আলোচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ'কথা স্বীকার্য যে, গভীর সত্যানুভূতির স্পর্শেই দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম বা তত্ত্বাশ্রিত প্রবন্ধ সরস ও প্রসাদগুণে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

রামমোহন প্রচারিত 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম'কেই দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব ধর্মমতানুসারে অংশত পরিবর্তন করিয়া 'ব্রাহ্মধর্মে'র নূতন কলেবর দান করিয়াছেন। ব্রহ্মোপাসনাকে মানবজীবনের সর্ববিধ কর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সাধারণের গ্রহণোপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ-বেদান্তের সার-সত্যের সহিত পশ্চিমের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের মৌলিক উপাদানসমূহের সার্থক সমন্বয় সাধন করিয়া একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সজীব ধর্ম গড়িয়া তুলিয়াছেন। ধর্ম বা তত্ত্ব বিষয়ক তাঁহার প্রায় সকল প্রবন্ধেই দেবেন্দ্রনাথ আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত মত অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের অভেদ এবং সগুণ ব্রহ্মের অতিরিক্ত এক নির্গুণ ব্রহ্মরূপ অস্বীকার করিয়া নিজস্ব প্রত্যয়সিদ্ধ ধর্মমতই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের সহিত উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া ইহাকেই ব্রাহ্মধর্মের সার-স্বরূপ হিসাবে প্রতিপন্ন করিতে অধিকতর প্রয়াস পাইয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার রচনায় প্রতিপাদ্য বিষয়ের সুষ্ঠু মীমাংসা বা প্রতিষ্ঠার জন্য হৃদয়ানুভূতিজাত নিছক ভাবাবেগের দ্বারাই পরিচালিত হন নাই—প্রসঙ্গ ও প্রয়োজনবোধে যুক্তি-তর্কের তীক্ষ্ণ চাতুর্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' নামক দার্শনিক প্রবন্ধ গ্রন্থে শঙ্কর বেদান্ত-দর্শন প্রতিপাদিত মতবাদ খণ্ডন করিয়া একদিকে যেমন জড় ও জীবাত্মার দ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তেমনি জড় ও জীবাত্মার বহুত্ব স্বীকার করিয়া এই উভয় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরমাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। জীবাত্মা সকলের সমষ্টি যে পরমাত্মা নহে, এই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যুক্তিনির্ভর

দার্শনিক আলোচনা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'যদি পরমাত্মাকে কেবল জীবাত্মা সকলের সমষ্টি করিয়া বলা যায়, তবে জীবাত্মা সকল ভিন্ন আর পরমাত্মা নাই এই বলা হয়। যেমন পার্থিব পরমাণু-পুঞ্জকে পৃথিবী বলা যায় তেমনি যদি জীবাত্মাপুঞ্জকেই পরমাত্মারূপে কেবল স্বীকার করা যায়, তবে পার্থিব পরমাণু ভিন্ন যেমন পৃথিবীর পৃথক্ সত্তা নাই তদ্রূপ জীবাত্মা সকল ভিন্ন যে আর পরমাত্মার পৃথক্ সত্তা নাই, এই বলা হয়।'[১]

এবংবিধ মত বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া তাহার পরেই দেবেন্দ্রনাথ এক ও বহুর চিরন্তন দ্বন্দ্বের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন—

'অনেক বস্তু কখন এক হইতে পারে না এবং এক বস্তুও কখন অনেক হইতে পারে না।'[২]

তিনি এই দ্বৈতমত বা সিদ্ধান্ত পরবর্তী কালে পরিবর্তন করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাস ও মতবাদ তাঁহার ধর্ম-জীবনের প্রথম পর্বে যেরূপ অস্ফুট ও অপরিণত ছিল, তাহা তিনি পরবর্তী জীবনে সুস্পষ্ট ও সুপরিণত করিয়া তুলিয়াছেন এবং ধর্ম বা তত্ত্বের কোন কোন অংশ পরিমার্জন ও সংশোধন করিয়া তাহার নূতন আকৃতি দান করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের বিভিন্ন ধর্ম বা তত্ত্বাশ্রিত প্রবন্ধ গ্রন্থে তাহার বহুল প্রমাণ উল্লেখ করা যায়।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে অনন্ত ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা দেবেন্দ্রনাথ স্বীকার করিলেও এই দৃঢ় বিশ্বাস পরবর্তী কালে তাঁহার 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' গ্রন্থের ধর্মীয় আলোচনায় অধিকতর শিথিল করিয়াছেন এবং শেষে 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' গ্রন্থে বিবিধ ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জীবাত্মা ও পরমাত্মার আত্যন্তিক ভেদ দেবেন্দ্রনাথের মন হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। পরমেশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'সমুদয় জগতে তাঁহার (পরমাত্মা) প্রতিরূপ; কিন্তু আত্মাতেই তাঁহার রূপ দেখা যায়। সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে, মানুষের মুখশ্রীতে, ধার্ম্মিকের কল্যাণতর অনুষ্ঠানে,

১ 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা', (কলিকাতা, ১৭৮৪ শকাব্দ), পৃঃ ৪৬

২ ঐ, পৃঃ ৪৭

তাঁহার ভাবের প্রতিরূপ মাত্র দেখা যায়। আত্মাতেই তাঁহার সাক্ষাৎ রূপ বিরাজ করিতেছে। সেখানেই তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। সেখানে তিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহার প্রতিরূপ সকল স্থানে। মাতার স্নেহ, ভ্রাতার সৌহার্দ্দ, পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেম এ সকলই তাঁহার প্রতিরূপ, আত্মাতেই তাঁহার রূপ প্রকাশ পাইতেছে। সেই "হিরন্ময়ে পরে কোষে" তিনি সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন। সেই সত্য-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, অমৃত-স্বরূপ—সেখানে প্রকাশিত হইতেছেন। জগৎ সংসার তাঁহার বিমল নিরবয়ব সুন্দর মূর্ত্তি অন্তরে যেমন প্রকাশ পাইতেছে, এমন আর কোন স্থানেই নয়।'[1]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্মপ্রাণ হৃদয়ের আকুতিতে ধর্মীয় বা তাত্ত্বিক আলোচনাও সরস ও সহজবোধ্য বাণীরূপ লাভ করিয়াছে।

নিসর্গ সৌন্দর্য ও ভগবৎ প্রেম দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ঈশ্বরের সুমহান্ প্রেমই যে বিবিধভাবে অনন্ত সৌন্দর্যের আশীষধারা পৃথিবীতে বর্ষণ করিতেছে, ইহাই মুক্তকণ্ঠে দেবেন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার বিবিধ রচনার মধ্য দিয়া পরমেশ্বরের অনন্ত মহিমাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এ'কথা সত্য যে, দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধই তাঁহার আধ্যাত্মিক চেতনার মূল উৎস। তাঁহার আধ্যাত্মমূলক রচনা সহজাত সৌন্দর্যরসে নিষিক্ত হইয়া সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে জনৈক সুরসিক সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

'সৌন্দর্য্যবোধ হইতেই তাঁহার আধ্যাত্মিকবোধের প্রেরণা আসিয়াছিল বলিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনাও এমনই ভাবে রস-শিল্পের নিপুণ স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।'[2]

দেবেন্দ্রনাথের সহজাত কবি-মন তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে সর্বক্ষণই সক্রিয় ও রসসিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। অধ্যাত্মযোগযুক্ত ঋষি-দৃষ্টি দ্বারা তিনি কখনও দৃশ্যমান জগৎকে অগ্রাহ্য করিয়া অতীন্দ্রিয় অরূপলোকে কাল্পনিক বিহারে

১ 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান', ১ম প্রকরণ, (কলিকাতা, ১৭৮৩ শকাব্দ), পৃঃ ১৮-১৯

২ আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলা সাহিত্য' (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৫৩), পৃঃ ৫৭৬

নিমগ্ন হন নাই। দেবেন্দ্রনাথ মর্ত্যলোকেরই সৌন্দর্যসাগরে অবগাহন করিয়া তাঁহার ধর্ম-পিপাসা নিবৃত্ত করিয়াছেন। বিশ্বসৌন্দর্য ও বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর তাঁহার নিকট কখনও পরস্পর পৃথক্ সত্তা লইয়া আবির্ভূত হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'তিনি (ঈশ্বর) শোভার আকর, সৌন্দর্য্যের সাগর। সকলেই তাঁহার সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছে; তাঁহার প্রভাবে প্রভাকর প্রভা দিতেছে—সুধাকর সুধা বর্ষণ করিতেছে—বিদ্যুৎ মেঘের অন্ধকার মধ্যে আলোক দিতেছে। তিনি এই জগতের জীবন ও আলোক। তাঁহাকে যদি আমরা না দেখিতে পাইতাম, তবে সকলি প্রভাহীন মলিন হইয়া থাকিত; নক্ষত্র-তারা-খচিত অনন্ত আকাশও শোভাশূন্য হইত। তিনি বিনা এই জগৎ সংসার শূন্যগৃহ,—শূন্য গৃহের শোভা কোথায়? সেই প্রকার আমারদের হৃদয়। তিনি বিনা এ হৃদয়, শূন্য হৃদয়। হৃদয় যদি তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ না থাকে, তবে সে শুষ্ক হৃদয় লইয়া কি হইবে?'[১]

ভাবের মহত্ত্ব বা গুরুত্ব অনুযায়ী ভাষা-প্রয়োগের ক্ষেত্রেও দেবেন্দ্রনাথের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কঠিন ধর্ম বা তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও বর্ণনায় দেবেন্দ্রনাথের গদ্য-ভাষা কখনও দুর্বোধ্যতা দোষে দুষ্ট হয় নাই। তাঁহার ভাষা যেমন সহজ, তেমনি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সুনিবিড় ধর্মানুভূতির স্নিগ্ধ রসে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষাকেও অধিকতর সাবলীল ও সরস করিয়া তুলিয়াছেন। যদিও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির ভক্তি-গাঢ় রসোচ্ছ্বাসের ফলে কোন কোন দুরূহ ধর্ম বা তত্ত্ব প্রসঙ্গের বিচার-বিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়াছে, তথাপি এ'কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ভাষা ও রচনারীতির স্বাভাবিক সারল্যে ও লেখকের ঐকান্তিক ধর্মপ্রাণতায় 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' গ্রন্থের প্রতিটি ব্যাখ্যাই অপূর্ব শিল্প-সার্থক রূপ লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থটিকে দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম বা তত্ত্ব বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' গ্রন্থ প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তীর সুচিন্তিত মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

'শুধু ধর্মতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্বের বিচার ও মীমাংসা নয়, একেবারে সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি; শুধু সম্যক্ দর্শন নয়, একেবারে সর্ব্বেন্দ্রিয় হৃদয় মন ও আত্মা সমস্ত দিয়া

১ 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান', ১ম প্রকরণ', (কলিকাতা, ১৭৮৩ শকাব্দ), পৃঃ ৯৪-৯৫

দর্শন ; শুধু একটি সমস্তার নিপুণ বিশ্লেষণ নয়, একেবারে অখণ্ড বোধের দ্বারা সকল সমস্তার চূড়ান্ত সমাধানের স্পষ্ট নিদর্শন।'[১]

দেবেন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ দার্শনিকতত্ত্বমূলক রচনা হিসাবে 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' এবং 'পরলোক ও মুক্তি' গ্রন্থদ্বয়ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' নামক গ্রন্থে তিনি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বা প্রকৃতি (Free Will) এবং বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বা ভাব যেমন বলিষ্ঠ চিন্তাপ্রসূত, ভাষাও তেমনি প্রাঞ্জল অথচ গম্ভীর। বেদ হইতেই ভারতের আদিমতম জাতির ইতিবৃত্ত সংকলন করা সম্ভব, প্রসঙ্গান্তরে দেবেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে সে-আলোচনারও সূত্রপাত করিয়াছেন। 'পরলোক ও মুক্তি' গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথ ধর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির জীবনের দুইটি প্রধান আবশ্যকীয় চিন্তা পরলোক ও মুক্তিতত্ত্ব সম্পর্কে তত্ত্ববহুল আলোচনা করিয়াছেন। এই রচনা মধ্যে তাঁহার গভীর ধর্মচিন্তাপ্রসূত যুক্তিনির্ভর অভিমতই সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে আত্মচরিতাশ্রিত ব্যক্তিগত প্রবন্ধ গ্রন্থ হিসাবে দেবেন্দ্রনাথের 'স্বরচিত জীবনচরিত' (১৮৯৮) একটি সার্থক ও সর্বজনোপভোগ্য রচনা। বাংলা ভাষায় যে অল্পসংখ্যক আত্মজীবনী লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। এই আত্মজীবনীর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার স্তর-পারম্পর্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত স্থূল জীবন-কথার সঙ্গে সূক্ষ্ম ধর্ম-কথার অপূর্ব-সুন্দর একীকরণ ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গভীর ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন-ভাষ্য রচনায় যে ভাব ও ভাষার আশ্রয় লইয়াছেন তাহার সুরও অতি উচ্চগ্রামে বাঁধা হইয়াছে।

জীবনচরিত ও আত্মজীবনী রচনার মধ্যে স্থূল সূক্ষ্ম বিবিধ পার্থক্য আছে। জীবনী-লেখক কোন মহৎ ব্যক্তি-পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া প্রধানতঃ সেই কালের ইতিবৃত্ত রচনা করেন ; কিন্তু আত্মচরিতকার মুখ্যতঃ নিজের অন্তর্নিহিত অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করিয়া সামগ্রিক জীবনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীর মধ্য দিয়া ধর্মোপলব্ধিজাত জীবনানুভূতির পরিচয়ই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

---

১ 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', (এলাহাবাদ, ১৯১৬), পৃঃ ৬৮৭

দেবেন্দ্রনাথ ৮৮ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্মজীবনীতে ৮ বৎসর হইতে ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত মাত্র ২৪ বৎসরের জীবন-বৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ ইহাতে তাঁহার বিশিষ্ট ধর্মজীবনের বিবিধ ঘটনাক্রম ও উত্তর ভারত ভ্রমণের বিচিত্র উপলব্ধির কথা বিবৃত করিয়াছেন। সাধারণ প্রথাসিদ্ধ আত্মজীবনী হইতে দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত ব্যাখ্যানের মধ্যে একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার আত্মকথা যেন ধ্যাননিমগ্ন সাধকের নিভৃত মনের সুগভীর আলাপন।

দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ভাবোপলব্ধি বাস্তব জীবনবোধের সহিত অবিমিশ্রভাবে জড়িত ছিল। জীবন ও জগত সম্পর্কে তাঁহার বিচিত্র কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার অন্ত ছিল না। তাঁহার ভাবগম্ভীর অনুভূতির সহিত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক সম্মিলনেই দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। দিদিমার প্রসঙ্গ লইয়া এক অভিনব সহজ ভঙ্গিতে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মকথার সূত্রপাত করিয়াছেন—

'দিদিমা আমাকে বড় ভালবাসিতেন। শৈশবে তাঁহাকে ব্যতীত আমিও আর কাহাকেও জানিতাম না। আমার শয়ন, উপবেশন, ভোজন, সকলই তাঁহার নিকট হইত। তিনি কালীঘাট যাইতেন, আমি তাঁহার সহিত যাইতাম। তিনি যখন আমাকে ফেলে জগন্নাথ ক্ষেত্রে ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন আমি বড়ই কাঁদিতাম।'[১]

অত্যন্ত সরস ঘরোয়া সুরে ও সহজ ভাষায় দেবেন্দ্রনাথকে অতি কাছের মানুষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহা দ্বারা ধর্মপ্রাণ মহর্ষির অসাধারণত্বের কোন দূর ব্যবধান অনুভব করা যায় না। তাঁহার ভাষা সহজাত ধর্মানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে অধিকতর প্রাণবন্ত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে এমন ঋজু প্রাঞ্জল ভাষা সেকালে অন্য কোন লেখকের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। ভাষার কারুকার্য ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের গভীর শিল্পবোধ বর্তমান ছিল। তাঁহার ভাব বা বিষয়ানুযায়ী ব্যবহৃত ভাষা-বৈচিত্র্য দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিতমূলক রচনার একটি বৈশিষ্ট্য যে, ইহার মধ্য দিয়া তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কোন

---

১ 'শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত', (কলিকাতা, ১৮৯৮), পৃঃ ১

রচনার মধ্য দিয়া লেখকের ব্যক্তি-পুরুষের স্বচ্ছ প্রতিবিম্বন বা আত্মসত্তার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ সাহিত্যের একটি দুর্লভ গুণ হিসাবে কীর্তিত হয় এবং সাধারণতঃ ইহাই সাহিত্যের 'স্টাইল'। এ'কথা অস্বীকার করা যায় না যে, বাংলা সাহিত্যে াথ একটি পরিণত বিশিষ্ট 'স্টাইলে'রও প্রবর্তনা করিয়াছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রণীত আত্মজীবনীর মধ্যে তাঁহার অন্তর্লোকের অদৃশ্য ধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার যেমন বহুল পরিচয় রহিয়াছে, তেমনি ইহাতে বহির্জগতের দৃশ্য রূপ-চিত্রেরও অভাব নাই। জগতের যে সকল বস্তু তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহারই মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ অনন্ত পরম পুরুষের গৌরবময় মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি যেমন সৌন্দর্যের মায়াঞ্জনে মণ্ডিত ছিল, তেমনি মনও ছিল গভীর কাব্য-রসধারায় সিক্ত। কাশী, আগ্রা, এলাহাবাদ, অমৃতসর, শিমলা প্রভৃতি দেশে ভ্রমণকালীন তথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায় দেবেন্দ্রনাথ অনন্যসাধারণ কবি-শক্তির পরিচয় দান করিয়াছেন। শিমলার পার্বত্য পরিবেশে অরণ্য-রূপের বর্ণনাটি কবিত্বের স্নিগ্ধ স্পর্শে এবং সরল সহজ চিত্তহারী ভাষায় অপূর্ব-সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'পর্ব্বতের গাত্রেতে বিবিধ প্রকারের তৃণলতাদি যে জন্মে তাহারই শোভা চমৎকার। তাহা হইতে যে কত জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ, সকল বর্ণেরই পুষ্প যথা তথা হইতে মনকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পুষ্প সকলের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য, তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্ত্তমান বোধ হইল।'[১]

দেবেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার ভাষাগত সারল্য ও সরসতা প্রকৃতই বিস্ময়কর তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমকালীন লেখক ছিলেন তৎকালীন বাংলা গদ্য-ভাষা প্রধানতঃ দীর্ঘ সমাসে ভারাক্রান্ত এবং পণ্ডিতজনোচিত দুরূহ শব্দগত জটিলতায় নীরস ও শিল্প-বর্জিত ছিল। বাংলা সাহিত্যে ভাবের গাম্ভীর্য অনুযায়ী ভাষাগত প্রাঞ্জলতা ও সরসতা সাধনে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথের কৃতিত্বও অস্বীকার করিবার নহে।

দেবেন্দ্রনাথের ভাষার নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁহার সূক্ষ্ম সাহিত্যবোধ বা সৌন্দর্যচেতনা সমসাময়িক অন্যান্য লেখকগণ হইতে তাঁহার ভাষায় একটি স্বতন্ত্র

১ 'শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত', (কলিকাতা, ১৮৯৮), পৃঃ ১৭৩

মহিমা দান করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের গদ্য রচনার বহু অংশ রবীন্দ্রনাথের গদ্য-ভাষাকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

এ'কথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের ভাষার রসমাধুর্য এবং বাক্য গ্রন্থন-পদ্ধতির মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য বর্তমান, তাহার মূলে দেবেন্দ্রনাথের ভাষার অমোঘ প্রভাবকে কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। বিষয় বা ভাব অনুযায়ী সার্থক শব্দ-নির্বাচন ও পদসমূহের পারস্পরিক ধ্বনি সামঞ্জস্য সাধন হেতু দেবেন্দ্রনাথের সমগ্র গদ্য-প্রবাহের মধ্যে একটি গীতিসুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ, প্রখর ব্যক্তিত্বের ন্যায় তাঁহার ভাষারও একটি রাজকীয় আভিজাত্য ছিল। তিনি যেমন প্রবল ভাবাবেগে বিহ্বল হইতেন, তেমনি তাহা শান্ত ও সংযত করিবার দুর্লভ ক্ষমতারও অধিকারী ছিলেন। ধর্ম বা তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে আবেগের আতিশয্যে দেবেন্দ্রনাথ যুক্তির বন্ধনকে কোথাও সম্পূর্ণ শিথিল করেন নাই। প্রবন্ধ রচনায় বিষয় বা ভাবের বলিষ্ঠতার সহিত ভাষার স্বচ্ছতা, দৃঢ়তা ও সরসতা প্রভৃতি গুণগুলির প্রত্যেকটি দেবেন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে বহু সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের প্রয়োগ এমন স্বাভাবিক ও যথাযথ ভাবে হইয়াছে যে, তাহা দ্বারা বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য বা মৌলিকতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথের ভাষা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

'ভাষাটি যেন অতি যত্নে কুঁদিয়া তোলা মর্ম্মর মূর্ত্তির মত।'[১]

দেবেন্দ্রনাথের বহুসংখ্যক সুলিখিত পত্র আছে। বিশেষতঃ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে লিখিত তাঁহার অধিকাংশ পত্র প্রবন্ধ-লক্ষণাক্রান্ত। এই পত্রাবলীর অংশ বিশেষে তিনি ধর্মীয় বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের পত্রসমূহ হইতে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হইলে ইহাদের এক একটিকে স্বতন্ত্র ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সার্থক পত্র-প্রবন্ধ রচনার পূর্বে দেবেন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট পত্রাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দেবেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও স্বতন্ত্র রচনারীতি বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশে যে উল্লেখযোগ্য সহায়তা করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

১ অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', (এলাহাবাদ, ১৯১৬), পৃঃ ৭৩৩

চতুর্থ অধ্যায়

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় ঐতিহ্য ও সাধনার মর্মবাণীকে অন্তরে গ্রহণ করিয়া যে সকল মনীষী আজীবন জাতীয় প্রগতিমূলক চিন্তা ও কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বের একজন বিশিষ্ট প্রবন্ধকার রূপেও খ্যাতি অর্জন করেন। আচারনিষ্ঠ, নিয়মানুগ ও সংযমী হিন্দু ব্রাহ্মণ হিসাবেও ভূদেব তৎকালে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবল সংঘাতের ফলে বাংলাদেশ প্রথমাবস্থায় সর্বক্ষেত্রেই এক বিপুল বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল। দেশের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি ও বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের বিধ্বস্তপ্রায় অবস্থার প্রাক্কালে ভূদেবের আবির্ভাব হয়। তিনি তাঁহার সর্বতোমুখী বুদ্ধি ও বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক চেতনা দ্বারা দেশ ও জাতির বিবিধ প্রতিকূল বাধা অপসারণ করিবার একান্ত প্রয়াস পাইয়াছেন। সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়া এবং আপনার কর্তব্যনিষ্ঠ জীবনের সংযত আচরণ দ্বারা ভূদেব আত্মচেতনালুপ্ত, স্বধর্ম-বিস্মৃত বাঙ্গালী হিন্দুর সম্মুখে একটি আদর্শও স্থাপন করিয়াছেন। শৈশবকালেই তিনি পিতার তত্ত্বাবধানে প্রাচ্য শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন এবং ফলে হিন্দুর শাস্ত্র, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের প্রতি ভূদেবের গভীর শ্রদ্ধাবোধ সেই শৈশবেই জাগ্রত হইয়াছিল ও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার এই জাতীয় ঐতিহ্যের উপর আস্থা দৃঢ়তর ছিল।

ভূদেব পাশ্চাত্ত্য ভাষা ও সাহিত্যেও একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ইউরোপীয় বিভিন্ন সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত তাঁহার পরিচয়ও অগভীর ছিল না। কিন্তু অন্ধ মোহের বশবর্তী হইয়া ভূদেব বিদেশী ধর্ম ও সভ্যতার কোন আদর্শ বা আচার-আচরণ কখনও গ্রহণ করেন নাই। স্বদেশ ও স্বজাতির ঐতিহ্য সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া লইয়া ভূদেব জাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিরই সুষ্ঠুভাবে বিকাশ সাধনের পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন; সমগ্র জীবনের বিভিন্ন কর্ম ও সাহিত্যকৃতির মধ্য দিয়া দেশ ও জাতির প্রতি ভূদেবের কল্যাণকামী মনোভাবই অধিকতর প্রকাশিত হইয়াছে। ভূদেবের বিবিধ প্রবন্ধের মধ্য হইতে তাঁহারি একনিষ্ঠ

স্বাজাত্যবোধ, গভীর স্বদেশপ্রেম এবং নির্ভীক ব্যক্তিত্বের দুর্লভ পরিচয় লাভ করা যায়।[8]

ভূদেব একজন আদর্শবাদী শিক্ষক ছিলেন। বিপর্যস্ত বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নবতর পন্থার নির্দেশ বা শিক্ষা দানই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়াছিল। জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে ভূদেবের বহুল বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল এবং এই অভিজ্ঞতা তিনি সরকারী সহায়তায় দেশের শিক্ষা-বিস্তার উদ্দেশ্যে বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অর্জন করিয়াছিলেন। সরকারী শিক্ষা-পরিচালনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিবার ফলে ভূদেবকে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল এবং এই উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রার সহিত তাঁহার পরিচয় লাভেরও সুযোগ ঘটিয়াছিল। ভূদেব সমগ্র জীবনব্যাপী পরিবার, সমাজ ও শিক্ষা সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার বিভিন্ন চিন্তাগর্ভ প্রস্তাব বা প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে ভূদেব ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্রষ্টা হইলেও মননশীল প্রবন্ধকার রূপেই তিনি সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ বিশিষ্ট প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহ হইতে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। ভূদেব শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সামাজিক আচার-ব্যবহার ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।[৬]

ভূদেব প্রণীত প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব' (১৮৫৬), ২। 'পুষ্পাঞ্জলি', ১ম ভাগ (১৮৭৬), ৩। 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), ৪। 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২), ৫। 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৫), ৬। 'বিবিধ প্রবন্ধ', ১ম ভাগ (১৮৯৫), ৭। 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৯৫) ও ৮। 'বিবিধ প্রবন্ধ', ২য় ভাগ (১৯০৫)। এই প্রবন্ধসমূহের অধিকাংশই ভূদেবের স্ব-সম্পাদিত 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার', 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৮] 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' তাঁহার সুসম্পাদনায় সমকালীন অন্যান্য সাময়িক পত্রের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। ভূদেব সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সত্য সংবাদ পরিবেশন ও নিরপেক্ষ সমালোচনার আদর্শ অনুসরণ করিয়া তিনি এই ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

। 'ভূদেবের প্রবন্ধের ভাষাও জটিল নহে।' দীর্ঘ সমাস বা দুরূহ সংস্কৃত শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়া ভাষাকে তিনি কখনও দুর্বোধ্য ও গুরুগম্ভীর করিয়া তুলেন নাই। ভূদেবের গদ্য রচনাশৈলী অপেক্ষাকৃত সংস্কৃতানুগামী হইলেও তাঁহার ভাষা সুস্পষ্টতা ও প্রসাদগুণ-বর্জিত নহে। চিন্তার স্বচ্ছতা ও ভাবার প্রাঞ্জলগুণে ভূদেবের জটিল বিষয়ক রচনাও সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।।

। 'ভূদেবের অধিকাংশ প্রবন্ধই তথ্যবহুল এবং উদ্দেশ্য বা উপদেশাশ্রিত।' অক্ষয়কুমার প্রণীত উদ্দেশ্যমূলক প্রবন্ধের ধারা ভূদেবও অনুসরণ করিয়াছেন। ভূদেবের সর্বপ্রথম রচনা 'শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব'। ইহা জাতীয় শিক্ষা-সমস্যা প্রসঙ্গে লিখিত তাঁহার একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ পুস্তিকা। ভূদেব এই প্রবন্ধের সূচনায় বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা এবং শিক্ষকগণের যথাযথ শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ মন্তব্য করিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতিকে সমুচিত শিক্ষায় উন্নত করিবার অভিপ্রায় লইয়া ভূদেব শিক্ষা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-প্রণালীর তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া তিনি উভয়ের মধ্যবর্তী এক নূতনতর শিক্ষা-রীতির প্রবর্তন করেন। তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহারে ভূদেব বিদ্যালয়ের নিয়মানুগ শিক্ষা-প্রণালী এবং পরিবার মধ্যে সন্তান-শিক্ষার যথোচিত বিধি-ব্যবস্থাদি প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তসহ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। ভূদেবের এই চিন্তাগর্ভ আলোচনাটি যেমন আধুনিক যুগধর্মসম্মত, তেমনি ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে সুপরিকল্পিত এই জাতীয় শিক্ষা-বিধি বা নির্দেশ ভূদেবই প্রথম তাঁহার শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

ভূদেবের প্রবন্ধে উপদেশ বা নির্দেশের বাহুল্য থাকিলেও তাহা কেবল নীরস তথ্যপঞ্জীমাত্রেই পর্যবসিত হয় নাই। সহৃদয় অন্তরের উষ্ণ স্পর্শে তাঁহার বিশুষ্ক উপদেশপ্রধান বক্তব্যও সরস ও সজীব হইয়া উঠিয়াছে। ভূদেব 'শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাবে' শিক্ষা বিষয়ক বিবিধ উপদেশ বা নির্দেশের অবতারণা করিলেও তাঁহার বাণীভঙ্গির কৌশলে এই উপদেশাত্মক প্রবন্ধটিও উপভোগ্য হইয়াছে। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক অবলম্বন করিয়া ভূদেব যে বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় লাভ করা যায়। শিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পর সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধার উপরই সত্যকার বিদ্যা ও নৈতিক শিক্ষা নির্ভর করে। তাঁহাদের সম্পর্ক ত্রুটিবহুল হইলে অনিবার্যভাবেই শিক্ষার মান (standard)

নিম্নগামী হয়। ভূদেব তাঁহার আলোচনার মধ্যে সর্বপ্রথমেই শিক্ষক-ছাত্রের পারস্পরিক ব্যবহারের উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'বালকদিগের সহিত শিক্ষকের প্রণয় করা কর্ত্তব্য। এই কথা সকলেরই অনুমত বটে। কিন্তু ইহা প্রতিপালনের উপযুক্ত কর্ম্ম করায় প্রথমতঃ অনেকের প্রবৃত্তি হয় না। পিতাপুত্রের যেরূপ ব্যবহার গুরুশিষ্যেরও সেইরূপ হওয়া উচিত, কিন্তু এখনও এই দেশে পিতাপুত্রের মধ্যে পরস্পরের প্রণয় সাধন চেষ্টা অতি অল্পস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। পাছে পুত্রের নিকট কিছু সম্ভ্রমের ত্রুটি হয়, এই ভয়ে অনেকেই স্ব স্ব সন্তানগণের সহিত অধিক মিলিত হইতে চাহেন না। আমার কাছে বসিয়া পড়াশুনা করুক, এবং চক্ষুর বাহির হইয়া খেলাদেলা যাহা করিতে হয় করুক অধিকাংশ লোকেই সন্তান এবং শিষ্যবর্গের পক্ষে ইহা পথ্য বিবেচনা করেন। কিন্তু এইরূপ বিবেচনা করেন বলিয়াই বালকদিগের ক্রীড়া তাহাদিগের পাঠের প্রতিবন্ধক হয়, এবং শৈশবাবস্থাতেই এত কুসংস্কার জন্মে। যদি শিক্ষকেরা বালকদিগের ক্রীড়ার সংসর্গী হন, তাহা হইলে ঐ সকল দোষ কিছুই হইতে পারে না। ক্রীড়াও নানা সুশিক্ষার সহকারিণী হয়, এবং বাল্যাবধি দুষ্প্রবৃত্তি দমনের ক্ষমতা জন্মে।'[১]

ভাষার সারল্যে ও পরিবেশন কৌশলে ভূদেবের সুচিন্তিত বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ সহজ প্রাঞ্জল ভাষণ ভূদেবের প্রবন্ধের একটি বিশিষ্ট গুণ।

শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত হিসাবেও ভূদেব খ্যাতি অর্জন করেন। 'পুষ্পাঞ্জলি' নামক গ্রন্থে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, চিন্তাশীলতা ও ভূয়োদর্শনের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। এই প্রবন্ধ গ্রন্থের ভূমিকায় ভূদেব লিখিয়াছেন—

'অতি গুরুতর বিষয়েই হস্তার্পণ করিয়াছি—ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি—আনুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য আছে।'

'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থটি সংলাপের আকারে লিখিত হইয়াছে। ভগবান বেদব্যাস ও মার্কণ্ডেয় মুনির প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া ভারতীয় তীর্থস্থানসমূহের নেপথ্যে যে ভারতীয় ধর্মাদর্শ বা ঐতিহ্যের প্রেরণা বিদ্যমান, তাহাই লেখকের অভিনব

[১] 'শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব,' (হুগলী, ১২৮৮), পৃঃ ৩০

ব্যাখ্যাগুণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আর্যশাস্ত্রসমূহের গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যাত হইবার ফলে ভারতীয় সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি অধিকতর স্পষ্ট হইয়াছে। ভূদেব প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরবময় পরিচয়ও দান করিয়াছেন। ভূদেবের ধর্মবোধের সহিত একনিষ্ঠ ইতিহাস-চেতনার অপূর্ব সমন্বয় তাঁহার 'পুষ্পাঞ্জলি' রচনার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বাহান্ন পীঠ সমন্বিত ভারতভূমি যে সতীদেহেরই আধিভৌতিক রূপ এবং ভারতস্থ তীর্থ-দর্শনের ভিতর দিয়া যে অধিভারতী দেবীর পরিক্রমা সার্থক হয়, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ভূদেব তাঁহার প্রবন্ধে তাহাই প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

ভূদেব ভারতীয় সনাতন ধর্মের উপযুক্ত ধারক ও বাহক ছিলেন। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। 'পুষ্পাঞ্জলি'র মধ্যে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভূদেব তাঁহার শিল্পদৃষ্টি ও ঋষিসুলভ অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় এই ধর্মমূলক রচনাটিকে অধিকতর সমুজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছেন। ভূদেবের প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'আমি ধ্যানে কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। ঐ মূর্ত্তি চিরকালের জন্য আমার হৃদয়কন্দরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। পাদপদ্মের কি অনুপম সৌন্দর্য্য—অঙ্গের কি জাজ্বল্যমান প্রভা—মুখচন্দ্রের কি রুচির কান্তি। ইনি পর্ব্বত রাজপুত্রী পার্ব্বতীর মত সিংহবাহনে আরূঢ়া নহেন—ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবীর যাবতীয় শোভা ইঁহার অঙ্গের একদেশেই বিদ্যমান—ইঁহাকে মাধবপ্রিয়া বলিয়াও ভ্রম হয় না; রমা রক্তাম্বরা, ইনি হরিদ্বসনা—ব্রহ্মনন্দিনীর ন্যায় ইঁহার সুস্নিগ্ধ সৌম্যভাব বটে, কিন্তু ইনি বীণাপাণি নহেন—আর অন্য সকল দেবদেবী হইতে ইঁহার বৈচিত্র্য এই যে, ইনি নিরন্তর অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্নপান প্রদান করিতেছেন।'[১]

ভূদেব রূপকের আশ্রয় লইয়া অধিভারতী দেবী অর্থাৎ মাতৃভূমি ভারতবর্ষের চিত্ররূপ অতি মনোহর ভঙ্গিতে বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের কোন কোন অংশে ভূদেবের আবেগবিহ্বলতা বা উচ্ছ্বাসপ্রবণতার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এ'কথা স্বীকার্য যে, বক্তব্য বিষয় আকর্ষণীয় করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি রূপকধর্মী

১ 'পুষ্পাঞ্জলি', ১ম ভাগ, (হুগলী, ১৮৭৬), পৃঃ ৩

উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তাহা দ্বারা তাঁহার প্রবন্ধের গুরুত্ব ও মাত্রাগত সংযমও কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ন হইয়াছে।

বৈদিক যুগের প্রারম্ভ কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রবহমাণ সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার মধ্যেই ভারতবর্ষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্যের আদর্শ নিহিত রহিয়াছে। এই সত্যসাধনার ফলস্বরূপ ভারতবর্ষ এক সময়ে বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শের মহিমাই ভূদেবের অন্তরস্থিত 'ব্রাহ্মণ্য সত্তা'কে জাগ্রত করিয়াছে। ভূদেব বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ্যের আদর্শেই তাঁহার জীবন শুচিসুন্দর ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং বাঙ্গালী হিন্দু সমাজেও এই আর্যোচিত ব্রাহ্মণ্য আদর্শকে গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

বৈদিক ব্রাহ্মণ্যের ভাবাদর্শ চতুরাশ্রমের মধ্য দিয়াই সার্থকভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয়। শ্রীপতি বিষ্ণু, গৃহী উমাপতি শিব ব্রাহ্মণ্যের উপাস্য দেবতারূপে পূজিত হইয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবন এই প্রাচীন আদর্শে গড়িয়া তুলিবার ব্যগ্র প্রয়াসই ভূদেবের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ভূদেব স্বয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহীর আদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করিয়াছেন এবং সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দুর সমাজ-জীবনকেও এই ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার এই আদর্শনিষ্ঠ চিন্তা ও কর্মের বহুধা পরিচয় ভূদেব বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

ভূদেব প্রণীত 'পারিবারিক প্রবন্ধ' গ্রন্থে প্রায় অর্ধশত প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন প্রবন্ধ হইতে বাঙ্গালী হিন্দু যৌথ পরিবারের একটি সামগ্রিক পরিচয় লাভ করা যায়। বাংলাদেশের স্বজন-পরিজনবহুল হিন্দু যৌথ পরিবারের সহিত ভূদেবের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। গার্হস্থ্য জীবনকে সুখসমৃদ্ধিময় কল্যাণকর পথে পরিচালিত করিতে হইলে পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষগণকে যে সমুদয় বিধি-নির্দেশ, কর্তব্যবোধ ও সদাচারসমূহ পালন করিবার প্রয়োজন হয়, ভূদেব অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতা ও ব্যবহারিক (practical) অভিজ্ঞতার সহায়তায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ভূদেবের নিকট পারিবারিক জীবনযাত্রা একটি পবিত্র স্নিগ্ধ গৌরবজনক অনুষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। আদর্শ পরিবারই সমাজের ভিত্তিস্বরূপ এবং সমাজকে সমুন্নত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে পরিবারের সার্বিক উন্নতি বিধান অবশ্য করণীয়—এই ভাব-চিন্তাই ভূদেবের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' গ্রন্থের বিভিন্ন

প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 'বাল্যবিবাহ', 'দাম্পত্য প্রণয়', 'উদ্বাহ-সংস্কার', 'গৃহিণী-পণা', 'কুটুম্বতা', 'অতিথি-সেবা' প্রভৃতি প্রায় সকল প্রবন্ধই তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত ও উপদেশাত্মক। উপদেশপ্রধান হইলেও ভূদেবের রচনা কোথাও গুরুপ্রদত্ত প্রথাসিদ্ধ শাস্ত্রবাক্যমাত্রেই পর্যবসিত হয় নাই—সরস সাহিত্যস্তরেই তাহা উন্নীত হইয়াছে। 'পারিবারিক প্রবন্ধ' গ্রন্থটি ভূদেবের সুস্থ সমাজ-চেতনা ও গভীর স্বজাতিপ্রেমের পরিচয়ও প্রকাশ করে। ভূদেবের পারিবারিক প্রবন্ধসমূহের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যে, তিনি প্রতিপাদ্য বিষয় বা বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আশ্রয় লইয়াছেন এবং ফলে তাঁহার এই জাতীয় প্রবন্ধ নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী হইয়াছে।

ভূদেব যুক্তিবাদী চিন্তাশীল পণ্ডিত ছিলেন। সমকালীন অন্যান্য লেখকগণের তুলনায় ভূদেব কিয়ৎপরিমাণে রক্ষণশীল হইলেও তাঁহার মধ্যে যুক্তিনিষ্ঠ প্রগতিশীল মনোভাব বা উদার দৃষ্টিভঙ্গিরও অভাব ছিল না। তাঁহার প্রতিটি প্রবন্ধেই চিন্তার বলিষ্ঠতা ও যুক্তির তীক্ষ্ণতা সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। প্রতিপাদ্য ভাব বা চিন্তা প্রকাশ করিতে ভূদেব সহজবোধ্য যুক্তি ও বাস্তব দৃষ্টান্তেরই অধিক আশ্রয় লইয়াছেন এবং ফলে তাঁহার রচনা সর্বজনোপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। মননের গভীরতায়, বিষয়ের গুরুত্বে ও প্রকাশের অভিনবত্বে ভূদেবের প্রবন্ধ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁহার 'পারিবারিক প্রবন্ধ' গ্রন্থের প্রতিটি রচনাই এই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হইয়াছে। এ'কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সাহিত্যের সহিত জীবনের সম্পর্ক অতি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। ভূদেবের পারিবারিক প্রবন্ধসমূহের মধ্য দিয়া সমাজ-জীবনের সহিত জীবনের শাশ্বত সত্যই নিখুঁতভাবে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। অতএব এই জাতীয় প্রবন্ধসমূহের সাহিত্যমূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভূদেবের পারিবারিক প্রবন্ধসমূহ হইতে বাঙ্গালীর গার্হস্থ জীবনের এক অভিনব গৌরবদীপ্ত রূপও প্রকাশিত হইয়াছে; তাঁহার পূর্বে অপর কোন বাঙ্গালী মনীষী পারিবারিক জীবন সম্পর্কে এমন গভীরভাবে চিন্তা করেন নাই। তিনি বাঙ্গালী হিন্দুর দাম্পত্য প্রণয়ের মধ্যেও এক মহনীয় আদর্শ লক্ষ্য করিয়াছেন এবং নর-নারীর প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ ও সমুচ্চ আদর্শ প্রসঙ্গে 'দাম্পত্য প্রণয়' প্রবন্ধে ভূদেব লিখিয়াছেন—

'ভালবাসা জিনিসটা নরনারীর শিরোভূষণ মুকুটস্বরূপ। উহা পথে ঘাটে যেখানে সেখানে কুড়াইয়া পাওয়া যায় না। উহাকে বহু যত্নে গড়াইয়া পরিতে

হয়। ভালবাসাটি প্রস্ফুটিত হৃদয়পদ্ম। উহা একবারে ফাঁপিয়া উঠে না। উহা অতি অল্পে অল্পেই উঠে—আদৌ নাল, পরে বৃন্ত, অনন্তর মুকুলভাবে অবস্থিত হয়, এবং পরিশেষে বায়ু, সলিল, তাপের সহযোগে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হয়। ভালবাসা পদার্থটী অভীষ্ট দেবতা। গুরু মন্ত্র দিলেই অমনি সিদ্ধি লাভ হয় না। জপ, তপ, ধ্যান ধারণাদি করিতে করিতে ক্রমে মন্ত্রচেতন এবং তপঃসিদ্ধি হয়। * * * আমাদিগের পক্ষে প্রকৃত দাম্পত্য প্রণয় লাভ করিবার যত সুবিধা, এমত আর কোন জাতির নাই।'[১]

ভূদেবের প্রবন্ধগত ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে, তিনি প্রয়োজনানুসারে সংস্কৃতের সহিত বাংলা তদ্ভব ও দেশী শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার ফলে, তাঁহার গদ্য-ভাষার গতি কোথাও মন্থর বা ব্যাহত হয় নাই। বরং অতি সাধারণ বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে ভূদেবের গদ্য-ভাষা ও রীতির উপযোগিতা বিশেষ অনুভব করা যায়। এ'কথা স্বীকার্য যে, ভূদেবের ভাষা তাঁহার প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় অধিকতর সহজবোধ্য করিয়া তুলিয়াছে।

সমাজশাস্ত্রী ভূদেব প্রণীত 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থে বাঙ্গালী জাতি ও সমাজের সমষ্টিগত জীবন সম্বন্ধে তাঁহার সূক্ষ্ম চিন্তা ও তত্ত্বগভীর সামাজিক দৃষ্টির পরিচয় লাভ করা যায়। 'পারিবারিক প্রবন্ধ' গ্রন্থে ভূদেব যেমন বাংলাদেশের গৃহস্থ পরিবার-জীবন প্রসঙ্গে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরের জীবনযাত্রা ও কর্মকৃতি নিখুঁতভাবে পরিবেশন করিয়াছেন ; তদনুরূপ তাঁহার 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থে ভূদেব স্বদেশীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদানগুলির সার্থক পরিচয় দান করিয়াছেন এবং ইহার মধ্য দিয়া জাতীয় ভাবধারার বিকাশ সাধনকল্পে তিনি ভারতীয় তথা ইউরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন সমাজ-তত্ত্ব বিষয়ক মতবাদসমূহের বিচার-বিশ্লেষণে নিয়োজিত হইয়াছেন। ভূদেব লিখিত ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থের ভিতর দিয়া তাঁহার বহুল অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় লাভ করা যেমন সহজ হয়, তেমনি বিভিন্ন দেশ ও জাতির সামাজিক প্রকৃতি ও রূপ-বৈশিষ্ট্য প্রদানের মধ্যে ভূদেবের নিপুণ বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতাও লক্ষ্য করা যায়।

ভূদেব সত্যনিষ্ঠ আদর্শবাদী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার আদর্শনিষ্ঠ চরিত্র বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ তাঁহার আত্মমর্যাদাবোধ ভূদেবকে

১ 'পারিবারিক প্রবন্ধ', (হুগলী, ১২৮৮), পৃঃ ৯

চারিত্রিক উন্নতশীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভূদেবের এই আত্মমর্যাদাবোধ তাঁহার স্বধর্ম ও স্বসমাজ-প্রীতির দ্বারা অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছিল। তাঁহার হিন্দু সমাজ-প্রীতি শূন্যগর্ভ কাল্পনিক মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না। ভূদেব হিন্দু সমাজের প্রকৃত স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে যথাযথভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'সামাজিক প্রকৃতি—হিন্দু সমাজ' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'সমাজ মাত্রেই অতি গুরুতর বস্তু। বৌদ্ধেরা সমাজকেই 'সংঘ' বলিয়া এবং কোমটিষ্ট্‌রা 'হিউমানিটী' বলিয়া অতি পূজনীয় পদার্থই বিবেচনা করেন। যুক্তি এবং শাস্ত্রমতেও সমাজ, শাসনে পিতা, পোষণে মাতা, শিক্ষায় গুরু, দুঃখে সহোদর, সুখে মিত্র। সমাজ প্রীতি, ভক্তি, সম্মান ও গৌরবের আস্পদ। বিশেষতঃ হিন্দু সমাজটি অতি গৌরবেরই বস্তু। ইহার প্রাচীনত্ব অসীম, ইহার বন্ধন প্রণালী অনন্যসাধারণ, ইহার আদর্শ অতি পবিত্র, এবং ইহার আভ্যন্তরিক বল এত অধিক যে পৃথিবীতে এ পর্যন্ত কোন সমাজ জন্মে নাই, যাহা ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে। সেই প্রাচীন মিশরীয়, আসিরীয়, পারসীক, গ্রীক এবং রোমীয় সমাজ সকল কোথায় চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু হিন্দু সমাজ এখনও অটুট এবং অটল। ইহার অন্তরে কোন অতি উচ্চতম সনাতন তথ্য না থাকিলে ইহা কি এতদিন স্থায়ী হইত?'[১]

'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় ভূদেবের গভীর আত্মদৃষ্টি এবং সুনিপুণ বিচার-বিশ্লেষণ শক্তির পরিচায়ক। ভূদেব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের (Nationalism) অন্যতম সমর্থক ছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক কোন আলোচনায় তিনি কখনও সংকীর্ণ প্রাদেশিক মনোবৃত্তির পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। এই ক্ষেত্রে তিনি অনুদার মনোধর্মের অধিকারী ছিলেন না, অর্থাৎ বাঙ্গালী স্বধর্মাচারনিষ্ঠ ভূদেব সংস্কৃতি প্রসঙ্গে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় ছিলেন। ভারতের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠাকল্পে সম্পূর্ণ ভারতীয় উদার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ভূদেব তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় ঐক্য বিধানে অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা অপেক্ষা হিন্দী অধিকতর সহায়ক হইবে উপলব্ধি করিয়া বাঙ্গালী ভূদেব হিন্দী ভাষার সঙ্গত দাবী প্রসঙ্গে 'ভবিষ্য বিচার- ভারতবর্ষের কথা (ভাষা-বিষয়ক)' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—।

১ 'সামাজিক প্রবন্ধ', (হুগলী, ১৩০২), পৃঃ ৩৩

'বিদ্যাচর্চ্চার বৃদ্ধির সহিত সংস্কৃত রত্নাকর হইতেও বহু পরিমাণে শব্দরত্নের উদ্ধার হইয়া চলিত ভাষায় মিলিয়া যাইবে। এইরূপ হইতে হইতে আমাদের বিভিন্ন ভাষাগুলি পরস্পর সমীপবর্ত্তী বই দূরবর্ত্তী হইবে না; অর্থাৎ ভাষা সমস্ত একতার দিকেই চলিবে। ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী-হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশ ব্যাপক। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।'[১]

'ভূদেবের প্রবন্ধ হইতে এ'কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় যে, আচারে-ব্যবহারে রক্ষণশীল বাঙ্গালী হিন্দু হইলেও বৃহত্তর ভারতের কল্যাণ সাধনায় ভূদেব কখনও বাঙ্গালিয়ানার সংকীর্ণ মনোভাব প্রকাশ করেন নাই অর্থাৎ বৃহত্তর ভারতীয় স্বার্থে তিনি সংস্কারবিমুখ উন্নতিপরিপন্থী বা রক্ষণশীল ছিলেন না। ভূদেবের প্রবন্ধ রচনার প্রায় শতবর্ষ পরে স্বাধীন ভারতবর্ষে তাঁহার ঈপ্সিত হিন্দী ভাষার মর্যাদা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এই বিষয়ে ভূদেবের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিশক্তির পরিচয় বিস্ময়কর। 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে ভূদেব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিশিষ্ট চিন্তা ও গবেষণায় সবিশেষ সমুজ্জ্বল হইয়াছে। প্রবন্ধগত বিষয়ের গুরুত্ব তাঁহার জাতীয়তাবোধসঞ্জাত আবেগের আতিশয্যে এবং যুক্তি বা বিচারের শৈথিল্যে কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এক দৃঢ়তর উচ্ছ্বাসহীন সংযত বাক্-ভঙ্গি দ্বারা ভূদেবের এই জাতীয় প্রবন্ধ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়াছে।

ভূদেব স্থিতধী, সদাচারনিষ্ঠ হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন। হিন্দুর জীবনযাত্রা যে সমুদয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি-বিধান অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেইগুলির বিস্তৃত পরিচয় ও অর্থবহ তাৎপর্য ব্যাখ্যা ভূদেব প্রণীত 'আচার প্রবন্ধ' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। আচার বা বিবিধ অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সাধারণতঃ দেশের প্রাকৃতিক পটভূমি, আবহাওয়া ও দেশীয় অধিবাসীদিগের প্রকৃতি অনুযায়ী গড়িয়া উঠে এবং আচার-অনুষ্ঠানাদির বিধি-নির্দেশে সমাজ ও ব্যক্তিজীবন পরিচালিত হয়। ব্যক্তির মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানাদির শুভ প্রভাব অস্বীকার করা যায় না শাস্ত্রদর্শী আচারপরায়ণ ভূদেব তাঁহার আচার-

১ 'সামাজিক প্রবন্ধ', (হুগলী, ১৩০২), পৃঃ ২২৫

মূলক প্রবন্ধসমূহের মধ্য দিয়া শাস্ত্রবিহিত আচার-বিধি প্রতিপালনেরই নির্দেশ দান করিয়াছেন এবং মানুষের ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণ যে ইহার উপর অধিকতর নির্ভরশীল, তিনি তাহাও অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহকারে প্রতিপাদন করিয়াছেন। 'আচার প্রবন্ধ' গ্রন্থে হিন্দুর শাস্ত্র ও লোকাচারসম্মত নিত্য ও নৈমিত্তিক আচরণের নিগূঢ় তাৎপর্য শাস্ত্র-শ্লোকসহ অতি সুন্দর অথচ সহজভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভূদেবের সৌম্যস্নিগ্ধ অথচ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনে তাঁহার সামান্য আচার বিষয়ক প্রবন্ধও সার্থক শিল্প-মর্যাদা লাভ করিয়াছে। 'নিত্যাচার প্রকরণ' প্রবন্ধে ভূদেব গায়ত্রী জপের তাৎপর্য প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'সূর্য্যোপস্থানের পর সূর্যমণ্ডল মধ্যে প্রাতে গায়ত্রী নামিকা, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী নামিকা এবং সায়াহ্নে সরস্বতী নামিকা সেই একই মহাদেবীর ত্রিকালে ত্রিবিধ রূপ ধ্যান করিতে হয়। একই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, এই চিন্তার অভ্যাস দ্বারা তথ্যজ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকে। যদিও কিছু পাইবার জন্য অভিলাষের আতিশয্য ভাল নয়, তথাপি গ্রহণে উন্মুখতা না থাকিলে কিছুই পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে। এইজন্য ব্রহ্মতেজ প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা গ্রহণোন্মুখতা অভ্যাস করা আবশ্যক। সেই অভ্যাসে প্রবৃত্ত করাইবার জন্যই গায়ত্রী জপের বিধি। গায়ত্রীর জপে কোন প্রার্থনা নাই, কোন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ নাই, কোন অপরাধ স্বীকার নাই, কোন দীনতা খ্যাপন নাই। শুদ্ধ এই কথা বলা আছে যে, যে ব্রহ্মতেজ আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক আমরা সেই তেজের ধ্যান করি।'[১]

সমাজকল্যাণকর বিবিধ চিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনা-কর্মেই ভূদেব অধিক সময় ব্যয় করিয়াছেন। ভূদেবের জীবনে নিছক সাহিত্য-সাধনার অবকাশ সীমিত থাকায় তাঁহার বহুবিধ ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার তুলনায় বিশুদ্ধ সাহিত্য-মূলক প্রবন্ধের সংখ্যা পরিমাণে অতি অল্পই লিখিত হইয়াছে। সংখ্যায় অল্প হইলেও বিশুদ্ধ সাহিত্যিক আলোচনা-ভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধ রচনাতেও ভূদেবের সিদ্ধহস্তের স্বাক্ষর লাভ করা যায়। 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম ভাগ) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'উত্তরচরিত', 'রত্নাবলী', 'মৃচ্ছকটিক' প্রভৃতি প্রবন্ধে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য অবলম্বন করিয়া লিখিত তাঁহার রসাত্মক আলোচনা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য অধিকতর সমৃদ্ধ করিয়াছে।

১ 'আচার প্রবন্ধ', (হুগলী, ১৩০১), পৃঃ ৯৮-৯৯

ভূদেব প্রাচ্য আলঙ্কারিক রীতিসম্মত সমালোচনারই অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার সমালোচনায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভবশীলতা ও বিস্ময়কর মৌলিকতা পরিলক্ষিত না হইলেও সহজ ব্যাখ্যাগুণে ও প্রাঞ্জল বর্ণনায় তাহা চিত্তগ্রাহী ও উপভোগ্য হইয়াছে।

'উত্তরচরিত' ও 'রত্নাবলী' প্রবন্ধে উক্ত নামধেয় দুইটি সংস্কৃত নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে ভূদেবের ভাবুকতার আতিশয্য তাঁহার সমালোচনা-শক্তির তীক্ষ্ণতা কতকটা খর্ব করিয়াছে। মূল নাটকের বিষয়গত রসানুভবে বিহ্বল হইয়া ভূদেব কাব্যধর্মী ভাষায় প্রবন্ধের দীর্ঘ অংশব্যাপী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন। উচ্ছ্বাসের আধিক্য থাকিলেও তাঁহার প্রবন্ধের কোন কোন অংশে রসগ্রাহী বিচার-বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় লাভ করা যায়। ভবভূতি প্রণীত 'উত্তরচরিত' নাটকের রচনা-বৈশিষ্ট্য ও রাম-সীতার পুনর্মিলনের জন্য রূপকধর্মী তৃতীয় অঙ্কের উপযোগিতা যে সার্থক ও রসসম্মত হইয়াছে, সেই সম্পর্কে ভূদেবের অপরূপ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মৌলিকত্ব অস্বীকার করা যায় না। শ্রীহর্ষ প্রণীত 'রত্নাবলী' নাটকের বিচার প্রসঙ্গে ভূদেব 'উত্তরচরিত', 'অভিজ্ঞান শকুন্তল', 'নাগানন্দ', 'মুদ্রারাক্ষস' প্রভৃতি বিবিধ সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থাদির তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভূদেব এই জাতীয় তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তাঁহার সমালোচ্য নাট্যবিষয় অধিকতর মনোজ্ঞ ও সহজবোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। ভূদেবের 'মৃচ্ছকটিক' প্রবন্ধটিও সংস্কৃত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের একটি সরস আলোচনা। এই সমালোচনাত্মক প্রবন্ধেও তাঁহার সামগ্রিক নাট্যরসানুভবশক্তির পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের নায়িকা গণিকা বসন্তসেনার প্রতি ভূদেবের সহমর্মিতা আশ্চর্যজনক। তিনি এই চরিত্র-চিত্রণে নাট্যকারের অসাধারণ শিল্পসম্মত ক্ষমতার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের দোষ-গুণ বিচার-বিশ্লেষণে ভূদেবের রসগ্রাহিতা ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা-নৈপুণ্যের পরিচয় লাভ করা যায়। কিন্তু তাঁহার এই আলোচনাটির একটি প্রধান ক্রটি এই যে, ইহার মধ্য দিয়া নৈষ্ঠিক সদাচারী ভূদেবের হিন্দু মনোভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর ধর্মাদর্শ ও শুচিসম্মত আচার-আচরণের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি সমালোচ্য নাটকের দুই প্রধান চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তথাপি সামগ্রিক নাট্যবিচারে ভূদেবের রসবোধের তীক্ষ্ণতা ও গভীরতা অস্বীকার করা যায় না।

'মৃচ্ছকটিক' নাটকের রচয়িতা শূদ্রক। এই শূদ্রক নামের পশ্চাতে যে একটি প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য আছে, ইহা কেহ কেহ অনুভব করিলেও তাহার সুস্পষ্টভাবে বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়াস কাহারও মধ্যে লক্ষ্য করা যায় নাই। ভূদেবই নাট্য-আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যার প্রয়াস পাইয়াছেন। 'মৃচ্ছকটিক' প্রণেতার নাম-রহস্য সম্পর্কে ভূদেবের অনুসন্ধান-স্পৃহা নিঃসন্দেহে তাঁহার মৌলিক চিন্তার পরিচায়ক। তিনি এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'মৃচ্ছকটিক' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'মৃচ্ছকটিকের ঐ পরিচয় ভাগে বলা হইল রচয়িতার নাম শূদ্রক, তিনি রাজা, এবং দ্বিজমুখ্যতম, ঋগ্‌বেদ এবং সামবেদে পণ্ডিত, বেদজ্ঞবর্গের শ্রেষ্ঠ, এবং হস্তীর সহিত বাহুযুদ্ধে উন্মুখ; তিনি শতবর্ষ এবং দশদিন আয়ুষ্কাল ভোগ করিয়া পুত্রকে রাজ্য দানপূর্ব্বক চিতারোহণে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। গ্রন্থ রচয়িতার এবম্ভূত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে বড়ই সন্দেহ জন্মে। ইনি নামে হইলেন শূদ্র, কাজে হইলেন সমরব্যসনী ক্ষিতিপাল এবং ব্যবহারে হইলেন তপোধন ব্রাহ্মণ। ইঁহাকে রাজা বলা হইল, অথচ কোথাকার রাজা এবং থাকিতেন কোথায়, তাহা বলা হইল না। এমনস্থলে যদি মনে করা যায় যে, গ্রন্থকারের এই শূদ্রক নামটাই কল্পিত, তাহা করিলে কি নিতান্ত কষ্ট কল্পনা করা হয়।'[১]

ভূদেব নিছক ঐতিহাসিক বা নীরস গবেষক না হইলেও তাঁহার মধ্যে ইতিহাস-চেতনার অভাব ছিল না। ইতিহাসনিষ্ঠ কল্পনার প্রসারতায়, রসসৃষ্টির ক্ষমতায়, প্রকাশ ও বর্ণনার মাধুর্যে তাঁহার 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক রচনাটি ইতিহাস না হইয়া সরস সাহিত্যস্তরে উন্নীত হইয়াছে। স্বপ্নলব্ধ ইতিবৃত্ত হিসাবে পরিচিতি লাভ করিলেও এই গ্রন্থটি ভূদেবের বাস্তব ইতিহাস চর্চারই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদিগের জয়লাভ ঘটিলে স্বাধীন ভারতবর্ষের গৌরবময় একটি উজ্জ্বল কাল্পনিক চিত্ররূপ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কল্পনাপ্রসূত হইলেও 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' ভূদেবের অসংলগ্ন চিন্তা বা অলীক মায়ামোহজাত রচনা নহে ও শূন্যভিত্তিক উচ্ছ্বাস বা আবেগের মধ্যেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। এই গ্রন্থে স্বদেশপ্রেমিক ভূদেবের স্বাধীন অনমনীয় ব্যক্তিত্বের নির্ভীক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ভূদেবের বলিষ্ঠ ইতিহাসনিষ্ঠ কল্পনা যথাযোগ্য

১ 'বিবিধ প্রবন্ধ', ১ম ভাগ (হুগলী, ১৩০২), পৃঃ ১১৫

ভাষাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই গ্রন্থের ভাষা ও রচনারীতি অপেক্ষাকৃত সংস্কৃতধর্মী হইলেও সহজ ও লালিত্যময়।

ভূদেব একজন বিশিষ্ট ক্রান্তদর্শী মনীষী ছিলেন। তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধে'র দ্বিতীয় ভাগে বহু দর্শননিষ্ঠ প্রবন্ধের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পুরাবৃত্ত, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব ও তন্ত্র সম্বন্ধীয় কয়েকটি মূল্যবান্ প্রবন্ধে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ হইয়াছে। তন্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যেই ভূদেবের গভীর দার্শনিক চিন্তার পরিচয় লাভ করা যায়।

তান্ত্রিক দর্শনের প্রতি ভূদেবের একটি সহজাত আকর্ষণ ছিল। তিনি তন্ত্রকে কলিযুগের বেদশাস্ত্রের মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন প্রবন্ধের মধ্যে ধর্ম বা তত্ত্ব সম্পর্কিত বিতর্কেরও সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে ভূদেবের কোনরূপ রক্ষণশীল ধর্মবোধজাত উষ্মা প্রকাশ পায় নাই। বরং অত্যন্ত শোভন ও সংযতভাবেই ভূদেব একটি যুক্তিনিষ্ঠ সার্থক মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। তন্ত্রোক্ত শাক্তধর্ম অভিজাত বাঙ্গালীর পুরুষানুক্রমিক সুপ্রাচীন ধর্ম। বাংলা দেশের মধুরভাবনিষ্ঠ বৈষ্ণবধর্মও যে শাক্ত-প্রভাবমুক্ত হইতে পারে নাই, তাহা তাঁহার 'বাঙ্গালী সমাজ' নামক প্রবন্ধে ভূদেব অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

ভূদেবের তন্ত্রবিষয়ক প্রতিটি প্রবন্ধের মধ্যেই তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি-শক্তি ও মননশীলতার পরিচয় বর্তমান। এ'কথা অনস্বীকার্য যে, চিন্তার গভীরতায়, যুক্তির তীক্ষ্ণতায় ও প্রকাশভঙ্গির প্রাঞ্জলতায় ভূদেবের সর্ববিষয়ক প্রবন্ধই সমুজ্জ্বল হইয়াছে। বিষয়ানুসারে তাঁহার প্রবন্ধগত ভাষা-বৈচিত্র্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ভূদেব প্রধানতঃ 'পারিবারিক প্রবন্ধ' 'আচার প্রবন্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে বিষয়-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইরূপ অভিনব বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করিয়া তিনি যে একক আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভূদেবকে অনুসরণ করিয়া এই জাতীয় গুণসম্পন্ন প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে অপর কোন লেখকের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবিধ প্রবন্ধকার

অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বের প্রবন্ধ-সাহিত্য কেবলমাত্র অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট প্রবন্ধ দ্বারাই সমৃদ্ধি লাভ করে নাই, এই পর্বে আবির্ভূত অন্যান্য স্বল্পখ্যাত প্রবন্ধকারগণের বিবিধ বিষয়ক রচনাও বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যকে অধিকতর পরিপুষ্ট করিয়াছে। বিবিধ প্রবন্ধকারদিগের মধ্যে অধিকাংশই উল্লিখিত চারিজন মনস্বী লেখকের প্রভাবমুক্ত হইয়া স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশের কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারেন নাই। যদিও কোন কোন লেখকের মধ্যে চিন্তাশক্তির মৌলিকত্ব বা স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদের রচনার অপ্রাচুর্য হেতু তাহা সম্যক্‌ভাবে বিকাশ লাভের সুযোগ ঘটে নাই। এই পর্বে এমন কয়েকজন শক্তিশালী প্রবন্ধকারেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাঁহাদের কয়েকটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, অথচ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নাই। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনাও 'বিবিধ প্রবন্ধকার' পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন—তারাশঙ্কর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুরাগী ও অনুসরণকারী লেখক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। বাণভট্ট প্রণীত সংস্কৃত গদ্য-কাব্য 'কাদম্বরী'র বাংলা অনুবাদ রচনার পর হইতেই বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছে। সৌষ্ঠব-গুণ ও সরসতা তাঁহার গদ্য-ভাষার অন্যতম আকর্ষণ ছিল। ভাষা-সংগঠনের পর্বে সার্থকভাবে বাংলা ভাষা-চর্চা ও ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া তাহার প্রয়োগ-দক্ষতায় তারাশঙ্করের বিস্ময়কর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহার ন্যায় তারাশঙ্করও আধুনিক প্রগতিশীল জীবনধারার একজন উৎসাহী সমর্থক হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সমকালীন স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তারাশঙ্করের মৌলিক ভাব-চিন্তা তাঁহার প্রগতিপন্থী মনোভাবেরই পরিচয় প্রকাশ করে। অনুবাদমূলক রচনা-কর্মেই তিনি মুখ্যতঃ

াাাত অর্জন করিয়াছেন। অনুবাদ-রচনা ব্যতীত তিনি একটি মাত্র প্রবন্ধ পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তারাশঙ্করের 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' (১৮৫০) নামক পুস্তিকাটি স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করিয়া লিখিত একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হিসাবে তৎকালে জনস্বীকৃতি লাভ করে এবং হেয়ার পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

তারাশঙ্কর 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' প্রবন্ধে প্রধানতঃ প্রাচীন সংস্কৃত াহিত্য ও স্মৃতি-শাস্ত্র হইতে তাঁহার আলোচ্য বিষয়ের অনুকূলে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং চারিটি খণ্ডে তাঁহার বক্তব্য বিন্যস্ত করিয়া স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত মালোচনার প্রয়াস পাইয়াছেন। শিক্ষা ব্যতিরেকে দেশের স্ত্রীলোকদিগের বর্তমান দুরবস্থার প্রসঙ্গ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের ্রমহিলাগণও যে শিক্ষিতা ছিলেন এবং তাঁহারা যে নিয়মিতভাবে বিদ্যাভ্যাস করিতেন, গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তারাশঙ্কর বিভিন্ন শাস্ত্র-সংহিতা হইতে তাহার প্রমাণপঞ্জী উদ্ধার করিয়াছেন। দেশের স্ত্রীজাতি সুশিক্ষিতা হইলে দেশের যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে, গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে তাহার আভাসও প্রদত্ত হইয়াছে এবং এই গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে অর্থাৎ শেষ ভাগে তারাশঙ্কর নারীজাতির বিদ্যানুশীলনের বিবিধ পন্থা নির্দেশ করিয়া রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার আবেদন জানাইয়াছেন। গ্রন্থের চারিটি নাতিদীর্ঘ রচনাই এক একটি খণ্ডে অর্থাৎ পৃথক্ পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং তারাশঙ্কর তাঁহার প্রতি খণ্ডের আলোচনায় একটি অন্তর্লীন যোগসূত্রও রক্ষা করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষামূলক এই গ্রন্থটির বক্তব্য বিষয় যেমন বলিষ্ঠ যুক্তিপূর্ণ, তেমনি তথ্যনিষ্ঠ এবং নারীজাতির প্রতি সহৃদয় আন্তরিকতায় তারাশঙ্করের প্রবন্ধের ভাষাও অপেক্ষাকৃত আবেগমণ্ডিত হইয়াছে।

তারাশঙ্কর রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হইয়াও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে শ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় উদারপন্থী ছিলেন। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে তিনি সমধিক প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রচলিত সামাজিক সংস্কারের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল না। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ এবং বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে যে জাতি অনিবার্যভাবেই শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন অসদ্‌গুণে জাতীয় চরিত্রের ভিত্তি শিথিলতর হয়, তাহা তারাশঙ্কর গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার প্রবন্ধের মধ্য দিয়া তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকগণ শিক্ষিতা হইলে সমাজ ও দেশের অধিকতর কল্যাণ-সাধনের যে সম্ভাবনা, সেই সম্পর্কে তারাশঙ্কর লিখিয়াছেন—

'এ দেশের বুদ্ধিমান নারীগণের মনে বিদ্যারূপ বীজ নিক্ষেপ করিয়া উৎসাহ বারি দ্বারা সেচন করিলে অবশ্য অমৃত ফল ফলিতে পারে। তাহারা নীতিজ্ঞ হইলে কদাচ কুমার্গে ধাবমান হয় না ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অধর্ম্মকে ঘৃণা করে, অন্য অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের উপকার তাহারাই স্বতন্ত্ররূপে সম্পাদন করিতে পারে, পুরুষের সাহায্য করিয়া কোন কোন বিষয়ে তাহাদিগের ক্লেশ ও শ্রম লাঘব করিতে শক্ত হয়, গৃহকার্য্যের সুশৃঙ্খলতা ও সুনিয়ম তাহারাই স্থাপন করে, প্রয়োজনবশতঃ পত্রাদি লিখিতে হইলে পরের উপাসনা করিতে হয় না, বালক ও বালিকাদিগে বিশেষ উপকার তাহারাই করিতে সমর্থ হয়।'[১]

চিন্তার স্বচ্ছতা ও বাস্তব উদাহরণসহ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা তারাশঙ্করের প্রবন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁহার ভাষা অপেক্ষাকৃত সংস্কৃতানুগ হইলেও ও সহজবোধ্য। সংস্কৃত দুরূহ সমাসভার ও অলঙ্কার বাহুল্যে তাঁহার গদ্য-ভাষা কোথাও আড়ষ্ট বা গতিহীন হয় নাই। ভাষা ও রচনারীতির ক্ষেত্রেও তারাশঙ্কর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে মুখ্যতঃ অনুসরণ করিয়াছেন।

তারাশঙ্কর প্রণীত হিন্দুধর্ম বিষয়ক একটি অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই প্রবন্ধটি নীলমণি বসাক সংগৃহীত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৫৭) গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। এই রচনার মধ্যে তারাশঙ্করের গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বজ্ঞ মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'হিন্দুধর্ম্ম' প্রবন্ধটিতে তারাশঙ্কর বেদ ও উপনিষদের তাৎপর্য সুষ্ঠুরূপে পর্যালোচনা করিয়া হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করিয়াছেন। নীরস ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধেও তারাশঙ্করের ভাষাগত সারল্য ও সরসতা তাঁহার পরিণত রচনা-শক্তিরই পরিচয় প্রকাশ করে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র—ভারতবর্ষের বিদগ্ধ সমাজে পুরাতাত্ত্বিক হিসাবেই রাজেন্দ্রলাল সুপরিচিত হইয়াছেন। ভারতবাসীর মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইতিহাস বা পুরাবৃত্ত পর্যালোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট সাময়িক পত্রের দায়িত্বশীল সম্পাদক

১ 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা', (কলিকাতা, ১৮৫১), পৃঃ ২৫-২৬

রূপেই তাঁহার খ্যাতি সমধিক বিস্তৃত হইয়াছে। অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন রচনা ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পরিচালনার আদর্শ রাজেন্দ্রলালও অনুসরণ করিয়াছেন।

রাজেন্দ্রলাল বিভিন্ন ভাষাবিৎ সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। পারসী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরাজী, গ্রীক্, ল্যাটিন্, ফরাসী ও জার্মান ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। রাজেন্দ্রলাল অধিকাংশ গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থঃ 'প্রাকৃত ভূগোল', 'শিল্পিক দর্শন', 'শিবজীর চরিত্র', 'মেবারের রাজেতিবৃত্ত', 'ব্যাকরণ প্রবেশ' ও 'পত্র কৌমুদী'—ইহাদের কোনটিই রাজেন্দ্রলালের গবেষণামূলক বা সাহিত্য পদবাচ্য মৌলিক প্রবন্ধের পর্যায় ভুক্ত নহে।

রাজেন্দ্রলালের বিবিধ রচনা প্রধানতঃ তাঁহারই সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' (১৮৫১) ও 'রহস্য সন্দর্ভ' (১৮৬৩) এই দুই সচিত্র বাংলা মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত বহু নাম স্বাক্ষরহীন প্রবন্ধের ভাষা ও রচনারীতি লক্ষ্য করিয়া তাহা নিঃসন্দেহে রাজেন্দ্রলালের রচনা বলিয়া প্রতীতি হয়। বিবিধ বিষয়ক অর্থাৎ পুরাবৃত্ত, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য প্রসঙ্গে প্রবন্ধই তিনি অধিকতর রচনা করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' পত্রিকায় প্রথম সাহিত্য-গ্রন্থসমূহের আলোচনার সূত্রপাত হয় এবং বাংলা সাহিত্যে গ্রন্থ-সমালোচনার প্রথম কৃতিত্ব তাঁহারই প্রাপ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের বহুখ্যাত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের প্রায় একুশ বৎসর পূর্বে রাজেন্দ্রলালের এই জাতীয় গ্রন্থ সমালোচনার প্রয়াস নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে' প্রকাশিত রঙ্গলাল, রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, মধুসূদন প্রমুখ সমকালীন বিশিষ্ট লেখকদিগের প্রণীত গ্রন্থসমূহের আলোচনাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। কোন কোন গ্রন্থ আলোচনার ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলাল সূক্ষ্ম বিচার-নৈপুণ্য ও মৌলিক সাহিত্য-চিন্তার পরিচয় দান করিয়াছেন।

রাজেন্দ্রলালের প্রবন্ধ প্রধানতঃ বিষয়নিষ্ঠ এবং রচনাভঙ্গি সরল ও জটিলতা বর্জিত। যে কোন দুরূহ বিষয়ও প্রাঞ্জলভাবে পরিবেশন করিবার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁহার ছিল। রাজেন্দ্রলালের গদ্য-ভাষা সংস্কৃতানুগ হইলেও সমাসবাহুল্যে ভারাক্রান্ত হয় নাই এবং তিনি প্রয়োজনানুসারে খাঁটি বাংলা শব্দ প্রয়োগ করিয়া বাংলা গদ্য-ভাষা অধিকতর সহজবোধ্য করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলালের অধিকাংশ

সারগর্ভ প্রবন্ধ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' ও 'রহস্য সন্দর্ভে' প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়া অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রে প্রকাশিত তাঁহার লিখিত গ্রন্থ-সমালোচনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের আলোচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

' "বল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন-কামিনীগণের এক্ষ যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে" অভিনয় দ্বারা স্বদেশীয় মহোদয়গণের মনে তাহা সমুদি করিয়া দেওয়াই প্রস্তাবিত নাটকের মুখ্যকল্প। দেশীয় কোন নিন্দিত প্রথার উৎসেদের নিমিত্ত প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই প্রকারে রূপক রচনা সর্ব্বদাই করিতেন। "ধূর্ত্ত-নর্ত্তক", "কৌতুকসর্ব্বস্ব" প্রভৃতি রূপক সকল এই অভিপ্রায়েই প্রস্তুত হইয়াছিল। জগদীশ নামা একজন কবি, রাজা, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও দৈবজ্ঞদিগের অধর্ম্মোৎসেদার্থে "হাস্যার্ণব" নামে একটি রূপক প্রস্তুত করেন। যদিচ তাহাতে অনেক অশ্লীল কথা আছে; তথাপি তাহা কুলীন কুলসর্ব্বস্বের আদর্শস্বরূপ বলিতে বলা যায়"।'[১]

প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ প্রবর্তিত সাহিত্য-সমালোচনার পদ্ধতিই রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থ-সমালোচনা-কর্মে অধিকতর অনুসৃত হইয়াছে। তবে কোন কোন গ্রন্থের আলোচনায় তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য-বিচারের আদর্শও অনুসরণ করিয়াছেন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক কাহিনী-কাব রচনা করিয়া রঙ্গলাল কবি হিসাবেই বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার কাব্যে মধ্য দিয়া প্রধানতঃ দেশের গৌরবময় ঐতিহ্যই প্রকাশ করিয়াছেন। দেশপ্রীতি তাঁহার সর্ববিধ রচনা-কর্মের মুখ্য প্রাণবস্তু ছিল। রঙ্গলাল তাঁহার প্রবন্ধে দেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির উচ্চ প্রশংসা করিয়া তাহার গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছেন প্রবন্ধের মধ্য দিয়া স্বদেশের কাব্য-সাহিত্যের প্রতি রঙ্গলালের গভীর প্রীতির পরিচ প্রকাশিত হইয়াছে।

রঙ্গলাল প্রণীত একমাত্র প্রবন্ধ পুস্তিকা 'বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' ১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত সাহিত্য সমালোচনাত্মক প্রবন্ধ হিসাবে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত

১ বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ, ৩৫ খণ্ড, ৩য় পর্ব্ব, মাঘ ১৭৭৬ শকাব্দ, পৃঃ ২৫৬

উভয় দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত রঙ্গলালের পরিচয় অগভীর ছিল না। রসসমৃদ্ধ বিদেশী সাহিত্য গভীরভাবে অনুশীলন করিবার ফলে তাঁহার পাণ্ডিত্য, রসগ্রাহিতা ও বিচার-ক্ষমতা অধিকতর পরিপুষ্ট হইয়াছিল। রঙ্গলালের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা পুস্তিকাটি তাঁহার তুলনামূলক রসসম্মত কাব্য-বিচারের একটি বিশিষ্ট স্বাক্ষর রূপে গ্রহণ করা যায়। সাহিত্যের ভাব ও রূপ যে সাহিত্যশিল্পীর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত, ইহা সমালোচক রঙ্গলালের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। তিনি এই প্রত্যয়ের মানদণ্ডেই সাহিত্য-বিচারমূলক রচনা-কমে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

রঙ্গলালের 'বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' পুস্তিকাটি মুখ্যতঃ হরচন্দ্র দত্ত প্রণীত ইংরাজী ভাষায় লিখিত *Bengali Poetry* নামক প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরস্বরূপে লিখিত হইয়াছে। হরচন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধে বাংলা কাব্যের রস-ঐতিহ্য অস্বীকার করিয়া কেবলমাত্র ইহার অশ্লীল প্রসঙ্গের উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। রঙ্গলাল হরচন্দ্রের অভিযোগ খণ্ডন করিয়া অশ্লীলতার স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং বাঙ্গালী কবি ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে'র সহিত ইংরাজ কবি Shakespeare-র *Venus & Adonais*-র তুলনামূলক আলোচনা করিয়া এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংরাজী কাব্য সাহিত্যের তুলনায় অশ্লীলতার ক্ষেত্রে বাংলা কাব্যের যে ভূমিকা, তাহা অকিঞ্চিৎকর মাত্র। রঙ্গলাল তাঁহার অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধের পরিসরে প্রতিপাদ্য বিষয় বিস্তৃতভাবে বিচার-বিশ্লেষণের সুযোগ পান নাই; কিন্তু ইহার মধ্যেও যে সামান্য সমালোচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রঙ্গলাল তাঁহার প্রবন্ধের শেষভাগে ভারতচন্দ্র ও তাঁহার পরবর্তী বাঙ্গালী কবিগণ অর্থাৎ দুর্গাপ্রসাদ, রামচন্দ্র, রামেশ্বর, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, রাজা রামমোহন, নিধুবাবু, রাম বসু, রাধামোহন সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির একটি সংক্ষিপ্ত কাব্য-পরিচিতি দান করিয়াছেন। পরবর্তী কালে বাংলা কাব্য প্রসঙ্গে যে ধারাবাহিক আলোচনা বহুল পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়, বীজাকারে তাহার প্রথম প্রকাশ রঙ্গলালের মধ্যেই পরিলক্ষিত হইয়াছে। রঙ্গলাল স্বয়ং কবি ছিলেন। অতএব কাব্য-বিচারে তাঁহার এক স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। ভারতচন্দ্রের কবিত্ব প্রসঙ্গে তাঁহার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। রঙ্গলাল লিখিয়াছেন—

'যথার্থ কবির চিহ্ন যথার্থ বর্ণনা অর্থাৎ কবি যে বিষয়ে বর্ণনা করিবেন, সে বিষয় পাঠ করিতে২ বোধ হইবেক, যেন তাহা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হইতেছে, "Thoughts that breathe and words that burn"—ভারতচন্দ্র রায়ের গাথায় শ্বাস প্রবহন এবং ভাবজালে অনল প্রভবন হইয়াছে কিনা, তাহা রতি বিলাপ এবং বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ প্রথম মিলনের পূর্ব্বাবস্থা পাঠ করিলেই প্রমাণীকৃত হইবেক।'[১]

বক্তব্য বিষয়ের স্পষ্টতার প্রতি রঙ্গলালের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এবং বিষয়ানুসারে তাঁহার ভাষাও সরস ও সাবলীল হইয়াছে।

রঙ্গলাল প্রণীত অপর একটি প্রবন্ধ পুস্তিকা 'শরীর সাধনী বিদ্যার গুণোৎকীর্ত্তন' ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। হেয়ার বার্ষিক সমাজ কর্তৃক পুরস্কৃত হইবার ফলে প্রবন্ধটি তৎকালে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। রঙ্গলাল তাঁহার এই প্রবন্ধ পুস্তিকায় দৈহিক বলবীর্য সাধনায় ব্যায়াম-বিদ্যার উপকারিতা এবং পাশ্চাত্ত্য বিভিন্ন দেশের ব্যায়াম চর্চার প্রসঙ্গ অতি সরস ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। দৈহিক বলবৃদ্ধি সাধনকল্পে বিশিষ্ট শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলনের অনুকূলে রঙ্গলাল যে যুক্তিসমূহের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা প্রবন্ধটি অধিকতর মূল্যবান্ হইয়াছে। এ'কথা অস্বীকার করা যায় না যে, গভীর স্বাদেশিক চেতনাই রঙ্গলালকে এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রঙ্গলালের প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'যে জাতি শারীরিক বলে অপটু এবং কোন কোন মানসিক বলের প্রাচুর্য্য জন্য প্রসিদ্ধ, সে জাতি জাতিমধ্যেই গণনীয় নহে,—তাহাদিগের মধ্যে একতা সঞ্চারের সম্ভাবনা নাই,—দেশানুরাগব্রতে তাহাদিগের কোনরূপেই প্রগাঢ় স্পৃহা জন্মে না,—দৈহিক বলবিহীনতা ও ভীরুতা বশতঃ প্রবঞ্চনা, প্রতারণা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি কণ্টকজালে তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র সমাকীর্ণ হয়।'[২]

রঙ্গলালের কৃতিত্ব যে, নীরস বিষয়ও তাঁহার বর্ণনা-কৌশলে সরস সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে।

রামনারায়ণ তর্করত্ন—বাংলা নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়া রামনারায়ণ বাংলা সাহিত্যে যশস্বী হইয়াছেন। বাংলা নাটকের আদি যুগে সামাজিক নাটক

১ 'বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ', (কলিকাতা, ১৮৫২), পৃঃ ৪৩

২ 'শরীর সাধনী বিদ্যাশিক্ষার গুণোৎকীর্ত্তন', (কলিকাতা, ১৮৬০), পৃঃ ৪

রচনায় তাঁহার স্বাভাবিক নাট্য-দক্ষতার জন্য তিনি জনসমাজে 'নাটুকে রামনারাণ' নামেই সমধিক পরিচিত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে রামনারায়ণের অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল এবং তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিলেও রামনারায়ণের সর্বপ্রথম বাংলা রচনা তাঁহার প্রবন্ধ, কোন নাট্যগ্রন্থ নহে। বাংলা ভাষায় রামনারায়ণের প্রথম লিখিত পুস্তক 'পতিব্রতোপাখ্যান' ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের শিরোনামে উপাখ্যান লিখিত হইলেও ইহা মুখ্যতঃ সামাজিক ও নৈতিক উপদেশাশ্রিত একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ। এই প্রবন্ধ রচনা করিয়া রামনারায়ণ রংপুরের কুণ্ডি পরগণার বিখ্যাত ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহোদয়ের প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। 'পতিব্রতোপাখ্যান' রামনারায়ণের একমাত্র প্রবন্ধ পুস্তক এবং প্রতিযোগিতার অনিবার্য প্রেরণার বশেই তিনি ইহা রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নাটক ব্যতীত রামনারায়ণ অপর কোন প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রণয়নে সচেষ্ট হন নাই।

'পতিব্রতোপাখ্যান' প্রবন্ধে পতিব্রতা রমণীগণের ধর্ম-কর্ম সংক্রান্ত বিবিধ আচার-আচরণ চিত্তাকর্ষক রীতিতে বর্ণিত হইয়াছে। 'ব্রহ্মবৈবর্ত', 'বরাহপুরাণ' প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থাদি হইতে অনুকূল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া রামনারায়ণ তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় অধিকতর প্রামাণ্য ও সমর্থনযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। প্রবন্ধের সূচনায় তিনি স্ত্রীজাতি সম্পর্কিত যে বহুবিধ সামাজিক কুসংস্কার দেশ মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা সমাজ-জীবনের কিরূপ অবনতি হইয়াছে, সেই সম্পর্কে বিবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়া রামনারায়ণ দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রামনারায়ণ রক্ষণশীল সামাজিক পরিবেশের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াও সেই সমাজেরই বিধি-নির্দেশের বিরোধী হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার প্রগতিপন্থী সংস্কারমুক্ত মন ও নির্ভীক ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রকাশ করে। কিন্তু এ'কথাও স্বীকার্য যে, সামাজিক বিধি-নির্দেশসমূহের মধ্যে যেগুলি প্রকৃতই সমাজ কল্যাণকর, তাহা রামনারায়ণ আন্তরিকভাবেই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের শেষ অংশটিতে বিভিন্ন পৌরাণিক নারী-চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইবার ফলে পাতিব্রত্য ধর্মের স্বরূপ ও প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে এবং পরিবেশন-নৈপুণ্যগুণে উপাখ্যানের ন্যায় ইহা সরস ও উপভোগ্য হইয়াছে।

রামনারায়ণের রচনা প্রসাদগুণ বিশিষ্ট। 'পতিব্রতোপাখ্যানে'র কোন কোন অংশে তাঁহার গদ্য-ভাষা সংস্কৃত শব্দালঙ্কারে ভূষিত হইলেও তাহা সুগম ও সহজবোধ্য হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। পতিব্রতার পরিচয় প্রসঙ্গে রামনারায়ণ লিখিয়াছেন—

'নারীরা পতিমতাবলম্বিনী হইয়া ব্যভিচারাদি দোষকে দূরীভূত করতঃ উত্তম পাতিব্রত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারেন স্ত্রীজাতির পাতিব্রত্য ধর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম তদ্ধর্ম্ম রক্ষা হইলে তাঁহারদিগের সকলি রক্ষিত হয় পুরুষদিগের নানা ধর্ম্মের উপদেশ আছে কিন্তু স্ত্রীজাতির পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বৈ আর কোন ধর্ম্ম উপদিষ্ট নহে তাঁহারা তদ্ধর্ম্মাবলম্বনে থাকিলেই ইহলোকে অনন্ত কীর্ত্তি ও পরলোকে অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া মানবজন্মের সার্থকতা বিধান করিতে পারেন। * * * যে স্ত্রী ব্রতের ন্যায় সর্ব্বদা নিজ পতির উপাসনা করেন শাস্ত্রে তাঁহাকেই পতিব্রতা কহে, সতী সাধ্বী সুচরিত্রা ও একপত্নী এই কএক শব্দ পতিব্রতার পরিচায়ক মাত্র।'[১]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—বাংলা কাব্য-সাহিত্যে নূতন যুগের প্রবর্তন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র স্থায়ী গৌরব অর্জন করিয়াছেন। কবিতার বিষয় নির্বাচনের মধ্যেই তাঁহার মৌলিকতা লক্ষ্যগোচর হয়। ঈশ্বরচন্দ্রই নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় বস্তু, সামাজিক ও সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে সরস কবিতা লিখিয়া বাংলার কাব্যাদর্শের ক্ষেত্রে আধুনিকতার সূত্রপাত করিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করিলেও সাংবাদিক ও প্রবন্ধকাররূপেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বাংলা ভাষায় প্রথম দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র বাংলার সাংবাদিক জগতের পুরোভাগে তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সংবাদপত্রের প্রথম যুগে যুগপৎ দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সম্পাদনার মধ্যে তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণ ধী-শক্তির পরিচয় লাভ করা যায়। 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) ব্যতীত ঈশ্বরচন্দ্র 'সংবাদ রত্নাবলী' (১৮৩২), 'পাষণ্ডপীড়ন' (১৮৪৬), 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' (১৮৪৭) প্রভৃতি অন্যান্য সাময়িক পত্রিকাও সম্পাদনা করিয়াছেন। কিন্তু 'সংবাদ প্রভাকর'ই তাঁহার মনীষা ও কর্মকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তৎকালে 'সংবাদ প্রভাকর'ই শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রিকার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং

১ 'পতিব্রতোপাখ্যান', (কলিকাতা, ১৮৫৩), পৃঃ ২৬

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পূর্বে এই পত্রিকায় লিখিত গদ্যের আদর্শেই সাধারণতঃ বাংলা গদ্য-রীতি পরিচালিত হইত। অক্ষয়কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ পরবর্তী কালের কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক 'সংবাদ প্রভাকরে'ই প্রথম সাহিত্যিক শিক্ষানবিশী করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত এই 'সংবাদ প্রভাকর' তৎকালে নূতন লেখকদিগের সাহিত্য-চর্চার একমাত্র আশ্রয় হইয়াছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের সার্থক প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস প্রাচীন বা অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবিদিগের অপ্রকাশিত রচনাসহ তাঁহাদের কবি-পরিচয় প্রকাশের মধ্যেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়। বাংলার প্রাচীন কবিদিগেব জীবনী ও তাঁহাদের লুপ্তপ্রায় কাব্য-সংগ্রহের উদ্যম বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বে কাহারও মধ্যে দৃষ্ট হয় নাই। বাংলা সাহিত্যে তিনিই এই জাতীয় গবেষণামূলক রচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে আধুনিকতার বার্তাবহ, তাহা তাঁহার ইতিহাস-চেতনা দ্বারা অনুভূত হয়। ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য কবি ও কবিওয়ালাব জীবন ও রচনা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের মাধ্যমে ঈশ্বরচন্দ্রের গবেষণাধর্মী অধ্যবসায়সুলভ অনুশীলন-বৃত্তির পরিচয় লাভ করা যায়। যদিও তাঁহার আলোচনাব মধ্যে ঐতিহাসিক পারম্পর্য ও ধারাবাহিকতা সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হয় নাই, তথাপি প্রাথমিক প্রয়াস ও পরবর্তী কালের গবেষকদিগের প্রেরণাস্বরূপ ঈশ্বরচন্দ্রের সংগৃহীত ও লুপ্তপ্রায় তথ্যের ভিত্তিতে লিখিত এই প্রবন্ধসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অনুপ্রাসের বাহুল্য ঈশ্বরচন্দ্রের সর্ববিধ রচনারই প্রধান বৈশিষ্ট্য। শব্দাড়ম্বরপ্রিয় কবির গদ্য-ভাষার মধ্যেও শব্দচ্ছটা ও অনুপ্রাসচমকের আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। কাব্যে যে রচনারীতি শ্রুতিসুখকর ও চিত্তাকর্ষক, তাহাই গদ্যে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও এই কাব্যসুলভ রচনারীতি অনুসরণ করিয়াছেন এবং ফলে তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়গত গাম্ভীর্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পূর্বতন অপস্রয়মান কবি সম্প্রদায়ের জীবন ও তাঁহাদের অপ্রকাশিত রচনার পরিচয় প্রসঙ্গে যে সমুদয় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে'ই প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র প্রণীত 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। জীবিতাবস্থায় ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের একমাত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের জীবন-বৃত্ত ব্যতীত তিনি কবির অপ্রকাশিত বহু উৎকৃষ্ট পদ এবং 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি গূঢ়ার্থব্যঞ্জক কাব্যাংশের টীকাসহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'অন্নদামঙ্গল' প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য তাঁহার পরিণত কাব্যরসগ্রাহী মনের পরিচায়ক। কাব্যগত রস-মীমাংসার ক্ষেত্রেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঈশ্বরচন্দ্রের প্রবন্ধের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল—

'এই পুস্তকে তত্তৎ প্রসঙ্গানুসারে প্রায় নবরস বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শুদ্ধ শৃঙ্গার রসের প্রাবল্যরূপেই বর্ণনা হইয়াছে, এবং বীর রসেরো কিঞ্চিৎ প্রাবল্যমাত্র। অপর করুণা, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্তি এই সপ্তরসের স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বর্ণনা হইয়াছে, কিন্তু তাহা প্রধান রূপে গণ্য হইতে পারে না। এই স্থানে অন্য রসের কথাই নাই, সমস্ত গ্রন্থখানি অন্বেষণ করিয়া দুই এক স্থানে যৎকিঞ্চিৎ করুণা রস যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাও শৃঙ্গার রসের প্রসঙ্গাধীনেই লিখিত হইয়াছে, শান্তি রস নাই বলিলেই হয়।

'অপিচ, নায়িকা বিশেষের অবস্থা বিশেষ, ও নায়ক প্রভেদ ও উদ্দীপন, আলম্বন, বিভাবন ও কোন কোন স্থানে ধ্বনি ও ব্যঙ্গ ইত্যাদিও সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।'[১]

প্রাচীন কবি ও কাব্যগ্রন্থের প্রসঙ্গ ব্যতীত ঈশ্বরচন্দ্র অপর কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত অথচ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে এতৎকাল অমুদ্রিত ঈশ্বরচন্দ্র প্রণীত ও সংগৃহীত প্রাচীন কবিদিগের জীবনী ও তৎসম্পর্কিত রচনা সম্প্রতি ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী' গ্রন্থে একত্র সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

রাজনারায়ণ বসু—অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বের বিবিধ প্রবন্ধকারগণের মধ্যে রাজনারায়ণ একটি নির্দিষ্ট আসন অলংকৃত করিয়াছেন। বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট বাগ্মী, শিক্ষাব্রতী ও ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রচারক হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় দিগ্‌ভ্রান্ত বাঙ্গালী সমাজে আবির্ভূত

১ 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত', (কলিকাতা, ১৮৫৫), পৃঃ ৫৭

হইয়াও তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁহার স্বধর্ম ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। যদিও হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্রাবস্থায় রাজনারায়ণ উচ্ছৃঙ্খল ও অমিতাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা সাময়িক যুগ-উত্তেজনা মাত্র। পরবর্তী কালে তিনি মিতাচারী, সংযত ও দেশের সামাজিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হইয়াছিলেন। দেশমাতৃকা ও মাতৃভাষা বাংলার প্রতি রাজনারায়ণের গভীর অনুরাগ ছিল। দেশীয় ঐতিহ্য, শিক্ষা, সাহিত্য ও ধর্মের উৎকর্ষ সাধনকল্পে তাঁহার আজীবন একনিষ্ঠ সাধনার ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। রাজনারায়ণ স্বদেশবাসীর সম্মুখে কেবলমাত্র বক্তৃতার মাধ্যমে উপদেশ প্রদান করিয়াই নিরস্ত হন নাই—বিবৃত বাণীকে কার্যে পরিণত ও সার্থক রূপ দিবার অশ্রান্ত উদ্যমও তাঁহার মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছে।

রাজনারায়ণের বিভিন্ন স্থানে বিবিধ বিষয় সম্পর্কিত প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহের অধিকাংশই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রধানতঃ সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনাই রাজনারায়ণের মুখ্য বিষয় ছিল। ধর্ম প্রসঙ্গে বক্তৃতাই তাঁহার সর্বাধিক। বক্তব্য বিষয়ের একমুখীনতা ও পরিমিত সংহত গুণের জন্য রাজনারায়ণের সর্ববিধ আলোচনাই প্রবন্ধস্তরে উন্নীত হইয়াছে। তাঁহার প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা' ১ম ভাগ, (১৮৫৫), ২। 'ব্রহ্মসাধন' (১৮৬৫), ৩। 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' ১ম ভাগ, (১৮৬৬), ২য় ভাগ, (১৮৬৭), ৪। 'রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা' ২য় ভাগ, (১৮৭০), ৫। 'প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে'? (১৮৭৩), ৬। 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭৩), ৭। 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪), ৮। 'ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব' (১৮৭৫), ৯। 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত (১৮৭৬), ১০। 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮), ১১। 'বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম খণ্ড, (১৮৮২), ১২। 'সারধর্ম' (১৮৮৬), ১৩। 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (১৮৮৭) ও ১৪। 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত' (১৯০৯)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, 'রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা' (১ম ও ২য় ভাগ) তাঁহার লিখিত বক্তৃতাবলীর একত্র সংকলন গ্রন্থ। কলিকাতা ও মেদিনীপুরের ব্রাহ্ম সমাজে ধর্ম বা তত্ত্ব প্রসঙ্গে তিনি এই সকল রচনা ক্রমান্বয়ে পাঠ করিয়াছিলেন। বক্তৃতাকারে লিখিত হইলেও রচনাসমূহের মধ্যে প্রবন্ধের বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ বর্তমান।

রাজনারায়ণ বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রবেত্তা একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ধর্ম বা তত্ত্ব সংক্রান্ত প্রবন্ধে ব্রহ্মবাদের অনুকূলে বিবিধ ধর্মতত্ত্বের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা লক্ষ্য করা যায়। যুক্তি-তথ্য সমন্বিত তাঁহার ধর্ম ব্যাখ্যানগুলি, বিশেষতঃ তাঁহার প্রণীত 'ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা' (১ম ও ২য় ভাগ) বাংলা ভাষায় ধর্মবিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট আলোচনা-ভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধ গ্রন্থ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। রাজনারায়ণের ধর্ম-ব্যাখ্যায় নীরস শাস্ত্র-কথা বিবৃত হইলেও, রচনাগুণে তাহা সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার গদ্য-ভাষাও অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরস। মৌখিক ভাষার সহজাত প্রাঞ্জলগুণ সাধু ভাষার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া তিনি ভাষাকে অধিকতর অনায়াসগতি ও সাবলীল করিয়া তুলিয়াছেন। রাজনারায়ণের ধর্ম বা তত্ত্ব প্রসঙ্গে লিখিত প্রবন্ধের চিন্তা বা ভাবধারাই কেবল নহে, ভাষা ও প্রকাশরীতিও দেবেন্দ্রনাথের রচনাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। রাজনারায়ণ দেবেন্দ্রনাথের সমকালীন লেখক এবং তাঁহারা একই ধর্মমতের পরিপোষক ও প্রচারক ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণের মধ্যে পারস্পারিক সৌহার্দও গভীর ছিল এবং ধর্ম বা তত্ত্ব প্রসঙ্গে তাঁহারা উভয়েই ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনা করিতেন। অতএব রাজনারায়ণের প্রবন্ধে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক নহে।

দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় রাজনারায়ণেরও একটি কবি-মন ছিল। তাঁহার সর্ববিধ রচনার মধ্যে এক ভাবমুগ্ধ কবির অন্তরঙ্গ স্পর্শ অনুভব করা যায়। ঐকান্তিক রসোপলব্ধিজাত কবিত্বময় ধর্ম-ব্যাখ্যা রাজনারায়ণের পূর্বে কেবলমাত্র দেবেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়। রাজনারায়ণের ধর্মীয় প্রবন্ধের কোন কোন অংশে কবিত্বের আতিশয্য থাকিলেও, তাহাতে যুক্তি বা তথ্যের বলিষ্ঠ প্রকাশেরও অভাব নাই। ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্মের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন এবং ধর্মীয় গূঢ়ার্থ বা তত্ত্ব তাঁহার সুষ্ঠু ব্যাখ্যানে অধিকতর সহজবোধ্য হইয়াছে। আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তির ভিত্তিতে ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার যে সুনিপুণ পর্যালোচনা, তাহা দ্বারা রাজনারায়ণের দ্বিধাহীন বিশ্বস্ততা ও বিশ্লেষণধর্মী মননের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনারায়ণের প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'ঈশ্বর-প্রকৃতির ভাব অন্য কোন ভাব হইতে উৎপন্ন হয় নাই। ঈশ্বর অনাদি কারণ। অনাদি কারণ অন্য সকল বস্তু হইতে ভিন্ন। অনাদি কারণের ভাব অন্য কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় নাই। পরন্তু ঈশ্বরকে যখন লোকে জড় ও

াত্মার নির্ভরস্থল বলিয়া বিশ্বাস করে, তখন তিনি জড় ও আত্মা হইতে ভিন্ন প্রকৃতি বলিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করে তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব প্রমাণ ইতেছে যে, ঈশ্বর-প্রকৃতির ভাব মূল ভাব।

যখন প্রমাণীকৃত হইল যে, ঈশ্বরের ভাব মূল ভাব, তখন তাহা কল্পনামূলক বলা াইতে পারে না।

ঈশ্বর-তত্ত্ব-প্রত্যয় যুক্তিমূলকও নহে। * * * যুক্তির বিষয়ীভূত বস্তু ান্যান্য বস্তু সদৃশ, কিন্তু ঈশ্বরের ভাব মূল ভাব।

অতএব ঈশ্বরে বিশ্বাস কল্পনা অথবা যুক্তিমূলক বিশ্বাস বলা যাইতে পারে না। শ্বরের অস্তিত্বে প্রত্যয় আত্মপ্রত্যয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়।'[১]

রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মের প্রবক্তা হইলেও অন্যান্য ধর্মমত বা বিশ্বাসের উপর াহার কোনরূপ অশ্রদ্ধা ছিল না। স্বীয় ধর্মমত আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি কখনও কান বিরোধী ধর্মের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রকাশ করেন নাই। সংযত । সৌজন্যসুলভ মিতভাষণে রাজনারায়ণের প্রবন্ধ এক পরিচ্ছন্ন পরিশুদ্ধি অর্জন রিয়াছে। ধর্মপ্রচারকদের ব্যবহার ও কর্তব্য প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ লিখিয়াছেন—

'যখন মনুষ্যের ধর্ম্মমত এত বিচিত্র ও পরিবর্ত্তনশীল, তখন মত লইয়া এত ারামারি কেন? যদি ধর্ম্ম বিষয়ে একান্তই তর্ক করিতে হয়, তাহা হইলে াতিপক্ষের প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার ও চাতুরী প্রয়োগ না করিয়া উষ্ণতাহীন ক্তিদ্বারা বিধিমতে সৌজন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তর্ক চালান কর্ত্তব্য। তর্ককালে নাস্তিকের াতিও এইরূপ ব্যবহার করা উচিত।'[২]

সংযম ও সুরুচিবোধ বিতর্কমূলক প্রবন্ধের যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, াহা রাজনারায়ণের প্রবন্ধসমূহকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে।

রাজনারায়ণ প্রণীত 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থে দেশের সামাজিক বিবর্তন-'রিবর্তনের একটি নিখুঁত ঐতিহাসিক চিত্র বিধৃত হইয়াছে। সেকাল আর একাল র্থে স্বয়ং রাজনারায়ণ লিখিয়াছেন—

'ইংরাজী আমলের প্রথম হইতে হিন্দু কলেজ সংস্থাপন পর্য্যন্ত যে সময় তাই াকাল এবং তাহার পরের কাল একাল শব্দে নির্দ্ধারণ করিলাম।'[৩]

১ 'ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা', ১ম ভাগ, (কলিকাতা, ১৭১৮ শকাব্দ), পৃঃ ১৮-১৯

২ 'সারধর্ম্ম', (কলিকাতা, ১৮০৭ শকাব্দ), পৃঃ ১১

৩ 'সেকাল আর একাল', (কলিকাতা, ১৭৯৬ শকাব্দ), পৃঃ ২

ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত ব্যক্তিচরিত্রের মধ্য দিয়া সেকাল ও একালের সামাজিক উন্নতি-অবনতির চিত্র রাজনারায়ণ যেভাবে পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার সূক্ষ্ম মননশীলতা ও ভূয়োদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় লাভ করা যায়। এই সামাজিক ইতিহাসনিষ্ঠ প্রবন্ধ পুস্তিকাটি উপাখ্যানসুলভ আঙ্গিকে লিখিত হইবার ফলে সরস ও উপভোগ্য হইয়াছে। এ'কথা স্বীকার্য যে, ভাষাগত প্রাঞ্জলতা ও মসৃণতা পুস্তিকাটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়াছে।

রাজনারায়ণের সাহিত্য-রসাস্বাদনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং কাব্যরস-বিশ্লেষণ ও পরিবেশনের ঐকান্তিক আগ্রহের ফলস্বরূপ তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' গ্রন্থটির উল্লেখ করা যায়। রাজনারায়ণ বাংলা ভাষাগত ইতিবৃত্ত, এবং প্রাচীন কাব্য প্রসঙ্গ হইতে আধুনিক উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্বল্প পরিসরে সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব না হইলেও এক পরিণত রসিক দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তায় রাজনারায়ণ বাংলা সাহিত্যের যে সামান্য পরিচয়ও প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা রচনা-নৈপুণ্যে, বিচার-বুদ্ধির ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতায় ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে বাংলা ভাষায় তৎকালীন একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মর্যাদায় ভূষিত হইয়াছে। রাজনারায়ণ এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ ইংরাজী সাহিত্যের সহিত বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা অধিকতর মূলবান্ করিয়া তুলিয়াছেন এবং এই জাতীয় সাহিত্য-মূল্য নিরূপণের যে প্রয়াস, তাহা দ্বারা তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বিচার ও রসবোধের পরিচয়ই প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের কবিতার মৌলিক লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁহার রসগ্রাহী অথচ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। রাজনারায়ণের প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'ভারতচন্দ্রের রচনার তিনটি প্রধান লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ তাঁহার ভাষা এরূপ চাঁচা ছোলা মাজা ঘষা যে, বঙ্গদেশের অন্য কোন কবির ভাষা সেরূপ মসৃণ ও সুচিক্কণ নহে। দ্বিতীয়তঃ তিনি সংক্ষেপে এরূপ বর্ণনা করিতে পারেন যে, অন্য কোন কবি সেরূপ পারেন না * * * * । তৃতীয়তঃ তাঁহার কতকগুলি বাক্য সাধারণ জনগণ মধ্যে এত প্রচলিত যে, তাহা গৃহবাক্য হইয়া উঠিয়াছে।'[১]

বিষয়ানুযায়ী ভাবপ্রকাশে ও ভাষা প্রয়োগে রাজনারায়ণের সহজ শিল্পবুদ্ধি ও মাত্রাসংগত রসজ্ঞানের পরিচয় তাঁহার প্রবন্ধের সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

[১] 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা', (কলিকাতা, সম্বৎ ১৯৩৫), পৃঃ ১৯

রাজনারায়ণ ব্যক্তিগত জীবনে অতি কৌতুকপ্রিয় ও রসিক ব্যক্তি ছিলেন। সহজাত পরিহাসপ্রিয়তার জন্য তাঁহার অধিকাংশ রচনাই অধিকতর সরস ও উপভোগ্য হইয়াছে। রাজনারায়ণ প্রণীত আত্মচরিতাশ্রিত ব্যক্তিগত প্রবন্ধগ্রন্থ 'রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিতে'র মধ্যে তাঁহার পরিহাসকুশলী সজীব মনের স্পর্শ অনুভব করা যায়। পরিহাসপ্রিয়তা বা কৌতুকরসিকতা রাজনারায়ণের চরিত্র-সঞ্জাত এবং সেইজন্য রচনায় বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে ইহা সহজভাবেই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। এ'কথা স্বীকার্য যে, এই জাতীয় স্বাভাবিক পরিহাসনৈপুণ্যের ফলেই তাঁহার আত্মচরিত আনুপূর্বিক পাঠোপভোগ্য হইয়াছে। নতুবা আত্মচরিত হিসাবে ইহা কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের পরিচয়বাহী নহে। আত্মপ্রশংসার অতীব আতিশয্যে ইহা দোষদুষ্ট এবং বহু অপ্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত কেবল আত্মপ্রসাদের জন্যই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ আত্মকেন্দ্রিক প্রকট মনোভাবের ফলে রাজনারায়ণের আত্মচরিত সার্থক সাহিত্য-স্তরে উন্নীত হইতে পারে নাই। তাঁহার আত্মচরিতের ভাষা ধর্ম বা তত্ত্বমূলক প্রবন্ধের সংযত-গম্ভীর ভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং ইহা অপেক্ষাকৃত লঘু ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—বাংলা সাহিত্যে নির্ভীক সাংবাদিক হিসাবেই দ্বারকানাথ সমধিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। সাংবাদিক জীবনে দেশের বহুবিধ সমস্যা অবলম্বন করিয়া লিখিত তাঁহার বহু সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সকল প্রবন্ধ অদ্যাপি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইবার সুযোগ লাভ করে নাই। সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮) ও মাসিক 'কল্পদ্রুম' (১৮৭৮) পত্রিকাদ্বয়েই তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমকালীন বাংলাদেশে মেধায় ও পাণ্ডিত্যে দ্বারকানাথের সমকক্ষ মনীষীর সংখ্যা অধিক ছিল না। দ্বারকানাথ অনুবাদ-কার্যেও প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ইংরাজী গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি 'রোমরাজ্যের ইতিহাস', 'গ্রীসদেশের ইতিহাস' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। 'মনুসংহিতা', 'সাংখ্য-দর্শন'-এর প্রাঞ্জল অনুবাদেও তাঁহার নৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য।

দ্বারকানাথের সাংবাদিক জীবনের সর্বপ্রধান কীর্তি 'সোমপ্রকাশ'। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য তাঁহার খ্যাতি সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। দ্বারকানাথের সময় হইতেই প্রথম সুনিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সংবাদপত্র পরিচালনা সার্থকভাবে সুরু হইয়াছে। সংবাদ-নির্বাচন ও পরিবেশনে তাঁহার

অসাধারণ তীক্ষ্ণ ধী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'সোমপ্রকাশে'ই প্রথম বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। সুতরাং সাংবাদিক জগতে দ্বারকানাথের যে দান, তাহা কোনদিনই উপেক্ষিত হইবার নহে।

দ্বারকানাথ সংযত ভাবাপন্ন সুমার্জিত লেখক ছিলেন। কুৎসা-বিদ্রূপে ভারাক্রান্ত ও রুচিভ্রষ্ট রচনার যুগে তাঁহার সংযত-গম্ভীর ও সুরুচিসম্পন্ন প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিরোধী মতাদর্শের প্রতিবাদ জ্ঞাপনকল্পেও দ্বারকানাথ কটূক্তি বা অশ্লীলতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। যদিও কটূক্তি বা অশ্লীলতাই সমকালীন বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবাদমূলক রচনার অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল।

দ্বারকানাথের কোন মৌলিক প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নাই। স্ব-সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতেই বিভিন্ন সময়ে তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতিই মুখ্যতঃ দ্বারকানাথের প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। তাঁহার রচনা প্রসাদগুণসমন্বিত ও অনাবশ্যক বাহুল্য-বর্জিত। প্রাঞ্জলতা ও ওজস্বিতা গুণের জন্য দ্বারকানাথের ভাষা সাধারণের নিকট জনপ্রিয় হইয়াছিল। তাঁহার প্রবন্ধ প্রধানতঃ সংবাদধর্মী; ইহা বিশুদ্ধ সাহিত্য-রসাস্বাদী হইতে পারে নাই। কারণ, দেশের সাময়িক রাজনৈতিক আবহাওয়া বা প্রত্যক্ষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই দ্বারকানাথের অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধের পরিচয় স্বরূপ 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত 'যুদ্ধ কি সভ্যতার প্রধান অঙ্গ?' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল—

'শরীরের মধ্যে মস্তক যেমন প্রধান, যুদ্ধও তেমনি সভ্যতার প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। হস্ত কাটিয়া ফেল, পদচ্ছেদন কর, চক্ষুরুৎপাটন কর, নাসিকা বিলুপ্ত কর, শরীর ও শরীরীর বিয়োগ হইবে না। কিন্তু যে ক্ষণে মস্তকচ্ছেদন করিবে, সেইক্ষণেই আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। আজকাল সভ্যতার যে রীতি দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অনায়াসে এ কথা বলিতে পারা যায়, সেইরূপ সভ্যতার দয়া, ধর্ম্ম, ভদ্রতা প্রভৃতি অন্য অন্য অঙ্গচ্ছেদন কর সভ্যতা স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকিবে; কিন্তু যেক্ষণে যুদ্ধের সহিত উহার বিচ্ছেদ করিবে, সেইক্ষণে সভ্যতার জীবন সংশয়ারূঢ় হইয়া উঠিবে।'[১]

---

১ 'সোমপ্রকাশ', ২৩শ ভাগ, ১৩শ সংখ্যা, ২৯ আষাঢ় ১২৮৭, পৃঃ ১৮৯

নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু—নন্দকুমার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে'র একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন এবং এই পত্রিকায় 'পঞ্জিকা' সম্পর্কিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার জন্যই তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য ছিল। নন্দকুমার ন্যায়শাস্ত্রেও অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং ন্যায়দর্শন-তত্ত্বে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য তিনি 'ন্যায়চুঞ্চু' এই গৌরবজনক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। মাত্র ২৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নন্দকুমারের মৃত্যু হয়। কিন্তু এই স্বল্প পরিসর জীবনেই তাঁহার যে সকল রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও পরিণত চিন্তাশীলতার পরিচয় বহন করে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও নন্দকুমারের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল এবং বাংলা ভাষার পরিপুষ্টি সাধনকল্পে তাহার সক্রিয় কর্মপ্রচেষ্টারও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত হইলেও নন্দকুমারের মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি কোনরূপ অনুদারতা ও পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হয় নাই। স্বদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে তাঁহার অক্লান্ত উদ্যম ও নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান-পদ্ধতির ঔচিত্য বা যৌক্তিকতা সম্পর্কে নন্দকুমারের একটি বলিষ্ঠ বক্তব্য ছিল। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির মূলে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রাদি অনুশীলনের যেমন প্রয়োজন, তেমনি সমুন্নত ইংরাজী সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনেরও আবশ্যকতা আছে। বাংলা ভাষার উন্নতি বিধানকল্পে এই উভয় সাহিত্যের উপর যে অধিকতর নির্ভরশীল হইতে হইবে, তাহাই প্রধানতঃ নন্দকুমারের মৌলিক চিন্তাপ্রসূত যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

নন্দকুমারের একমাত্র প্রবন্ধ পুস্তিকা 'সংস্কৃত প্রস্তাব' ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে অপরিণত, অপুষ্ট বাংলা ভাষার পরিপুষ্টি সাধনের বিবিধ পন্থা নির্দেশিত হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও দায়িত্বের উল্লেখ করিয়া নন্দকুমার তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ভাব বা চিন্তার ধারা যেমন স্বচ্ছ ছিল, তেমনি তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবার এক সরল রচনাভঙ্গিও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। নন্দকুমারের প্রবন্ধের ভাষা ও বাক্য-গঠন রীতি-অপেক্ষাকৃত সংস্কৃতানুসারী হইলেও, তাহা দ্বারা তাঁহার রচনা কোথাও দুর্বোধ্য বা জটিল হয় নাই। বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি সাধনকল্পে সংস্কৃত ভাষা ও

সাহিত্য অনুশীলনের উপযোগিতা প্রসঙ্গে তাঁহার সারগর্ভ মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। এই প্রসঙ্গে নন্দকুমারের প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'বঙ্গদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষার আলোচনা যে নিতান্ত আবশ্যক * * *। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার আলোচনা উত্তমরূপে করিতে হইলে যেমন ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে হয়, সেইরূপ দর্শন শাস্ত্রেরও অনুশীলন করার বিশেষ উপযোগিতা আছে।

বাঙ্গালা ভাষার পূর্ণতা সম্পাদনের নিমিত্ত, সংস্কৃত কাব্যাদি শাস্ত্রের ন্যায় ন্যায়াদি দর্শন শাস্ত্রানুশীলনেরও সম্পূর্ণ আবশ্যকতা রহিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় যে কিছু দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি করিতে হইবে সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।'[১]

প্যারীচাঁদ মিত্র—সংস্কৃতবহুল গুরুগম্ভীর সাধুভাষার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সাহিত্যে সর্বপ্রথম চলিত অর্থাৎ কথ্যভাষা প্রবর্তনার জন্য প্যারীচাঁদ সমধিক পরিচিত হইয়াছেন। যদিও তিনি কথ্যভাষাকে সাহিত্যিক রূপ ও রীতিতে প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য হন নাই এবং তাঁহার ভাষার মধ্যেও বহু গুরুচণ্ডালী দোষ প্রকট হইয়াছে; তথাপি এ'কথা স্বীকার্য যে, বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য-সাধন এবং সংস্কৃত প্রভাবিত সহজ-গম্ভীর সাধুভাষাকে অংশতঃ নমনীয় (Flexible) করিবার প্রয়াস প্যারীচাঁদের মধ্যেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়।

প্যারীচাঁদ সর্বপ্রথম কথ্যভাষায় তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর হইতেই প্যারীচাঁদ প্রবর্তিত কথ্যভাষা 'আলালী ভাষা' নামে পরিচিত হইয়াছে। 'আলালী ভাষা'র প্রবর্তক হইলেও প্যারীচাঁদ এই ভাষা তাঁহার সর্ববিধ রচনার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহার প্রতিটি প্রবন্ধগ্রন্থই বিশুদ্ধ সাধুভাষায় লিখিত হইয়াছে। প্যারীচাঁদ বাংলা অপেক্ষা ইংরাজী ভাষাতেই অধিকাংশ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বাংলা প্রবন্ধ পুস্তিকা যথাক্রমেঃ ১। 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০) ২। 'কৃষি-পাঠ' (১৮৬১) ৩। 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫) ৪। 'ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত' (১৮৭৮) ও ৫। 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা' (১৮৭৯)। ইহা ব্যতীত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে'র ৫ম খণ্ডে প্যারীচাঁদের তিনটি চরিতমূলক

১ 'সংস্কৃত প্রস্তাব', (কলিকাতা, সম্বৎ ১৯১৬), পৃঃ ১৪-১৫

প্রবন্ধেরও সন্ধান পাওয়া যায়। প্যারীচাঁদের মৃত্যুর পরও 'পন্থা', 'নব্যভারত' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সর্বদর্শী-জ্ঞানে শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধই অধিক রচনা করিয়াছেন।

প্যারীচাঁদের 'রামারঞ্জিকা' গ্রন্থটি সংলাপাত্মক ভঙ্গিতে লিখিত হইয়াছে। ইহা বিশ সংখ্যা বা অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার প্রতিটি অধ্যায়ের সহিত পরবর্তী অধ্যায়ের একটি অন্তর্লীন যোগসূত্র আছে। সংলাপাত্মক ভঙ্গিতে ব্যাপকভাবে প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস রামমোহন-পর্বেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করা যায়। প্যারীচাঁদ তাঁহার প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পর্বে প্রচলিত সংলাপাত্মক রীতিরই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। 'রামারঞ্জিকা'য় পতি-পত্নীর কথোপকথনের মধ্য দিয়া নারীজাতির সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার উৎকর্ষ-সাধন বিষয় দৃষ্টান্তসহ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উদ্দেশ্যে প্যারীচাঁদ মহাভারত, শ্রুতি, স্মৃতি ও বিবিধ পুরাণাদি হইতে সংস্কৃত বচন উদ্ধার করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় বহুল তথ্যনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য করিয়াছেন। কথোপকথনমূলক ভঙ্গিতে লিখিত হইবার ফলে প্যারীচাঁদের রচনায় প্রবন্ধগত সংহতগুণ ও প্রতিপাদ্য বিষয়গত গুরুত্ব কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে, এই জাতীয় রচনারীতি উপদেশাশ্রিত বা নীতিমূলক প্রবন্ধকে সরস ও চিত্তাকর্ষক করিবার পক্ষে উপযোগী হইয়া থাকে।

প্যারীচাঁদ প্রণীত 'যৎকিঞ্চিৎ' দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত ঈশ্বর-তত্ত্বমূলক একটি দার্শনিক রচনা। আখ্যানের আবরণে প্যারীচাঁদ ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অবিনাশিত্ব, পরলোক ও উপাসনাদি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণ ধর্মীয় বা দার্শনিক প্রবন্ধের কলাবিধি তিনি ইহাতে অনুসরণ করেন নাই। সহজ আখ্যানমূলক রীতিতেই প্যারীচাঁদ দুরূহ ধর্ম বা দার্শনিক তত্ত্ব এই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ধর্মভাবপূর্ণ উদার ব্যক্তিত্বের স্পর্শে এই জাতীয় প্রবন্ধ অধিকতর আকর্ষণীয় হইয়াছে। প্যারীচাঁদের প্রবন্ধ হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল—

'হে পরমাত্মন! * * * তুমি সামান্য রূপে সকল বস্তু ও জীবে আছ। জ্যোতিস্বরূপ, গতিস্বরূপ, আকর্ষণস্বরূপ, সৌন্দর্যস্বরূপ, সুগন্ধস্বরূপ, সুরম্য ধ্বনিস্বরূপ! তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা-সর্ব্বসুখদাতা। বাহ্যরাজ্যে যেমন দিবাকর প্রজ্বলিত; তেমনি অন্তররাজ্যের তুমি সূর্য্য। তোমার জ্যোতিতে আত্মার মালিন্য ও তিমির

তিরোহিত হয়—যে আত্মা নত, পরিশুদ্ধ ও জ্ঞানে ও প্রেমেতে পূর্ণ; সেই আত্মাতেই তুমি বিশেষরূপে বিরাজ কর, তখন সেই আত্মাই তোমার স্বর্গের স্বর্গ হয়। তোমার অস্তিত্ব প্রত্যেক নিঃশ্বাসে, প্রত্যেক দৃষ্টিতে, প্রত্যেক ঘ্রাণে, প্রত্যে ধ্যানে, প্রত্যেক ভাবে জাজ্বল্যমান।'[১]

প্রাচীনকালে ভারতীয় নারীগণ সর্বক্ষেত্রেই সম্মানিতা ও পূজিতা হইয়াছেন তাঁহারা অর্থাৎ ভারতীয় পুরমহিলাগণের প্রত্যেকেই শিক্ষিতা ছিলেন এবং সেই শিক্ষা কেবমাত্র তাঁহাদের বাহ্য অলঙ্কারস্বরূপ ছিল না। আন্তরিকভাবেই তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা অর্থাৎ সাংসারিক, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করিতেন। সেইজন্য তাঁহাদিগের ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান ও আত্মার অবিনাশিতা সম্পর্কে এক বিশিষ্ট ভাব হৃদয়ে জাজ্বল্যমান থাকিত। প্রাচীন মহীয়সী নারীগণের জীবন-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া প্যারীচাঁদ 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা' গ্রন্থে তাহা পরিবেশন করিয়াছেন। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ভারতীয় ললনাগণের সমাজ ও ধর্ম-জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্য দিয়া সার্থকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে চলিত অর্থাৎ কথ্যভাষার প্রবর্তক হইলেও প্যারীচাঁদ তাঁহা সকল প্রবন্ধই সংস্কৃত শব্দবহুল সাধুভাষায় রচনা করিয়াছেন। প্যারীচাঁদ লিখিত সাধুভাষার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'দময়ন্তী ঘোর ক্লেশে পতিত হইয়াছিলেন,— অরণ্যে পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা— অর্দ্ধবস্ত্র পরিধানা, তথাচ, নিমেষমাত্র পতিকে বিস্মরণ না করিয়া অনেক দুর্গমস্থানে পর্যটনপূর্ব্বক পুনরায় পতিকে পাইয়াছিলেন।'[২]

কালীপ্রসন্ন সিংহ—বাংলা সাহিত্যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' নামক সামাজিক ব্যঙ্গ-চিত্র রচনা করিয়া কালীপ্রসন্ন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাঁহার এই ব্যঙ্গ-চিত্রটি আনুপূর্বিক বিশুদ্ধ চলিত অর্থাৎ কথ্যভাষায় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন প্যারীচাঁদের ন্যায় গুরুগম্ভীর সাধুভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার ভাষাগত ছন্দপ্রবাহে ও প্রাঞ্জলতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রভাব অধিক পরিমাণে অনুভূত হয়।

---

১ 'যৎকিঞ্চিৎ', (কলিকাতা, ১৮৬৫), পৃঃ ৮

২ 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা', (কলিকাতা, ১৮০০ শকাব্দ), পৃঃ ১২

কালীপ্রসন্ন বিভিন্ন প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া বিবিধ নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ', 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা', 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাসমূহে তাঁহার অধিকাংশ রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। কালীপ্রসন্নের গ্রন্থ-পরিচয়জ্ঞাপক প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক। ইহা ব্যতীত সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সম্পর্কেও তিনি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'সভ্যতার বিষয়', 'চাঞ্চল্য', 'বাল্যবিবাহ', 'কৌলীন্য', 'বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা' প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহ কালীপ্রসন্নেরই রচনা।

কালীপ্রসন্ন জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম কর্ণধার ও পরিপোষক ছিলেন। 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' ও 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া তাঁহার উদার সাংস্কৃতিক মনের পরিচয় লাভ করা যায়। পৌরাণিক ঐতিহ্যের প্রতি দেশীয় জনগণের সশ্রদ্ধ মনোভাব জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি মূল মহাভারত ও প্রাচীন সংস্কৃত নাটকসমূহের অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' কালীপ্রসন্নের নাটক অত্যন্ত সাফল্য সহকারে অভিনীত হইয়াছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' তৎকালীন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আলোচনার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সভায় কালীপ্রসন্ন তাঁহার অধিকাংশ লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন এবং এই সকল প্রবন্ধই পরে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন পত্রিকায় মুদ্রিত কালীপ্রসন্নের বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ একত্র সংকলিত হইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।

কালীপ্রসন্ন তৎকালীন বাংলাদেশে একজন রসিক সমালোচক হিসাবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে' কা, প্র, সি, স্বাক্ষরে তিনি মধ্যে মধ্যে গ্রন্থ-সমালোচনা করিতেন। পরবর্তী কালে অর্থাৎ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কালীপ্রসন্ন 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র সম্পাদনাভার গ্রহণ করিয়া নূতন গ্রন্থের সমালোচনা স্বয়ং নিয়মিতভাবে লিখিয়াছেন। তাঁহার বহুসংখ্যক গ্রন্থ-সমালোচনার মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ' নাটক এবং কবি শ্রীমধুসূদন প্রণীত 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সমালোচনা অন্যতম।

সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্নের মৌলিক কোন চিন্তা বা কল্পনাশক্তির অভিনবত্ব প্রকাশিত হয় নাই। রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থ-সমালোচনার ধারা তিনিও

অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু কালীপ্রসন্নের রচনায় রাজেন্দ্রলালের ন্যায় দৃষ্টিশক্তির সূক্ষ্মতা বা গভীর রসবোধের কোনরূপ পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। কালীপ্রসন্নের গ্রন্থ-সমালোচনা পরিণত সাহিত্য-রসাত্মক সমালোচনার স্তরে উন্নীত হইতে পারে নাই—ইহা সাধারণ গ্রন্থ-পরিচিতি হইয়াছে মাত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কালীপ্রসন্ন লিখিত 'নীল-দর্পণ' নাটকের আলোচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'পঞ্চমাঙ্কে এই নাটকের উপসংহার হইয়াছে। এই অঙ্কটি চারিটি গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। ইহার আনুপূর্ব্বিক সমুদায়ভাগে করুণা রস প্রবাহিত; এমন কি এক এক স্থান প্রণয়ন সময়ে লেখকের লেখনী অশ্রুনীরে অভিষিক্তা হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর অনতিপরই নীলকরের সহিত বিবাদ করিয়া নবীনমাধব নিজে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। বসুগৃহিণী প্রিয় পতি পুত্র বিনাশ শ্রবণে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া স্বয়ং পুত্রবধূরে বিনাশ করিলেন। এই ঘটনা বিলক্ষণ বিস্ময়কার্য। এক সময়ে যে গৃহস্থের কিছুরই অভাব ছিল না, * * * । শুদ্ধ নীল বপনানুরোধে ঐ সুখসংসার শ্রীভ্রষ্ট ও শ্মশানতুল্য হইয়া উঠিল। নীলদর্পণ গ্রন্থকারকে প্রস্তাবটী অমূলক অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে হয় নাই।'[১]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ একজন বিচিত্র প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন। কাব্য, সংগীত, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব ও গণিতশাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'স্বপ্ন-প্রয়াণে'র কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করিলেও একজন বিশিষ্ট প্রবন্ধকাররূপেও তাঁহার একটি স্বতন্ত্র আসন আছে। ধর্ম, দর্শন, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে তিনি বহুসংখ্যক সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং তাহার অধিকাংশ প্রবন্ধই 'ভারতী' 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রে প্রকাশিত হয়। এই সকল পত্রিকার সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ন্যায় বিশিষ্ট সাময়িক পত্রটি তিনি দীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ মূলতঃ একজন দার্শনিক মনীষী। প্রথম জীবনে কিয়ৎকাল কাব্য ও সংগীত রচনা করিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বে যে কয়েকজন ক্ষুরধার মেধাসম্পন্ন প্রবন্ধকার

১ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ', ১ম পর্ব্ব ২য় কল্প, আষাঢ় ১৭৮৩ শকাব্দ, পৃঃ ৫২

বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যুক্তিধর্মী মননের চূড়ান্ত বিকাশ যাঁহাদের প্রতিটি রচনার মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছে, দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিলেও তাঁহার দর্শন বা তত্ত্ব সম্পর্কিত প্রবন্ধের সংখ্যা পরিমাণে অধিক এবং বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে দার্শনিক প্রবন্ধকাররূপেই তিনি সমধিক পরিচিত হইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'ভ্রাতৃভাব' (১৮৬৩), ২। 'তত্ত্ববিদ্যা' ১ম—৪র্থ খণ্ড, (১৮৬৬-৬৯), ৩। 'অদ্বৈতমতের সমালোচনা' (১৮৯৬), ৪। 'অদ্বৈতমতের প্রথম ও দ্বিতীয় সমালোচনা' (১৮৯৭), ৫। 'ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন' (১৯০০), ৬। 'আচার্য্যের উপদেশ' ১ম খণ্ড, (১৯০০), ২য় খণ্ড, (১৯০২), ৭। 'শ্রীমন্মহর্ষিদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আচার্য্য শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা' (১৯০১), ৮। 'একটি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর' (১৯০৬), ৯। 'বঙ্গের রঙ্গভূমি' (১৯০৭), ১০। 'গীতাপাঠ' (১৯১৫), ১১। 'নানা চিন্তা' (১৯২০), ১২। 'প্রবন্ধ-মালা' (১৯২০) ও ১৩। 'চিন্তামণি' (১৯২২)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রণীত 'নানা চিন্তা', ও 'প্রবন্ধ-মালা' গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত প্রবন্ধসমূহের অধিকাংশ ইতিপূর্বেই পৃথক্‌ভাবে ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথের নিজস্ব একটি গদ্যরীতি ছিল। প্রবন্ধ রচনায় তিনি যে রীতি ও ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা যেমন যুক্তিনিষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল, তেমনি প্রাঞ্জলতাগুণে সমৃদ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য গদ্যরীতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইলেও দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনারীতি কোন বিদেশী গদ্যের প্রভাবে গড়িয়া উঠে নাই। বরং বাক্-পদ্ধতি বা ভাষাগত বিশেষত্বের মধ্যে সংস্কৃত ও দেশী অর্থাৎ চলিত বাংলার প্রকৃতি বা লক্ষণগুলিই অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার গদ্যরীতি অপেক্ষাকৃত চলিত অর্থাৎ কথ্য-রীতি অনুসরণ করিলেও কথ্য-ভাষা ইহাতে ব্যবহৃত হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রনাথের নিজস্ব 'স্টাইল' অর্থাৎ রচনারীতির ইহাই বৈশিষ্ট্য।

দ্বিজেন্দ্রনাথ মনননিষ্ঠ দার্শনিক প্রবন্ধই অধিকসংখ্যক রচনা করিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনশাস্ত্রেই তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। দুরূহ দার্শনিক মতবাদ বা তত্ত্বকে সরলভাবে পরিবেশন ও বোধগম্য করিয়া তুলিবার এক দুর্লভ ক্ষমতার তিনি অধিকারী ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের পূর্বে এই জাতীয় সরস দার্শনিক প্রবন্ধ প্রায় বিরলগোচর। দর্শনের নীরস ও কঠিন

তত্ত্বকথা যে কিরূপ সরস ও সহজ হইতে পারে, তাহা দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার বিভিন্ন দার্শনিক প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিবিধ দর্শন-তত্ত্বসমূহ তিনি গভীরভাবে অনুশীলন করিয়া এক সহজাত দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। ফলে অতি দুর্বোধ্য তত্ত্বসমূহ দ্বিজেন্দ্রনাথের ধ্যানদৃষ্টির নিকট অতি সহজ রূপ গ্রহণ করিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে এবং তিনি তাহাই তাঁহার প্রবন্ধ মধ্যে অতি সরল ভঙ্গি ও সুস্পষ্ট ভাষার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের গভীর অন্তর্দৃষ্টি কেবলমাত্র বিবিধ দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন বা অনুশীলন দ্বারাই অর্জিত হয় নাই— ইহা তাঁহার মনন ও একাগ্র নিদিধ্যাসনের সার্থক ফলশ্রুতি। একনিষ্ঠ ধ্যানোপলব্ধিজাত ভাব-গভীরতা ও ভক্তি-বিহ্বল কবিপ্রাণতায় দ্বিজেন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রবন্ধমাত্রেই অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে। 'তত্ত্ববিদ্যা', 'অদ্বৈতমতের সমালোচনা', 'ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন', 'গীতাপাঠ' প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থ এই বৈশিষ্ট্য দ্বারা সমুজ্জ্বল হইয়াছে। 'গীতাপাঠ' দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ। ইহাতে দুরূহ তত্ত্বকথা দুর্লভ সাহিত্য-রসে নিষিক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রবন্ধ যেমন, 'তত্ত্ববিদ্যা' গ্রন্থেও দ্বিজেন্দ্রনাথের স্পষ্ট, প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা-নৈপুণ্য সমধিক লক্ষ্য করা যায়। দুর্বোধ্য জটিল বিষয়ও তাঁহার পরিবেশনগুণে সহজবোধ্য হইয়াছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন —

' "আমি" বলিলে যে আত্মাকে বুঝায়, তাহাই জীবাত্মা। এই জীবাত্মা জড়-ভাব দ্বারা ওতপ্রোত ;—জীবাত্মার চিন্তা সংশয় দ্বারা, স্পৃহা অভাব দ্বারা, যত্ন আলস্য দ্বারা ওতপ্রোত। এই জড় ভাবাশ্রিত জীবাত্মার মধ্য হইতে যে এক পবিত্র নিষ্কলঙ্ক আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই পরমাত্মা। জীবাত্মা শরীরী, পরমাত্মা অশরীরী ; জীবাত্মা অপূর্ণ-আত্মা ; পরমাত্মা পূর্ণ-আত্মা ; জীবাত্মা জড়ময় আত্মা, পরমাত্মা অসঙ্গ নির্লিপ্ত কেবলাত্মা। অসীম আকাশ মূলে না থাকিলে যেমন খণ্ড আকাশ থাকিতে পারে না, সেইরূপ পূর্ণ-আত্মা মূলে না থাকিলে অপূর্ণ-আত্মা থাকিতে পারে না, যেহেতু অপূর্ণ-আত্মা পূর্ণ-আত্মারই প্রতিকৃতি।'[১]

দার্শনিক তত্ত্ব বা ধর্মপ্রসঙ্গ ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রনাথ সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়েও কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। 'সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য', 'মুখ্য এবং

১ 'তত্ত্ববিদ্যা', ৪র্থ খণ্ড, (কলিকাতা, সম্বৎ ১৯২৪), পৃঃ ৩০-৩১

গৌণ', 'সোনার কাটি রূপার কাটি', 'একটি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁহার ভূয়োদর্শিতা ও গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথের সুচিন্তিত যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধসমূহ ভাষা ও পরিবেশন-নৈপুণ্যে আখ্যানমূলক রচনার ন্যায় সুললিত ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সামাজিক সমস্যামূলক প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধানে তাঁহার সারগর্ভ অথচ বলিষ্ঠ বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য এবং ইহা দ্বিজেন্দ্রনাথের গভীর অনুধ্যান ও বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচায়ক। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা বাঙ্গালী জাতিকে যখন নিজস্ব কল্যাণকর জাতীয় ভাবের প্রতি নিতান্ত অশ্রদ্ধা ও অনাস্থাশীল করিয়া তুলিতেছিল, সেই সংকটমুহূর্তে দ্বিজেন্দ্রনাথ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ও গভীর চিন্তা সহকারে তাঁহার প্রবন্ধের মধ্য দিয়া যে বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ব্যর্থ ও সুলভ ভাবালুতারই পরিচয়বাহী নহে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠ পন্থারই অনুসারী। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'মুখ্য এবং গৌণ' নামক প্রবন্ধের একাংশে লিখিয়াছেন—

'বাঙ্গালীদের দেশ কাল অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তটি স্থির হয় যে, স্বজাতীয় ভাব অর্থাৎ মঙ্গলপ্রধান ভাব অবলম্বন করিয়া চলাই বাঙ্গালীদের মুখ্য কর্ত্তব্য * * * ।

* * * বঙ্গীয় যুবকেরা ইংরাজদিগের অনুকরণকেই সার জ্ঞান করেন; ইংরাজেরা বাস্তবিক স্বাধীন জাতি,—বাঙ্গালীরা তাঁহাদের দেখাদেখি স্বাধীনতার ভান করিয়া থাকেন—স্বাধীনতার ভান করিলেই যদি স্বাধীন হওয়া যাইত, তাহা হইলে শুকপক্ষীও বক্তৃতা-বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারিত। স্বাধীনতার ভান না করিয়া, স্বাধীনতা লাভের উপায় অবলম্বন করা তাঁহাদের আবশ্যক। সে উপায় মঙ্গল-ভাবের অনুশীলন। কেননা আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা, তাহাতেই লোকের মধ্যে ঐক্য হয়, তাহাই সকল স্বাধীনতার মূল। মঙ্গল-ভাবের অনুশীলন করিলে, হিন্দুদিগের স্বজাতীয় ভাবেরই অনুশীলন করা হয়, কেননা হিন্দুজাতি মঙ্গলপ্রধান।'[১]

সহজ পরিহাসপ্রিয়তা দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আলোচনার বিষয়ভেদে তাঁহার প্রবন্ধের কোন কোন অংশ তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপাত্মক

১ 'প্রবন্ধ-মালা', (কলিকাতা, ১৩২৭), পৃঃ ১৪-১৫

তির্যক ভাষণে উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের মধ্যেই অধিকতরভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথের এই পরিহাসকুশলী মনের সম্যক্ পরিচয় লাভ করা যায়।

বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠা, বিশুদ্ধ পরিহাসপ্রিয়তা ও প্রকাশভঙ্গির পরিচ্ছন্নতাই দ্বিজেন্দ্রনাথের সর্ববিধ প্রবন্ধের মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

রাসসুন্দরী দাসী—বাংলা সাহিত্যে যখন আত্মজীবনী রচনার কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ণীত হয় নাই এবং ব্যক্তিগত জীবন প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া যখন কোন প্রকার রচনার প্রয়াস সাহিত্যে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে নাই, সেই সময়ে রাসসুন্দরীর আত্মচরিতাশ্রিত ব্যক্তিগত প্রবন্ধ পুস্তিকা 'আমার জীবন', (১৮৬৮) নিঃসন্দেহে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি এবং বাঙ্গালী মহিলার প্রথম এই 'জাতীয় সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হিসাবে ইহা অভিনন্দনীয়।

'আমার জীবন' গ্রন্থটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রাসসুন্দরী তাঁহার জীবনের ষাট বৎসর পর্যন্ত নিজস্ব সাংসারিক অভিজ্ঞতার বিবিধ বিষয় নিরাভরণ ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন এবং গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে রাসসুন্দরীর পরবর্তী পঁচিশ বৎসরের কথা বর্ণিত হইয়াছে। 'আমার জীবন' একটি পূর্ণাঙ্গ আত্মচরিত নহে; ইহা মুখ্যতঃ একটি স্মৃতিচিত্র। বাল্যজীবন হইতে বার্ধক্য কাল পর্যন্ত এক সরলমনা ধর্মশীলা নারীর অজস্র অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার এক বিচিত্র স্মৃতিকথায় ইহা পূর্ণ। জীবন ও জগতের প্রতি রাসসুন্দরীর এক অপরিসীম শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ ছিল। তাঁহার এই মমতা বা শ্রদ্ধা এক গভীর ঈশ্বরপ্রীতি ও কর্তব্যনিষ্ঠার দ্বারা অধিকতর সুদৃঢ় হইয়াছিল। তিনি জীবনের সুখ-দুঃখ এবং আশা-নৈরাশ্য তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্যজ্ঞানে ও স্নিগ্ধরসে অভিষিক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। নারীজীবনের একনিষ্ঠ সাধনব্রতে ও সরল নারীচিত্তের উষ্ণ স্পর্শে 'আমার জীবন' সজীব ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে।

রাসসুন্দরী সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন পরিবারের গৃহস্থ বধূ ছিলেন। সর্বক্ষণ গৃহের অন্তঃপুরে বসবাস করিয়া তিনি নারীজীবনের অন্তর্লোকের বিচিত্র অনুভূতি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সাংসারিক জীবনের এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও তাঁহার সঞ্চিত হইয়াছিল। রাসসুন্দরী তাঁহার উপলব্ধ অনুভূতি ও জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাই সহজ ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক সহৃদয়তা ও অকৃত্রিম সত্য ভাষণে 'আমার জীবন' কেবলমাত্র.

ব্যক্তিবিশেষের জীবন-কথাতেই পর্যবসিত হয় নাই—সেকালের সকল সাধারণ হিন্দু নারীজীবনের ইহা যেন একটি প্রতিচ্ছবি হইয়া উঠিয়াছে।

রাসসুন্দরী অতি ধৈর্যশালা, কষ্টসহিষ্ণু রমণী ছিলেন। তাঁহার গভীর আত্মবিশ্বাস ও অনমনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল। ইহারই প্রেরণায় রাসসুন্দরী প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশে জীবন যাপন করিয়াও নিজস্ব অভিলাষ চরিতার্থ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তৎকালীন সামাজিক বিধি-নির্দেশ বিশেষতঃ নারীদিগের প্রতি অধিকতর নির্মম ও কঠোর ছিল। নারী-শিক্ষার প্রচলন তখন ছিল না। সমাজের সুকঠিন সংস্কারের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া রাসসুন্দরী পরিণত বয়সে গোপনে সকলের অলক্ষ্যে বিদ্যানুশীলন করিয়াছিলেন। নারী-শিক্ষার প্রতি সমাজের কঠোর বিধি-নির্দেশ ও তাঁহার ব্যক্তিচিত্তের নিরন্তর অন্তর্দ্বন্দ্ব অলঙ্কারবিরল গদ্যরীতিতে তিনি অতি সুন্দরভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। রাসসুন্দরী লিখিয়াছেন—

'অনন্তর আমার মনের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল যে, আমি একান্ত লেখাপড়া শিখিয়া পুথি পড়িব। তখন আমি মনে মনে মনের উপর রাগ করিতে লাগিলাম। কি জ্বালা হইল, এ কি দায় উপস্থিত হইল। আমি কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। তখন আমাদিগের দেশের সকল আচার-ব্যবহারই বড় মন্দ ছিল না, কিন্তু এই বিষয়টি ভারি মন্দ ছিল। সকলেই মেয়েছেলেকে বিদ্যায় বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখনকার মেয়েছেলেগুলা নিতান্ত হতভাগা, প্রকৃত পশুর মধ্যে গণনা করিতে হইবেক।'[১]

এই জাতীয় মনোভাব যেন কোন এক মহিলাবিশেষের নহে, তদানীন্তন কালের শিক্ষানুরাগিণী মহিলামাত্রেই ইহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন। রাসসুন্দরীর ব্যক্তিগত অনুভূতি বাঙ্গালী নারীর সামাজিক স্বার্থে সর্বজনীন ও মূল্যবান্ হইয়া উঠিয়াছে।

সাধারণ সাংসারিক জীবনযাত্রার মধ্য দিয়া কেবলমাত্র ব্যক্তিমনেরই বিকাশ নহে, নারীচিত্তে আধ্যাত্মিক চেতনার ক্রমোন্মেষেও 'আমার জীবন' বৈশিষ্ট্যপূর্ণ

১ 'আমার জীবন' ১ম ভাগ, (কলিকাতা, ১৩০৫), পৃঃ ৫৭

হইয়াছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে রাসসুন্দরীর ভগবদ্বিষয়ক প্রশস্তিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। 'আমার জীবন' রচনাটিতে পরিণত সাহিত্যিক সৌকর্য ও লালিত্যের অভাব থাকিলেও বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় রচনার প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবে ইহা উল্লেখযোগ্য। ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় এহ গ্রন্থের ভাষাও অপেক্ষাকৃত সহজ ও প্রাঞ্জল হইয়াছে।

'আমার জীবনে'র প্রধান বিশেষত্ব যে, ইহাতে রাসসুন্দরীর পূতঃস্নিগ্ধ অন্তরের পরিচায়িকা স্বরূপ প্রতি অধ্যায়ের সূচনায় এক একটি ভগবদ্বিষয়ক গীতিকবিতা সংযোজিত হইবার ফলে ইহা এক শুচিসুন্দর বিরল মহিমা অর্জন করিয়াছে।

এ' কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, রাসসুন্দরী প্রণীত 'আমার জীবন' কেবলমাত্র তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনেরই স্মৃতিচিত্র নহে, ইহা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর অন্দর মহলের একটি নিখুঁত আলেখ্য।

ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য—ক্ষেত্রনাথ সাহিত্য-বিচার সম্পর্কিত সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' নামক এক বিশিষ্ট সাময়িক পত্রিকার তিনি একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই পত্রিকাটির সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সম্পাদনাকালেই 'এডুকেশন গেজেটে' ক্ষেত্রনাথের প্রায় সকল রচনাই প্রকাশিত হয়।

ক্ষেত্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে একজন সিভিল ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। সুকুমার সাহিত্যের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বৃত্তি গ্রহণ করিলেও তাঁহার রসগ্রাহী সাহিত্যিক মন তাহা দ্বারা কখনও আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই। ক্ষেত্রনাথ সাহিত্যচর্চার প্রেরণা প্রধানতঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই সাহচর্যে ক্ষেত্রনাথের একটি বিশিষ্ট সাহিত্যাদর্শও গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভূদেবের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইবার পর তিনি পরবর্তী কালে 'এডুকেশন গেজেটে'র সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সাময়িক পত্রিকায় ক্ষেত্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলেও স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে তাঁহার সর্ববিধ প্রবন্ধ একত্র সংকলিত হইয়া অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। ক্ষেত্রনাথের মৃত্যুর বহু বৎসর পরে তদীয় পুত্র বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনামূলক কয়েকটি প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

গ্রন্থটি 'নাটক ও নাটকের অভিনয়' নামে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ক্ষেত্রনাথের একটি দীর্ঘ বিশিষ্ট প্রবন্ধের নামানুসারেই এই গ্রন্থটির নামকরণ করা হইয়াছে।

'নাটক ও নাটকের অভিনয়' গ্রন্থে ক্ষেত্রনাথের মাত্র চারিটি প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধসমূহের মধ্যে গ্রন্থের শিরোনামায় ব্যবহৃত অর্থাৎ 'নাটক ও নাটকের অভিনয়' নামক প্রবন্ধটি ক্ষেত্রনাথের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও উল্লেখযোগ্য রচনা। ক্ষেত্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় উপবিভাগ করিয়া অতি নৈপুণ্য-সহকারে তাহা পরিবেশন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি নাটক ও উপন্যাস এই দুই সাহিত্যরূপের উপস্থাপনা-পদ্ধতির পার্থক্য সার্থকভাবে নিরূপণ করিয়াছেন এবং পরে ইহাতে নাটকের উপাখ্যান, নাটকীয় মূল তাৎপর্য, চরিত্র-কল্পনা ও ইহার সঙ্গতি-চেতনা প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ক্ষেত্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধে উৎকৃষ্ট নাটকের স্বরূপ লক্ষণ প্রসঙ্গে যে বিচার-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা-প্রভাবিত হইলেও নাট্য-বিশ্লেষণ নৈপুণ্যে ও পরিকল্পনার অভিনবত্বে তাঁহার সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টি ও নাট্যরসানুভূতির গভীরতা অস্বীকার করা যায় না 'নাটক ও নাটকের অভিনয়' প্রবন্ধটি নাট্যকলা ও অভিনয়রীতির সামগ্রিক আলোচনায় তাৎপর্যপূর্ণ হইয়াছে।

ক্ষেত্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধ মধ্যে নাট্যগ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত 'সধবার একাদশী' নামক নাটকটির উল্লেখ করিয়া তাহার সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। নাটকীয় চরিত্রালোচনায়, বিশেষতঃ নায়ক নিমচাঁদের চরিত্র-বিশ্লেষণ হইতে সমালোচক ক্ষেত্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম রসানুভবশীলতার সম্যক্ পরিচয় লাভ করা যায়। অশ্লালতা দোষে অভিযুক্ত নাটক 'সধবার একাদশী' সম্পর্কে ক্ষেত্রনাথ সংস্কারমুক্ত হইয়া যে নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রগতিশীল অথচ সার্থক কলা-শিল্পসম্মত মনের পরিচায়ক। ক্ষেত্রনাথ উক্ত নাটকের প্রতি অশ্লীলতার অভিযোগ যুক্তির পর যুক্তি উত্থাপন করিয়া অতি নৈপুণ্যসহকারে খণ্ডন করিয়াছেন। নাটকান্তর্গত অশ্লীলতা যে, নাট্যকারের ইচ্ছাকৃত বা বিকৃত রুচি হইতে উদ্ভূত নহে, বরং নিখুঁত বাস্তব চরিত্র অঙ্কনের অনিবার্য প্রযোজনে তাহা স্বাভাবিকভাবেই সংঘটিত হয়, প্রবন্ধে তাহাও অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণসহ প্রমাণিত হইয়াছে। রসই সাধারণতঃ সাহিত্য-বিচারের অভ্রান্ত মানদণ্ড। রচনা রসোত্তীর্ণ হইল কিনা, তাহাই মুখ্যতঃ বিচার্য বিষয়। ক্ষেত্রনাথ তাঁহার আলোচনায়

সমালোচনার এই নির্দিষ্ট আদর্শটি যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত সমালোচনাত্মক প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'অবলম্বনের উত্তমতা বা অধমতার প্রতি রসাত্মক রচনার উত্তমতা বা অধমতা নির্ভর করে না। অবলম্বন অতি উত্তম হইলেও রচনা অধম হইতে পারে। অবলম্বন অধম হইলেও রচনা উত্তম হইতে পারে। রসাত্মক রচনার প্রতি তাহার অবলম্বন সামগ্রীর উপযোগিতা কিরূপ আছে, রচনার গুণাগুণ বিচারসময়ে কেবল তাহারই বিবেচনা করিতে হইবে। রোগের উপযোগী অর্থাৎ উপশমকারী হইলেই ঔষধ প্রশংসনীয় হয়; নতুবা স্বর্ণ মুক্তা প্রবালাদি মহার্হ দ্রব্যজাত হইলেই প্রশংসনীয় হয় না, অথবা অনায়াসপ্রাপ্য সর্ব্বজন বিদিত সামান্য সামগ্রী হইলেই অবজ্ঞেয় হয় না। অবলম্বনের উপযোগিতা ধরিয়াই রসাত্মক রচনার বিচার, অবলম্বনের সাধুতা অসাধুতা ধরিয়া বিচার নহে।'[১]

ক্ষেত্রনাথের গভীর চিন্তাপ্রসূত উন্নত সমালোচনা-পদ্ধতি তাঁহার অন্যান্য প্রবন্ধসমূহেও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ, কবি বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী কাব্য' ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 'ভ্রান্তিবিলাস' গ্রন্থদ্বয়ের উপর তাঁহার সংক্ষিপ্ত ও সরস আলোচনা উল্লেখযোগ্য।

ক্ষেত্রনাথের সমালোচনার ভাষাও তীক্ষ্ণাগ্র, নৈয়ায়িক বিশ্লেষণে যুক্তিনিষ্ঠ। ইহা কোথাও অতিরিক্ত পল্লবিত বা উচ্ছ্বসিত হয় নাই। বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী সতর্ক ও সুনিপুণ ভাষা-বিন্যাসেও তাঁহার সমালোচনামূলক প্রবন্ধ অধিকতর মনোজ্ঞ হইয়াছে।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ—অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বে যশস্বী প্রবন্ধকারগণের মধ্যে কালীপ্রসন্ন অন্যতম। তাঁহার প্রবন্ধ রচনার ভাষা ও রীতি-বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলা সাহিত্যে তিনি এক স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। কালীপ্রসন্নের রচনারীতি সম্পর্কে জনৈক রসিক সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য—

'যাঁহারা বাঙ্গালা গদ্যে শুদ্ধি এবং সৌন্দর্য্য একত্র মিশাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কালীপ্রসন্নের স্থান তাঁহাদের মধ্যে অতি উচ্চে। তাঁহার ভাষা সর্ব্বত্র সুন্দর এবং প্রাণস্পর্শী না হইলেও, শুদ্ধ এবং সংযত বলিয়া চিরদিন উহা বাঙ্গালীর আদরের বস্তু হইয়া থাকিবে।'[২]

১ 'নাটক ও নাটকের অভিনয়', (কলিকাতা, ১৩২৭), পৃঃ ৫২-৫৩

২ চন্দ্রশেখর বিদ্যাবিনোদ, 'পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর', (কলিকাতা, ১৩১৭), পৃঃ ৫

বিষয় নির্বাচন এবং রচনার চারুত্ব ও পরিশুদ্ধি রক্ষণে কালীপ্রসন্নের সযত্ন নিষ্ঠা বিশেষ লক্ষণীয়। গুরুগম্ভীর অথচ শ্রুতিসুখকর শব্দের প্রতি কালীপ্রসন্নের এক সহজাত আকর্ষণ ছিল এবং যথাযথ শব্দ-যোজনার দুর্লভ কৃতিত্বের পরিচয়ও তাঁহার রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁহার প্রবন্ধে শব্দাড়ম্বরের বাহুল্য থাকিলেও, তাহা জটিল বা শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।

ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত কালীপ্রসন্ন সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার তৎসম শব্দপূর্ণ গুরুগম্ভীর গদ্যরীতি বিদ্যাসাগরী গদ্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বিদ্যাসাগরী গদ্যের প্রভাব অনুভূত হইলেও কালীপ্রসন্নের রচনার মধ্যে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যও লক্ষ্য করা যায়।

কালীপ্রসন্ন বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, নীতি-ধর্ম, চরিত-কথা, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে তাঁহার প্রবন্ধ আছে। তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধই স্ব-সম্পাদিত 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকা সম্পাদনা ও তাহার পরিচালনা-কর্মেও কালীপ্রসন্ন সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। 'সাহিত্য-সমালোচনী সভা' নামে একটি সাহিত্য আলোচনা-চক্রও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। 'বান্ধবে' প্রকাশিত ও 'সাহিত্য-সমালোচনী সভা'য় পঠিত কালীপ্রসন্নের বহু প্রবন্ধই পরবর্তী কালে একত্র সংকলিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সুরসিক সমালোচক হিসাবেও তৎকালে কালীপ্রসন্ন প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধে গভীর রসাস্বাদন-বৈচিত্র্যের পরিচয় লাভ করা যায়।

কালীপ্রসন্নের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৬৯), ২। 'সমাজশোধনী' (১৮৭২), ৩। 'প্রভাত-চিন্তা' (১৮৭৭), ৪। 'নিভৃত-চিন্তা' (১৮৮৩), ৫। 'ভক্তির জয় অথবা হরিদাসের জীবন-যজ্ঞ' (১৮৯৫), ৬। 'নিশীথ-চিন্তা' (১৮৯৬), ৭। 'মা না মহাশক্তি' (১৯০৫), ৮। 'জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা' (১৯০৫), ও ৯। 'ছায়াদর্শন' (১৯১০)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কালীপ্রসন্ন প্রণীত 'ভ্রান্তিবিনোদ' (১৮৮১) গ্রন্থে তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধও সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। কালীপ্রসন্নের এই গ্রন্থটি মুখ্যতঃ রস-রচনার একটি সংকলন। যে সকল রচনায় বক্তব্য বিষয়কে গৌণ করিয়া তরল হাস্যরস বা শ্লেষ-বিদ্রূপই প্রধান হইয়া উঠে এবং বিষয়গত গাম্ভীর্য বা স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় না, তাহাই প্রধানতঃ রস-রচনা নামে অভিহিত হয়।

কালীপ্রসন্ন গভীর চিন্তাশীল লেখক ছিলেন এবং তিনি প্রধানতঃ সামাজিক কল্যাণনিষ্ঠ চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধই রচনা করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞানানুশীলিত মনন বা বুদ্ধি সম্পূর্ণ আবেগশূন্য ছিল না। এক সহজাত কাব্যানুভূতি তাঁহার দুরূহ তত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধকেও অপেক্ষাকৃত সরস করিয়া তুলিয়াছে। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং একজন গীতিকবি ছিলেন এবং তাঁহার প্রবন্ধেও গীতিকাব্যোচিত সুরের একটি স্পন্দন সর্বত্র অনুভব করা যায়।

কালীপ্রসন্ন প্রণীত 'প্রভাত-চিন্তা', 'নিভৃত-চিন্তা' ও 'নিশীথ-চিন্তা' এই গ্রন্থত্রয়ের প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং বিবিধ ভাব ও বিষয়াশ্রিত এই জাতীয় চিন্তাধর্মী প্রবন্ধসমূহের জন্যই তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মানবজীবন বা হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় রূপ-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ এক বিরল ভাবুকতা কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধ-সমূহে প্রকাশ পাইয়াছে। 'প্রভাত-চিন্তা', 'নিভৃত-চিন্তা' ও 'নিশীথ-চিন্তা' গ্রন্থত্রয়ে সংকলিত অধিকাংশ প্রবন্ধের পশ্চাতে কালীপ্রসন্নের এক গভীর ভাবদৃষ্টির পরিচয় লাভ করা যায়। এই ভাবদৃষ্টির সূক্ষ্মতাই তাঁহার প্রবন্ধসমূহকে অধিকতর সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। 'নিভৃত-চিন্তা'র অন্তর্ভুক্ত 'অশ্রুজল' নামক প্রবন্ধে কালীপ্রসন্ন অশ্রুজলের গভীর তাৎপর্যের উল্লেখ করিয়াছেন এবং অশ্রুজল যে 'দ্রবীভূত মনুষ্যহৃদয়ের সজীব ধারা', তাহা তাঁহার নিবিড় ভাব-চেতনার দ্বারা মহিমান্বিত হইয়াছে। মনুষ্যহৃদয়ের অন্তর্লোকের এক গভীরতর পরিচয় এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছেন—

'বুদ্ধি জ্ঞান দান করিতে পারে; বিবেক নির্ম্মল-চেতা নির্ভীক সুহৃজ্জনের ন্যায় নীতির দুর্গম পথ প্রদর্শন করিতে পারে;—কিন্তু তৃষ্ণায় তৃপ্তিদান করিতে, জ্বালা ও বেদনায় শান্তি দিতে, এবং শান্তি যখন আশাতীত ও অসম্ভব হয়, তখন সহানুভূতির অমৃত স্পর্শে প্রাণ জুড়াইতে মানবজগতে একমাত্র বস্তু মনুষ্যহৃদয়। অশ্রুধারা সেই মনুষ্যহৃদয়ের জীবনময়ী নির্ঝরিণী।'[১]

এই জাতীয় গভীর ভাবাশ্রিত রচনার দৃষ্টান্ত হিসাবে 'প্রভাত-চিন্তা'র 'অভিমান' এবং 'নিশীথ-চিন্তা'র 'বিরহ' নামক দুইটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়। 'নিভৃত-চিন্তা' ও বিশেষতঃ 'প্রভাত-চিন্তা'র কয়েকটি প্রবন্ধে মানবজীবনের সামগ্রিক কল্যাণসাধনের উপায় স্বরূপ বিবিধ কর্তব্য-ব্রতের বিষয় সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই

১ 'নিভৃত-চিন্তা', (ঢাকা, ১৩০৯), পৃঃ ৪২

প্রসঙ্গে 'মহত্ত্ব ও মিতব্যয়', 'বিনয়ে বাধা', 'প্রকৃতিভেদে রুচিভেদ', 'রাজা ও রাজশক্তি', 'লোকরঞ্জন' প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহ উল্লেখযোগ্য। 'নিশীথ-চিন্তা' গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ প্রবন্ধগুলি প্রধানতঃ কালীপ্রসন্নের দার্শনিক মনের পরিচয় প্রকাশ করে। কালীপ্রসন্ন ইহার ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়া মনোজগতের রহস্যগূঢ় ক্ষেত্র অনুসন্ধান করিয়াছেন। এ'কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, প্রবন্ধগত গভীর ভাব বা বক্তব্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার সহজ কবিত্বের আবেগঘন উচ্ছ্বাসে সংহত-নিবিড় বা সুষ্ঠু পরিণতি লাভের সুযোগ পায় নাই।

কালীপ্রসন্নের প্রথম পর্যায়ের প্রবন্ধসমূহ প্রধানতঃ বুদ্ধিপ্রধান ও যুক্তিনিষ্ঠ। কিন্তু তাঁহার শেষ পর্যায়ের প্রবন্ধে জ্ঞান ও যুক্তির সহিত প্রবল ভক্তিভাবেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞান ও ভক্তি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ধর্ম-দর্শন এবং বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক মতের মধ্যে এক বিরাট সমন্বয় সাধনের চিন্তাই শেষ জীবনে কালীপ্রসন্নের মন ও চিত্ত অধিকতর আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'আগে বিজ্ঞান গাইত এক গীত, ভক্তি গাইত আর এক গীত; বিজ্ঞানের কণ্ঠে ছিল এক সুর, ভক্তির কণ্ঠে ছিল আর এক সুর। এখন বিজ্ঞান আর ভক্তি, প্রেমবদ্ধ দম্পতির মত, একপ্রাণ হইয়া,—একে অন্যের কণ্ঠস্বরে সুর মিশাইয়া, মনুষ্যমাত্রকেই কহিতেছে— মনুষ্য, তুমি নয়ন মেলিয়া নিরীক্ষণ কর, এই অনন্ত জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্য সেই রাগিণীরই অনুপম রূপের আভা ও প্রতিভামাত্র।'[১]

জগতের মূলীভূত কারণ যে মহাশক্তি, তাহা যে জড় শক্তি নহে—কালীপ্রসন্ন তাঁহার প্রবন্ধে ইহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার ভক্তিভাব-প্রণোদিত আলোচনায় সেই জগন্ময়ী শক্তিই যে জীবের অপূর্ণতাজনিত দুঃখ নিরসনের একমাত্র উপায় স্বরূপ, ইহাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। মহাশক্তির সহিত তন্ময়তাবোধ জ্ঞানী, ভক্ত উভয়েরই শেষ লক্ষ্য বা পরিণতি। জ্ঞানীর অদ্বৈতবাদ ও ভক্তসাধকের দ্বৈতবাদের দ্বন্দ্ব নিছক কথা বা বাক্যকৌশলের বিরোধ মাত্র; বস্তুতঃ পরিণামে উভয়েরই একই গতিপথ অর্থাৎ শেষ সিদ্ধান্ত একই। কালীপ্রসন্ন প্রণীত 'মা না মহাশক্তি' গ্রন্থে পাশ্চাত্ত্য মনীষী Herbert Spencer লিখিত *First Principles* গ্রন্থের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভব করা যায়।

ধর্ম প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্নের কোনরূপ রক্ষণশীলতা বা সংকীর্ণচিত্ততার পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার ধর্মীয় বা ভগবৎচিন্তাশ্রিত প্রবন্ধসমূহ হইতে তাহাই

১ 'মা না মহাশক্তি', (ঢাকা, ১৩১১), পৃঃ ৯৯-১০০

প্রমাণিত হয়। আচার বা অনুষ্ঠানের সীমাবদ্ধ গণ্ডী মধ্যে, কোন বিশেষ আদর্শ বা মত-বিশ্বাসের মধ্য দিয়া তিনি পরমপুরুষকে অনুসন্ধান করিতে প্রয়াসী হন নাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ও মানুষের সর্ববিধ কর্মকৃতিতে অর্থাৎ মনুষ্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস আলোচনায়, বিজ্ঞানের জ্ঞানগর্ভ গভীর গবেষণায়, ব্যক্তিমানুষের সাধারণ বা বিশিষ্ট মানসিক প্রত্যয়ে সর্বত্রই কালীপ্রসন্ন পরমশক্তির অমোঘ প্রভাব উপলব্ধি করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন শেষ জীবনে দুরূহ রহস্যযুক্ত অধ্যাত্মমূলক তত্ত্বালোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। আত্মার স্বরূপ ও প্রকৃতি, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মার গতি বা ক্রিয়া-প্রক্রিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে চিন্তা, অনুধ্যান ও অনুশীলন করিয়াছেন। কালীপ্রসন্নের 'ছায়াদর্শন' গ্রন্থ হইতে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

কালীপ্রসন্নের চিন্তা বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নপুষ্ট চিন্তা—নিছক কল্পনাভিত্তিক নহে। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের দার্শনিক প্রবন্ধসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক এমার্সন (Emerson) এবং বিশেষতঃ কার্লাইলের (Carlyle) অন্যতম ভক্ত ও অনুরাগী পাঠক ছিলেন। জীবন ও জগত সম্পর্কে কার্লাইল এক স্বতন্ত্র মতাদর্শ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিশিষ্ট দার্শনিক দৃষ্টি দ্বারাই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। কার্লাইলের সূক্ষ্ম-গভীর দার্শনিক চিন্তার পরিচয় তাঁহার প্রণীত *Sartor Resartus* গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে বিধৃত হইয়াছে। তিনি বিশ্বজগৎ ও জীবনের মর্মমূলে এক অনির্বচনীয় মহাশক্তির (Divinity) প্রভাব অনুভব করিয়াছেন এবং মুখ্যতঃ সেই প্রসঙ্গ ভিত্তি করিয়াই কার্লাইলের বিবিধ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধ মধ্যে কার্লাইলের গভীর দর্শন-চিন্তার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় এবং এই সূত্রেই তৎকালীন বাংলাদেশে কালীপ্রসন্ন 'বঙ্গের কার্লাইল' নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ'কথা সত্য যে, কার্লাইলের চিন্তার আভাস কালীপ্রসন্নের রচনায় পরিলক্ষিত হইলেও, উক্ত ইউরোপীয় দার্শনিক মনীষীর ন্যায় সূক্ষ্ম ও অন্তর্গূঢ় দার্শনিক ভাব-ব্যঞ্জনার রূপাদর্শ তাঁহার ছিল না।

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্নের চিন্তাগত স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। বিবৃতির পরিবেশন-মাধুর্য, ভাষার বিশুদ্ধ কলা-চাতুর্য ও উপযোগী দৃষ্টান্তের প্রাচুর্যে তাঁহার সর্ববিধ প্রবন্ধই সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—সুবিখ্যাত সাময়িক পত্রিকা 'বঙ্গবাসী'র অন্যতম পরিচালক হিসাবেই হরিমোহনের নাম সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে মৌলিক প্রবন্ধ রচনা অপেক্ষা সংকলন-কার্যেই তিনি বিশেষ খ্যাতি ও সাফল্য লাভ করেন। 'সঙ্গীত-তরঙ্গ', 'সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ', 'বঙ্গভাষার লেখক' প্রভৃতি বহুল প্রচারিত গ্রন্থসমুদয় তাঁহার দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়াছে। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এই একই নামে বাংলা সাহিত্যে অপর একজন লেখকেরও সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। কিন্তু তিনি প্রধানতঃ কবি ও ঔপন্যাসিক ছিলেন এবং তাঁহার লিখিত কোন প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায় না।

সংকলন ও সম্পাদনা ব্যতীত হরিমোহন মৌলিক একটি প্রবন্ধগ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'কবি-চরিত' এবং ইহা ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে হরিমোহন কয়েকজন প্রাচীন এবং আধুনিক কবি ও তাঁহাদের কবিকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনায় হরিমোহন মুখ্যতঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্রই প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদিগের জীবন ও রচনা অবলম্বন করিয়া এই জাতীয় আলোচনার প্রথম সূত্রপাত করিয়াছিলেন। হরিমোহনের 'কবি-চরিত' প্রণয়নের পশ্চাতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রেরণা অস্বীকার করা যায় না।

হরিমোহন তাঁহার গ্রন্থে কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশারাম, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই কয়েকজন বাঙ্গালী কবির সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ তাঁহাদের কাব্য-পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। 'কবি-চরিত' গ্রন্থের উপক্রমণিকা অংশে হরিমোহনের সুচিন্তিত আলোচনাটিও এই গ্রন্থটিকে অধিকতর মূল্যবান্ করিয়া তুলিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং বাংলা কাব্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের একটি সামগ্রিক পরিচয় ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। হরিমোহনের যে একটি কাব্যরসগ্রাহী মন ছিল, তাহা তাঁহার কাব্য-বিচারনৈপুণ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের আদি পর্বে কাব্যের সাধারণ গুণ বা প্রকৃতি নির্ণয়ে তাঁহার রসসম্মত মন্তব্য উন্নত রসরুচিরই পরিচায়ক। সংযত আবেগ ও সহৃদয় আন্তরিকতায় হরিমোহনের আলোচনা সরস ও সুস্পষ্ট হইয়াছে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের কবিত্ব প্রসঙ্গে হরিমোহন লিখিয়াছেন—

'কবিরঞ্জন সকল রস বর্ণনাতেই বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ অপেক্ষা কি ছন্দোবন্ধ, কি বাগাড়ম্বর, কি কল্পনাশক্তি, কিছুতেই হীনকল্প

ছিলেন না, বরং শ্রেষ্ঠই ছিলেন। ইহার রচনা ওজস্বী, প্রগাঢ় এবং অনুপ্রাস-বাহুল্য। রায়গুণাকরের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কবিরঞ্জনের কবিতা সরল ও প্রসাদগুণসম্পন্ন নহে বটে, কিন্তু কবিত্বে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, বরং দুই একস্থানে উৎকৃষ্টই প্রতীত হইয়া থাকে।'[১]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, হরিমোহন সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৯০৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত জীবনীমূলক প্রবন্ধসমূহ বিভিন্ন লেখক কর্তৃক লিখিত হইলেও, তাহার মধ্যে হরিমোহনের কয়েকটি নিজস্ব রচনাও আছে। বিশেষতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবি-পরিচিতি প্রসঙ্গ তাঁহারই লিখিত। হরিমোহন এই সকল প্রবন্ধে উক্ত দুই যুগের কবিগণের ব্যক্তিগত জীবন সংক্ষেপে প্রামাণ্য তথ্যসহ বর্ণনা করিয়াছেন এবং কবিগণের রচনার উদ্ধৃতি দ্বারা তাঁহাদের কবিত্ব সম্পর্কেও ইহাতে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হইয়াছে। এ'কথা অনস্বীকার্য যে, হরিমোহনের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাসমূহ হইতে বিশিষ্ট সমালোচকোচিত মনীষার পরিচয় প্রকাশিত না হইলেও, তাঁহার যথার্থ রসানুভবশীলতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—বাংলাদেশে যোগেন্দ্রনাথ একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে সুপরিচিত। দেশের বিবিধ রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া তিনি তৎকালে বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় পদমর্যাদাও লাভ করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা ও সাংবাদিক কর্মকুশলতার জন্য বাংলা সাহিত্যে তিনি সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার সম্পাদনায় 'আর্য্যদর্শন' (১৮৭৪) মাসিক পত্রটি সেই সময়ে এক উচ্চশ্রেণীর আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছিল। 'আর্য্যদর্শনে'ই যোগেন্দ্রনাথের প্রায় সকল প্রবন্ধই প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধই জীবন-বৃত্ত বিষয়ক। কয়েকজন বিশিষ্ট পাশ্চাত্ত্য রাজনীতিজ্ঞ ও দার্শনিক মনীষীর জীবনচরিত রচনা করিয়া তিনি বাংলাভাষায় লিখিত জীবনীমূলক প্রবন্ধ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনার পশ্চাতে যোগেন্দ্রনাথের নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শের প্রেরণাই সমধিক কার্যকরী হইয়াছিল। তিনি যে সকল মনীষীর জীবনাদর্শের মধ্যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা-স্পৃহার দুর্দমনীয়তা লক্ষ্য করিয়াছেন, প্রধানতঃ তাঁহাদেরই জীবনের বিস্তৃত

১ 'কবি-চরিত,' (কলিকাতা, ১৮৬৯), পৃঃ ১০৭-৮

পরিচয় তাঁহার প্রবন্ধসমূহের মধ্যে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তৎকালীন পরাধীন জাতির জাতীয় চরিত্র গঠনের অন্যতম সহায়ক বা প্রেরণা হিসাবে যোগেন্দ্রনাথের এই জাতীয় প্রবন্ধসমূহের মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

যোগেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের জীবন-বৃত্ত রচনায় ইংরাজী গ্রন্থাদির আদর্শ অনুশীলন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই অনুশীলন নিছক অনুবাদের মধ্যেই পর্যবসিত হয় নাই। নিজস্ব চিন্তা ও দূরদৃষ্টির সহায়তায় যোগেন্দ্রনাথের রচনা সম্পূর্ণ নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিপাদ্য চরিত্রের মাহাত্ম্য বা বিচারযোগ্য বিশেষত্বগুলি তিনি সার্থকভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। অতএব তাঁহার জীবনীমূলক প্রবন্ধ সম্পূর্ণরূপে মৌলিকতা-বর্জিত নহে। বাংলা ভাষায় ব্যাপক-ভাবে এই জাতীয় সার্থক জীবন-বৃত্ত রচনার প্রথম গৌরব যোগেন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য। প্রবন্ধসমূহে তাঁহার গভীর অনুসন্ধিৎসা ও ভূয়োদর্শনের বিলক্ষণ পরিচয় লাভ করা যায়। ভাষার গাঢ়তা ও ওজস্বিতায় যোগেন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য বিষয় এক স্বতন্ত্র গাম্ভীর্যগুণে মণ্ডিত হইয়াছে।

যোগেন্দ্রনাথ প্রণীত প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদ্‌গ্রন্থ সমালোচনা' (১৮৭১), ২। 'জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন-বৃত্ত' (১৮৭৭) ৩। 'ম্যাট্‌সিনির জীবন-বৃত্ত' (১৮৮০) ৪। 'হৃদয়োচ্ছ্বাস বা ভারত বিষয়ক প্রবন্ধাবলী' (১৮৮১) ৫। 'আত্মোৎসর্গ বা প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা' (১৮৮৩), ৬। 'সমালোচনা-মালা' (১৮৮৫) ৭। 'ওয়ালেসের জীবন-বৃত্ত' (১৮৮৬) ৮। 'কীর্ত্তিমন্দির বা রাজপুত বীরকীর্ত্তি' (১৮৮৯) ৯। 'গারিবল্‌ডীর জীবন-বৃত্ত' (১৮৯০), ১০। '"নিষ্কৃতি-লাভ-প্রয়াস" বিফল' (১৮৯০), ১১। 'চিন্তা-তরঙ্গিণী' (১৮৯০) ও ১২। 'বীরপূজা', ১ম-২য় ভাগ (১৯০০)।

যোগেন্দ্রনাথ সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। 'হৃদয়োচ্ছ্বাস বা ভারত বিষয়ক প্রবন্ধাবলী', 'চিন্তা-তরঙ্গিনী' প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থে তাঁহার বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। যোগেন্দ্রনাথের সর্ববিধ প্রবন্ধেই তথ্য ও যুক্তির সহিত তাঁহার গভীর চিন্তা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

যোগেন্দ্রনাথ প্রণীত 'চিন্তা-তরঙ্গিণী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সমাজ, ধর্ম ও রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজ-সংস্কারমূলক প্রবন্ধসমূহের মধ্য দিয়া

যোগেন্দ্রনাথের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, যুক্তিনিষ্ঠা ও সহৃদয় আন্তরিকতার সুষ্ঠু পরিচয় লাভ করা যায়। তিনি সম্যক্‌রূপে অবহিত ছিলেন যে, সমাজ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রধানতঃ সুদৃঢ় জাতীয় চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। জাতির চারিত্রিক সমুন্নতি প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ তাঁহার 'হিন্দু সমাজ-সংস্কার' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'সমাজ-সংস্কার বা সমাজ-বিপ্লব এই দুই এরই ভিত্তি-ভূমি চরিত্র। জাতীয় চরিত্র সুদৃঢ় না হইলে সংস্কারে বা বিপ্লবে প্রবৃত্তিই জন্মিতে পারে না। শুদ্ধ নেতার মনে সে প্রবৃত্তি জন্মিলে সংস্কার বা বিপ্লব সাধিত হইতে পারে না। * * * যখন জাতি সাধারণ সৎ ও অসৎ বুঝিতে শিখিবে, এবং বুঝিয়া সত্যের অনুসরণ করিতে শিখিবে, তথনই প্রকৃত জাতীয় উন্নতি আরম্ভ হইবে।'[১]

যোগেন্দ্রনাথের 'চিন্তা-তরঙ্গিনী' গ্রন্থে সংকলিত 'ভারতের জাতীয় ভাষা', 'বর্ণভেদ', 'জাতীয় বিদ্বেষ', 'জাতীয় সংস্থান' প্রভৃতি অন্যান্য প্রবন্ধেও তাঁহার রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর জাতীয়তাবোধের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে।

যোগেন্দ্রনাথ একজন রসিক সমালোচক হিসাবেও সমাদৃত হইয়াছেন। সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণেও তাঁহার বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতার বিশেষ পরিচয় লাভ করা যায়। মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত গ্রন্থাদির আলোচনা এবং 'সমালোচনা-মালা' গ্রন্থে সংগৃহীত তাঁহার সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস অবলম্বনে লিখিত যোগেন্দ্রনাথের রসগ্রাহী আলোচনাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার এই আলোচনার মধ্যে ভাবাতিশয্যের আধিক্য থাকিলেও বক্ষ্যমাণ উপন্যাসের সাহিত্যিক উৎকর্ষ ও মৌলিকতা নির্ণয়ে যোগেন্দ্রনাথের সমালোচনা-প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

যোগেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ভাষা সাধারণতঃ বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল এবং বিষয়ানুসারে পল্লবিত বা উচ্ছ্বসিত হইলেও, তাহা তেজস্বী ও দীপ্তিময় হইয়াছে। বাংলা গদ্য-ভাষা ও রীতির ক্ষেত্রে তিনি মুখ্যতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করিয়াছেন।

১ 'চিন্তা-তরঙ্গিনী', (কলিকাতা, ১২৯৬), পৃঃ ৩৯

বঙ্কিম-পর্ব

(১৮৭২—১৮৯০)

সূচনা

(ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত জাতীয় চৈতন্যবোধ বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী জাতির জীবনী ও প্রাণশক্তি প্রকাশের যে নিত্য নূতনধারা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিল, বঙ্কিম-প্রতিভা স্পর্শে তাহা একটি সুগভীর পরিণতি ও দূরপ্রসারী বিস্তৃতি লাভ করিয়া জাতীয় জীবন ও ধর্মের একটি শাশ্বত সত্যরূপকে শিল্পায়িত করিয়া তুলিয়াছে। চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার পশ্চাতে যে প্রাণময়তা, যে একটি আনন্দময় জীবনচেতনার স্ফূর্তি ছিল, তাহাই যুগের অনিবার্য প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্রকে কীর্তিমান্ যুগস্রষ্টার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহার আবির্ভাবে অর্থাৎ বঙ্কিম-প্রতিভাদীপ্ত সৃষ্টি-কর্ম দ্বারা বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন পর্বের সূচনা হইয়াছে।) মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রে এবং তাঁহার যাবতীয় রচনা ও সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে তৎকালীন বাঙ্গালীর আত্মজাগরণজাত চিত্তকর্ষণার এক আদর্শনিষ্ঠ পরিচয় সুষ্ঠুভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মৃতকল্প জাতির সুপ্ত জীবনীশক্তি ও আত্মমর্যাদা এই সত্যসন্ধ নিষ্ঠাব্রতী ঋত্বিকের ভাব-চিন্তা আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়া বাংলা সাহিত্যের এই নূতন পর্ব বঙ্কিম-পর্ব নামে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

রামমোহন ও অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বে ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবজাত যে ভাবধারা বিবিধ প্রবন্ধ রচনা ও সাহিত্যিক আয়োজনের মধ্য দিয়া একটি নূতন জীবনচেতনার স্বরূপ-সন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছিল, তাহারই একনিষ্ঠ ধারক ও বাহক হইয়া যুগনায়ক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বিবিধ জ্ঞান ও ভাবগর্ভ প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে সেই অভিনব জীবনধর্মের পূর্ণ রূপায়িত আদর্শই প্রচার করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় ও সংস্কৃতিগত বিবর্তন-পরিবর্তনের ফলে অসাম্য, অস্থিরতা ও অসঙ্গতিতে বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-জীবন বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। বিবিধ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতবহুল চিত্ত-চাঞ্চল্যের মধ্যে একটি স্থিতিশীল বিশিষ্ট জীবনাদর্শের অনুসন্ধানই তখন দেশের বিভিন্ন মনীষী ব্যক্তির চিন্তাধারার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। যে উচ্চ জীবনাদর্শের

প্রেরণায় জাতির সামগ্রিক মর্মচেতনা এক বিশিষ্ট সুরে ঝংকৃত হইয়া উঠিবে— সর্ববিধ জটিল সমস্যার সমাধান হইয়া বাঙ্গালী সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাইয়া সার্থকতা লাভ করিবে, রামমোহন হইতে অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্ব পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় ব্যাপী সেই মহান, সমুন্নত জীবনাদর্শের রূপ-সন্ধানেরই প্রয়াস চলিয়াছে। রামমোহন, অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ চিন্তাশীল অগ্রগণ্য ব্যক্তিগণের রচনায় মুখ্যতঃ কল্যাণকর নীতি-নির্দেশই প্রচারিত হইয়াছে, জাতীয় জীবনের বহুবিধ সমস্যা ও বিরোধের ছবিই প্রধান ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু কোনরূপ সুষ্ঠু মীমাংসা বা নূতন বিচারবোধে নির্ণীত কোন সুনির্দিষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত হইবার সুযোগ ঘটে নাই। পূর্ববর্তী মনীষী ব্যক্তিগণ প্রধানতঃ জ্ঞান-তপস্বী এবং তাঁহারা নিছক বুদ্ধিবাদী বিচারক ছিলেন। তাঁহাদের রচনা বিবিধ প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসায় আচ্ছন্ন ছিল—ভাবুকতা বা সৃষ্টিধর্মী কল্পনায় তাহা উদ্ভাসিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রও যুক্তিবাদী, জ্ঞানী-পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তদুপরি তিনি ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও জীবনরাসক। এই স্বতন্ত্র কবিদৃষ্টি ও জীবনরসিকতার দ্বারাই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর সহজাত স্বরূপ ও প্রকৃতি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিঘাতে যে বিশিষ্ট জীবনাদর্শের অনুসন্ধান এতৎকাল চলিতেছিল, তাহাই বঙ্কিমচন্দ্রের সমন্বয়মুখী সাধনায় এক পরিণত রসরূপ লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত জ্ঞানী-পুরুষ এবং প্রাচ্য জীবনরসিকতায় সুরসিক কবি-ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি যেমন যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা মনুষ্যজীবনের প্রকৃত ধর্ম ও শাশ্বত সত্যরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তেমনি সুগভীর প্রেমভাব ও সহৃদয় রসদৃষ্টির সহায়তায় তাহা প্রত্যক্ষ জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন এবং তাহার ফলে সমাজ ও জীবনের আদর্শ এক অখণ্ড শিল্পরূপের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

(বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য ছিল বলিষ্ঠ ও স্বকীয় অনুভূতিতে মহিমান্বিত। যুগধর্মের প্রেরণায় তাঁহার প্রবন্ধগত বক্তব্য প্রকাশের মধ্যে যেমন একটি অভিনব ভঙ্গি পরিলক্ষিত হইয়াছে, তেমনি তাঁহার প্রবন্ধ এক সঞ্জীবনী বাণীর আধার হইয়া উঠিয়াছে।) পূর্ববর্তী লেখকগণের বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গি হইতে পৃথক্ এক স্বতন্ত্র ভাব ও রীতি আশ্রয় করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় তাঁহার মানসপ্রবৃত্তির লক্ষণ অতিশয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। (বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার পশ্চাতে একটি পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ববোধের আদর্শ প্রচ্ছন্ন ছিল এবং পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য এই

দুই বিভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘর্ষজাত এক নবযুগোচিত আদর্শের প্রবল প্রেরণা তিনি বাঙ্গালীর ভাবে, কর্মে ও চিন্তায় সঞ্চার করিয়া এই জাতিকে এক অমিত জীবনীশক্তি ও আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর মনীষা ও সাধনায় পাশ্চাত্ত্যের জীবনবাদ অর্থাৎ মানবত্ব (Humanism) ও প্রাচ্যের অধ্যাত্মতত্ত্ব একটি অন্তর্গূঢ় সমন্বয়ের সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এক বিশিষ্ট জীবনাদর্শের রূপমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।) বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার সমসাময়িক লেখকগণ তাঁহাদের সাহিত্য-কর্ম, বিশেষতঃ প্রবন্ধসমূহের মধ্য দিয়া এই অভিনব জীবনাদর্শের পরিচয়ই ব্যক্ত করিয়াছেন—মনুষ্যজীবনের যাহা প্রকৃত কাম্য অর্থাৎ ধ্যান, জ্ঞান ও হৃদয়-বলের সাধনায় মানবপ্রীতি-ধর্মের সার্থক অনুশীলনের কথাই তাহাদের বিভিন্ন প্রবন্ধের ভিতর দিয়া সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

এ'কথা নিঃসংশয়ভাবে স্বীকার্য যে, সাময়িক পত্রিকার অনিবার্য প্রেরণাই বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি সাধনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। বঙ্কিম-পর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার প্রবর্তনা বা প্রেরণা এই পর্বের প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং এই পত্রিকাই তাঁহার সর্ববিধ প্রবন্ধ প্রকাশের প্রধান বাহন হইয়াছিল। 'ভ্রমর,' 'নবজীবন', 'প্রচার' প্রভৃতি পত্রিকাসমূহেও বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বলিষ্ঠ লেখনীপ্রসূত রচনা দ্বারা অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে 'বঙ্গদর্শন' সমকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা মাসিকের স্থান অধিকার করিয়াছিল। 'বঙ্গদর্শনে'র ন্যায় বিশিষ্ট সাহিত্যপত্রকে কেন্দ্র করিয়া একটি শক্তিশালী সাহিত্যিক গোষ্ঠীরও অভ্যুদয় হয় এবং তাঁহাদের লিখিত বিবিধ বিষয় সম্পর্কিত উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধসমূহ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়া তাহার গৌরব অধিকতর বৃদ্ধি করে। 'বঙ্গদর্শনে'র সহিত পূর্ববর্তী বাংলা সাময়িক পত্রিকাসমূহের একটি লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল যে 'বঙ্গদর্শন'-পূর্ব পত্রিকাগুলিতে জ্ঞানোদ্দীপক প্রবন্ধ প্রকাশের সহিত সংবাদ-পরিবেশনও অন্যতম লক্ষ্য ছিল, কিন্তু 'বঙ্গদর্শনে' সাংবাদিকতার বিশেষ কোন স্থান ছিল না। বিশুদ্ধ রসসম্মত সাহিত্যমূলক ও জ্ঞানগর্ভ রচনা প্রকাশ করাই, এই পত্রিকার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। চিন্তাগর্ভ মননশীল বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিষয় ও ভাষার চরম উৎকর্ষ সাধনে এই পত্রিকার অসামান্য দান অস্বীকার করা যায় না। অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বে বিচিত্র বিষয়াশ্রিত প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত হইলেও, তাহা ভাব

ও রচনারীতিতে সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা বা পরিপুষ্টি অর্জন করিতে সক্ষম হয় নাই। বঙ্কিম-পর্বে বিবিধ বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে এবং প্রতিটি প্রবন্ধই গভীর ভাব-ভূষিত এবং দৃঢ়ভিত্তিক ভাষা ও প্রকাশরীতির সহায়তায় তাহা অধিকতর সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্কিম-পর্বে আবির্ভূত বিভিন্ন মনস্বী ব্যক্তিগণের একনিষ্ঠ লেখনী-চর্চায় ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্যতত্ত্ব, সমালোচনা, বিজ্ঞান, চরিতকথা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার ফলে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য ঈপ্সিত পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। 'বঙ্গদর্শন' ব্যতীত এই পর্বে মুদ্রিত 'আর্য্যদর্শন', 'সাধারণী', 'বান্ধব', 'কল্পদ্রুম', 'বঙ্গবাসী', 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতি অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায়ও বিশিষ্ট প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। 'বঙ্গদর্শনের' আদর্শ ও প্রেরণার ফলেই বঙ্কিম-পর্বের অন্যান্য সাময়িক পত্রিকাগুলির ভাব ও রসরুচির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হয়। পূর্ববর্তী পর্বের সাময়িক পত্রিকাগুলির অধিকাংশই কেবলমাত্র কুৎসা-প্রচার ও কদর্য-ভাষায় পরিপূর্ণ ছিল—এই পর্বেই সর্বপ্রথম সাময়িক পত্রিকাগুলি সংযত ও শুদ্ধ হইয়া উন্নত মান ও মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিবিধ শুদ্ধ-দীপ্ত রুচিসম্মত প্রবন্ধ প্রকাশনার জন্যই মুখ্যতঃ বঙ্কিম-পর্বের সাময়িক পত্রিকাগুলি এক বিশেষ গৌরবের অধিকারী।

বঙ্কিম-পর্বেই সর্বপ্রথম বিষয়প্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখকের ব্যক্তি-মনের মাধুর্যে সরস ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই পর্বের প্রবন্ধ লেখকদিগের মধ্যে কেহ কেহ হ্যাজলিট্, কার্লাইল, এমার্সন, রাস্কিন, ম্যাথু আর্ণল্ড প্রমুখ বিশিষ্ট পাশ্চাত্ত্য লেখকগণের ভাব ও রচনারীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের রচনায় নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়ও দুর্লভ নহে। পাশ্চাত্ত্য রীতি অনুসৃত বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত প্রবন্ধের (Personal Essay) রচনা-ধর্মও বঙ্কিম-পর্বেই প্রথম আভাসিত হইয়াছে। যে কোন বিষয় বা ভাব অবলম্বন করিয়া এবং তাহাতে নিজস্ব কল্পনা ও ভাবনা মিশাইয়া বক্তব্য বিষয় রমণীয়ভাবে প্রকাশ করিবার যে প্রবণতা, তাহা ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে ছিল না। এই পর্বেই সর্বপ্রথম প্রবন্ধের বিষয়ানুসারে ভাষাগত বিভিন্নতা অর্থাৎ যুক্তিধর্মী ও কাব্যধর্মী গদ্য-ভাষার ভেদরেখা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিচিত্র ভাষাগত দীপ্তি ও ওজস্বিতা বঙ্কিম-পর্বেই প্রথম পরিলক্ষিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ বাংলাদেশ ও সমাজের সমকালীন অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি

করিয়া একটি সুদৃঢ় লক্ষ্য বা আদর্শের প্রেরণায় সাহিত্য-কর্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধ রচনার মধ্যে দেশের সমসাময়িক সমস্যা ও ভাব-সঙ্কটের একটি সুমীমাংসিত পন্থা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় পর্ব-নির্দেশক বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান থাকায় তাঁহার সম্পর্কে পৃথক্ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবিত ভাবশিষ্য মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনার দ্বারাও এই পর্ব সবিশেষ সমৃদ্ধ এবং তাঁহার রচনাদিও স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদ ব্যতীত বহু শক্তিশালী প্রবন্ধকারও এই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের আলোচনা 'বিবিধ প্রবন্ধকার' অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বঙ্কিম-পর্বের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পটভূমির পরিচয় প্রসঙ্গে এ'কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই সময় দেশের সকল ক্ষেত্রে যে ব্যাপক প্রস্তুতি ও সংগঠনের আয়োজন চলিয়াছিল, তাহার একটি প্রধান অংশই প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। জাতীয় কল্যাণসাধনের বিবিধ প্রচেষ্টার পরিচায়িকা হিসাবে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যও বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ হইয়া এক অভিনব রূপাবয়ব গ্রহণ করিয়াছে।

অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বে সংঘটিত সিপাহী-বিদ্রোহ, নীলকর-বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব ক্রমশঃ শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনের উপর এক প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং দেশের জনসাধারণ স্বদেশ ও ব্যক্তির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কেও ক্রমান্বয়ে সচেতন হইয়া উঠিতেছিল। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জন্য দেশের চিন্তাশীল মনীষীদিগের প্রবল বিক্ষোভ ও অসন্তুষ্টি তাঁহাদের বিবিধ কার্য-কলাপের মধ্য দিয়া এই সময়ে প্রকাশ পাইয়াছে। দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানে যে বিভিন্নমুখী গঠনমূলক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল, বঙ্কিম-পর্বের সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহাই প্রধানতঃ প্রচারিত হইয়াছে। স্বদেশের সনাতন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে ঐশ্বর্য ও আভিজাত্য, তাহার পরিচয় প্রদানকল্পে এই পর্বের লেখকগণ বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। দেশের লুপ্ত ইতিহাস পুনরুদ্ধার করিয়া জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ বহু বিশিষ্ট মনীষী তাহার মাহাত্ম্য প্রচারে অগ্রণী হইয়াছেন। বঙ্কিম-পর্বে বিবিধ ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক প্রবন্ধ রচনার পশ্চাতে যে, জাতীয় ঐক্য এবং গভীর স্বাদেশিক চেতনাই প্রেরণা স্বরূপ বর্তমান ছিল, তাহা অনুমান করিয়া লইতে অসুবিধা হয় না।

অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বে ইতিহাস, পুরাবৃত্ত সম্পর্কিত বাংলা প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত হইলেও, তাহা প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য লেখকগণের গবেষণামূলক বিচার-পদ্ধতি ও ভাবধারা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। এ'কথা স্বীকার্য যে, ভারতীয় ইতিবৃত্ত, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় ইউরোপীয় মনীষী ব্যক্তিগণের দ্বারাই প্রথম এ'দেশে প্রকাশিত হয়। অক্ষয়-ঈশ্বর-পর্বের এই জাতীয় প্রবন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান-চর্চার প্রবর্তনা ব্যতীত জাতীয় জাগরণ বা দেশের গৌরবময় ঐতিহ্য উদ্ধারের কোনরূপ আন্তরিক প্রেরণা ছিল না। বঙ্কিম-পর্বে লিখিত ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধসমূহেই সর্বপ্রথম জাতীয় গৌরববোধের গভীর স্পর্শ লাভ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামদাস সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ লেখকগণের এই জাতীয় প্রবন্ধ দ্বারা বঙ্কিম-পর্ব সমৃদ্ধ হইয়াছে।

বঙ্কিম-পর্বে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের ধারা অধিকতর সংস্কৃত ও সংগঠিত হইয়া আচার্য কেশবচন্দ্রের ধর্মসাধনার মধ্য দিয়া পরিস্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। প্রগতিশীল ধর্মনেতা কেশবচন্দ্রের ধর্মবিষয়ক রচনা ক্রিয়াকলাপ হিন্দুধর্ম ও সমাজের বহুবিধ অভ্যস্ত আচার-অনুষ্ঠান ও অন্ধ সংস্কারের পরিবর্তন সাধনে সহায়ক হইয়াছে। জাতিভেদ, বর্ণ-বৈষম্য, স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ই এই পর্বের মনস্বী ব্যক্তিগণের চিন্তা অধিকতর আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের ধর্মান্দোলন ব্যতীত বঙ্কিম-পর্বে হিন্দুধর্ম ও তাহার নবভাবে উজ্জীবনও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং ইহার পশ্চাতে দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূত পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ধর্মসাধনা ও তাঁহার সমন্বয়ধর্মী বাণীর প্রভাবই অধিকতর কার্যকরী হইয়াছে। এই পর্বে ধর্ম, দর্শন ও সমাজ-সংস্কারমূলক প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর মধ্যে এই দুইজন সাধক পুরুষের সাধনা ও কর্মকৃতির প্রতিক্রিয়াজাত ভাব-চিন্তা অনুভব করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রশেখর বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ লেখকগণ ধর্ম-দর্শন ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিয়া বঙ্কিম পর্বের প্রবন্ধ-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

বাংলা সাহিত্যে সার্থক সাহিত্য-সমালোচনাত্মক প্রবন্ধ বঙ্কিম-পর্বেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। এই পর্বে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও সমালোচনা-তত্ত্বের সহিত সুগভীর পরিচয় সাধনের ফলে বহু কৃতবিদ্য মনীষীর সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টি সম্প্রসারিত হয়। পূর্ব-বঙ্কিম-পর্বে সাহিত্য-সমালোচনার সূত্রপাত হইলেও, তাহা

অপরিণত সাহিত্যদৃষ্টি ও গভীর রসোপলব্ধির অভাবে সমালোচনার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করিতে পারে নাই। বঙ্কিম-পর্বের সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ-সমূহ সুপণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সুকুমার সাহিত্যবোধ এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের তুলনামূলক রস-বিচার পদ্ধতির সার্থক অনুসরণে ও তাহার যথোচিত শিল্পিসুলভ প্রয়োগ-নৈপুণ্যে আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র বসু, চন্দ্রনাথ বসু, বীরেশ্বর পাঁড়ে, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ মনীষিগণের সাহিত্যতত্ত্ব ও রস-বিচারমূলক প্রবন্ধ দ্বারা এই পর্ব এক বিশিষ্ট মর্যাদায় ভূষিত হইয়াছে।

বঙ্কিম-পর্বে বিচিত্র বিষয়াশ্রিত বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য যে সার্থক অথচ দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অভিনব বিষয় উপস্থাপনার বিবিধ কারুকৃতি, রচনায় লেখকের গভীর অন্তর্চেতনার গূঢ় ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি ও সরস কৌতুকমণ্ডিত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের প্রকাশ-পারিপাট্যে এই পর্বের প্রবন্ধ-সাহিত্য নব যৌবনের অমিত শক্তি অর্জন করিয়াছে।

প্রথম অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সম্রাট্ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। উপন্যাস ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই তাঁহার এই অভিধা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। তাঁহার পূর্বে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য বিষয় ও ভাষারীতিতে অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ লেখকগণের দ্বারা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ ও সহজবোধ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা প্রবন্ধের কলা-সৌষ্ঠব ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এক অনমনীয় দৃঢ়তা ও সুসংবদ্ধ সাহিত্যিক সরসতা দান করিয়া ইহাকে প্রথম শ্রেণীর শিল্পকলার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা-স্পর্শে বাংলা ভাষারও অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বসূরিগণ সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রই সমগ্রভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণতম রূপের সার্থক স্রষ্টা। তিনি বিচিত্র, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার লোকোত্তর মনীষা দ্বারা বঙ্গভাষার প্রকৃতি-ধর্মের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্ভবপর হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম সংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইবে যে, তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভকালীন রচনাসমূহে ভাষার যে গতি, ভঙ্গি, শব্দ-বিন্যাস ও রীতি-বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা পরবর্তী কালে তাঁহার আত্মপ্রত্যয় ও রসরুচি ভেদে রূপান্তরিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ভাষাগত পরিবর্তন প্রধানতঃ উপন্যাসের ক্ষেত্রেই অধিকতর লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার প্রবন্ধ-সাহিত্যে ভাষা বা রচনারীতির

১ 'আধুনিক সাহিত্য', (বিশ্বভারতী, ভাদ্র, ১৩৬৩), পৃঃ ১৮

পরিবর্তন উপন্যাসের ন্যায় সুস্পষ্টগোচর নহে। কারণ, প্রবন্ধ-সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত মন ও বয়সের সৃষ্টি। তাঁহার ভাষা তখন নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও দীপ্তি অর্জন করিয়া এক বিশিষ্ট স্তরে উন্নীত হইয়াছে।

বঙ্কিম-প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন' বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ববিধ প্রবন্ধ প্রকাশের অন্যতম প্রধান বাহন ছিল। এই মাসিক পত্রটি তাঁহার সম্পাদনায় ও রচনায় সমৃদ্ধ হইয়া তদানীন্তনকালে এক শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক মুখপত্রের খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-ভাষার ক্ষেত্রেও এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। আলঙ্কারিক আতিশয্য ও সমাসবদ্ধ পদের হ্রাসকরণে তাঁহার ভাষায় প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ যুগপৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাষাকে অধিকতর প্রাণবন্ত ও সাধারণের নিকট সহজ ও বোধগম্য করিবার একনিষ্ঠ প্রয়াস 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি-বৈচিত্র্য সম্পর্কে তিনি সারগর্ভ প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট, সহজ ও যুক্তিধর্মী ভাষাই সর্ববিধ প্রবন্ধ রচনার প্রাণস্বরূপ। ভাষা সম্পর্কিত প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর চিন্তা ও উপলব্ধির পরিচয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে।'[১]

'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশ-কাল হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনান্তকাল পর্যন্ত তাঁহার রচনায় প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষারই ক্রমবিকাশ ও অপূর্ব-সংযত প্রস্ফুরণ পরিলক্ষিত হইয়াছে। ভাবের মহান্ দ্যোতনায়, ভাষার অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ও বাণীভঙ্গির নিপুণ কলাকৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে। এ'কথা স্বীকার্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের প্রধান আকর্ষণ তাঁহার ভাষা। এইরূপ সম্মোহনকারিণী,

১ 'বিবিধ প্রবন্ধ' ২য় ভাগ, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৬), পৃঃ ৩৮৬

সৌন্দর্যময়ী, যুক্তিপূর্ণ অথচ রসসমৃদ্ধ ভাষাই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধকে অধিকতর মহিমান্বিত করিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাস রচনার যুগ-প্রবর্তনকারী ঔপন্যাসিকরূপেই বঙ্কিমচন্দ্র সর্বাধিক পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধকার হিসাবেও তাঁহার মর্যাদা বা বিশিষ্টতা কোন অংশেই উপেক্ষণীয় নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিচিত্র বিষয়-ভূয়িষ্ঠ রচনারাজি দ্বারা বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য দুর্লভ ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। তিনি শেষ জীবনেই তাঁহার অধিকাংশ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধসমূহ রচনা করিয়াছেন। পরিণত বয়সই পূর্ণাঙ্গ মননিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনার উপযুক্ত সময়। অতিরেক উচ্ছ্বাসপ্রবণ ভাবালুতা তখন যুক্তিগর্ভ গহন-গম্ভীর মননশীলতায় পরিণতি লাভ করে। ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনকে দুইটি বিশিষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া লিখিয়াছেন—

'The earlier Bunkim was only a poet and stylist—the later Bunkim was a seer and nation-builder.'[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের ধারাবাহিকতা অনুধাবন বা অনুশীলন করিলে উল্লিখিত মন্তব্যটি যে যথোপযুক্ত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের একজন ধ্রুপদী শিল্পী। তিনি বিবিধ প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস—কোন প্রধান বিষয়ই তাঁহার আলোচনা-বহির্ভূত হয় নাই। এই সকল প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বহুদর্শী অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি, গভীর ধ্যান ও ধারণালব্ধ তীক্ষ্ণ বোধিদৃষ্টি এবং গবেষণা ও রসবোধের সম্যক্ পরিচয় লাভ করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের একজন প্রজ্ঞাবান্, শীর্ষস্থানীয় প্রবন্ধ-লেখক। প্রবন্ধ-ধর্মের সর্ববিধ লক্ষণই তাঁহার রচনায় পরিস্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সুপণ্ডিত চিন্তাশীল মনীষী ব্যক্তি। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা ও সাহিত্যিক মূল্যায়নে স্বকীয়তার স্বাক্ষর তাঁহার প্রবন্ধের সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার প্রতিভা-দীপ্তিতে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য এক সুদূর

১ *Rishi Bunkim Chandra*, (Chandernagore, 1923), p. 10

প্রসারী বিস্তৃতি ও অতলান্ত গভীরতা লাভ করিয়া প্রথম শ্রেণীর গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ নিছক উচ্ছ্বাসধর্মী গদ্যরচনা নহে। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা বা অনুশীলন না থাকিলে প্রবন্ধকারের পক্ষে নিরপেক্ষ এবং তথ্যসমৃদ্ধ ও তত্ত্বগভীর দৃষ্টিলাভ করা সম্ভব হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল প্রসারিত এবং তাহা কখনও কোন সীমাবদ্ধ মতাদর্শের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নাই। সমকালীন বাংলা দেশে তাঁহার ন্যায় বহুমুখী প্রতিভাধর মনীষীর সংখ্যা বিরল ছিল। দৈবী প্রতিভা, দুর্লভ মনীষা ও তেজোদীপ্ত ব্যক্তিত্বের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের অন্তঃপ্রকৃতির গভীরতর মর্মমূলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতির সহিতও তাঁহার নিবিড় পরিচয় ঘটিয়াছিল। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয়ের সাংস্কৃতিক জীবনের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র এক বিশিষ্ট জীবনাদর্শের অর্থাৎ পূর্ণ মনুষ্যচরিত্রের আদর্শ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার-বিশ্লেষণধর্মী অধিকাংশ প্রবন্ধই তাঁহার মহান্ সুন্দর বলিষ্ঠ কল্পনায় অধিকতর মহিমামণ্ডিত হইয়াছে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁহার সুদুর্লভ এক অখণ্ড রূপের প্রতীতি হইতেই ইহার উদ্ভাবনা সম্ভবপর হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায় বাংলা ভাষায় জ্ঞানগর্ভ, বিচারধর্মী প্রবন্ধ-সাহিত্যের যে সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমান্বয়ে সংহত চিন্তা ও গাঢ়বন্ধ বাণীভঙ্গিতে সুসমৃদ্ধ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করিয়াছে।

প্রবন্ধের বিষয়-বৈচিত্র্য হেতু বঙ্কিমচন্দ্রকে বহুলক্ষেত্রে বিষয়োপযোগী উপাদান আহরণে গবেষণা-কর্মে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল এবং বিভিন্ন মূল্যবান্ উপাদান সংগ্রহকল্পে তাঁহার একনিষ্ঠ উদ্যমেরও অভাব ছিল না। প্রামাণ্য তথ্য-সমাবেশে ও নিস্পৃহ যুক্তির সুতীক্ষ্ণতায় বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ববিধ প্রবন্ধই সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধ কোথাও অসংযত অতিরেক উচ্ছ্বাসে প্রগল্‌ভ নহে এবং কোথাও অবান্তর শব্দ বা অলঙ্কার প্রয়োগ দ্বারা রচনার ভাব বা রূপগত সঙ্গতি ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বিতর্কমূলক প্রতিপাদ্য বিষয়ও দৃঢ়ভিত্তিক যুক্তির সহায়তায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার সকল প্রবন্ধেরই বক্তব্য বিষয় পরিবেশন গুণে সুস্পষ্ট এবং মননদীপ্ত হইয়াছে এবং দুরূহ সমস্যামূলক বিষয়ও অস্পষ্ট বা জটিল গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া পড়ে নাই। তাঁহার প্রবন্ধের ভাষাও বিষয়ানুসারে স্বচ্ছ ও সরস হইয়াছে। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় বিজ্ঞান-সচেতন, দার্শনিক মনস্বী

ব্যক্তির বিচিত্র চিন্তা ও ভাবোপলব্ধি তাঁহার প্রবন্ধসমূহের মধ্য দিয়াও রসসম্মত-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ প্রধানতঃ বুদ্ধিনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী। সাধারণতঃ বুদ্ধি ও বিচারপ্রধান প্রবন্ধ দুর্লভ সাহিত্য-স্বাদ হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে সাহিত্যগুণের অসদ্ভাব ঘটে নাই। জাতীয় সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবন তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধেরই ভিত্তিভূমি। প্রত্যক্ষ সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনই বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র চিন্তা হইয়াছিল। মূলতঃ বিচারনিষ্ঠ মনের পরিচয় তাঁহার প্রবন্ধের সর্বত্র প্রকাশ পাইলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদী রসিক হৃদয়ের স্পন্দন-বৈচিত্র্যও তাহাতে দুর্লভ নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহ যথাক্রমে: ১। 'বিজ্ঞান-রহস্য' (১৮৭৫), ২। 'বিবিধ সমালোচন' (১৮৭৬), ৩। 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী' (১৮৭৭), ৪। 'সাম্য' (১৮৭৯), ৫। 'প্রবন্ধ-পুস্তক' (১৮৭৯), ৬। 'কৃষ্ণচরিত্র' ১ম ভাগ (১৮৮৬), ঐ, [সম্পূর্ণ-গ্রন্থ] (১৮৯২), ৭। 'বিবিধ প্রবন্ধ', ১ম ভাগ (১৮৮৭), ৮। 'ধর্ম্মতত্ত্ব', ১ম ভাগ [অনুশীলন] (১৮৮৮), ও ৯। 'বিবিধ প্রবন্ধ' ২য় ভাগ (১৮৯২)। এই গ্রন্থসমূহ ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত প্রবন্ধনিচয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর ব্যবস্থাপনায় একত্র সংকলিত হইয়া 'বিবিধ' নামে অধুনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ-সমালোচন' ও 'প্রবন্ধ-পুস্তকে'র প্রবন্ধসমূহ পরবর্তী কালে প্রকাশিত তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম ভাগ) পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল প্রবন্ধের বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে তাঁহার প্রণীত 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) ও বিশেষতঃ 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) গ্রন্থের রচনাগুলি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সকল রচনাই কৌতুক-রসাশ্রিত। বিভিন্ন সাময়িক বিষয় ও ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার অতি লঘু সুরের আলোচনা ইহাতে নিছক ব্যঙ্গ রস-পিপাসাই চরিতার্থ করিয়াছে। ইহাতে বক্তব্য বিষয়ের গাম্ভীর্য যথাযথ রক্ষিত হয় নাই—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তরল হাস্য-পরিহাসাত্মক এই জাতীয় রচনা বিশুদ্ধ প্রবন্ধের সগোত্র নহে। 'লোকরহস্য' গ্রন্থটিকে 'রস-রচনা' নামে আখ্যাত করাই অধিকতর সঙ্গত। সাধারণতঃ কোন লেখক যখন 'রস-রচনা' সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার

সেই সৃষ্টির মূলে মুখ্যতঃ রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কোন অসঙ্গতি, অদ্ভুত কোন ঘটনা বা চরিত্রকে লক্ষ্য করিয়া নিছক ব্যঙ্গ বা কৌতুক করিবার উদ্দেশ্যই বর্তমান থাকে। 'লোকরহস্য' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের কৌতুকপ্রবণ ব্যঙ্গাত্মক উদ্দেশ্যই মুখ্যভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

'লোকরহস্যে'রই ব্যঙ্গাত্মক, শাণিত শ্লেষপূর্ণ মনোভাব বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এক অভিনব পদ্ধতিতে চিত্তাকর্ষকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থের সকল রচনাই কেবলমাত্র তরল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যেই পরিসমাপ্তি লাভ করে নাই—কৌতুকরসের আবরণে রূপকধর্মী উপন্যাসসুলভ উপাখ্যানের মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম ও সাহিত্যেরও পর্যালোচনা করিয়াছেন। কতকগুলি রচনায় ব্যঙ্গরস সম্পূর্ণ গৌণ হইয়া গিয়াছে। বরং পরিহাস-বিদ্রূপ আচ্ছন্ন করিয়া তাহার পরিবর্তে বঙ্কিমচন্দ্রের মনন-প্রকৃতি নূতন ভাব ও বিচিত্র চিন্তাশ্রয়ী ধ্যান-ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যদিও সাধারণ প্রথাসিদ্ধ প্রবন্ধের নিরিখে 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র রচনাসমূহ বিচার্য নহে, তথাপি ইহার কোন কোন অংশে প্রবন্ধের মৌল ধর্ম বা প্রকৃতির আভাস বর্ত্তমান থাকায় বাংলা প্রবন্ধ ধারায় ইহার আলোচনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত 'কমলাকান্তের দপ্তর' সর্বপ্রথম ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রায় দশ বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র ইহার 'কমলাকান্ত' এই শিরোনাম দিয়া পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থের পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' লিখিয়াছেন—

'এই গ্রন্থ কেবল "কমলাকান্তের দপ্তরে"র পুনঃ সংস্করণ নহে। "কমলাকান্তের দপ্তর" ভিন্ন ইহাতে "কমলাকান্তের পত্র" ও "কমলাকান্তের জোবানবন্দী" এই দুইখানি নূতন গ্রন্থ আছে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের পত্র' ও 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' অপেক্ষা তাঁহার 'কমলাকান্তের দপ্তর' অংশের রচনাগুলিই উল্লেখযোগ্য তাৎপর্যমণ্ডিত এবং সাহিত্যের চিরন্তন আবেদনে অধিকতর মূল্যবান্ হইয়াছে।

'কমলাকান্তের দপ্তর' স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ইহা যে বঙ্কিম-প্রতিভার অন্যতম বিশিষ্ট সাহিত্যিক

সৃষ্টি, তাহা অনস্বীকার্য। 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র ভাব ও আঙ্গিক পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য কোন কোন বিশিষ্ট লেখকের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে প্রধানতঃ ডি কুইন্সির (De Quincey) '*The Confessions of an English Opium-Eater*' গ্রন্থখানির রচনা-প্রকরণের উল্লেখ করা যায়। এই সম্পর্কে জনৈক সমালোচক লিখিয়াছেন—

* * * as far as mere form goes Kamala Kanter Daptar owes much to De Quincey's Confessions of an Opium-Eater......[১]

কেবলমাত্র ডি কুইন্সিই নহে, 'কমলাকান্তের দপ্তর' রচনায় স্কট্ (Scott), লী হান্ট্ (Leigh Hunt) প্রমুখ লেখকগণের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বলিষ্ঠ রচনাকৌশলে ও চিন্তা-বৈচিত্র্যের অভিনবত্বে ইহা এক অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছে।

'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপম কল্পনাপ্রসূত চারিটি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কমলাকান্ত স্বয়ং, ভীষ্মদেব খোসনবীশ, নসীরামবাবু ও প্রসন্ন গোয়ালিনী। কমলাকান্তই প্রধান চরিত্র এবং তাহারই চিন্তা-ভাবনা অন্যান্য চরিত্রগুলির সংলাপ সহযোগে প্রকাশ পাইয়াছে। আফিং নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি কমলাকান্তের বিবৃতি হইতে তাহার চরিত্র সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু ধারণা করা সম্ভব হয় এবং কমলাকান্ত যে তথাকথিত সাধারণ নেশাগ্রস্ত বিকৃত-মস্তিষ্ক কোন ব্যক্তি নহে, সেই সম্পর্কেও নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। বরং কমলাকান্তের মধ্য দিয়া একজন প্রত্যুৎপন্নমতি, সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাশীল পুরুষের পরিচয়ই প্রকাশিত হইয়াছে। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' সংকলিত বিবিধ বিষয়ক রচনার মাধ্যমে কমলাকান্তের একটি উজ্জ্বল চিত্ররূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিনব গ্রন্থে চরিত্র, ঘটনা, সংলাপ প্রভৃতি ঔপন্যাসিক উপকরণসমূহ বর্তমান থাকায় কোন কোন সমালোচক ইহাকে উপন্যাসের মানদণ্ডে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ঔপন্যাসিক ধর্ম বা স্বরূপ-প্রকৃতির কিছু কিছু বাহিক লক্ষণ ইহাতে প্রকাশ পাইলেও সার্থক রসোত্তীর্ণ উপন্যাসের সর্বপ্রধান যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ একটি অবিচ্ছিন্ন ঘটনা পরম্পরা সম্বলিত কাহিনী বা গল্প এবং উপন্যাসগত বিভিন্ন চরিত্রের

১ **Priyaranjan Sen, *Western Influence in Bengali Literature*, (Calcutta, 1947), p.** 223

পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়া কাহিনীর রস-পরিণতির অভিমুখে যে স্বচ্ছন্দ অগ্রগতি, তাহা কোথাও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। অতএব 'কমলাকান্তের দপ্তর' রচনাটিকে উপন্যাস পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা স্বভাবতই সম্ভব হয় না।)

'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অধিকাংশ রচনাই বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট মনন-সমৃদ্ধজাত এবং ইহার কোন কোন রচনার মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টির সহায়তায় জগৎ ও জীবনের গভীর রূপ-রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কমলাকান্তের দপ্তরে' যে সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া রচনা-কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা যে সাধারণ বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধেরই উপযুক্ত বিষয়বস্তু, তাহাতে কোন সংশয় নাই। দেশপ্রীতি, মানবপ্রীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সাহিত্য ও মানব-জীবনাদর্শ প্রসঙ্গে তাঁহার মনন-চিন্তা যেমন 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থের রচনাসমূহে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তদনুরূপ উক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে সুচিন্তিত গভীর পর্যালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধ' সংকলন-গ্রন্থাদির মধ্য দিয়াও সম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তি হৃদয়ানুভূতি বা মনোভাব 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র ন্যায় আত্মকেন্দ্রিক, পরিহাস-অতিরেক ও বক্রকুটিল হইয়া উঠে নাই। ('বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে প্রধানতঃ তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ও অর্থপূর্ণ কল্পনার দ্বারা বক্তব্য বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।) এতদ্ব্যতীত, 'কমলাকান্তের দপ্তর' রচনায় অভিনব আঙ্গিক অর্থাৎ ব্যঙ্গ-রসাত্মক লঘু নক্সার আকারে ভাব-চিন্তা প্রকাশের ফলে ইহাতে প্রবন্ধ শিল্পের যথাযথ গঠন বা আকার-সৌষ্ঠবও রক্ষিত হয় নাই।

'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অন্তর্ভুক্ত কোন কোন রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের মানব-জীবন সম্পর্কিত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, নূতনতর ইঙ্গিতের পরিচয় আভাসিত হইয়াছে। জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁহার মৌলিক চিন্তা ও ব্যক্তিমানসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া 'পতঙ্গ', 'মনুষ্য-ফল', 'ঢেঁকি', 'বড়বাজার' প্রভৃতি রচনাসমূহে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতীয় রচনার প্রধান সুর বা আশ্রয় হাস্যরস এবং বিশুদ্ধ সংযত কৌতুক রস-রসিকতার মধ্য দিয়া তিনি মুখ্যতঃ তাঁহার বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইচ্ছাকৃত প্রসঙ্গ পরিবর্তন দ্বারা বিষয়ের গুরুত্ব লঘু ও মাত্রা-সংগতি ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার কোন কোন রচনার অংশ বিশেষের মধ্যে বিশিষ্ট প্রবন্ধের উৎকৃষ্ট গুণসমূহ লক্ষ্য করা যায়। 'পতঙ্গ' নামক রচনা হইতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, * * * জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়। * * * রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। * * * বহ্নি কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এ সকল কথার অর্থ নাই এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে। ধর্ম্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?'[১]

উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি বিশিষ্ট একটি দার্শনিক প্রবন্ধের অংশ বিশেষ বলিয়া সম্পূর্ণ ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

'কমলাকান্তের দপ্তরে'র একটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'বিড়াল'। সাধারণ প্রবন্ধ-শিল্পের যে বিশেষ লক্ষণ অর্থাৎ নৈয়ায়িক বিচার-বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে কোন প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপস্থাপনা—তাহা এই রচনার প্রতিটি অনুচ্ছেদে লক্ষ্য করা যায়। কূটতর্কবহুল বিষয়ের বিচার-মীমাংসা হাস্যরসিকতার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবাব অনন্যসাধারণ ক্ষমতা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। 'বিড়াল' নামক রচনা হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই রূপকাত্মক রচনা-চিত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রবাদ ও ধনতন্ত্রবাদ এই দুইটি পরস্পরবিরোধী মতবাদের বৈশিষ্ট্য যুক্তি-তর্ক সহকারে বিবৃত করিয়াছেন। চতুষ্পদ জন্তু বিড়াল সাম্যবাদী সমাজের প্রতিনিধি এবং উকিল ও কমলাকান্ত পুঁজিবাদী ধনিক্ সম্প্রদায়ের প্রতিভূরূপে ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মতাদর্শ অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে বিশুদ্ধ একটি রাষ্ট্রনীতিমূলক বুদ্ধিনিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনা করা সম্ভব হইত; কিন্তু এখানে নিছক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়া মূল উদ্দেশ্য প্রকাশের অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। রাজনৈতিক জটিল মতবাদের অন্তর্গূঢ় তত্ত্ব শ্লেষাঢ্য রেখাচিত্রের আবরণে বঙ্কিমচন্দ্র দুগ্ধাপহারক বিড়াল ও আফিংসেবী কমলাকান্তের সরস ইঙ্গিতপূর্ণ কথোপকথনের মধ্য দিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। ফলে, বুদ্ধিগ্রাহ্য রাষ্ট্রীয় মতবাদ

১ 'কমলাকান্ত', (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৪), পৃঃ ১৪-১৫

অপেক্ষাকৃত সহজ ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। দরিদ্র সর্বহারা ব্যক্তিদিগের ব্যথা-বেদনা এবং চুরি, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সামাজিক দুর্নীতির মূল উৎস সন্ধানে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনা মধ্যে যে বাস্তব সত্যের আলোকপাত করিয়াছেন, তাহা যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনি তাঁহার কৌতুকমিশ্র বিদগ্ধ মনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'বিড়াল' রচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?'[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অন্তর্গত 'একা', 'আমার মন' প্রভৃতি রচনায় মানবজীবনের বহুবিধ চিত্তবিক্ষোভ এক সর্বপ্লাবী উদ্দীপনা সহকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার প্রতি রচনার পশ্চাতে যে একটি গভীর দার্শনিক ভাবাদর্শ প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিলে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। এই জাতীয় রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তি-চৈতন্যের সুনিবিড় স্পর্শে সমধিক চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এ'কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই রচনাসমূহের মধ্যেই পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যে বহুল প্রচলিত বিশুদ্ধ আত্মনিষ্ঠ বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের (Personal Essay) বীজ সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ পরিচয় যে, তিনি একজন স্বদেশপ্রেমিক লেখক ছিলেন। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' যুগনায়ক বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের সহিত একাত্ম ও অভিন্ন হইয়া কয়েকটি রচনা মধ্যে দেশাত্মবোধের যে পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা এক বলিষ্ঠ প্রাণশক্তিতে মহিমাদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'আমার দুর্গোৎসব', 'একটি গীত' প্রভৃতি রচনায় হাস্যরস সম্পূর্ণ গৌণ হইয়া দেশমাতৃকার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সশ্রদ্ধ ঐকান্তিক প্রেমভাবই অধিকতর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

১ 'কমলাকান্ত', (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৪), পৃঃ ৫৯

দেশ ও দেশবাসীর প্রতি সুগভীর মমতায় বঙ্কিমচন্দ্রের মর্মচেতনা তীব্রভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে এবং তাঁহার ভাব ও ভাষাও সমপরিমাণে আবেগবিহ্বল ও কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

'কমলাকান্তের দপ্তরে'র ভাব ও বিষয়গত চিন্তা যেমন বহুমুখী তেমনি ভাষারও বহুধা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বিষয় বা ভাব অনুসারে ভাষা প্রযোজনার ক্ষেত্রেও অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভাব বা বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবার জন্য যেখানে যে শব্দ বা বাক্যের প্রযোজন, যে উপমা সার্থক, তাহার যথাযথ প্রয়োগে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধকাম হইয়াছেন। তাঁহার ভাষার বিশুদ্ধতা ও রীতি-সৌষ্ঠব ভাব বা বিষয়ের স্বচ্ছন্দ ও সুসংগত প্রকাশে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকন্তের দপ্তর' একটি নিঃসন্দেহে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক সৃষ্টি। ইহা প্রকৃত উপন্যাসও নহে এবং যথার্থ প্রবন্ধ-শিল্পেরও মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। এই গ্রন্থ সম্পর্কে প্রখ্যাতনামা সাহিত্য-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের বিচার-বিশ্লেষণজাত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

'উহা একটি সম্পূর্ণ নূতন সাহিত্যিক রচনা-রূপ; উহাতে গল্প, কাব্য, আত্মচিন্তা, সমাজ-দর্শন, সমালোচনা—একাধারে সকল উপাদান একই ভাব-মণ্ডলের মধ্যে অপূর্ব্ব কৌশলে সমাবিষ্ট হইয়াছে, একটা গোটা মানুষের হৃদয় ও মনের সবগুলি মুখ (facets) চারিদিক ঘুরাইয়া দেখানো হইয়াছে। আমরা যে প্রবন্ধের কথা বলিতেছি তাহা উহার একটা লক্ষণমাত্র, সেই জাতীয় প্রবন্ধের উৎকৃষ্ট গুণ উহাতেও আছে; কিন্তু তথাপি গল্পের ঐ আবরণটির জন্য ব্যক্তিটা আড়ালে রহিয়াছে, এবং উহার নিজস্ব গঠন বা রূপ নিজের নিয়মে সার্থক হইলেও, উহাকে প্রবন্ধ বলা যাইবে না।'[১]

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁহার সর্বপ্রথম প্রবন্ধ সংকলন 'বিজ্ঞান-রহস্য'। গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক রচনাও যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যস্বাদী হইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বিজ্ঞান-রহস্যে'র প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানের বস্তুগত

১ 'বাংলা প্রবন্ধ ও রচনারীতি', (কলিকাতা, ১৯৫১), পৃঃ ১৭

কাঠিন্য ও শুষ্কতাই সাধারণতঃ মানুষের চিত্তলোক আকর্ষণের পরিপন্থী। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নীরস বৈজ্ঞানিক বিষয়ও সাহিত্যরসে সঞ্জীবিত করিয়া চিত্তাকর্ষক ও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব ও সেই অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক তথ্যের সহজ সরস বিবৃতি-কৌশল বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে অন্য কোন প্রবন্ধকারের বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় লক্ষ্য করা যায় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত 'বিজ্ঞান-রহস্য' মুখ্যতঃ জীব ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সমষ্টি। জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রসঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা অতীব রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশাল বিস্তৃততর ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গভীর কল্পদৃষ্টি প্রসারিত করিয়া অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়াছেন। 'আকাশে কত তারা আছে?', 'গগন-পর্য্যটন', 'চঞ্চল জগৎ', 'জৈবনিক', 'চন্দ্রলোক' প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহের দ্বারা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানেরই পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই, তাঁহার তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অতি নিবিড় সাহিত্যরসে উপাদেয় হইয়াছে।

ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, নীরস বিষয়কে সাহিত্যরসার্দ্র করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র ভাব-কল্পনাকেই আশ্রয় করেন নাই। বিজ্ঞানের বিবিধ গাণিতিক তথ্যাদি ও নবতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিজ্ঞানসম্মত ইতিবৃত্তের সহিত তাঁহার যে গভীর পরিচয় ছিল, তাহাও তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসমূহের সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্য, বিচার-বুদ্ধি ও সর্বোপরি সাহিত্যিক রচনাভঙ্গি দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। তাঁহার বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধ মধ্যে কেবলমাত্র পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকের জটিল মতবাদসমূহ উদ্ধৃত বা আলোচনা করিয়াই রচনা শেষ করেন নাই, সর্ববিধ মতামতের যুক্তিপূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া এমন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্বভাবতই তাহা যেন তাঁহার মৌলিক নিজস্ব মতবাদ হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রারম্ভেই একটা সাহিত্যিক আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া মূল বিষয়ের গভীরে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার 'আকাশে কত তারা আছে?' নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

'আকাশে পরিষ্কার রাত্রে এক স্থূল শ্বেতরেখা নদীর ন্যায় দেখা যায়। আমরা সচরাচর তাহাকে ছায়াপথ বলি। ঐ ছায়াপথ কেবল দৌরবীক্ষণিক

নক্ষত্র সমষ্টি মাত্র। উহার অসীম দূরতাবশতঃ নক্ষত্র সকল দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাহার আলোক সমবায়ে ছায়াপথ শ্বেতবর্ণ দেখায়।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকের জীবনী এবং তাঁহাদের সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে কয়েকটি সারগর্ভ আলোচনা-ভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই জীবন-বৃত্ত সহকারে কবি বা লেখকগণের সাহিত্যকৃতি বিষয়ক এই জাতীয় আলোচনার প্রথম সূত্রপাত করেন। কিন্তু তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার সমকালীন কোন কবি বা লেখককে অবলম্বন করেন নাই—প্রাচীন কবিওয়ালা ও তাহারও পূর্ববর্তী কবি ভারতচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল। প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচনগত ঐক্য বা সাদৃশ্য দৃষ্ট হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের ভাবধারা বা আলোচনা-পদ্ধতি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত হইতে স্বতন্ত্র ছিল এবং রচনার বিস্তৃতি ও গভীরতার ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী' ব্যতীত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব', 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্র', '৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী' নামক প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই জাতীয় প্রতিটি প্রবন্ধই চিন্তার মৌলিকতা, রসবোধের গভীরতা এবং প্রকাশভঙ্গির সারল্য ও সরসতায় সমুদ্দীপ্ত হইয়াছে।

নাট্যকার দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ নাট্যসৃষ্টি 'নীল-দর্পণ'। 'নীল-দর্পণ'কে আশ্রয় করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর ব্যক্তি-চরিত্র ও সাহিত্যিক মানসের যে নিখুঁত পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই দীনবন্ধু সম্পর্কে সর্ববিধ আলোচনার শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'নীল-দর্পণে'র নাটকীয়তা, গুণাগুণ সম্পর্কে যখন বাংলাদেশে প্রবল বাদ-প্রতিবাদ ও বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্রই উক্ত নাটকের শিল্পসম্মত নাট্যগুণ নির্দেশ করিয়া তাঁহার প্রবন্ধে যে মূল্যবান্ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অতি আধুনিককালেও 'নীল-দর্পণে'র নাট্য-বিচার প্রসঙ্গে আধুনিকতম নাট্য-সমালোচকও বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাকে শ্রদ্ধার সহিত অনুসরণ করিয়া থাকেন। 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'নীল-দর্পণ' প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

১ 'বিজ্ঞান-রহস্য', (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৫), পৃঃ ৯

'বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক, নবেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায়ই সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট, তাহার কারণ কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। তাহা ছাড়িয়া সমাজ-সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিস্ফল হয়। কিন্তু নীল-দর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য এবম্বিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট। তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভুতি সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের মূল বক্তব্য ছিল যে, রচনা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইলেই কাব্য-সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে যে তাহা ব্যর্থ হইবে, এমন নহে। বিবৃত বিষয়ের সহিত লেখকের গভীর সহানুভূতির সহজ সমীকরণ হইলে, তাহা নিঃসন্দেহে কাব্যরসে স্নিগ্ধ ও সরস হইবে। সাহিত্যগত এই বিশিষ্ট সত্যের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধের মধ্য দিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং দীনবন্ধুর রচনার মধ্য হইতে এই দুর্লভ সাহিত্যগুণই তাঁহার দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সর্বোপরি বঙ্কিমচন্দ্র 'নীল-দর্পণে'র সহিত যুগান্তকারী মার্কিণ উপন্যাস *Uncle Tom's Cabin*-এর তুলনা করিয়া তাঁহার আলোচনা গভীর ব্যাখ্যা-বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। এ'রূপ সাদৃশ্যমূলক ভাব-চিন্তার প্রসঙ্গ নির্দেশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সূক্ষ্ম সাহিত্যরসিক সমালোচকের মর্যাদা লাভ করিয়াছেন।

/ বঙ্কিমচন্দ্র একজন রাজনৈতিক চেতনাপুষ্ট জাতীয়তাবাদী লেখক ছিলেন। স্বদেশপ্রেমের আন্তরিক প্রেরণার বশেই তিনি বাংলাদেশের সমাজজীবন ও তাহার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে গভীরভাবে অবহিত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের দ্বারা তাঁহার বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় চিন্তার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। (বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি 'সাম্য'। ইহা তাঁহার সমাজনীতি বা রাষ্ট্র বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পুস্তিকা।) সমাজে প্রচলিত বর্ণ-বৈষম্য, অর্থ-বৈষম্যের বিষময় পরিণতির এক সুস্পষ্ট ছবি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছিল এবং তিনি এই প্রসঙ্গে তাঁহার প্রবন্ধে যুক্তি-বিচার সহকারে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া সামাজিক ভঙ্গুর অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। দরিদ্র কৃষক সমাজের প্রতিনিধি পরাণ মণ্ডলের দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের নিখুঁত বিবরণী, বাংলাদেশের নারীর প্রতি বিবিধ কুসংস্কারমূলক সামাজিক নিগ্রহ, অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতি অভিজাত সম্প্রদায়ের অমানুষিক নিষ্ঠুর

---

১ **'বঙ্কিম রচনাবলী'**, ২য় খণ্ড, (সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা), পৃঃ ৮৩৫

আচরণের নগ্ন পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহার এই জাতীয় প্রবন্ধকে অধিকতর সত্যনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। সাধারণ জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিবেক জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনায় প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলাদেশে প্রথম সাহিত্যিক রচনার মধ্য দিয়া সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মূলমন্ত্র প্রচার করিয়াছেন এবং তাঁহার দ্বারাই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় কৃষিজীবী ও সাম্যবাদ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। তৎকালীন ফরাসীদেশের রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যতঃ তাঁহার সাম্যমন্ত্রের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। ফরাসী-বিপ্লবের পর হইতে ইউরোপে যে গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সর্বোত্তম আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সেই আদর্শেই গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পূতস্নিগ্ধ বাণীই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'সাম্য' প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার এই মতবাদ যে প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্ত্য আদর্শেই পরিপুষ্ট, তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করিলে লক্ষ্য করা যায় যে, এই আদর্শের বাণী ভারতবর্ষের নিকট সম্পূর্ণ নূতন নহে। দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে অতি প্রাচীনকালে উৎকট বর্ণ-বৈষম্য জনিত সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের পার্থক্য বিলোপ-সাধনকল্পে মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব ভারতবর্ষে এই সর্বজনীন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শই প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সুস্থ, সবল কল্যাণকর রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থার একটি বিশিষ্ট রূপচিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' প্রবন্ধের ভিতর দিয়া সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিবাদী সহৃদয় লেখক ছিলেন। যুক্তিজাল সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া নিছক আত্মবিগলিত অবস্থায় তিনি তাঁহার কোন রচনা মধ্যে প্রসঙ্গ-বহির্ভূত অবান্তর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নাই। বঙ্গদেশের কৃষকদিগের বর্তমান দুরবস্থা, তাহাদের প্রতি জমিদারগণের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা, রাষ্ট্রীয় আইন, বিশেষতঃ লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-নীতি প্রবর্তনের ফলে তাহাদের অযথা বিড়ম্বনা অর্থাৎ বাঙ্গালী কৃষক সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবনের সর্ববিধ পতনের কারণ উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে তাঁহার যুক্তিগর্ভ সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। জমিদার ও প্রজার পারস্পরিক তিক্ত সম্পর্ক প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

'জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগকে উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধে বাঙ্গালী কৃষকদিগের শোচনীয় জীবনযাত্রার পরিচয় প্রকাশ করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তাহাদের সামাজিক উন্নতির বিবিধ পন্থাও নির্দেশ করিয়াছেন এবং তাহা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাশক্তির মৌলিকতা ও অভিনবত্ব প্রমাণিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধে কৃষক সমাজের প্রতি তাঁহার অনুরাগসঞ্জাত আবেগ, সহমর্মিতা প্রকাশ পাইলেও, তাহাই একান্তভাবে প্রধান-প্রবল হইয়া প্রবন্ধগত বিষয় ও তাঁহার বিচার-বিশ্লেষণধর্মী মনোভাব আচ্ছন্ন করে নাই।

'বঙ্গদেশের কৃষক' চারিটি পরিচ্ছেদ সম্বলিত বঙ্কিমচন্দ্রের একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। ইহা তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধেরই কিয়দংশ বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' গ্রন্থেও গৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞান-চর্চার উল্লেখ্য নিদর্শন। তাঁহার গভীর সামাজিক সহানুভূতির সহৃদয় স্পর্শে রায়ত-জমিদার-রাষ্ট্রীয় সরকার সম্বন্ধীয় নীরস তথ্যালোচনাও সরস হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের সহিত হৃদয়াবেগ, তথ্য বিচার-বিশ্লেষণের সহিত সুগভীর সহানুভূতি, আত্মপ্রত্যয়গত গাম্ভীর্যের সহিত সহজ কৌতুকপ্রিয়তা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধকে এক অপূর্ব সুষমা দান করিয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় সুষ্ঠু পরিবেশন-কৌশলে কোথাও অস্পষ্ট হয় নাই। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি তথ্যবহুল হইলেও ইহার প্রতি পরিচ্ছেদেই দেশের নিপীড়িত কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগপূর্ণ প্রাণাবেগ ও প্রীতিবিগলিত হৃদয়ের সহানুভূতি উদাত্ত-বলিষ্ঠভাবে সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে। স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবোধ ও অখণ্ড মনুষ্যত্বের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি অধিকতর মহিমা-সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীজাতি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তৎকালীন বাংলাদেশে তাঁহার ন্যায় একান্ত বাঙ্গালীনিষ্ঠ প্রাণের সন্ধান পাওয়া

১ 'বিবিধ প্রবন্ধ', ২য় ভাগ, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৩), পৃঃ ২৪১

দুর্লভ। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম গভীরভাবে অনুভব করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীর জাতিগত ইতিবৃত্ত ও জাতীয় চরিত্রের সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় স্থাপন করিতে হইলে বাংলার ধারাবাহিক প্রামাণ্য ইতিহাস অনুশীলনের অবশ্যই প্রয়োজন। বাংলাদেশের যে একটি সত্য ইতিহাস বা আত্মপরিচয় আছে এবং তাহারই মাধ্যমে যে বাঙ্গালীর ধ্যান ও ধারণার সহিত সম্যক্ পরিচয় লাভ করা সম্ভব হয়, এইরূপ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা সর্বাগ্রে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই প্রবলভাবে জাগ্রত হইয়াছে। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলার ও বাঙ্গালীর বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-আলোচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইতিপূর্বে বাংলার যে ইতিহাস প্রচলিত ছিল, তাহা বিভ্রান্তিপূর্ণ এবং বিদেশী লেখকের দ্বারা সম্পূর্ণ বিকৃতভাবে পরিবেশিত। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব যে, তিনিই গবেষণালব্ধ ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যের ভিত্তিতে ইতিহাস রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং বাংলার তথাকথিত ইতিহাসের বিকৃতি ও মিথ্যাচার সপ্রমাণ করিয়াছেন। বাংলার বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যাদি অনুসন্ধান করিয়া বাংলার প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি মূল্যবান্ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রবন্ধগুলিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়। পরবর্তী কালে প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ইতিহাসগত তথ্যের সত্যতা ও তাহার সাহিত্যমূল্য শ্রদ্ধা সহকারে স্বীকার করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক প্রবন্ধসমূহ যেমন তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠ, তেমনি এক মহান্ আদর্শবাদ ও স্বজাতিপ্রেমের গভীর আবেগে উদ্ভাসিত হইয়াছে। বাঙ্গালীকে ঐতিহ্য-সচেতন ও স্বধর্মে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালী লেখকদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র উদাত্ত-গম্ভীর কণ্ঠে বাংলার ইতিহাস রচনার আহ্বান জানাইয়া তাঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। * * * যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ চিরকাল দুর্ব্বল অসার, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল অসার, গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।'[১]

১ 'বিবিধ প্রবন্ধ', ২য় ভাগ, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৬), পৃঃ ৩২০

এই প্রবন্ধ মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের বিকৃত তথ্য-প্রচারকারী বিদেশী ইংরাজ ঐতিহাসিকগণকেও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, ইংরাজ লেখক প্রণীত কোন গ্রন্থে বাংলার প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান করা কখনই সম্ভব নহে। খাঁটি তথ্যবাহী ইতিবৃত্তের পরিবর্তে ইংরাজগণ তাঁহাদের গ্রন্থে স্বকপোলকল্পিত রহস্যমণ্ডিত রূপকথা বা রোমাঞ্চকর কাহিনী পরিবেশন করিয়াছেন মাত্র। বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিক হইয়াও বঙ্কিমচন্দ্র এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনায় অতীতমুখী কোনরূপ রোমাঞ্চরসে আকৃষ্ট হন নাই—বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক অনুপ্রেরণাই তিনি মনেপ্রাণে সর্বদাই অনুভব করিয়াছেন।

বাংলার বৈশিষ্ট্য, বাংলার কল্যাণ, বাংলার ঐশ্বর্য বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্লোকে সর্বদা জাগ্রত ছিল। স্বজাতির প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগই তাঁহাকে বাংলার ঐতিহ্য উদ্ধারে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। ইংরাজ জাতির তুলনায় ইতিহাস-অনভিজ্ঞ নির্বিকার বাঙ্গালী জাতির উদ্দেশ্যে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অতীব ক্ষোভ সহকারে লিখিয়াছেন—

'সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।'[1]

বাঙ্গালীর আত্মবিস্মৃতি এবং ব্যর্থ অনুচিকীর্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং এই তীব্র বিক্ষোভের ফল স্বরূপ তাঁহার প্রবন্ধের সর্বত্রই এক নূতন বল-দীপ্ত আত্মজাগরণ এবং আত্মোদ্ভাবনের গভীর অনুচিন্তা ও প্রেরণাই লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির গৌরবময় অতীত ইতিহাসের এক বিস্তৃত পরিচয় দানেরই প্রয়াস পাইয়াছেন।

বাংলাদেশের এক অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করিতে হইলে বাংলার প্রত্নতত্ত্ব ও নৃ-তত্ত্বমূলক বিষয়ও সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নহে। বঙ্কিমচন্দ্র এই উভয় বিষয় সম্পর্কেই সম্যক্ অবহিত হইয়াছিলেন। 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রভৃতি কয়েকটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে তাঁহার বিস্তৃত অধ্যয়ন, গবেষণা ও ইতিহাসনিষ্ঠ আধুনিক বৈজ্ঞানিক চেতনার স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

বাংলার লোকবৃত্তের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধনের প্রয়াসে বঙ্কিমচন্দ্র নব্য বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান-কর্মে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। প্রধান কয়েকটি সামাজিক বর্ণ-বিভাগ ব্যতীত বাংলাদেশে বহু জাতির অস্তিত্বও বর্তমান এবং

১ 'বিবিধ প্রবন্ধ', ২য় ভাগ, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৬), পৃঃ ৩০৯

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর গোষ্ঠী-নির্ণয়কল্পে তাহাদের প্রত্যেকেরই নামোল্লেখ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে সর্বত্রই তাঁহার দৃঢ়নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' শীর্ষক প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি দীর্ঘ নৃ-তত্ত্ব (Anthropology) বিষয়ক প্রবন্ধ এবং সাতটি পরিচ্ছেদে ইহা বিভক্ত। প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে তাঁহার তীক্ষ্ণ যুক্তিবোধ ও ইতিহাস-দৃষ্টির গভীরতা এই রচনা হইতে প্রমাণিত হয়। অনার্য, আদিম জাতিগুলির ক্রমপরিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের ইতিবৃত্ত ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং বিস্তৃত বিচার-বিশ্লেষণের পর বঙ্কিমচন্দ্র নব্য বাঙ্গালীর মূল উদ্ভব বা উৎসক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যসন্ধানী এক বিশিষ্ট গবেষকের রূপও ইহাতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বতন বাংলার রাজবৃত্তও বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বাংলাদেশের পাঠান রাজন্যবর্গের শাসনকালই সর্বাপেক্ষা গৌরবময় এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি প্রধানতঃ এই সময়েই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালী-প্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধসমূহে এই পাঠান রাজন্যবর্গের উন্নত-শীর্ষ মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠান এবং মোগল রাজত্বের তুলনামূলক বিচার করিয়া তিনি পাঠান রাজন্যবর্গকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং মোগল শাসনকালেই যে বাংলার প্রদীপ্ত প্রাণশিখা ক্রমান্বয়ে অনুজ্জ্বল হইয়া শেষে নির্বাণ লাভ করিয়াছিল, তাহাও বিস্তৃতভাবে তাঁহার প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালার শ্রীহানির আরম্ভ। * * * বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগল কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় হিন্দুর অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন পাওয়া যায়, শতবৎসর মাত্রে ইংরেজ অনেক কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালায় মোগলের কোন কীর্ত্তি কেহ দেখিয়াছে?'[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিযোগ কোনরূপ বিদ্বেষ হইতে উদ্ভূত নহে, ঐতিহাসিক তথ্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ'কথা সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রই

১ 'বিবিধ প্রবন্ধ', ২য় ভাগ, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৬), পৃঃ ৩১৭

বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা-কর্মে ব্রতী হইয়াছেন এবং এই জাতীয় প্রথম প্রয়াসের ফল স্বরূপ তাঁহার রচনা সর্বোতোভাবে ঐতিহাসিক দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। তাঁহার কোন কোন প্রবন্ধে তথ্যগত ভুলভ্রান্তিও বিরল নহে। কিন্তু তথাপি ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারাই বাঙ্গালী লেখকগণের মধ্যে প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচেতনা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত বিশুদ্ধ সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলি তাঁহার গভীর রসবোধ ও কবিপ্রাণতার সার্থক নিদর্শন। এই প্রবন্ধসমূহের রচনা-পদ্ধতিও স্বতন্ত্রধর্মী। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য জাতীয় প্রবন্ধ হইতে সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের ভাষারীতি ও উপস্থাপনার পার্থক্য সহজেই লক্ষ্যগোচর হয়। বিশেষতঃ কাব্য-সাহিত্যের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-পুরুষের অন্তরঙ্গ স্পর্শ অনুভব করা যায়। এই জাতীয় আলোচনায় তিনি বিশুষ্ক বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা সরস হৃদয়বৃত্তির দ্বারাই অধিকতর অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত অলঙ্কৃত ভাষা এবং গীতিপ্রাণময় সুদূরপ্রসারী কবিদৃষ্টিতে এই শ্রেণীর প্রতিটি প্রবন্ধই সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রবন্ধসমূহেরও কোন পৃথক্ সংকলন নাই। প্রধানতঃ তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের প্রথম ভাগে এই জাতীয় প্রবন্ধসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যেমন, সাহিত্য-রূপকল্প (Form) ও সাহিত্য-সমালোচনা (Criticism), 'গীতিকাব্য', 'প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত', 'সঙ্গীত' প্রভৃতি প্রবন্ধ সাধারণতঃ সাহিত্যের রূপকল্প ও বস্তু-সামগ্রীর (Matter) আলোচনা। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যাদর্শে প্রভাবিত হইয়া সাহিত্যের প্রকৃতি ও উপাদান অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে তিনি গীতিকাব্যের লক্ষণ ও স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত হইলেও এই প্রবন্ধ মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সূক্ষ্ম চিন্তা ও গভীর মনন-ধর্মের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

'গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল, অনেক গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।'[১]

সংক্ষিপ্ত হইলেও এই প্রবন্ধ মধ্যে মহাকাব্য, নাটক ও গীতিকাব্যের পারস্পরিক পার্থক্য নির্দেশের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-চিন্তার মৌলিকতা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

'সঙ্গীত' নামক প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সুপরিণত রসগ্রাহী মনোভঙ্গীর পরিচয় দান করিয়াছেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রাচীন গীতিরসিক ব্যক্তিগণের সূক্ষ্মদর্শিতা ও গভীর ভাবনিষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্র বিস্ময়মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে সঙ্গীত-শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর সজীব মূর্তি কল্পনা করিয়া সঙ্গীত-সাধন রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে এই জাতীয় পরিকল্পনা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও লঘু রসিকতার লক্ষ্যস্থল হইলেও ইহার মাধুর্যময় আবেদনশীলতা উপেক্ষণীয় নহে। বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর স্বরূপ-নির্দেশক মূর্তি-কল্পনায় দেশীয় সঙ্গীতরসিক শিল্পিগণের যে মৌলিক সৃষ্টিশক্তি, সৌন্দর্যানুভূতি ও সঙ্গীত-সাধনার রীতি-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র রাগ-রাগিণীর মূর্তি সম্পর্কিত প্রচলিত তরল ও নির্মম রসিকতার অসারতা প্রমাণ করিয়াছেন। রাগ-রাগিণীর এই প্রকার অভিনব রূপ-কল্পনা আশ্রয় করিয়া প্রাচ্য দেশীয় প্রতিটি রাগ বা রাগিণীর স্বরূপ-প্রকৃতির এই জাতীয় স্বচ্ছ ব্যাখ্যান ইতিপূর্বে কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এ'ক্ষেত্রেও এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

বঙ্কিম-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে সাহিত্য-সমালোচনাত্মক প্রবন্ধ লিখিত হইলেও, তাহা অপেক্ষাকৃত অপূর্ণাঙ্গ ও অপরিণত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য-রীতি অনুসারী শিল্পসম্মত প্রবন্ধ রচনা করিয়া বাংলা ভাষার অপুষ্ট ও অপরিণত সমালোচনা-কর্মকে সৃষ্টিধর্মী মৌলিক সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের প্রথম কীর্তিমান্ স্রষ্টার গৌরব তাঁহারই প্রাপ্য। এ'কথা সর্ববাদিসম্মত যে, বঙ্কিমচন্দ্রের নৈয়ায়িক মনীষাবৃত্তির সহিত উদার উন্মুক্ত অনুভূতি-স্নিগ্ধ হৃদয়বৃত্তির সুষ্ঠু সম্মিলনে বাংলা ভাষায় সাহিত্য-সমালোচনার একটি বিশিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমশ্রেণীর একজন সুদক্ষ সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন। তিনি যেমন একদিকে ইংরাজী সমালোচনা-সাহিত্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর

১ 'বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম ভাগ, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৩) পৃঃ ৪৮

জ্ঞানার্জন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অন্যদিকে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রেও তাঁহার পাণ্ডিত্য অগভীর ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য গ্রেকো-রোমান্ আলঙ্কারিকদিগের সাহিত্য-বিচার রীতিই অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তিনি ম্যাথু আর্ণল্ড, ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চিন্তাধারাও আত্মস্থ করিয়াছিলেন। এইভাবে সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার মানস-পরিধি উদার-বিস্তীর্ণ সাহিত্যের রসলোকে প্রসার লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই মূলতঃ বাংলা সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার সর্ববিধ সাহিত্যালোচনা বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে সমুদ্ভাসিত হইয়াছে। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে তুলনামূলক সহৃদয় সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। 'উত্তরচরিত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রভৃতি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে গভীর রসদৃষ্টি, বহুশ্রুতত্ব (wide reading) এবং তীক্ষ্ণ-সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের সামগ্রিক ঐশ্বর্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যালোচনার প্রধান উল্লেখযোগ্য গুণ—সুস্পষ্টতা ও যুক্তি-ধর্মিতা। তদুপরি উপন্যাসসুলভ ভাষাসৌষ্ঠবও তাঁহার এই শ্রেণীর প্রবন্ধকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। ভাষার অস্বচ্ছতায় কোন ভাব বা বিষয় ইঙ্গিতধর্মী কুহেলিকা ও অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন হয় নাই। সুচিন্তিত ও সুনির্ণীত তত্ত্ব-সামগ্রী সরল ও সহজভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া রসোত্তীর্ণ সাহিত্য হইয়াছে।

'উত্তরচরিত' বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচনাত্মক প্রবন্ধ। সরস বিশ্লেষণ ও গভীর রসবোধের সার্থক সম্মিলনে প্রবন্ধটি সমুজ্জ্বল। সাহিত্য-সমালোচনার সূত্র ও রীতি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট আদর্শ ছিল এবং 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধ রচনায় তিনি তাঁহার নিজস্ব সাহিত্য-সূত্রটি অবলম্বন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র অখণ্ড বা সামগ্রিক রসদৃষ্টির সহায়তায় সাহিত্য-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সাহিত্য-বিচারে খণ্ড অংশ অপেক্ষা একত্র সমগ্র অংশের বিচার-বিশ্লেষণের প্রতি তিনি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধের একাংশে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

'এক একখানি প্রস্তর পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। * * * কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগর-মাহাত্ম্য

অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের এই স্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সর্ব্বাংশের পর্য্যালোচনা করিলে, প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না। 'যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগর-গৌরব অনুভূত করিতে হইলে তাহার অনন্ত বিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্যনাটক সমালোচনও সেইরূপ।'[১]

সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-বিচারের এই বিশিষ্ট প্রাণধর্মই স্বীকার করিয়াছেন এবং সংস্কৃত কবি ভবভূতি প্রণীত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যনাট্য 'উত্তররামচরিত' গ্রন্থের সমালোচনায় তিনি এই আদর্শই মুখ্যতঃ অনুসরণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে সাধারণ কাব্যের বিশিষ্ট কতকগুলি স্বরূপ-লক্ষণ নির্দেশিত হইয়াছে এবং তাহাই ভিত্তি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তৃতভাবে ভবভূতির কাব্য পর্যালোচনা করিয়াছেন। কাব্য-সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচ্যের প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ প্রবর্তিত রসাস্বাদন-পন্থা অনুসরণ করেন নাই। প্রাচ্য অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত নির্দিষ্ট রস-বিভাগের মাধ্যমে নিত্য পরিবর্তনশীল, ঘাত-প্রতিঘাতময় বিচিত্র মানসিক ভাবধারার সূক্ষ্ম বিচার সর্বত্র সম্ভব হয় না। সেইজন্য প্রগতিশীল স্বতন্ত্র এক সাহিত্য-চিন্তাও বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করিয়াছেন। অতএব বাংলা সমালোচনা ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব রুচিসম্মত বিচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন এবং তাঁহার আলোচনা-রীতি অপেক্ষাকৃত পাশ্চাত্ত্য প্রভাবপুষ্ট হইয়াছে।

ভবভূতির কাব্যের সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধে যে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি ও মৌলিক চিন্তার পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই সাহিত্য-বিচার ক্ষেত্রে তিমি একটি স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কাব্য-নাট্যের আঙ্গিকগত সৌকর্য, নাট্যগত ভাববস্তু এবং তাহার বিচিত্র রসানুভূতি ও সৌন্দর্য সুষ্ঠুভাবে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। মোহগ্রস্তের ন্যায় কেবলমাত্র অবিমিশ্র স্তুতিবাদেই তাঁহার আলোচনা শেষ হয় নাই—সাহিত্য-শিল্পের মানদণ্ডে ভবভূতির রচনার যে অংশ ত্রুটিপূর্ণ হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাও অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার সমালোচনার বিষয়ীভূত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্র প্রাসঙ্গিকভাবে মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতির সাহিত্যদৃষ্টির তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা তাঁহার 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধটিকে মূল্যবান্ করিয়া তুলিয়াছেন।

---

১ 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য গ্রন্থাবলী', ১ম ভাগ, (বসুমতী সংস্করণ), পৃঃ ২১-২২

কবি ভবভূতির গ্রন্থ আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে প্রাচ্যের প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে যে, তিনি এ'দেশের অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি অবিচার ও অমর্যাদা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এই জাতীয় ধারণা পোষণ করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। সাহিত্য-বিচারে তিনি প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই বলিয়া যে, তাঁহাদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র অসম্মান প্রকাশ বা হেয়জ্ঞান করিবেন, এ অভিযোগ অমূলক। 'উত্তররামচরিত' গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধের শেষ অংশে লিখিয়াছেন—

'কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোদ্ভাবন। রসোদ্ভাবন কাহাকে বলে, আমরা বুঝাইতে বাসনা করি, কিন্তু রস শব্দটি ব্যবহার করিয়াই আমরা সে পথে কাঁটা দিয়াছি। দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি এ কালে পরিহার্য্য।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্র কাব্য-বিচার প্রসঙ্গে প্রাচ্য অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত বিচার-পদ্ধতির সহিত তাঁহার নিজস্ব রস-বিচারের পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়া মূল বক্তব্য বিষয় সরল অথচ ওজস্বী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। যদিও এ'কথা সত্য যে, প্রাচ্যদেশীয় আলঙ্কারিকগণের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য অপেক্ষাকৃত কঠিন ও তীক্ষ্ণ হইয়াছে, তথাপি সমালোচনার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তাহা কোনভাবেই অমর্যাদাজনক বা অভিযোগ উদ্রেকবাহী উক্তি হিসাবে বিবেচ্য হইতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনামুখ্য প্রবন্ধসমূহের মধ্যে 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশিষ্ট তিনটি নাট্যগ্রন্থের নায়িকা-ত্রয়ীর চরিত্রগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য অভিনব ভঙ্গিতে এই প্রবন্ধে পর্যালোচিত হইয়াছে। চরিত্র আলোচনার মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মূল নাট্যগ্রন্থসমূহের ভাববস্তুও চুম্বকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং মূল গ্রন্থাদি হইতে যথাযথ সংলাপ উদ্ধৃতির দ্বারা নায়িকাগণের চরিত্রগত তারতম্য-বিচারও ইহাতে বিশেষভাবে সার্থক হইয়াছে। সংস্কৃত মহাকবি কালিদাস প্রণীত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র শকুন্তলা এবং স্বনামধন্য

১ 'বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম ভাগ, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৩), পৃঃ ৪৩-৪৪

ইংরাজ কবি-নাট্যকার শেক্স্‌পীয়রের *The Tempest*-ও *Othello*-র যথাক্রমে মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা চরিত্র অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার এই রসগ্রাহী-বিচারভিত্তিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের একটি স্বতন্ত্র রসদৃষ্টি ছিল এবং এই বিশিষ্ট দৃষ্টির আলোকেই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের রসবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও সৌন্দর্যরূপাস্বাদন-বৈচিত্র্যের অপূর্ব পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তাকর্ষক ভাষাও তাঁহার প্রবন্ধের অন্যতম আকর্ষণ। এই প্রবন্ধের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ভাষার সজীব স্পন্দন অনুভূত হয় এবং ভাষার ঔজ্জ্বল্য ও রূপ-বৈচিত্র্য তাঁহার প্রবন্ধগত ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র একজন সৌন্দর্যসাধক শিল্পী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সামান্য শৈল্পিক রেখাচিত্রণে অন্তর্গূঢ় বিষয় বা ভাবের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি বিস্ময়কর এবং তাহাতে যেন বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর স্বাদ অনুভূত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধের কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইল—

'শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র, দেস্‌দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেস্‌দিমোনা আমাদিগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত, শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।'[১]

বাংলা ভাষায় তুলনামূলক সমালোচনার প্রথম সাহিত্যিক প্রয়াস হিসাবে 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধটি সমুল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক প্রচেষ্টা হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র এই রচনায় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দান করিয়াছেন। পরস্পর পৃথক্ দুই দেশের নাটকীয় রূপ ও রীতিগত আদর্শ সম্পর্কে সচেতন হইয়াও তিনি ভিন্ন জাতীয় নাটকাবলীর ভাবরস আকণ্ঠ পান করিয়া তাহাদের মধ্যে গভীরতর ঐক্য অনুসন্ধান করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার মৌলিকতা ও রসদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য এই শ্রেণীর আলোচনা হইতে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

বিশুদ্ধ দার্শনিক প্রবন্ধগুলিও বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। তাঁহার এই জাতীয় প্রবন্ধে প্রধানতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ প্রচারিত মতবাদ ও চিন্তাধারার গভীর প্রভাব অনুভব করা যায়।

১ 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য গ্রন্থাবলী' ১ম ভাগ, (বসুমতী সংস্করণ), পৃঃ ৪৮

বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ভিত্তিতে প্রাচ্যদেশীয় দর্শন-তত্ত্বসমূহের বিচার-বিশ্লেষণ করিলেও, তাহা দ্বারা প্রাচ্যের নিজস্ব দার্শনিক বৈশিষ্ট্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই এবং বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক চিন্তা এক বাগাড়ম্বরহীন, ভাবোচ্ছ্বাসরহিত ও সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদের উপরই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। 'জ্ঞান', 'সাংখ্য-দর্শন', 'মনুষ্যত্ব কি?' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি অল্প পরিসরে ভারতীয় দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য অতি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রকাশ-কৌশলের ঋজুতা, বিচার-বিশ্লেষণের নিজস্বতা ও বাচনভঙ্গির মনোজ্ঞতায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই দার্শনিক প্রবন্ধগুলি সমুজ্জ্বল হইয়াছে। 'জ্ঞান' নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত হইল—

'ভারতবর্ষে দর্শন কাহাকে বলে? ইহার উত্তর দিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, ইউরোপে যে অর্থে 'ফিলসফি' শব্দ ব্যবহৃত হয়, দর্শন সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বাস্তবিক ফিলসফি শব্দের অর্থের স্থিরতা নাই,—কথন ইহার অর্থ অধ্যাত্মতত্ত্ব, কথন ইহার অর্থ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কথন ইহার অর্থ ধর্ম্মনীতি, কথন ইহার অর্থ বিচারবিদ্যা। ইহার একটিও দর্শনের ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে। ফিলসফির উদ্দেশ্য জ্ঞানবিশেষ; তদতিরিক্ত অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। দর্শনেরও উদ্দেশ্য জ্ঞান বটে, কিন্তু সে জ্ঞানেরও উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য নিঃশ্রেয়স, মুক্তি, নির্ব্বাণ বা তদ্বৎ নামান্তর-বিশিষ্ট পারলৌকিক অবস্থা।'১

বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্ম্মতত্ত্ব' তাঁহার ধর্মবিষয়ক দুইটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ গ্রন্থ। হিন্দুধর্মের অভিনব ব্যাখ্যা দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের এই গ্রন্থদ্বয় ভারতীয় ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে এক বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। সমন্বয়বাদী নব্য হিন্দুধর্মের আদর্শ প্রচারের মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধিদীপ্ত, ব্যাখ্যানিপুণ মননের পরিচয় লাভ করা যায়। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, জড় অর্থাৎ অন্ধ সংস্কারবদ্ধভাবে শাস্ত্রীয় প্রথা অথবা লোকাচার বা দেশাচারের অনুবর্তী হইয়া ধর্মানুষ্ঠানে ব্রতী হওয়া মূঢ়তা মাত্র। প্রথাসিদ্ধ প্রচলিত বিশ্বাস-সমূহ বিজ্ঞানসুলভ বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া মনের উচ্চতম আদর্শের অনুশীলনই বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট প্রকৃত ধর্মাচরণ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

১ 'বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম ভাগ, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৬), পৃঃ ১০৪

তাঁহার মতে শাস্ত্রমাত্রেই বিশ্বাস্য নহে; বরং যাহা বিশ্বাসযোগ্য তাহাই শাস্ত্র। এই জাতীয় অভিনব ধর্মব্যাখ্যা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সূক্ষ্ম যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তা ও বৈদগ্ধ্য, গভীর অধ্যয়ননিষ্ঠা এবং বিশিষ্ট দার্শনিক মনীষার পরিচয় প্রমাণিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান মনীষিগণের রচিত বিবিধ ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার জ্ঞানের পরিধি যেমন বিস্তৃত করিয়াছেন, তেমনি বিভিন্ন সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থাদির অনুশীলন দ্বারা তাঁহার ধর্মীয় চেতনা ও মননশীলতা সম্যক পরিপুষ্ট করিয়াছেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্ম্মতত্ত্ব'গ্রন্থদ্বয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাচ্য-প্রতীচ্য বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নের সার্থক ফলশ্রুতি। তাঁহার এই দুই গ্রন্থ মধ্যে বিশেষতঃ মিল্, কোম্ত, ফিক্‌টে, সীলি, হার্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণেরই প্রভাব অধিকতর অনুভূত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যা যে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সনাতন ধর্মীয় আদর্শের বিরোধিতা করিয়াছে, তাহা নহে। সনাতন ধর্মাদর্শকেই তিনি এক নূতন কলেবর দান করিয়াছেন মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ যুক্তিবাদী লেখক এবং তাঁহার নৈয়ায়িক যুক্তি-পদ্ধতি আশ্রয় করিয়া নিশ্চেষ্ট, কুসংস্কারে জড়বদ্ধ হিন্দুসমাজ নূতন প্রাণাবেগে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের যে গভীর পাণ্ডিত্য ও সহজ অধিকার ছিল, তাহা দ্বারা তিনি ভারতীয় ধর্ম শাস্ত্রসমূহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যথোচিতভাবে বিচার-বিশ্লেষণের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মৌলিক বিশ্লেষণ ও সুতীক্ষ্ণ সমালোচনার বিশিষ্ট ভঙ্গিতে প্রাচ্যের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রসমূহের অন্তর্মুখী প্রাণশক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বাহ্যিক ও তথাকথিত অসার কল্পনাবিলাস পরিত্যক্ত হইয়া এক বিশিষ্ট ধর্ম-পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরাবতার হিসাবে বিশ্বাস করিয়াছেন এবং এই প্রবন্ধগ্রন্থের সূচনায় তিনি লিখিয়াছেন—

'আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।'[১]

কিন্তু ইহাও লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণে নিছক অবতারত্ব আরোপ করিয়াই তাঁহার আলোচনা সম্পূর্ণ করেন নাই। কারণ, তিনি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব

১ 'কৃষ্ণচরিত্র', (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৩), পৃঃ ১

করিয়াছিলেন যে, ধর্মজীবন-চর্যায় সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করিতে হইলে তাহা কেবলমাত্র শুষ্ক অবতারবাদের তত্ত্ব-কথা দ্বারা সম্পন্ন হইবে না, তাহাদের সম্মুখে এক মহোত্তম জীবন্ত আদর্শ উপস্থাপনার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী এবং সেইজন্য নরবপুধারী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শস্থানীয় মনুষ্যরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ-চরিত মনুষ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসে ইহার অনুকূলে বঙ্কিমচন্দ্র 'মহাভারত', 'হরিবংশ,' 'অষ্টাদশ পুরাণ' প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থাদি হইতে বহুসংখ্যক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্যোচিত মহিমার নিখুঁত পরিচয় দান করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্মদর্শিতা ও অক্লান্ত অধ্যবসায় প্রকাশ পাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের সর্বত্র বিবিধ দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে সংগৃহীত প্রামাণ্য তথ্যাদির একত্র সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় এবং এই সকল তথ্যাদি ভিত্তি করিয়া প্রমাণ করা সম্ভব হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন মর্ত্যলোকবাসী আদর্শ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

'কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী এবং ধর্ম্মপ্রচারক; সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বীদিগের, ধর্ম্মবেত্তাদিগের এবং একাধারে সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ।'[১]

শ্রীকৃষ্ণের মানবীয় গুণের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবশালী দুই বিরোধী দলের প্রচারিত মতাদর্শের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ দুই অভিমতই তিনি অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে মনুষ্য সুলভ বিশিষ্ট বৃত্তিসমূহের অধিকারী ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই শ্রীকৃষ্ণের মানবত্বে অবিশ্বাসী পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণের নিকট যেমন যুক্তি-তর্ক দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তেমনি রক্ষণশীল প্রাচ্য পণ্ডিতগণ প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রাকৃত রূপ ও ক্রিয়াকলাপের অলৌকিকতাও তিনি নৈপুণ্য সহকারে খণ্ডন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'কৃষ্ণ মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন।'[২]

১ 'কৃষ্ণচরিত্র' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৩), পৃঃ ১৭৬

২ ঐ, পৃঃ ১৯১

বঙ্কিমচন্দ্র বলিষ্ঠভাবেই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন নরদেহ ধারণ করিয়াছেন, তখন তিনি মানুষের সাধ্যায়ত্ত ক্রিয়া-কর্মই সম্পন্ন করিবেন; কিন্তু যেহেতু তিনি ঈশ্বর, সেই কারণে, তাঁহার দ্বারা অতি মানুষিক কর্মকৃতি সাধিত হইলেও কোন অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব নহে। নরদেহে শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ মানুষেরই আদর্শ। অতএব অলৌকিক শক্তি তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইলে তাঁহার মানবীয় আদর্শচ্যুতি ঘটাই স্বাভাবিক। যুক্তিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র এই ক্ষেত্রে সর্ববিধ ধর্ম-সংস্কার বা দুর্বলতা হইতে নিজেকে নির্মুক্ত রাখিয়া নিরপেক্ষ ভাবে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মানুষের যে সকল ক্রিয়া কলাপ যুক্তি অথবা মননের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, তাহা মনুষ্যোচিত স্বাভাবিক ধর্ম হইতে বিচ্যুতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট সমাদৃত হয় নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কর্মবহুল ঘটনার প্রসঙ্গ মূল মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা প্রসঙ্গেও একটি বিশ্বাসযোগ্য মানবীয় ব্যাখ্যা সংযোজনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণায়ত মনুষ্যচরিত্রের প্রতিভূস্বরূপ। এইরূপ আদর্শ মনুষ্যত্বের অনুশীলন ও সাধনা করিয়া সাধারণ মানবসমাজকে চিত্তপরিশুদ্ধি ও পরিপূর্ণতার শক্তি অর্জন করিতে হইবে—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে প্রধানতঃ ইহাই প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যতঃ মহাভারত-বর্ণিত কৃষ্ণের বিভিন্ন সংলাপ ও তাহার জীবনের বিচিত্র ঘটনার ভিত্তিতে কৃষ্ণ-চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাহার ঐতিহাসিক সততা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বিষয়গত তথ্য-প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে সর্বত্র অভ্রান্ত যুক্তির তীক্ষ্ণতা ও নৈপুণ্য প্রকাশ না পাইলেও সেইযুগে বঙ্কিমচন্দ্রের অক্লান্ত ঐতিহাসিক গবেষণা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধের কোন কোন স্থলে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ও বিরোধী ধর্মমতাবলম্বী ব্যক্তিগণকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন এবং তাঁহার শ্লেষ ও বিদ্রূপের মধ্যে স্থূলতা বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে, এই জাতীয় প্রবন্ধের ভাব ও ভাষার গাম্ভীর্য ও রচনা-সৌষ্ঠবের সংযম-নিয়ন্ত্রিত মাত্রাবোধ আনুপূর্বিক রক্ষিত হয় নাই।

ভগবদ্গীতায় ব্যাখ্যাত ধর্মতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্রকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল এবং গীতার ধর্মভাব সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা ও বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যেই তিনি 'ধর্মতত্ত্ব' নামক বিশিষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্ব'

এই গ্রন্থ দুইটি পরস্পরের পরিপূরক। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের সত্যাদর্শের অনুশীলনকেই ধর্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। সকল মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের সাধনায় উদ্বুদ্ধ করিবার প্রচেষ্টাই এই রচনার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম সম্পর্কিত এই জাতীয় বিস্তৃত ও সহজ সরল ব্যাখ্যা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার মধ্য দিয়া সাধারণ সংসারীর সর্ববিধ কর্তব্য-কর্ম ও সুস্থ জীবনধারার চিত্র সুপরিকল্পিতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনমূলক অভিনব আঙ্গিকে জটিল ধর্মব্যাখ্যাও সুন্দর ও উপভোগ্য হইয়াছে। এই জাতীয় গ্রন্থ রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের প্রচারিত মতবাদ অবলম্বন করিলেও, তাহাই তাঁহার রচনাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে নাই—কেবলমাত্র প্রয়োজনানুসারে তিনি পাশ্চাত্ত্য মতবাদ বা তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিজস্ব প্রতিপাদ্য বিষয় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই কথা অনস্বীকার্য যে, মুখ্যতঃ ভগবদ্গীতার ধর্মবোধই বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্বে' প্রধান আসন লাভ করিয়াছে।

৮. বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে পাশ্চাত্ত্যের Religion ও প্রাচ্যের 'ধর্ম' —এই উভয়বিধ অর্থের স্বরূপ ও প্রকৃতি অবলম্বনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আলোচনা করিয়াছেন। তিনি নৈয়ায়িক দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া এইভাবে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পাশ্চাত্ত্যদেশীয় জাতিগণের নিকট ঈশ্বর ও পরকাল-চিন্তাই একমাত্র ধর্ম এবং ইহাকেই ইংরাজী ভাষায় সাধারণতঃ Religion বলা হইয়া থাকে। প্রাচ্যদেশীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট ইহকাল, পরকাল, সমস্ত মানুষ, সকল জীব, সমগ্র বিশ্বজগৎ প্রভৃতি সকলের সমবায়-রূপই ধর্ম; যে বস্তুর সহায়তায় মানুষ মনুষ্যত্বের অনুশীলন করিয়া ঈশ্বরাভিমুখী হইবার প্রেরণা লাভ করে, তাহাই ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র Religion ও ধর্মের পার্থক্য নির্ণয়ে বিশিষ্ট পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় অধিকতর প্রমাণনির্ভর ও মূল্যবান্ করিয়া তুলিয়াছেন।

মনুষ্যজীবনে ধর্মকে সার্থকভাবে গ্রহণ বা আত্মস্থ করিতে হইলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের সম্যক্ অনুশীলন ও পরিপুষ্টি সাধনের প্রয়োজন হয়। ইহার ফল স্বরূপ, মানুষের সকল কর্মে, চিন্তায় ও বাক্যে এক অখণ্ড ঐক্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা পায় এবং মনুষ্যজীবন পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়া

সুন্দর ও সুখাবহ পরিণতি লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'ধর্মতত্ত্ব' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

১। 'মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। * * * সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।

৫। এই সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সকলেই ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধর্মীয় অনুশীলন-তত্ত্ব তাঁহার পরিণত বিচারবুদ্ধির সহায়তায় গঠিত হইয়াছে। আধুনিক কালের অন্যতম বিশিষ্ট কবি-সমালোচক মোহিতলাল বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাখ্যাত ধর্মতত্ত্বকে সমর্থন করিয়া তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক প্রবন্ধের একাংশে লিখিয়াছেন—

'তিনি প্রকৃত জীবনের সমস্যা, পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ,—জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, কর্ম্ম—সর্ব্ববৃত্তির সামঞ্জস্যমূলক একটি সত্যের সন্ধান করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে নিছক জ্ঞান বা ধ্যানের মধ্যে নয়, জীবনের সমগ্র বাস্তবতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সত্যের সন্ধানই তাঁহার ধর্মতত্ত্ব।'[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ধর্ম ও সংস্কৃতির (culture) মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ বা পার্থক্য অনুভূত হয় নাই। বরং তিনি উভয়ের এক অদ্বৈত সম্পর্কই স্বীকার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, প্রাণ-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের অনুশীলন ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক অধ্যাপক সীলির মূল্যবান্ মন্তব্য উদ্ধৃত করিবার ফলে তাঁহার বক্তব্য অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এক সত্যান্বেষী আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁহার এই সত্যনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও মননের দ্বারা প্রাচ্য শাস্ত্রসমূহের সহিত পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'কেই

১ 'ধর্ম্মতত্ত্ব', (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৭), পৃঃ ১৪০

২ 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (কলিকাতা, ১৩৫৩), পৃঃ ২৫

জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

'এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব, অপূর্ব্ব ধর্ম্ম কেবল গীতাতেই আছে। এইরূপ আশ্চর্য্য ধর্ম্মব্যাখ্যা আর কখন কোন দেশে হয় নাই।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্র 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'য় প্রচারিত ধর্মই সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে তাহারই মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সকল জীবের মধ্যে আপনাকে অনুভব, আপনাতে সর্বভূতের অস্তিত্ব উপলব্ধি, সর্বত্র সমদৃষ্টি প্রদান, ঈশ্বরকে সর্বত্র অনুধাবন ও ঈশ্বরের মধ্যে সকল জীবের স্থিতি—এই প্রতীতি বা বোধই প্রধানতঃ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র মর্মকথা,। বঙ্কিমচন্দ্র গীতার মহোত্তম ধর্মভাবই বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন; এইজন্য সর্ব্বভূতে প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই।

আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া, এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্বদেশপ্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত।'[২]

ধর্ম্মতত্ত্ব-বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রীতিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করিয়াছেন। স্বদেশপ্রীতির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন যুগধর্মের প্রবণতাই প্রকাশ করিয়াছেন। তৎকালে দেশ এবং সমাজে প্রচলিত হিন্দুধর্ম বহুবিধ ভ্রান্ত বাহ্যিক সংস্কার ও সংকীর্ণতায় ভারগ্রস্ত ও কলুষিত হইয়া ধর্মগত মহান্ ঐতিহ্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছিল। প্রচলিত ধর্মচিন্তায় ঔদার্য, বিচারবুদ্ধি বা কোনরূপ বলিষ্ঠ পৌরুষের স্পর্শ ছিল না; তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্মল বিশুদ্ধ ভক্তি-পরাহত ছিল। অতএব সেই ধর্ম-সংকট মুহূর্তে বঙ্কিমচন্দ্র যুগোপযোগী স্বদেশপ্রীতি-ধর্মকে প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া তাহারই মাধ্যমে দেশের জনসমাজকে পুনর্বার সনাতন শাশ্বত ধর্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় তাঁহার সকল প্রবন্ধই সংকলিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধরাজি ও অন্যান্য রচনা পরবর্তী কালে উদ্ধার করিয়া 'বিবিধ' নামক পুস্তকের

১ 'ধর্ম্মতত্ত্ব', (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৭), পৃঃ ৭৫

২ ঐ, পৃঃ ১৪০-৪১

মধ্যে সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ বিশুদ্ধ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধই রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লিখিত, 'মেঘ', 'বৃষ্টি', 'খদ্যোত', প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহের মধ্যে যুক্তিধর্মী জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা গীতিধর্মী কবিপ্রাণ এবং মনন অপেক্ষা হৃদয়ের স্নিগ্ধরূপেরই অধিক অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। এই জাতীয় প্রবন্ধের রচনা বা শিল্প-কৌশল যেমন অভিনব, তেমনি প্রবন্ধগত অন্তর্নিহিত ভাবও চিত্তগ্রাহী ও তাৎপর্যময়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বৃষ্টি' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু একা একজনে যূথিকা-কলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কণা মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে ?'[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সর্ববিধ প্রবন্ধই বিশেষভাবে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। কেবলমাত্র প্রবন্ধের ক্ষেত্রেই নহে, উপন্যাস ও অন্যান্য সাহিত্যিক রচনার মধ্য দিয়াও তিনি তাঁহার আদর্শগত একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও সত্যই প্রচার করিয়াছেন। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচক-সমাজ কর্তৃক বিশুদ্ধ সাহিত্যস্রষ্টা অপেক্ষা প্রচারধর্মী লেখক হিসাবেই অধিকতর অভিহিত হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ-সাহিত্যে তাঁহার প্রচারকের ভূমিকাও একান্ত গৌণ নহে। তাঁহার এই জাতীয় ত্রুটি স্বীকার করিলেও এ'কথা সত্য যে, সাহিত্যে প্রচার-কর্মেরও একটি বিশেষ মূল্য আছে এবং প্রতি সৎ সাহিত্যের মধ্যে প্রচার-গুণ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যুগপৎ ইহাও লক্ষণীয় যে, সেই প্রচার-গুণ দ্বারা যেন রচনার সাহিত্য-রস ক্ষুণ্ণ না হয় এবং সুষ্ঠু পরিবেশননৈপুণ্যে যদি কোন রচনা কেবলমাত্র কতকগুলি গুরুগম্ভীর তত্ত্ব বা তথ্যপুঞ্জে পরিণতি লাভ না করে, তাহা হইলে সেই রচনায় প্রচার-গুণ বর্তমান থাকিলেও, তাহা সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হয়। সাহিত্যের এই মানদণ্ডে বিচার বা পর্যালোচিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের সকল প্রবন্ধই সাহিত্যপদবাচ্য। কেবলমাত্র প্রবন্ধেই নহে, বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ববিধ রচনা মধ্যেই প্রচার-ধর্ম গৌণ হইয়া তাঁহার সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও সাহিত্যরস-দীপ্তি প্রকাশ পাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যদৃষ্টি প্রসঙ্গে সমালোচকপ্রবর মোহিতলালের উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য। মোহিতলাল তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'বঙ্কিম কেবলমাত্র চিন্তা-বীর বা সত্যপরায়ণ সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না—আরও বড় ছিলেন। দেশপ্রেমের প্রেরণাযুক্ত এক অপূর্ব্ব প্রতিভায় তিনি সে

১ 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য গ্রন্থাবলী' ২য় ভাগ, (বসুমতী সংস্করণ), পৃঃ ২৮৩

যুগে স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্মের বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন—তাঁহার চিন্তায় শুধুই বিশ্লেষণী শক্তি নয়, সৃজনী শক্তি ছিল। * * * 'Our greatest thoughts come from the heart'—এই রহস্যময় চিত্তবৃত্তি, হৃদয়ের গভীর গহনের অনুভূতি না থাকিলে, কেহ কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না। এইজন্য বঙ্কিম কবি।'[১]

অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে প্রচার-ধর্মের আধিক্য থাকিলেও তাহা তাঁহার হৃদয়ের গভীর গহন অনুভূতি-রসে নিষিক্ত হইয়া সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগত প্রতিপাদ্য বিষয় ও ভাবধারার মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য ও গভীরতা পরিলক্ষিত হয়, তেমনি বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে তাঁহার রচনারীতি সৌষ্ঠব-সৌকর্যে উজ্জ্বল ও প্রসাদগুণে স্বচ্ছ-সুন্দর হইয়াছে। অপূর্ব বিচিত্র ভঙ্গির লীলায় লীলায়িত তাঁহার ভাষার এবংবিধ সহজ সাবলীল গতিপ্রবাহ সমকালীন বাংলা সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট।

সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি কালিদাসের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রও একজন প্রয়োগ-নিপুণ শব্দ-শিল্পী ছিলেন। অব্যর্থ শব্দ-যোজনার কৃতিত্বে ও পরিমিত বাক্যবিন্যাস দ্বারা তিনি ভাষার নমনীয়তা ও আভিজাত্য রক্ষা করিয়া ইহাতে এক অমিত জীবনীশক্তি দান করিয়াছেন। সহৃদয় ভঙ্গি ও মাত্রাবোধের অপূর্ব সমন্বয়ে রচনারীতির সৌষ্ঠব ও সমুন্নতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ-সচেতন এক বিশিষ্ট অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। অসাধারণ প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য ও গভীর আন্তরিকতার স্নিগ্ধ-মধুর লালিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সকল প্রবন্ধই ওজস্বী ও দীপ্তিময় হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধসমূহ প্রধানতঃ তাঁহার শেষ কয়েক বৎসরের মধ্যেই লিখিত হইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধ রচনার কাল সাধারণতঃ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়ের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে ও প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্বে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের আদর্শ বা মান (Standard) প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষাদীপ্ত প্রবন্ধ-সম্পদের ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট হইয়া বর্তমান বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য অধিকতর সমৃদ্ধি ও গৌরবময় পথে অগ্রসর হইবার শক্তি অর্জন করিয়াছে।

১ 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', (কলিকাতা, ১৩৫৩), পৃঃ ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন নিষ্ঠাব
গবেষক ও অন্যতম শক্তিশালী প্রবন্ধকার রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। নেপাে
রাজদরবারের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় লিি
বৌদ্ধ গানের পুঁথি আবিষ্কারই তাঁহার বিস্তৃত অনুসন্ধান ও গভীর গবেষণার সা
ফলশ্রুতি। হরপ্রসাদ পরবর্তী কালে ইহা 'বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে বঙ্গীয়-সাহিত
পরিষৎ হইতে প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষার আদিম রচনার আবিষ্কর্তা হিসাবে
হরপ্রসাদের খ্যাতি সর্বাধিক। ইতিপূর্বে অর্থাৎ চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগের বাংল
ভাষার কোনরূপ অবিসংবাদী প্রাচীন নিদর্শন সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট অজ্ঞা
ছিল। হরপ্রসাদই সর্বপ্রথম চর্যাপদসমূহ প্রকাশ করিয়া বাংলা ভাষার প্রাচীন
ও ইহার গৌরবময় আভিজাত্য প্রমাণ করিয়াছেন। কেবলমাত্র প্রাচীন পুঁথি
আবিষ্ক্রিয়া বা বিস্মৃতপ্রায় মূল্যবান্ গ্রন্থসমূহের সম্পাদনাই হরপ্রসাদের একমা
কর্মকৃতি নহে, বিভিন্ন বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ-রচয়িতা হিসাবেও বাংলা সাহিত্যে
তিনি একটি উল্লেখযোগ্য আসনের অধিকারী হইয়াছেন। হরপ্রসাদ উপন্যাস ও
কাব্য রচনার ক্ষেত্রেও সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক
হরপ্রসাদের খ্যাতির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে।

হরপ্রসাদ ধীমান্ নৈয়ায়িকের ন্যায় তীক্ষ্ণ যুক্তিপ্রবণ এবং সংস্কারমুক্ত
বৈজ্ঞানিকের ন্যায় বিশ্লেষণপরায়ণ মনের অধিকারী ছিলেন। ন্যায়ধর্মী বিচার-
বিশ্লেষণ তাঁহার সর্ববিধ প্রবন্ধের একটি বিশেষ গুণ। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস
বা প্রত্নতত্ত্ব ব্যতীত সাহিত্য, দর্শন, ধর্মনীতি, শিক্ষা ও বাঙ্গালী-সমাজের বিচিত্র
জীবন-পদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত হরপ্রসাদের আলোচনা তাঁহার অনন্যসাধারণ মনীষা
ও শ্রমসিদ্ধ বহুপ্রসারী অভিজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বংশের
সন্তান হরপ্রসাদেরও ব্যাপক পাণ্ডিত্য ছিল এবং তিনি সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ও
ইংরাজী সাহিত্যে তুল্য যশস্বী ও কৃতবিদ্য ছিলেন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির
ক্ষেত্রেই হরপ্রসাদের জ্ঞান ও গবেষণার সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার
পাণ্ডিত্যের বিস্তৃতি ও গভীরতার সহিত বিচার-শক্তির উন্নত নৈপুণ্যের সম্মিলনে

হরপ্রসাদের প্রবন্ধ অধিকতর প্রোজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম সাহিত্য-জীবনের অধিকাংশ প্রবন্ধই বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শন' ব্যতীত হরপ্রসাদ 'আর্য্যদর্শন', 'নব্যভারত', 'সাহিত্য', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', 'নারায়ণ', 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' প্রভৃতি সমকালীন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-পত্রসমূহের একজন নিয়মিত প্রবন্ধ-লেখক ছিলেন।

হরপ্রসাদের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'ভারত-মহিলা' (১৮৮১), ২। 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' (১৯৪৬) ও ৩। 'বৌদ্ধধর্ম্ম' (১৯৪৮)। হরপ্রসাদ প্রণীত 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' (১৯০২) গ্রন্থের নামকরণ হইতে ইহাকে একটি আলোচনা-ভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধ হিসাবে ভ্রম হয়। কিন্তু তাঁহার এই গ্রন্থটি মহাকবি কালিদাস রচিত সংস্কৃত 'মেঘদূত' কাব্যের ভাবানুবাদ মাত্র। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির কর্তৃক প্রথম 'হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয়। ইহাতে হরপ্রসাদের উপন্যাস ও কাব্যগ্রন্থসমূহের সহিত তাঁহার কিছু সংখ্যক প্রবন্ধও সংকলিত হইয়াছে। সম্প্রতি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তির সম্পাদনায় 'হরপ্রসাদ রচনাবলী'র প্রথম ও দ্বিতীয় সম্ভার প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতেও হরপ্রসাদের অন্যান্য রচনা-সমূহের সহিত তাঁহার বিভিন্ন বিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং রচনাবলীর পরবর্তী সম্ভারে হরপ্রসাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবশিষ্ট প্রবন্ধসমূহ প্রকাশ করা হইবে বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে।

হরপ্রসাদের প্রবন্ধসমূহ বিষয়গৌরবে ও স্বকীয় রচনাশৈলীগুণে মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তাঁহার রসদৃষ্টি ও আলোচনা-পদ্ধতির অভিনবত্ব সর্ববিধ প্রবন্ধের মধ্যেই একটি বিশিষ্ট মহিমা আরোপ করিয়াছে। যুক্তিশৃঙ্খলার মাধ্যমে অথচ রসসম্মতভাবে বক্তব্য বিষয় সুচারুভাবে পরিবেশনের সুবিন্যস্ত ও চিত্তগ্রাহী প্রণালী হরপ্রসাদের প্রবন্ধের মধ্যে সার্থকভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার সহজ সুললিত রচনাভঙ্গি, সুচিন্তিত সিদ্ধান্তমুখী মানসিকতা এবং রচনার মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ কৌতুকোজ্জ্বল রসের বিচ্ছুরণে প্রবন্ধগুলি উপভোগ্য ও বৈশিষ্ট্যময় হইয়াছে।

হরপ্রসাদ চিন্তাশীল মনীষী ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি প্রধানতঃ নীরস গুরুগম্ভীর বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধগত বিষয়-চিন্তার মধ্যে গাম্ভীর্য পরিলক্ষিত হইলেও প্রকাশভঙ্গির সহজ রসিকতায় তাহা আস্বাদ্য

হইয়া উঠিয়াছে। এবংবিধ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রচনা বাংলা সাহিত্যে সহজপ্রাপ্য নহে—এই ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক ভাবশিষ্য।

সর্বোপরি হরপ্রসাদের প্রবন্ধের অন্যতম আকর্ষণ তাঁহার প্রসাদগুণান্বিত, স্বচ্ছ-সাবলীল ভাষা। একটি সহজ সুরের আমেজে তাঁহার ভাষার লাবণ্য অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ জটিল বিষয়ও সহজ ভাষা-শিল্পের গুণে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হইয়াছে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও হরপ্রসাদের ভাষায় সংস্কৃত শব্দবাহুল্য বা পণ্ডিতী অলংকার ব্যবহারের প্রয়াস নাই। তাঁহার ভাষা খাঁটি বাংলা অর্থাৎ হরপ্রসাদের অমিত নিষ্ঠা ও প্রযত্নে তৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দের অপূর্ব মিলনের ফলে এই প্রকার স্বচ্ছ, সরল ভাষার উদ্ভাবনা সম্ভবপর হইয়াছে। হরপ্রসাদ তাঁহার সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মুখ্যতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক ভাষা ও রচনারীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মধ্যেও তাঁহার ভাষার স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ অস্পষ্টগোচর হয় নাই। ভাষার স্বকীয় শক্তি ও বৈশিষ্ট্য হরপ্রসাদের পরবর্তী কালের রচনায়, বিশেষতঃ প্রবন্ধসমূহের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার সরস বাগ্‌ভঙ্গির শৌর্য ও সৌন্দর্যে বাংলা গদ্য-ভাষাও এক উজ্জ্বল দীপ্তি ও সহজ ঋজুগতি লাভ করিয়াছে।

কেবলমাত্র ভাষার ক্ষেত্রেই নহে, হরপ্রসাদের সাহিত্যদৃষ্টি ও বিশিষ্ট চিন্তাধারার মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের সুস্পষ্ট প্রভাব অনুভব করা যায়। বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক ভাবধারা হরপ্রসাদকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সাহিত্যে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ রীতি অবলম্বনের জন্যও তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ঋণী। কিন্তু পরবর্তী কালে হরপ্রসাদ স্বকীয় চিন্তা ও ভাবের অনুধ্যান ও অনুশীলনের ফলে এবং নিজস্ব রীতি প্রবর্তনা দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

হরপ্রসাদের প্রথম লিখিত প্রবন্ধপুস্তিকা 'ভারত-মহিলা'। এই প্রবন্ধ রচনা করিয়া তিনি মহারাজা হোলকারদত্ত পুরস্কার লাভ করেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা ও তাহাদের চারিত্রিক মাহাত্ম্য অবলম্বনে তৎকালীন কবি-পণ্ডিতগণ কর্তৃক লিখিত বিবরণীর ভিত্তিতে হরপ্রসাদ তাঁহার 'ভারত-মহিলা' গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে ভারতীয় নারীজাতির বিশিষ্টতা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। হরপ্রসাদের প্রবন্ধগত বিষয়টি নূতন নহে। কারণ, ইতিপূর্বেই কয়েকজন প্রবন্ধকার ভারতবর্ষীয় প্রাচীন মহিলাগণের সামাজিক

জীবনযাত্রা ও শিক্ষা প্রসঙ্গে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বিষয়-নির্বাচনে হরপ্রসাদের অভিনবত্ব প্রকাশ না পাইলেও চিন্তাধারা ও পরিবেশন-রীতির মৌলিকতা বা স্বাতন্ত্র্য তাঁহার প্রবন্ধে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'ভারত-মহিলা' প্রবন্ধ গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার প্রথম দুইটি অধ্যায়ের মধ্যে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ হইতে উদ্ধৃত তথ্যাদি সহযোগে পুরাকালীন স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অধ্যায়সমূহে বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস প্রমুখ খ্যাতনামা ঋষি-কবিগণের কাব্যগ্রন্থসমূহ হইতে কয়েকটি বিশিষ্ট নারীচরিত্র নির্বাচন করিয়া তাহাদের চারিত্রিক মাহাত্ম্য হরপ্রসাদ অতি মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষকভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার সীতা ও সাবিত্রীর তুলনামূলক আলোচনার কিয়দংশ 'ভারত-মহিলা' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল—

'সীতা ও সাবিত্রী দুইজনই অদ্বিতীয় রমণী। পৃথিবীর কোন দেশের কোন কবিই স্বীয় কল্পনাশক্তিবলে উঁহাদের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সীতার স্নেহপ্রবৃত্তি অলৌকিক, সুখ দুঃখ বিপদসম্পৎ সকল সময়েই স্বামীর প্রতি তাঁহার মনোভাব অবিচলিত। দেবর লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার স্নেহ সর্ব্বদা সমান। দেবর তাঁহাকে বনমধ্যে একাকী রাখিয়া আসিলেন, তথাপি তিনি উহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং গুরুজনকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী স্বামীর বিরহে জীবন দিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের উভয়েরই বুদ্ধিবৃত্তি সমান প্রভাবশালিনী। সীতা রাবণের সহিত, সাবিত্রী যমরাজের সহিত কথোপকথনে ইহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন।'[১]

হরপ্রসাদ তাঁহার 'ভারত-মহিলা' প্রবন্ধগ্রন্থে কয়েকটি পৌরাণিক স্ত্রী-চরিত্রের উৎকৃষ্ট চিত্র অতীব নিষ্ঠাসহকারে অঙ্কিত করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত হইতে পতিপ্রাণা নারীগণের একটি দীর্ঘ তালিকাও এই প্রবন্ধ মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে এবং হরপ্রসাদ তাঁহার প্রদত্ত তালিকা হইতে লোপামুদ্রা, সাবিত্রী ও সীতা চরিত্র নির্বাচন করিয়া তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি দ্রৌপদী, দময়ন্তী, চিন্তা ও গান্ধারী চরিত্রেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দান

১ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' ১ম সম্ভার, (কলিকাতা, ১৩৬৩), পৃঃ ৪৯-৫০

করিয়াছেন। 'ভারত-মহিলা' গ্রন্থের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ অধ্যায়ে হরপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবি কালিদাস, ভবভূতির সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলির আলোচনায় বিশেষ আগ্রহশীল ও বিশ্লেষণ-প্রয়াসী হইয়াছেন। কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ কবিগণ রামায়ণ, মহাভারতে বর্ণিত নারীচরিত্রসমূহের মহিমা ও ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট হইয়াই প্রধানতঃ তাঁহাদের কাব্যগত উপাখ্যান নির্বাচন করিয়াছেন। যদিও ইহার দ্বারা আখ্যানগত চরিত্রসমূহ অর্থাৎ বাল্মীকির সীতা ও ভবভূতির সীতা সমপ্রকৃতির হয় নাই এবং বেদব্যাসের শকুন্তলা ও কালিদাসের শকুন্তলার মধ্যেও বিলক্ষণ পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপি তাঁহাদের চরিত্রগত ওজস্বিতা ও মাধুর্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ স্বয়ং 'ভারত-মহিলা' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'বাল্মীকির রামায়ণ হইতে আখ্যায়িকা লইয়া যে সকল কাব্য ও নাটক রচনা করা হইয়াছে, তাহাতে রাম ও সীতার চরিত্র উত্তমরূপে বর্ণিত হয় নাই। ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কালিদাসের রাম ও সীতা বাল্মীকির রাম ও সীতা হইতে উৎকৃষ্ট না হউক, তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে।'[১]

বাল্মীকি ও বেদব্যাসের বিশিষ্ট নারীচরিত্রগুলির সহিত পরবর্তী কালের কবি কালিদাস, ভবভূতির অঙ্কিত নারীচরিত্রসমূহের যুগপৎ সমালোচনার মধ্যে হরপ্রসাদের মৌলিক চিন্তা ও রসবোধের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে এবং ভাব বা বিষয়বস্তু পরিবেশন-কৌশলের অভিনবত্বে তাঁহার 'ভারত-মহিলা' প্রবন্ধগ্রন্থটি সমধিক চিত্তাকর্ষক হইযাছে।

হরপ্রসাদ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি তাঁহার অভিনব ভঙ্গিতে সংস্কৃত সাহিত্য-রস গ্রহণের পদ্ধতি বাংলার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিপূর্বে সংস্কৃত সাহিত্যের রস-বিচারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের ব্যাখ্যানিপুণ ও রসসমৃদ্ধ আলোচনায় হরপ্রসাদকেই প্রথম ও অগ্রগণ্য আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা অসঙ্গত হইবে না।

মহাকবি কালিদাস ছিলেন হরপ্রসাদের অন্যতম প্রিয় কবি এবং তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়া কালিদাস-সাহিত্যের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও রস-মাধুর্যের

১ 'হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী', (বসুমতী সংস্করণ), পৃঃ ১০

পরিচয় লাভ করা যায়। 'মেঘদূত', 'রঘুবংশ', 'রঘুবংশের গাঁথুনি', 'কালিদাসের বসন্ত বর্ণনা', 'পার্ব্বতীর প্রণয়', 'দুর্ব্বাসার শাপ' প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহে হরপ্রসাদের গভীর সংস্কৃত সাহিত্য-প্রীতি ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-বুদ্ধির দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাইয়াছে।

হরপ্রসাদের এক বিশিষ্ট রসগ্রাহী কবিমন ছিল এবং তিনি স্বয়ং একজন গীতিকবিও ছিলেন। অতএব স্বাভাবিকভাবেই কবি কালিদাসের কাব্যগত প্রেরণার উৎসক্ষেত্রের সন্ধান লাভ করা হরপ্রসাদের অনায়াসসাধ্য হইয়াছিল। কালিদাসের কাব্য-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত গভীর প্রেরণা ও ভাব-ব্যঞ্জনা তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধে অতি মনোজ্ঞভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। হরপ্রসাদ যেমন রসস্রষ্টা, তেমনি ভাবুক বা তীক্ষ্ণধী রসিক বোদ্ধা ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কাব্যশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও রসানুভব-শক্তি প্রখর ছিল। কাব্যের মূলতত্ত্ব, স্বরূপ-প্রকৃতি বা ভাব-বিশ্লেষণে হরপ্রসাদের অসাধারণ নৈপুণ্য, বিচক্ষণ রসদৃষ্টি, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও অভিনব রচনাশৈলীর পরিচয় মুখ্যতঃ তাঁহার 'মেঘদূত' কাব্যের আলোচনায় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। হরপ্রসাদ মহাকবি কালিদাস প্রণীত 'মেঘদূত' কাব্য অবলম্বন করিয়া একাধিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কালিদাসের সৌন্দর্যদৃষ্টির বৈচিত্র্য ও গভীরতা প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার 'মেঘদূত' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'তাঁহার প্রথম সহানুভূতি স্বভাব-সৌন্দর্য্যে। রামগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাস পর্ব্বত পর্য্যন্ত এই সুদূর বিস্তীর্ণ পথে যেখানে যে বস্তু সুন্দর, কালিদাস যক্ষমুখে সেই সমস্তই বর্ণনা করিয়াছেন। * * * ক্রমে ভৌতিক সৌন্দর্য্য পরিহার করিয়া তিনি মনুষ্য-সৌন্দর্য্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া রমণী-সৌন্দর্য্য দ্বারা তাহার উপসংহার করিলেন। দেখাইলেন রমণী-সৌন্দর্য্য স্বভাব-সৌন্দর্য্য হইতে উচ্চতর; উহাই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা।'[১]

মহাকবি কালিদাস এক দুর্লভ কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। হরপ্রসাদ প্রণীত 'দুর্ব্বাসার শাপ' নামক প্রবন্ধ হইতে কালিদাসের কবিমানসের এক বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। সংস্কৃত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে দুর্বাসার শাপ প্রসঙ্গটির অবতারণা করিয়া কালিদাস দুষ্মন্ত চরিত্রকে মহিমান্বিত করিয়া

১ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' ১ম সম্ভার, (কলিকাতা, ১৩৬৩), পৃঃ ৪৮০

তুলিয়াছেন। মহাভারতে বর্ণিত দুষ্মন্ত চরিত্র হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য সহজেই লক্ষ্যগোচর হয় এবং মুখ্যতঃ কালিদাসের বিশিষ্ট সৌন্দর্যদৃষ্টিই এইরূপ চরিত্রগত মৌলিক পরিবর্তন সাধনে সহায়ক হইয়াছে। হরপ্রসাদ কালিদাসের কবি-প্রকৃতি গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছেন এবং 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত 'দুর্ব্বাসার শাপ' প্রবন্ধে তিনি যে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা সমগ্র নাটকের ভাববস্তু যেমন সম্যক্‌ভাবে অথচ সংক্ষেপে পরিস্ফুট হইয়াছে, তেমনি কালিদাসের সহজাত রসদৃষ্টির অন্তরঙ্গ তাৎপর্যও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। দুর্বাসার শাপই যে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের প্রাণশক্তি, তাহা হরপ্রসাদ সহজেই অনুধাবন করিয়া তাঁহার 'দুর্ব্বাসার শাপ' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক দুর্ব্বাসার শাপেই উজ্জ্বল। মহাভারতে রাজা দুষ্মন্ত বড় ভাল লোক ছিলেন না। * * *

কালিদাস দুর্ব্বাসার শাপ আনিয়া ঐ মহাপুরুষকে রাজার মতন রাজা, এমন-কি, দেবতা করিয়া তুলিয়াছেন। * * * শাপে রাজার চরিত্রটী খুব খুলিয়াছে।'[১]

প্রবন্ধের নামকরণের মধ্যেও হরপ্রসাদের স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার সমগ্র প্রবন্ধের একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত প্রবন্ধের শিরোনাম হইতেই উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হরপ্রসাদের পাণ্ডিত্যসুলভ বিদ্যা-বুদ্ধি তাঁহার সহজ সরস কবিমনকে বিশুষ্ক ও রসশূন্য করিতে পারে নাই। ভাষার সরল স্বচ্ছন্দ গতি ও রসমধুব বাগ্‌ভঙ্গিতে তাঁহার 'দুর্ব্বাসার শাপ' প্রবন্ধটি অধিকতর চিত্তগ্রাহী হইয়াছে। এই প্রবন্ধ মধ্যে যথাযথ তথ্যের উপস্থাপনা ও তত্ত্বের তাৎপর্য বিশ্লেষণে হরপ্রসাদের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

হরপ্রসাদের প্রবন্ধ রচনাশৈলীর প্রধান গুণ যে, ইহাতে প্রবন্ধগত জটিল বিষয়ও চিত্রবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে এবং তাঁহার সর্ববিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে এক সহজ মীমাংসামুখী মানসপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ'কথা স্বীকার্য যে, চূড়ান্ত পরিণতি বা সিদ্ধান্তের অভিমুখে যথাযথ অগ্রসরণ বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লক্ষণ এবং এই লক্ষণ হরপ্রসাদের সকল শ্রেণীর প্রবন্ধেই বর্তমান।

১ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' ১ম সম্ভার, (কলিকাতা, ১৩৬৩), পৃঃ ৫৫৩

হরপ্রসাদের কালিদাস-সাহিত্য পর্যালোচনার ধারায় 'দুর্বাসার শাপ' তাঁহার একটি শ্রেষ্ঠ রসগ্রাহী প্রবন্ধ হিসাবে উল্লেখযোগ্য এবং এই প্রবন্ধ হইতে কালিদাস-নাট্যকাব্যের স্থায়ী সৌন্দর্যরসের আস্বাদ লাভ করা যায়। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে কালিদাসের সমাজ-কল্যাণনির্ভর সৌন্দর্যরূপটি হরপ্রসাদের প্রবন্ধে অতি সুনিপুণভাবে বিধৃত হইয়াছে। হরপ্রসাদ কালিদাসের নাটক হইতে মুখ্য চরিত্র ও ঘটনা অনুসন্ধান করিয়া তাহারই ভিত্তিতে 'দুর্বাসার শাপ' নামক মনোজ্ঞ প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছেন। এ'কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলা সাহিত্যে কালিদাসের নাট্যকাব্য অবলম্বন করিয়া এই জাতীয় ব্যাখ্যানিপুণ প্রবন্ধ হরপ্রসাদের পূর্বে লিখিত হয় নাই।

বাংলা সাহিত্যে তুলনামূলক সমালোচনার (Comparative Criticism) ক্ষেত্রেও হরপ্রসাদের পাণ্ডিত্য, মৌলিক চিন্তা ও সূক্ষ্ম রসানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-বিচার পদ্ধতির আদর্শ অনুসরণেরই অপেক্ষাকৃত পক্ষপাতী ছিলেন। হরপ্রসাদের তুলনামূলক সাহিত্যিক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে 'কালিদাস ও সেক্ষপীয়র' এবং 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

'কালিদাস ও সেক্ষপীয়র' প্রবন্ধে হরপ্রসাদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের দুই বিশিষ্ট কবি-নাট্যকারের কবি-প্রকৃতি ও রচনারীতির স্বরূপ-ধর্ম সম্পর্কে পারস্পরিক তুলনায় ব্রতী হইয়াছেন। উভয় মহাকবির রচনা হইতে বিভিন্ন তথ্য, উপকরণ ও প্রমাণ উদ্ধৃতিযোগে হরপ্রসাদ দুই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য বা রূপরেখা সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা তথ্যনির্ভর অথচ রমণীয়, গভীর অথচ সহজবোধ্য। সমগ্র আলোচনার মধ্য দিয়া এক বিদগ্ধ রসবোদ্ধার পরিচয়ই প্রকাশিত হইয়াছে। হরপ্রসাদের সমালোচনা-প্রবন্ধ কোন তথ্য বা তত্ত্ব-ভূয়িষ্ঠ কিংবা নিছক পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্যামিতিক রূপ নহে—ইহা তাঁহার এক প্রোজ্জ্বল রসদীপ্ত শিল্পকীর্তি হইয়াছে।

হরপ্রসাদ সংস্কৃতজ্ঞ প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিত হইলেও প্রাচ্যের সুমহান্ কবি কালিদাসের প্রতি কোনরূপ অদেয় পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করেন নাই। এক উদার, সার্বভৌম সাহিত্যদৃষ্টি ও রসরুচির আদর্শ অনুসরণ করিয়া তিনি নিরপেক্ষভাবেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কবিদ্বয়ের গুণাগুণ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে কালিদাস ও শেক্সপীয়রের যেমন প্রশংসা আছে, তেমনি তাঁহাদের স্বভাব বা রচনাগত ত্রুটিও উল্লেখিত হইয়াছে। কালিদাস মুখ্যতঃ বহিপ্রকৃতির কবি অর্থাৎ বাহ্যজগতের

সৌন্দর্য বর্ণনায় তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু অন্তর্জগতের অর্থাৎ মনুষ্যহৃদয় রহস্যের যে দুর্লভ সৌন্দর্য, তাহার স্বরূপ উদঘাটনে তিনি শেক্সপীয়রের ন্যায় কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। শেক্সপীয়র মূলতঃ অন্তপ্রকৃতির কবি অর্থাৎ মনুষ্যচিত্তলোকের জটিল রহস্যঘন রূপ বর্ণনায় তিনি অতুলনীয়; কিন্তু বহির্জগতের অনন্যসাধারণ দীপ্যমান্ সৌন্দর্য পরিবেশনায় তিনি কালিদাস অপেক্ষা অনেকাংশে ন্যূন। হরপ্রসাদ এইভাবে দুই কবি-প্রতিভার তুলনামূলক সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার 'কালিদাস ও সেক্ষপীয়র' প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত হইল—

'বাহ্যজগদ্বর্ণনায় কালিদাস অদ্বিতীয়। সেক্ষপীয়র বাহ্যজগদ্বর্ণনায় হাত দেন নাই, তিনি বাহ্যজগৎ বড় গ্রাহ্যও করিতেন না। মনুষ্যের হৃদয়ের উপর তাঁহার আধিপত্য সর্ব্বতোমুখী। তাঁহার যেমন অন্তর্জগতের উপর, কালিদাসের তেমনই বাহ্যজগতের উপর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা।'[১]

'কালিদাস ও সেক্ষপীয়র' প্রবন্ধটি হরপ্রসাদের তুলনামূলক সাহিত্য-বিশ্লেষণী প্রতিভার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এই জাতীয় গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাও তাঁহার সরল-স্নিগ্ধ রচনাভঙ্গিতে সরস ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' নামক তুলনামূলক আলোচনা-ভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধের মধ্যেও হরপ্রসাদের বিচারনিষ্ঠ তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় লাভ করা যায়। তৎকালীন নব্যবঙ্গের জীবন-দর্শন ও সাহিত্যাদর্শের ক্ষেত্রে যে একটি আলোড়ন বা পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল, তাহারই গভীর স্পন্দন এই প্রবন্ধ মধ্যে অনুভূত হয়। হরপ্রসাদ যুগধর্ম ও চিন্তাকে স্বীকার করিয়া এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নব্যবঙ্গের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী যুবকগণের উপর তিনজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কবির অর্থাৎ কালিদাস, বায়রণ ও বঙ্কিমচন্দ্রেরই সর্বাধিক প্রেরণা ও প্রভাব পড়িয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নব্যবঙ্গে প্রাচীন মহাকাব্যের অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারতের সামাজিক প্রভাবের গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে এবং তাহার যুগোপযোগী আবেদনও লুপ্ত হইয়াছে। এমন কি, তাহা হইতে প্রগতিশীল ভবিষ্যৎ সমাজ-গঠনের কোন নির্দেশও লাভ করা যায় না। এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

[১] 'হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী', (বসুমতী সংস্করণ), পৃঃ ২৬৫

'রামায়ণ ও মহাভারত এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্ম্মিত। বহুকাল অবধিই হিন্দুরা রাম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রানুকরণ করত সমাজশাসনের অধীন হইয়াছেন। সমাজও উত্তমরূপে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শুদ্ধ সমাজবন্ধনই ত মনুষ্যের উদ্দেশ্য নহে, সমাজবন্ধন পথ।'[১]

প্রাচীন মহাকাব্যের মূল উদ্দেশ্য বা মর্মবাণী নিছক সমাজবদ্ধতার পরিপুষ্টি সাধনের মধ্যেই নিহিত। ইহাতে সমাজবদ্ধ মানুষের ভবিষ্যৎ বা অগ্রগতির কোন প্রগতিশীল পন্থা নির্দেশিত হয় নাই। সেইজন্য যুগের পরিবর্তনে ও তদনুযায়ী সামাজিক জীবনের উন্নয়নের ফলে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র রামায়ণ-মহাভারতই নহে, পরবর্তী কালের সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের সামাজিক প্রভাব বা আধিপত্যও হরপ্রসাদ অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি একমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি কালিদাসের মধ্যেই 'শাশ্বতভাবে আধুনিক' মনোভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহারই ফলে, কালিদাসের সৌন্দর্যসৃষ্টির আবেদনে নব্যবঙ্গীয় যুবকগণ প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্যের নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিঘাতে নব্যবঙ্গের যুবকগণ সনাতন সমাজ-ব্যবস্থার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদের বিদ্রোহাত্মক মনের উপর স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন সমাজ-বিরোধী পাশ্চাত্ত্য কবি বায়রণও অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আধুনিক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারাও যে বঙ্গীয় যুবকগণ গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছে, হরপ্রসাদের প্রবন্ধ মধ্যে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কালিদাস, বায়রণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকৃতির ভিত্তিতে তাহাদের সামাজিক প্রভাব বিস্তৃতভাবে আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনজন বিভিন্ন ভাষার কবির সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য ও তাহাদের সামাজিক শিক্ষা বা প্রভাবের তারতম্য প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ তাঁহার 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' প্রবন্ধের একাংশে লিখিয়াছেন—

'একজন সমাজ ভাঙ্গিতে, সমাজের অত্যাচারী নিয়মাবলী পরিবর্তন করিতে শিক্ষা দেন, সমাজ ছাড়িয়া গেলে কিরূপ সুখ হয়, তাহাই দেখান। একজন সমাজে থাকিয়া কতদূর সুখ ভোগ করা যাইতে পারে, তাহাই দেখান; আর একজন সমাজের সহায়তায় ও উহার বিরোধে কিরূপ আনন্দ অনুভব করা যায়, দেখাইয়া শেষ করেন।'[২]

১ 'হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী', (বসুমতী সংস্করণ), পৃঃ ২৭৯

২ ঐ, পৃঃ ২৮১

হরপ্রসাদের এই প্রবন্ধ হইতে তাঁহার সংস্কারমুক্ত, সত্যদর্শী মনের পরিচয় লাভ করা যায়। তিনি যুগ-সচেতন লেখক ছিলেন। প্রথাসিদ্ধ প্রাচীন রক্ষণশীল সংস্কার দ্বারা তিনি কখনও যুগ ও যুগ-সাহিত্যকে বিচার করেন নাই। এ'ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ প্রগতিশীল উদার মনোভাবেরই অধিকারী ছিলেন।

হরপ্রসাদ বাংলা ভাষা ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ অবলম্বনেও কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় তিনিও বাংলা ভাষার পরিপুষ্টি সাধনকল্পে একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ে হরপ্রসাদের গভীর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় তাঁহার ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধ হইতে লাভ করা সম্ভব হয়। বাংলা ভাষা সম্পর্কে হরপ্রসাদের আধুনিক মননসম্মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। 'বাঙ্গালা ভাষা', 'বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য', 'নূতন কথা গড়া', 'বাঙ্গালা ভাষার পরিণতি' প্রভৃতি প্রবন্ধ হইতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

বাংলা ভাষার একটি নিজস্ব প্রকৃতি বা স্বরূপ-ধর্ম আছে এবং ইহা সংস্কৃত ভাষাজাত হইলেও, তাহা হইতে পৃথক হইয়া ইহা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত হইয়াছে কিন্তু প্রচলিত বাংলা ভাষায় তাহার যথাযথ বৈশিষ্ট্য রক্ষাকল্পে সযত্ন প্রয়াসের অভাব লক্ষ্য করিয়া হরপ্রসাদ 'নূতন কথা গড়া' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'বাঙ্গালা ভাষা কি, তাহাও ঠিক হইতেছে না। বাঙ্গালা যে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃত হইতে ইহার সত্তা স্বতন্ত্র, জীবন স্বতন্ত্র, উৎপত্তি স্থিতি এবং লয় এই তিনই স্বতন্ত্র, এ কথা বর্ত্তমান লিখিত বাঙ্গালা দেখিলে কাহারও বোধগম্য হয় না।'[১]

বাংলা ভাষা কি ভাবে লিখিত হওয়া উচিত ও ইহার স্বরূপ-প্রকৃতি প্রসঙ্গে হরপ্রসাদের একাধিক প্রবন্ধ আছে। এই সকল ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রবন্ধ তাঁহার যুক্তিসঙ্গত ও সুচিন্তিত মতামত দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে।

পুরাতত্ত্ববিদ্ হরপ্রসাদের প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাই পরিমাণে অধিক। যদিও ইংরাজী ভাষাতেই তিনি অধিকাংশ এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন; তথাপি তাঁহার লিখিত এই শ্রেণীর বাংলা প্রবন্ধও অল্প নাই। বিবিধ সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় তাহা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। হরপ্রসাদের এই জাতীয় প্রত্যেকটি প্রবন্ধ অদ্যাপি একত্র সংকলিত হইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

১ 'হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী', (বসুমতী সংস্করণ), পৃঃ ২৪৮

ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বাংলা দেশের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে গভীর কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার প্রেরণা হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক প্রবন্ধসমূহ রচনা ও তাহার আবেদন যে ব্যর্থ হয় নাই, তাহা হরপ্রসাদের ন্যায় ইতিহাস-অনুসন্ধানব্রতী মনীষী ব্যক্তির ঐতিহাসিক কর্মকৃতি হইতেই প্রমাণিত হয়। হরপ্রসাদ বহু বিস্মৃতপ্রায় তথ্যাদি উদ্ধার করিয়া বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস রচনার পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। উইলিয়ম্ জোন্স্, উইলসন্, কোলব্রুক প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য লেখকগণের গ্রন্থাদি যে প্রামাণ্য ও নির্ভরশীল নহে, তাহা তিনি তাঁহার বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রবন্ধ মধ্যে প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। 'আমাদের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে হরপ্রসাদ লিখিয়াছেন—

'আমাদের দেশের ইতিহাসটা ঢালিয়া সাজিতে হইবে। এতদিন আমরা যে ভাবে ইতিহাস পড়িয়া আসিতেছিলাম, সে ভাবে আর চলিবে না। আমাদের ইতিহাস ছিল না, ইয়ুরোপীয়ানরা আমাদিগকে ইতিহাস শিখাইয়াছেন, সে কথা সত্য। * * * কিন্তু তাঁহাদের কথা শুনিলে আর চলিবে না। তাঁহারা আমাদের দেশের সব খবর রাখেন না, সব বই পড়েন না, সকলের সঙ্গে মিশেন না; দুই দশখানি বই পড়িয়াছেন, তাহা হইতেই একটা ইতিহাস খাড়া করিয়া দেন।'[১]

ছাত্র-পাঠ্য দুইখানি ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন ব্যতীত হরপ্রসাদ 'আমাদের গৌরবের দুই সময়', 'পাল বংশের রাজত্বকালে বাঙ্গালার অবস্থা', 'ভারতবর্ষের ধর্ম্মের ইতিহাস', 'পুরান বাঙ্গালার একটা খণ্ড' প্রভৃতি ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠ গবেষণানির্ভর প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিটি প্রবন্ধই মৌলিক চিন্তাপ্রসূত ও তথ্যনির্ণায়ক। হরপ্রসাদের রচনার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক জ্ঞান বা বিদ্যাকে সাহিত্যভাত করিবার বিরল ক্ষমতা অর্জন করিয়াছিলেন এবং ফলে, তাঁহার এই জাতীয় কোন প্রবন্ধই কেবল নীরস ইতিহাস মাত্রে পর্যবসিত হয় নাই।

ভারতবর্ষের ইতিহাস যে বহু প্রাচীন এবং অভিজাত, তাহা হরপ্রসাদ তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধ মধ্যে সেই সম্পর্কিত সত্যনিষ্ঠ তথ্যনির্ভর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন

১ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' ১ম সম্ভার, (কলিকাতা, ১৩৬৩), পৃঃ ৪৫৭

বৈদেশিক লেখকগণ প্রণীত ভারতীয় ইতিহাসে হিন্দুযুগ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হইয়াছিল—হরপ্রসাদই সর্বপ্রথম হিন্দুযুগের অভিনব তথ্যপূর্ণ পরিচয় দান করিয়া এ'ক্ষেত্রে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। হরপ্রসাদ বহু প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন এবং বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথিও তাঁহার দ্বারা আবিষ্কৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইভাবে বহু বিচিত্র প্রত্নতত্ত্ব বা ঐতিহাসিক উপকরণাদি সংগৃহীত হইবার ফলে ভারতবর্ষের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রবন্ধের মধ্য দিয়া হরপ্রসাদ বহু অভিনব ঐতিহাসিক তথ্য ও উপকরণরাজিরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

হরপ্রসাদ মুখ্যতঃ বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিষ্ঠাবান্ ধারক ও প্রচারক ছিলেন। তিনি প্রকৃতই বাঙ্গালীপ্রেমিক সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্যতম উত্তরসাধক। বাংলাদেশের মহান্ ঐতিহ্য এবং বাঙ্গালী জাতির বনিয়াদী আভিজাত্য ও তাহার বিশিষ্ট কারু ও শিল্পকৃতি সম্পর্কে হরপ্রসাদের চিন্তা ও গবেষণা গভীর জাতীয়তাবোধে সমুজ্জল হইয়াছে। 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' গ্রন্থটিতে ঐতিহ্য-সন্ধানী, স্বদেশপ্রেমিক হরপ্রসাদের পরিচয়ই সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই গ্রন্থে সংকলিত তাঁহার বিশটি প্রবন্ধ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে সভাপতির সম্বোধনরূপে পঠিত হয়। 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান', 'ভাস্করের কাজ', 'বাংলায় সংস্কৃত', 'বাঙালী ব্রাহ্মণ', 'চৈতন্য ও তাঁহার পরিকর' প্রভৃতি প্রতিটি প্রবন্ধই প্রকাশের পরিচ্ছন্নতায়, যুক্তিপূর্ণ সহজ বর্ণনায় ও প্রমাণনির্ভর তথ্যসম্পদে সমৃদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যময়। হরপ্রসাদের এই শ্রেণীর গবেষণাধর্মী তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধও জাতীয় গৌরববোধের অনুরঞ্জনে রঞ্জিত হইয়া সরস স্নিগ্ধোজ্জ্বল হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার 'ভাস্করের কাজ' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'বাংলার ত্রয়োদশ গৌরব ভাস্কর শিল্প। * * * বাংলায় এরূপ আঁকিয়া দিবার লোক কত ছিল বলা যায় না। পাথর তাহারা মোমের মত ব্যবহার করিত। * * * ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইত। মহিসুর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশেও নানারূপ মূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে সাজসজ্জাই বেশী, গহনা, ফুল, সাজ—ইহাতেই পরিপূর্ণ; ভাব দেখাইবার চেষ্টা খুব কম। যে ভাবে ভাবুকের মন মুগ্ধ করে সে ভাব কেবল বাংলাতেই ছিল। * * *

শিল্পের এত উন্নতি অল্প সাধনার ফল নয়। বাঙালী এককালে যে সাধনা করিয়াছিল, তাহার ফলও পাইয়াছে। শুধু পাথরে নয়, পিতলে তামায় রূপায় সোনায় অষ্ট ধাতুতে, যাহাতেই বল, মূর্ত্তিগুলি যেন সজীব।'[১]

বিশুদ্ধ প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও হরপ্রসাদের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। এ'ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার পূর্বসূরী মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উপযুক্ত শিষ্য। রাজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ লাভ করিয়া হরপ্রসাদ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলাল ও হরপ্রসাদ উভয়েরই মনীষা ছিল সমশ্রেণীর। হরপ্রসাদের পাণ্ডিত্য ও বিচারবুদ্ধির সহিত রাজেন্দ্রলালের তুলনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'এখানে রাজেন্দ্রলালের উল্লেখ করবার কারণ এই যে, আমার মনে এই দুই জনের চরিত-চিত্র মিলিত হয়ে আছে। উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা,— যে কোনো বিষয়ই তাঁদের আলোচ্য ছিল, তার জটিল গ্রন্থিগুলি অনায়াসেই মোচন ক'রে দিতেন। জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে এটা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধন-প্রণালী সম্মিলিত হয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছিল।'[২]

হরপ্রসাদের প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা অধিকাংশই ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সেই তুলনায় বাংলা ভাষায় লিখিত তাঁহার এই জাতীয় প্রবন্ধের সংখ্যা অল্প। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় হরপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত পাশ্চাত্ত্য প্রত্নতত্ত্বসম্মত বিচার-পদ্ধতিরই অনুবর্তী ছিলেন। পুরাবৃত্তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেই তাঁহার মনীষা সর্বাধিক পরিস্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, অবস্থিতি ও অবলুপ্তির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাৎপর্য প্রদর্শনের মধ্যে হরপ্রসাদের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও প্রতিক্রিয়া, বাংলার ধর্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতি, বিবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে বৌদ্ধ ভাব বা চিন্তার প্রভাব, হিন্দু-দর্শন ও বৌদ্ধ-দর্শনের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার

১ 'প্রাচীন বাংলার গৌরব', (কলিকাতা, ১৩৫৩), পৃঃ ৪১

২ নরেন্দ্রনাথ লাহা ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা' ২য় ভাগ, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৩৯), পৃঃ ॥৶০

তৃতীয় অধ্যায়

বিবিধ প্রবন্ধকার

বঙ্কিম-পর্বের প্রবন্ধ-সাহিত্যের একচ্ছত্র অধিপতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিয়া বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের যথার্থ পরিপুষ্টি ও বৈচিত্র্য সাধন করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ সমুন্নতি ও অগ্রগতির জন্য যে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ রচনারও প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে তাঁহার এই মহান্ উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করিবারই অধিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। 'বঙ্গদর্শনে'র সহায়তায় বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রুচিবোধ ও বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করিয়াছেন, তেমনি তাঁহারই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া বহু সংখ্যক নূতন লেখকেরও অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। ইঁহাদের অধিকাংশই 'বঙ্গদর্শনে'র নিয়মিত লেখক ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব ও ভাষা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' ব্যতীত এই সময়ে একাধিক সাহিত্যপত্রেরও আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাহাতে বিবিধ তত্ত্ব ও তথ্যমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তাহা বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। বঙ্কিম-পর্বে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনার মূলে এক গভীর স্বাজাত্যাভিমানের প্রেরণাই সমধিক কার্যকরী হইয়াছে এবং এই প্রেরণাদাতার গৌরব নিঃসন্দেহে বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রাপ্য। বঙ্কিম-পর্বের বিবিধ প্রবন্ধকারগণ বঙ্কিমচন্দ্রকে অল্পবিস্তর অনুসরণ করিলেও নিজস্ব কৃতিত্বের স্বাক্ষরও তাঁহাদের অনেকের রচনায় দুর্লভ নহে।

রামগতি ন্যায়রত্ন—রামগতি সমকালীন বিশিষ্ট সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশে'র একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। প্রবন্ধ রচনা ব্যতীত তিনি ছাত্রপাঠোপযোগী বাংলার ইতিহাস, আখ্যায়িকা, মজলিসি গল্প, নাটক প্রভৃতিও রচনা করিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যে রামগতির বিশেষ কোন অধিকার ছিল না; কিন্তু সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, সাংখ্য, ন্যায় প্রভৃতি বিবিধ প্রাচীন শাস্ত্রেও তাঁহার পারদর্শিতার পরিচয় লাভ করা যায়।

রামগতি প্রাচীনপন্থী নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহারে প্রাচীন ধারা বা পন্থার অনুবর্তী হইলেও তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি তথাকথিত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল না। তৎকালীন বাংলার সমাজ-জীবনে বিচারমূঢ়তা ও অন্ধ সংস্কারের একটা স্রোত আসিয়াছিল। কিন্তু রামগতি কখনও সেই স্রোতোধারায় নিজেকে যুক্ত করিয়া বিবেচনাহীন অন্ধ ভ্রান্তির উপরই সনাতন সত্যের মহিমা আরোপ করেন নাই। সমস্যাসঙ্কুল সেই সামাজিক পরিবেশেও সকল কিছু বুদ্ধি বা বিবেক দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া গ্রহণ করিবার এক অদম্য প্রবণতা রামগতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ, সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার কোনরূপ সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। পক্ষপাতশূন্য বিশুদ্ধ সাহিত্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি সমালোচনা-কর্মে ব্রতী হইয়াছেন। রক্ষণশীল হিন্দু ভূদেবের রচনা বিচার-বিশ্লেষণে রামগতি যে মানদণ্ডের আশ্রয় লইয়াছেন, সেই সম বা একই মানদণ্ডে তিনি ব্রাহ্ম রামমোহন, খ্রীষ্টান মধুসূদন প্রভৃতি লেখকগণের রচনাদি আলোচনা করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। সাহিত্য-বিচারে কোন ধর্মীয় মনোভাব দ্বারা তিনি পরিচালিত হন নাই। এ'ক্ষেত্রে রামগতির নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত সাহিত্যালোচনামূলক একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'। এই গ্রন্থের কেবলমাত্র প্রথম ভাগ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এবং ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্র সংবলিত হইয়া পরবর্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে রামগতির ইহা এক স্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সূচনা হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার সমকালীন লেখকবর্গের বিচিত্র সাহিত্য-চর্চার ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত ইহার পূর্বে লিখিত হয় নাই। বাংলা সাহিত্যে রামগতিই এই জাতীয় অবিচ্ছিন্ন ক্রমিক সাহিত্যালোচনার প্রথম সূত্রপাত করিয়াছেন। ভারতীয় ভাষাসমূহের উৎপত্তি, স্বরূপ-ধর্ম অর্থাৎ ভাষা-বিজ্ঞান সম্পর্কেও তাঁহার গভীর গবেষণা ও ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা অক্ষর ও ভাষা কোন্ শতাব্দী হইতে প্রচলিত হইয়াছে, সে বিষয়েও রামগতির তীক্ষ্ণ বিচারনৈপুণ্য ও অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমোন্নতি ও বিবিধ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যুগবিভাগ করিয়া রামগতি বিভিন্ন লেখক ও তাঁহাদের রচনাসমূহের যে অনুধ্যান ও অনুশীলন করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার তথ্যনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক

চেতনারই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। আদ্য, মধ্য ও ইদানীন্তন এই যুগ-বিভাগের মাধ্যমে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস হইতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকগণের সাহিত্যালোচনা রামগতি তাঁহার এই প্রবন্ধগ্রন্থে অতি বিচক্ষণ ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। রামগতির ভাষা অলংকৃত, সংযত ও সুমার্জিত। গদ্য-ভাষা ও রচনারীতির ক্ষেত্রে তিনি প্রধানতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুগামী ছিলেন। সংযম ও শালীনতা রামগতির প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি কখনও কোন লেখক সম্পর্কে অশোভন কটাক্ষপাত বা অসংযত ভাষা ব্যবহার করিয়া তাঁহার রুচিবোধ বিকৃত করেন নাই।

রামগতি প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় তিনি সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের বিচার-পদ্ধতি অন্ধভাবে অনুসরণ করেন নাই। এ'ক্ষেত্রে তাঁহার সর্বসংস্কারমুক্ত স্বাধীন রসচেতনারই সমধিক অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। উদার সংস্কৃতিসম্পন্ন এক সহজাত রসিক মনের প্রেরণা দ্বারা রামগতির এই জাতীয় আলোচনা অধিকতর নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক আলোচনায় সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণশক্তির নৈপুণ্য প্রকাশ না পাইলেও আলোচ্য কবি বা লেখকগণের মানসপ্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা তিনি নির্ভুলভাবেই প্রদান করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কবি-প্রকৃতি সম্পর্কে রামগতির আলোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে স্বভাববর্ণনে কবিকঙ্কণের ন্যায় নিপুণ আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। * * * ফুল্লরার দারিদ্র-বর্ণন সময়ে তদ্বিষয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাঁড়ু দত্ত ও মুরারি শীল বণিকের বঞ্চকতা বর্ণনে তিনি সাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করেন নাই। বাঙ্গালদিগের বিলাপে প্রচুর পরিহাস-রসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন।'[১]

বাঙ্গালী সমাজের ভিন্ন ভিন্ন মানুষের স্বভাব-বর্ণনায় এবং বাংলার বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের নিখুঁত বিবরণী দানের মধ্য হইতে মুকুন্দরামের কবি-প্রকৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। মুকুন্দরাম সম্পর্কিত আলোচনায় রামগতি নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন। কোন কোন কবি বা লেখক সম্পর্কে রামগতি তাঁহার গ্রন্থে যে বিশিষ্ট অভিমত প্রকাশ

১ 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', (চুঁচুড়া, ১৩৪২), পৃঃ ৯৫

করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি অতি আধুনিক সাহিত্য-সমালোচকও শ্রদ্ধার সহিত অনুসরণ করিয়া থাকেন।

রামদাস সেন— বাঙ্গালী মনীষিদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্বপ্রথম ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান ও অনুশীলনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, রামদাস সেন তাঁহাদিগের অন্যতম। পুরাতত্ত্ব প্রসঙ্গে তাঁহার প্রায় সকল মৌলিক গবেষণা ও আলোচনা বাংলা ভাষায় লিখিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অন্যতম প্রবন্ধকারের বিশিষ্ট গৌরব তাঁহারই প্রাপ্য। প্রখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক হিসাবে রামদাসের পূর্বে বাংলাদেশে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য হইলেও, তাঁহার পুরাতত্ত্ব বিষয়ক সকল রচনাই প্রধানতঃ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে প্রচারিত হইয়াছে। রামদাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে, তিনি তাঁহার প্রায় সকল গবেষণামূলক আলোচনাই বাংলা ভাষায় এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

পুরাবৃত্তানুসন্ধানী রামদাস প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত সর্বক্ষেত্রেই চূড়ান্ত হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার গবেষণাধর্মী মনন ও বুদ্ধি অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য ও বিস্মৃতপ্রায় সংস্কৃত গ্রন্থরাজির মধ্য হইতে উপাদান অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছে এবং তাহা হইতেই তিনি নূতনতর তথ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। সকল বিষয়ের প্রতি রামদাসের গভীর কৌতূহল ও জ্ঞানানুসন্ধিৎসা প্রবল ছিল এবং প্রধানতঃ প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রেই তাঁহার মৌলিক চিন্তার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

বিদ্যোৎসাহী রামদাস সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র অন্যতম বিশেষতঃ, প্রত্নতত্ত্বের বিশিষ্ট প্রবন্ধ-লেখক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রামদাস পুরাতত্ত্ব বিষয়ক তাঁহার অধিকাংশ গবেষণা-মূলক প্রবন্ধই 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই সকল প্রবন্ধ যথাসময়ে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়া বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। রামদাসের প্রতিটি প্রবন্ধই তাঁহার বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শন মনীষার পরিচায়ক। রামদাস প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমে: ১। 'ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন' (১৮৭২), ২। 'মহাকবি কালিদাস' (১৮৭২), ৩। 'ঐতিহাসিক রহস্য', প্রথম ভাগ (১৮৭৪), দ্বিতীয় ভাগ (১৮৭৬), তৃতীয় ভাগ (১৮৭৯), ৪। 'রত্ন-রহস্য' (১৮৮৪), ৫। 'ভারত-রহস্য' (১৮৮৫) ও ৬। 'বুদ্ধদেব' (১৮৯১)। তাঁহার অবশিষ্ট

অন্যান্য প্রবন্ধসমূহ পরবর্তী কালে প্রকাশিত 'রামদাস-গ্রন্থাবলী'র তৃতীয় ভাগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রামদাসের দুইটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন' ও 'মহাকবি কালিদাস' প্রথমে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইলেও পরবর্তী কালে এই প্রবন্ধদ্বয় তাঁহার 'ঐতিহাসিক রহস্য' (১ম ভাগ) নামক গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

রামদাস নীরস পুরাতত্ত্ব বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিলেও তাহা তাঁহার সহজ রচনাকৌশল ও সহজাত কবিপ্রাণতায় সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। রামদাস মূলতঃ কবি এবং প্রথম জীবনের কয়েক বৎসর তিনি কবিতা রচনা-কর্মেই ব্যাপৃত ছিলেন। 'তত্ত্বসংগীত লহরী', 'কুসুমমালা', 'বিলাপতরঙ্গ', 'কবিতালহরী', 'চতুর্দ্দশ-পদী কবিতামালা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থসমূহ রামদাসের কবি-মনীষার সার্থক নিদর্শন। কবিমনের মাধুর্য ও স্বদেশের গৌরবময় ঐতিহ্যগত ভাব-চিন্তার পশ্চাতে গভীর আবেগের প্রেরণা ছিল বলিয়াই রামদাসের জটিল গবেষণামূলক প্রবন্ধও সাধারণের নিকট উপভোগ্য ও সমাদৃত হইয়াছে।

রামদাস তাঁহার প্রায় সকল প্রবন্ধগ্রন্থেরই নামকরণে 'রহস্য' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার কারণ বা সমর্থনস্বরূপে তাঁহার বক্তব্য 'ভারত-রহস্য' গ্রন্থের সূচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। রামদাস লিখিয়াছেন—

'পূর্ব্বে ভারতবাসী ঋষিরা কি প্রকারে যাগযজ্ঞ করিতেন, কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতেন, যুদ্ধের উপকরণ বা অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি কিরূপ ছিল? এ সকল প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর বা প্রকৃত ভাব আজকাল জনসাধারণের অবিদিতপ্রায় হইয়া আছে; সুতরাং ঐ সকল তথ্যের অববোধক এতৎ পুস্তকের "রহস্য" নাম দেওয়া বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই।'

এ'কথা স্বীকার্য যে, রামদাসের সর্ববিধ আলোচনার বিষয়ই জনসাধারণের নিকট রহস্যতুল্য। যদিও তিনি বক্ষ্যমান বিষয়ের রহস্যভেদ করিয়া তাঁহার আলোচনা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন, তথাপি তাঁহার গ্রন্থের নামকরণে 'রহস্য' শব্দের প্রয়োগ যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রামদাস অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে প্রাচীন ভারতবর্ষের শাস্ত্রচর্চা, জীবন-পদ্ধতি, ধর্ম, সমাজনীতি, দর্শনাদির গভীর পর্যালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ আলোচনাই পুরাতত্ত্বাশ্রিত। জটিল নীরস বিষয় রামদাসের

আলোচ্য হইলেও তাঁহার লিপি-চাতুর্যগুণেই তাহা আকর্ষণীয় হইয়াছে। রামদাসের কবিত্বসুলভ সংযত ভাষার মধ্যে কোথাও শব্দগত অনর্থক আড়ম্বর নাই। সহজ সাবলীল ভাষা রামদাসের সর্ববিধ রচনারই একটি বিশিষ্ট গুণ। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে বহু বিতর্কমূলক বিষয় নির্বাচন করিয়া তাহার যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত তিনি অতি সহজভাবেই পরিবেশন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। রামদাস প্রণীত 'মহাকবি কালিদাস', 'বররুচি' 'শ্রীহর্ষ', 'হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়', 'বাণভট্ট', 'বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ' 'পাণিনি' প্রভৃতি গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রবল জ্ঞানানুসন্ধিৎসা ও শ্রমসাধ্য গবেষণার ফলে দুরূহ সমস্যাবহুল বিতর্কমূলক বিষয়ও এক সহজ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছে। রামদাস তাঁহার প্রতিটি আলোচনায় বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা-রীতির পরিচয় স্বরূপ 'মহাকবি কালিদাস' প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। রামদাস লিখিয়াছেন—

'কালিদাস যদি প্রবরসেনের সমকালিক হয়েন, তাহা হইলে তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি এবং মাতৃগুপ্ত একই ব্যক্তি; তাহা "রাজতরঙ্গিণী"র লিখিত প্রমাণে ঠিক হইতেছে, এবং ইনিই মহাকবি কালিদাস— একথা ভাওদাজী লিখিয়াছেন। * * * এরূপ প্রবাদ আছে, বিক্রমাদিত্য কবি কালিদাসের উপর অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। "রাজতরঙ্গিণী"র মতে হর্ষ-বিক্রমাদিত্য মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীর রাজ্য প্রদান করেন। তাহা হইলে মাতৃগুপ্তই আমাদিগের কালিদাস এবং উল্লিখিত জনশ্রুতিও সম্পূর্ণ সত্য।'[১]

রামদাসের প্রতিটি প্রবন্ধই যুক্তিনিষ্ঠ ও তথ্যবহুল। তাঁহার আধুনিক বিজ্ঞান-সচেতন অর্থাৎ ঐতিহাসিক যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গির সম্যক্ পরিচয় 'বুদ্ধদেব' নামক গ্রন্থ হইতে লাভ করা যায়। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধপুস্তিকায় তিনি প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন যে, ভগবান শাক্যসিংহ প্রবর্তিত ধর্ম হিন্দুধর্মের বিরোধী নহে। বরং বৌদ্ধ-দর্শন হিন্দু-দর্শনেরই অন্যতম শাখা মাত্র। রামদাস এই প্রসঙ্গে ভারতীয় যোগশাস্ত্র ও অধ্যাত্মশাস্ত্রের সহিত মূল বৌদ্ধধর্মের যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে, তাহারও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বুদ্ধ বিষয়ক রামদাসের এই জাতীয় তথ্যনির্ভর প্রামাণিক আলোচনা বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে লক্ষিত হয় না।

[১] 'ঐতিহাসিক রহস্য', ১ম ভাগ (কলিকাতা, ১৮৭৪), পৃঃ ৩১

চন্দ্রশেখর বসু—বাংলা ভাষায় ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের একনিষ্ঠ চর্চা করিয়া চন্দ্রশেখর বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দার্শনিক মনীষিগণের প্রচারিত নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধে অতি সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় পরিবেশিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখরের অধিকাংশ প্রবন্ধই শাস্ত্রীয় ধর্মক্রিয়া ও ব্রহ্মজ্ঞান বিষয় অবলম্বনে লিখিত। তিনি মুখ্যতঃ তত্ত্বজ্ঞ ও শাস্ত্রবিদ্ দার্শনিক প্রবন্ধকার হিসাবেই বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক পরিচিত হইয়াছেন।

চন্দ্রশেখর অসাধারণ চিন্তাশীল মনীষী ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজী, সংস্কৃত, পারসী, উর্দূ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ হইতে চন্দ্রশেখরের গভীর চিন্তাশীলতা, মনস্বিতা এবং পাণ্ডিত্যের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষা ও বিবৃতি-কৌশলগুণে এবংবিধ জটিল নীরস দার্শনিক রচনাও অপেক্ষাকৃত সরস হইয়াছে। চন্দ্রশেখরের এই জাতীয় প্রবন্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, তিনি দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্য বিচারে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় শাস্ত্রসমূহের উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং প্রাচ্যদেশীয়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখর কখনও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ প্রদত্ত টীকা-টিপ্পনী ও মীমাংসা তাঁহার রচনায় প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। চন্দ্রশেখরের অধিকাংশ প্রবন্ধই ‘তত্ত্ববোধিনী’, ‘নবজীবন’ প্রভৃতি বিশিষ্ট সাময়িক পত্রিকায় মুদ্রিত হয় এবং এই প্রবন্ধগুলিই পরবর্তী কালে বিভিন্ন গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হইয়া প্রকাশলাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রণীত প্রবন্ধপুস্তিকা যথাক্রমে : ১। ‘অধিকার-তত্ত্ব’ (১৮৭২ ?), ২। ‘বক্তৃতা-কুসুমাঞ্জলি’ (১৮৭৫), ৩। ‘বেদান্তপ্রবেশ’ (১৮৭৫), ৪। ‘সৃষ্টি’ (১৮৭৫), ৫। ‘হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ’ (১৮৮৪), ৬। ‘বেদান্তদর্শন’ (১৮৮৫), ৭। ‘পরলোক-তত্ত্ব’ (১৮৮৫), ও ৮। ‘প্রলয়তত্ত্ব’ (১৮৮৬)।

চন্দ্রশেখরের দার্শনিক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মৌলিক ও বিশিষ্ট রচনা হিসাবে ‘অধিকার-তত্ত্বে’র নাম উল্লেখ করা যায়। ইহাতে তাঁহার গভীর মননশীলতা ও অপূর্ব বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। নিরঞ্জন ব্রহ্মের পূজাধিকার সম্পর্কিত আলোচনাই এই গ্রন্থটির মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। স্বীয় সমাজ ও সাম্প্রদায়িক ধর্মে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও সাধারণ মানুষ কিরূপে উচ্চ বা নিম্ন মানসিক স্তরভেদে উপাসনা-বিধির ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত নিরঞ্জন ব্রহ্মের পূজাধিকার লাভে সমর্থ হয়, তাহাই এই প্রবন্ধপুস্তিকায় অতি প্রাঞ্জলতা সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানীরও যে সাধারণ মানুষের মানসিক অবস্থা ও উপাসনা-

পদ্ধতির সামঞ্জস্য সাধনের উপায় স্বরূপ ভগবানের বিবিধ উপাধি সম্বলিত রূপের পূজা সমর্থন এবং প্রচার করা অবশ্য কর্তব্য ও বিধেয়, তাহাও চন্দ্রশেখর বিবিধ শাস্ত্রীয় যুক্তি ও ব্যাখ্যাসহ প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। চন্দ্রশেখরের জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক রচনার পরিচয় স্বরূপ 'অধিকার-তত্ত্ব' নামক প্রবন্ধগ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'ব্রহ্মজ্ঞানের মূল-অধিকার সাধারণতঃ পূজা, আলোচনা, শ্রবণ, মনন, ধ্যান, ধারণা, পাঠ, সাধনা প্রভৃতি উপায় দ্বারা ক্রমে প্রশস্ত হয়। যখন যতখানি প্রশস্ত হয় তখন ভগবানকে তত জাগ্রত ও মহদ্‌ভাবে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বরের পূর্ণভাব অনাদি, অনন্ত এবং ধ্রুব, সত্য, প্রেমপূর্ণ, জীবন্ত, এ নিমিত্তে তাঁহার পূজার দ্বারা ঐ অধিকার যতই উদার ও উন্নত হইতে থাকিবে, উপাসক তাঁহাকে ক্রমে ততই কোটী কোটী গুণে বৃহৎ দেখিতে থাকিবেন। সর্ষপ-পরিমিত নর-হৃদয়ের আয়তন সাগর-তুল্য হইলেও বিন্দুমিত ব্রহ্মকৃপাতে তাহা প্লাবিত হইয়া যাইবেক।'[১]

চন্দ্রশেখরের 'বেদান্তদর্শন' গ্রন্থটিও গম্ভীর দার্শনিক চিন্তা উদ্রেকে সহায়তা করে। ইহাতে যেমন ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতির সুষ্ঠু মীমাংসা সাধনের প্রয়াস আছে, তেমনি অন্যদিকে ব্রহ্ম, জীব, প্রকৃতি, সৃষ্টি, প্রলয়, পরলোক, উপাসনা, অদৃষ্ট, ব্রহ্মজ্ঞান, মোক্ষ প্রভৃতি বিবিধ তত্ত্বসমূহ যথাযথভাবে বিচারিত ও বিবৃত হইয়াছে। এই সকল তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণের পর এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল বস্তুই অনিত্য ও অসার এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য ও সারবস্তু। এই জাতীয় নীরস দার্শনিক তত্ত্বাদি সরসভাবে পরিবেশন করিয়া চন্দ্রশেখর এক অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন।

চন্দ্রশেখরের সর্ববিধ দার্শনিক প্রবন্ধই যেমন ভাব-গম্ভীর, তেমনি ভাষা ও রচনারীতির স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল ও বৈশিষ্ট্যময়।

রজনীকান্ত গুপ্ত—বাংলাদেশে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব প্রসঙ্গে যে সকল বিদ্যোৎসাহী মনস্বী ব্যক্তি গভীর গবেষণায় নিয়োজিত হইয়া প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন, রজনীকান্ত তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার প্রণীত 'জয়দেব-চরিত' ও 'পাণিনি' গ্রন্থদ্বয় এই জাতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার সার্থক

১ 'অধিকার-তত্ত্ব', (কলিকাতা, ১৮৭২), পৃঃ ২৬

নিদর্শন। রজনীকান্ত 'জয়দেব-চরিত' গ্রন্থে কবি জয়দেব সম্পর্কিত বহু দুষ্প্রাপ্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহারই ভিত্তিতে জয়দেবকে ঐতিহাসিক চরিত্র রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দুর্লভ ঐতিহাসিক তথ্যালোচনার সহিত জয়দেবের কাব্য-বিচার প্রসঙ্গ সংযোজিত হইবার ফলে এই গ্রন্থটি সবিশেষ মূল্যবান্ হইয়াছে ও রজনীকান্তের এবংবিধ সার্থক কাব্যালোচনা হইতে তাঁহার গভীর রসগ্রাহী মনেরও পরিচয় লাভ করা যায়।

রজনীকান্ত তাঁহার সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে পুরাতত্ত্বালোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি এই ক্ষেত্রে নিজেকে অধিকদিন নিযুক্ত রাখেন নাই। ভারতবর্ষের এক পূর্ণাঙ্গ সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসের অভাব গভীরভাবে অনুভব করিয়া রজনীকান্ত স্বদেশের অতীত ও বর্তমান ইতিবৃত্তই তাঁহার মুখ্য আলোচনার বিষয় করিয়াছিলেন এবং প্রধানতঃ ঐতিহাসিক গবেষণা-কর্মেই তিনি শেষ পর্যন্ত ব্যাপৃত ছিলেন। রজনীকান্ত তাঁহার 'ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'যে ভারত একসময়ে জগতের শিক্ষা-ভূমি ছিল, সেই ভারত এখন একটি সামান্য বিষয়ের জন্য অন্যের দ্বারে লালায়িত। এইরূপ একসময়ে ভিক্ষা-দাতা অন্যসময়ে ভিক্ষাপ্রার্থী, একসময়ে লোকারণ্যের হৃদয়োদ্দীপক কোলাহলপূর্ণ অন্যসময়ে বিকট শ্মশানের বিকট মূর্ত্তির প্রতিরূপ—ভারতের সমুদয় অবস্থা আনুপূর্ব্বিক জানিবার উপায় নাই। ভারতের একখানি প্রকৃত ইতিহাস আজও পর্য্যন্ত লোক-সমাজে প্রচারিত হইয়া অতীত জ্ঞানের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ আলোকিত করে নাই।'[১]

বঙ্কিম-পর্বে আবির্ভূত ঐতিহাসিক প্রবন্ধকারদিগের মধ্যে রজনীকান্ত এক বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। তাঁহার লিখিত পাঁচভাগে সম্পূর্ণ 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। এতদ্ব্যতীত রজনীকান্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহুসংখ্যক নাতিদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার এই জাতীয় প্রতিটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়াই স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে।

রজনীকান্ত পুরাতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ব্যতীত ধর্ম, শিক্ষা, জীবন-বৃত্ত সাহিত্য সম্পর্কেও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। 'এডুকেশন গেজেট', 'বঙ্গবাসী'

[১] 'ভারত-কাহিনী', (কলিকাতা, ১৮৮৩), পৃঃ ২-৩

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' প্রভৃতি বিশিষ্ট সাময়িক পত্রে তাঁহার বিভিন্ন প্রসঙ্গ অবলম্বনে লিখিত প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্তী কালে এই প্রবন্ধগুলিই একত্র সন্নিবদ্ধ হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। রজনীকান্ত প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'জয়দেব-চরিত' (১৮৭৩), ২। 'পাণিনি' (১৮৭৫), ৩। 'প্রবন্ধ-মালা' (১৮৭৭), ৪। 'দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৮), ৫। 'প্রবন্ধকুসুম' (১৮৮০), ৬। 'নব চরিত' (১৮৮০), ৭। 'কুমারী কার্পেণ্টারের জীবন-চরিত' (১৮৮২) ৮। 'ভারত-কাহিনী' (১৮৮৩), ৯। 'বীরমহিমা' (১৮৮৬), ১০। 'ভীষ্ম চরিত' (১৮৯১), ১১। 'আমাদের জাতীয় ভাব' (১৮৯১), ১২। 'হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়' (১৮৯২)' ১৩। 'স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' (১৮৯৩), ১৪। 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়' (১৮৯৪) ও ১৫। 'প্রতিভা' (১৮৯৬)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রজনীকান্তের কোন কোন প্রবন্ধ তাঁহার একাধিক প্রবন্ধ-সংগ্রহ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

রজনীকান্তের ইতিহাস ও জীবন-বৃত্ত বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাই সর্বাধিক। দুষ্প্রাপ্য বিস্মৃতপ্রায় ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহে তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও ইতিহাসপ্রিয় অনুসন্ধানী দৃষ্টির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। রজনীকান্ত তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বীর পুরুষ ও নারীদিগের 'চরিত্র-মাহাত্ম্য অতি নৈপুণ্যসহকারে বর্ণনা করিয়াছেন। জাতীয় ভাবের সহজাত উদ্দীপনায় স্বজাতির গৌরব-মহিমা প্রচারই তাঁহার এই শ্রেণীর প্রবন্ধগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

রজনীকান্তের ঐতিহাসিক প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য যে, তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রীতি ও অনুরাগে অন্ধ হইয়া কখনও তাঁহার রচনার কোথাও অবান্তর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নাই। ঐতিহাসিক তথ্যাদিসহ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রজনীকান্ত সকল বিষয়েরই বিচার-বিশ্লেষণে প্রয়াসী হইয়াছেন। 'প্রাচীন আর্য্যজাতি', 'ভারতে আর্য্যবসতি', 'ভারতে গ্রীক্', 'বাঙ্গালীর বীরত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহ হইতে তাহা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। কোন কোন প্রবন্ধের মধ্য দিয়া রজনীকান্ত প্রচলিত ইতিহাসের ভ্রান্তি ও মিথ্যাচারও প্রমাণ করিয়াছেন। 'বাঙ্গালীর বীরত্ব' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

'পাঠানেরা যে, কেবল সপ্তদশ অশ্বারোহীমাত্র লইয়া বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছে, এ কথা মিথ্যা। বাঙ্গালায় পাঠানের উদয়, স্থিতি ও বিলয় হইয়াছে, তথাপি অনেক স্থানে অনেক বাঙ্গালী আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা

করিয়াছেন। ইহার পর মোগলের আধিপত্য সময়েও বাঙ্গালীর বীর্য্য-বহ্নি নিবিয়া যায় নাই।'[১]

রজনীকান্তের অধিকাংশ প্রবন্ধ ইতিহাসাশ্রিত হইলেও তাহা সাহিত্য-রসবিচ্যুত নহে। তাঁহার ভাষা সরস ও সুন্দর এবং বিশুদ্ধ ও গম্ভীর। বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রতি রজনীকান্তের আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা তাঁহার ভাষা ও রচনারীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। সমুচ্চ ভাবপ্রকাশে তাঁহার সরস অথচ ওজোগুণান্বিত ভাষা সমধিক কার্যকরী হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ভাব ও ভাষার বিশুদ্ধি এবং পরিপুষ্টি সাধনে রজনীকান্তের দান অস্বীকার করা যায় না।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যরুচি ও আদর্শের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ ভাবশিষ্য ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করিয়া অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার ভাষা ও রচনারীতিও গভীরভাবে অনুশীলন ও অনুসরণ করিয়াছেন। দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য বিষয়ে বহুল সাদৃশ্য থাকায় তাঁহার প্রবন্ধকে অনেক সময় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলিয়া ভ্রম হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও অক্ষয়চন্দ্রের রচনার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং তাঁহার 'কমলাকান্ত' গ্রন্থে অক্ষয়চন্দ্রের একটি রচনা অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' অক্ষয়চন্দ্র লিখিত বহুবিধ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। অক্ষয়চন্দ্রের সমালোচনা-শক্তির উপর বঙ্কিমচন্দ্রের যে গভীর আস্থা ছিল, তাহা ইহা হইতে প্রমাণিত হয়। বঙ্কিম-পর্বে শক্তিশালী প্রবন্ধ-লেখকদিগের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

অক্ষয়চন্দ্র সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিধি প্রভৃতি বহু বিচিত্র প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তে'র অনুকরণে তাঁহার লিখিত কয়েকটি রস-রচনা অর্থাৎ রঙ্গ বা ব্যঙ্গমূলক রচনারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গবেষণানির্ভর তত্ত্বমূলক বা গভীর ভাবাশ্রিত প্রবন্ধ অপেক্ষা লঘুবিদ্রূপাত্মক রস-রচনার মধ্যেই অক্ষয়চন্দ্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব সমধিক লক্ষ্য করা যায়।

১ 'ভারত-কাহিনী', (কলিকাতা, ১৮৮৩), পৃঃ ১০৭

অক্ষয়চন্দ্র প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমে : ১। 'সমাজ-সমালোচন' (১৮৭৪), ২। 'আলোচনা' (১৮৮২), ৩। 'সনাতনী' (১৯১১), ৪। 'কবি হেমচন্দ্র' (১৯১২) ও ৫। 'মহাপূজা' (১৯২১)। 'সমাজ-সমালোচন' গ্রন্থে অক্ষয়চন্দ্রের 'উদ্দীপনা' ও 'গ্রাবু' নামক দুইটি রচনা সংকলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে শেষোক্ত রচনাটি শ্লেষপ্রধান ও রঙ্গরসিকতায় পূর্ণ। সেইজন্য এই রচনাটি পরবর্তী কালে প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্রের রূপক ও রহস্য' নামক রস-রচনা-সংগ্রহে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অক্ষয়চন্দ্র একজন কৃতী সাংবাদিক হিসাবেও খ্যাতিমান্ ছিলেন। তাঁহার সুষ্ঠু ও নির্ভীক সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'সাধারণী' (১৮৭৩) ও মাসিক 'নবজীবন' (১৮৮৪) এই দুইটি সাময়িক পত্র তৎকালীন জনসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' ও স্ব-সম্পাদিত পত্রিকা মধ্যেই প্রধানতঃ অক্ষয়চন্দ্রের অধিকাংশ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

অক্ষয়চন্দ্র স্বদেশভক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম সার্থক উত্তরাধিকারী। তিনিও স্বদেশের সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং দেশের উচ্চতম সনাতন ভাবাদর্শ তাঁহার মনন ও চিন্তারাজ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অক্ষয়চন্দ্রের অধিকাংশ প্রবন্ধেই তাঁহার স্বাদেশিক চৈতন্যবোধের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। প্রতীচ্য ভাবধারা যখন সর্বদিক হইতে প্রাচ্যের সমাজ ও সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তখন স্বদেশের বহির্মুখী ভাবচিন্তাকে অন্তর্মুখী ও আত্মবোধে সচেতন করিবার একান্ত প্রয়াস অক্ষয়চন্দ্রের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর প্রীতিবোধ ছিল। অক্ষয়চন্দ্রের বাংলা সাহিত্য-প্রীতি ও সাধনা প্রসঙ্গে মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—

'তাঁহার জীবন সাহিত্যময় ছিল। শয়নে, স্বপনে, ঘরে বাহিরে, সমাজে-মজলিসে, ঘাটে পথে, আহারে বিহারে, পূজায় পার্ব্বণে, খবরের কাগজে, মাসিক পত্রে, কাগজে কলমে, সংসারে সভায় তিনি বাঙ্গালাময় ছিলেন; তাঁহার সবটাই বাঙ্গলা সাহিত্য।'[১]

অক্ষয়চন্দ্র একজন প্রাচীনপন্থী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুয়ানী বা হিন্দু সংস্কৃতিকে (Hindu Culture) বিজাতীয় শিক্ষা বা ধর্মীয় ভাবধারা হইতে

'অক্ষয়চন্দ্র সরকার', ভারতী, ভাদ্র ১৩২৯, পৃঃ ৪১৭

রক্ষা করিবার প্রয়াসে তিনি দেশের সনাতন ধর্মের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ক আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। 'সনাতনী' ও 'মহাপূজা' গ্রন্থদ্বয়ের ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধগুলি হইতে অক্ষয়চন্দ্রের ধর্মচিন্তার এক সুষ্ঠু পরিচয় লাভ করা সম্ভব হয়। তাঁহার এই জাতীয় প্রবন্ধগুলি আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ধর্ম-বিশ্বাসের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার 'ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'ধর্ম্ম কখনও পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। ধর্ম্ম ত কাল্পনিক পদার্থ নহে যে পরিবর্ত্তনশীল হইবে। যাহার জন্য বস্তুর অবস্থিতি এবং যাহা না থাকিলে বস্তুর অবস্থিতি থাকে না, যাহা বস্তুর প্রকৃতিস্বরূপ, তাহাই তাহার ধর্ম্ম ; মনুষ্যের ধর্ম্মও সেইরূপ।'[১]

দেশ ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যেই অক্ষয়চন্দ্রের অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। তাঁহার গভীর ভাবাশ্রিত প্রবন্ধও স্থানে স্থানে শ্লেষ-বিদ্রূপ বা বিশুদ্ধ কৌতুকরসে সরস ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রবন্ধ মধ্যে কৌতুকমিশ্র বিদ্রূপের তীব্রতা যে অক্ষয়চন্দ্রের গভীর আন্তরিকতা ও স্পর্শকাতর হৃদয় হইতেই উদ্ভূত, তাহা তাঁহার প্রবন্ধের বিশিষ্ট অর্থবহ সিদ্ধান্ত হইতে উপলব্ধি করা যায়।

অক্ষয়চন্দ্রের প্রবন্ধগত বিষয়ের মধ্যে মৌলিক চিন্তার গভীরতা বা অভিনবত্ব প্রকাশ না পাইলেও তাঁহার ভাষার যে এক যাদুকরী শক্তি ও সরলতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুললিত ও সহজবোধ্য ভাষার অন্তঃপ্রকৃতি তাঁহার সম্পূর্ণ অধিগত হইয়াছিল। প্রবন্ধ মধ্যে বিবিধ রসোদ্দীপক, চিত্তহারী শব্দসমূহের যথাযথ প্রয়োগে অক্ষয়চন্দ্রের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও বিষয়-বৈচিত্র্যানুযায়ী তাঁহার ভাষাও কখনও কখনও সংস্কৃত শব্দাড়ম্বরবহুল হইয়াছে, কিন্তু তাহা দুর্বোধ্য হইয়া জটিলতা সৃষ্টি করে নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অক্ষয়চন্দ্রের প্রবন্ধের ভাষায় একটি সহজ সরল সাবলীল গতি লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্কিম-পর্বে অক্ষয়চন্দ্র অন্যতম সাহিত্য-সমালোচক হিসাবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সমালোচনা ক্ষেত্রে তিনি প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্রেরই অনুসরণকারী ছিলেন।

১ 'সনাতনী', (কলিকাতা, ১৯১১), পৃঃ ৪২

যদিও কোন কোন প্রবন্ধে তাঁহার ভাবের মৌলিকতা ও সূক্ষ্ম রসদৃষ্টিও সম্পূর্ণ দুর্লভ নহে। 'কবি হেমচন্দ্র' গ্রন্থে কবির সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ অক্ষয়চন্দ্র হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার যে বিস্তৃত পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সূক্ষ্ম অনুভূতি ও যথার্থ বিচার-শক্তির নিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম কবি হেমচন্দ্র সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। গভীর কাব্যতত্ত্বের অবতারণা করিয়া হেমচন্দ্র প্রণীত কাব্যসমূহের গুণাগুণ বিশ্লেষণের যে প্রয়াস, তাহার মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রের সমালোচকোচিত অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অক্ষয়চন্দ্রের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'কবিতা সঙ্গীতাভাস। সঙ্গীত যেমন সুরে, তালে, লয়ে একটা কুহক সৃষ্টি করে, করিয়া এই সংসার ভুলাইয়া দেয়, আর এক সংসারে আমাদিগকে লইয়া যায়, কবিতাও তাহাই করে। কবিতার ভাব হইবে—উজ্জ্বল, পরিস্ফুট; ভাষা হইবে—প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণবিশিষ্ট; ছন্দ হইবে—মোলায়েম। এই তিন মেশামিশি করিয়া হৃদয়ের সহিত একটি লয় উৎপাদন করিবে। তবে ত কবিতা সফল হইবে। হেমবাবুর কবিতা অনেকস্থলেই প্রসাদগুণের অভাবে সফল হইতে পারে নাই। কিন্তু যে যে স্থলে, তিনি প্রসাদগুণ রাখিতে পারিয়াছেন, সেই সেই স্থলে তিনি বাঙ্গালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।'[১]

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবন্ধ-লেখক ছিলেন। বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় রাজকৃষ্ণ গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অসমীয়া, ওড়িয়া, পারসী, উর্দু, হিন্দী, ফরাসী, জার্মান্, ল্যাটিন্, পালি প্রভৃতি ভাষাসমূহেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বিবিধ ভাষা আয়ত্ত করিবার ফলে বিভিন্ন দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত অতি সহজেই রাজকৃষ্ণের নিবিড় পরিচয় সাধিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার লিখিত বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেমন মূল্যবান্ তথ্যে পরিপূর্ণ ও সারগর্ভ, তেমনি মৌলিক গবেষণা ও বহুদর্শী

১ 'কবি হেমচন্দ্র' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১৮), পৃঃ ৫০

পাণ্ডিত্যের পরিচয়বাহী। রাজকৃষ্ণের চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ সম্পর্কে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক-সমালোচক রমেশচন্দ্র দত্তের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

'Rajkrishna was a man of accurate scholarship and learning, and his Prabandhas are marked by a spirit of honest research.'[১]

রাজকৃষ্ণ তাঁহার বহুখ্যাত 'প্রথম শিক্ষা : বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪) নামক গ্রন্থ রচনা ব্যতীত কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ মননশীল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত তাঁহার একমাত্র মৌলিক প্রবন্ধের সংকলন 'নানা প্রবন্ধ' ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সমকালীন অন্যান্য লেখকের তুলনায় রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধের সংখ্যা অল্প হইলেও, তাহা দ্বারাই তিনি বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ভিত্তিভূমি সুদূর বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিটি প্রবন্ধই অভিনব চিন্তা-স্ফুরণে ও গভীর গবেষণায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের এক মহান্ আদর্শ ও গভীর ভাবদৃষ্টি তৎকালীন যে কয়েকজন খ্যাতিমান্ লেখককে ঐতিহাসিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, রাজকৃষ্ণ তাঁহাদের অন্যতম। বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-গবেষণায় রাজকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান সহায়ক ছিলেন। দুরূহ, অধ্যয়নসাপেক্ষ ও গবেষণাপ্রসূত অভিনব ঐতিহাসিক তথ্যাদি আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধাদি বিদ্বৎসমাজে বিশেষভাবে সমাদর লাভ করিয়াছিল। কবিতা রচনার দ্বারা রাজকৃষ্ণের সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত হইলেও, পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের সনির্বন্ধ অনুরোধ ও নির্দেশে তিনি প্রবন্ধ রচনা-কর্মেই আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা সাহিত্যে কবি-পরিচয় অপেক্ষা রাজকৃষ্ণ প্রবন্ধকার হিসাবেই সমধিক পরিচিত হইয়াছেন।

রাজকৃষ্ণের ঐতিহাসিক প্রবন্ধের অভিনবত্ব ও প্রধান বৈশিষ্ট্য যে, তিনি তাঁহার প্রবন্ধে দেশের সামাজিক ও লোক-জীবনের প্রসঙ্গকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়া ঐতিহাসিক রচনাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইতিহাস সম্পর্কে রাজকৃষ্ণের এক স্বতন্ত্র চিন্তা ও নিজস্ব বিচার-পদ্ধতি ছিল। 'প্রাচীন ভারতবর্ষ' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

'রাজা বা সেনানীর জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাস নহে। ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যাবলী ইতিহাসের পটে অল্পস্থান মাত্র অধিকার করিতে পারে; সমাজের পরিবর্ত্তন

১ *The Literature of Bengal*, (Calcutta, 1895), p. 233

প্রদর্শনই ইতিহাসের প্রকৃত বিষয়। সুতরাং ঐতিহাসিক চিত্রে রাজা অপেক্ষা সর্ব্বসাধারণ প্রজাগণের প্রাধান্য। লোকের রীতি, নীতি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, শিল্প, শাস্ত্র, কৃষি, বাণিজ্য, ধন, বল প্রভৃতি কালে কালে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা লিপিবদ্ধ করাই ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতবর্ষের এরূপ ইতিহাস লিখিবার উপকরণ নাই আমরা মনে করি না। প্রথমতঃ আমাদিগের মন্ত্রময় ঋগ্বেদ আছে, ইহা হইতে তাৎকালিক সমাজের অবস্থা জানিতে পারা যায়।'[১]

রাজকৃষ্ণ প্রণীত 'নানা প্রবন্ধ' তাঁহার বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধের একটি সংকলন-গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁহার পনেরটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে রাজকৃষ্ণের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক। প্রবন্ধগত বিবিধ প্রসঙ্গ, সমাজ-কল্যাণের বিভিন্ন তত্ত্ব তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসু, বিচারধর্মী লেখনী দ্বারা সমুজ্জ্বল ও মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিপাদ্য বিষয় সুস্পষ্ট ও সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ করিবার এক দুর্লভ ক্ষমতা রাজকৃষ্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ভাষার অনাড়ম্বর ঋজুতা ও শূন্যগর্ভ কল্পনা-কুয়াশাহীন পরিচ্ছন্নতা তাঁহার প্রবন্ধের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কোন কোন প্রসঙ্গ বা বিষয়ের উপর রাজকৃষ্ণের গভীর আকর্ষণ ও মমতা থাকিলেও অহেতুক আবেগ বা উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হইয়া বক্ষ্যমাণ বিষয় সম্পর্কে তিনি অবান্তর আলোচনা করেন নাই। রাজকৃষ্ণের সকল শ্রেণীর প্রবন্ধেরই পশ্চাতে এক সত্যসন্ধ, যুক্তিবাদী মনন-চিন্তা বর্তমান। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ সম্পর্কে রাজকৃষ্ণের সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। কিন্তু শ্রদ্ধা বা প্রীতির অন্ধ মোহে তিনি বাংলা বা ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে কখনও গৌরবদীপ্ত মহিমায় মহিমান্বিত করিতে সচেষ্ট হন নাই। বরং গবেষণালব্ধ প্রামাণ্য তথ্যাদি যুক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজকৃষ্ণ প্রাচীন বাংলা বা ভারতবর্ষের প্রকৃত ঐতিহাসিক চিত্র উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হইয়াছেন। জনশ্রুতি বা নিছক ভাব-কল্পনার আশ্রয় লইয়া তিনি বাংলা বা ভারতের গৌরব গাথা রচনায় ব্রতী হন নাই। বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের প্রকৃত প্রামাণ্য ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিয়া রাজকৃষ্ণ মুখ্যতঃ তাহারই গৌরব বা মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায় প্রণোদিত হইয়াছেন। তাঁহার লিখিত 'ভারত মহিলা', 'প্রাচীন

১ 'নানা প্রবন্ধ', (কলিকাতা, ১৯০৪), পৃঃ ১০২-১০৩

ভারতবর্ষ', 'ঐতিহাসিক ভ্রম', 'শ্রীহর্ষ' প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহ হইতে তাহাই প্রমাণিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম ভাবশিষ্য ও তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রভাবিত লেখক হইলেও রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধের ভাষা তাঁহার ন্যায় সরস গুণোপেত নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের সুদূরবিস্তৃত সত্যনিষ্ঠ কল্পদৃষ্টি ও পরিণত শিল্পরসিক মনস্বিতা তাঁহার প্রবন্ধের ভাষাকে এক রাজকীয় আভিজাত্য ও অপরিসীম মাধুর্য দান করিয়াছে। কিন্তু রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধের ভাষা ও রচনারীতি তদনুযায়ী অলঙ্কারবহুল, আবেগধর্মী বা হৃদয়গ্রাহী হয় নাই।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম-পর্বের অন্যতম প্রবন্ধ-লেখক ছিলেন। 'পালামৌ' নামক প্রথম উপন্যাসধর্মী ভ্রমণ-কাহিনী রচনা করিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হইয়াছেন। 'পালামৌ' মুখ্যতঃ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইলেও ইহাতে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রাজ্ঞজনোচিত গভীর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা এবং দার্শনিক চিন্তার সরস পরিচয়ও লাভ করা যায়। এই গ্রন্থের অংশবিশেষে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের (Personal Essay) উৎকৃষ্ট গুণসমূহ পরিলক্ষিত হয়। পালামৌর প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং এই স্থানের অধিবাসীদিগের স্বভাব-চরিত্র ও জীবনযাত্রা ভিত্তি করিয়া সঞ্জীবচন্দ্র নিজস্ব রস-সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে মনুষ্যজীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁহার রচনা মধ্যে যে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধেরই খণ্ডাংশ হইয়া উঠিয়াছে।

সঞ্জীবচন্দ্র ভ্রমণকাহিনী ব্যতীত ছোটগল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় লিখিত তাঁহার একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধগ্রন্থেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধগ্রন্থ যথাক্রমে: ১। 'যাত্রা-সমালোচনা' (১৮৭৫), ২। 'সৎকার' (১৮৮১) ও ৩। 'বাল্য-বিবাহ' (১৮৮২)। প্রতিটি প্রবন্ধই তাঁহার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, বিশ্লেষণ-পটুতা ও গভীর রসবোধে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্কিম-ভাবধারায় পরিবর্ধিত হইলেও সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার মধ্যে ভাষাগত একটা নিজস্ব ভঙ্গি ও দুর্লভ শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় লাভ করা যায়। গল্প বা উপন্যাসের ন্যায় প্রবন্ধ সাধারণতঃ মনোমুগ্ধকর বা চিত্তাকর্ষক হয় না; কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের লিপি-চাতুর্যের মধ্যে এমন এক আশ্চর্য-সুন্দর চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করা

যায় যে, তাহা দ্বারা তাঁহার প্রবন্ধও সহজ সরল ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

'যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে লেখাগুলি কথা কহার অজস্র আনন্দবেগেই লিখিত—ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া, এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে।'[১]

সঞ্জীবচন্দ্র মুখ্যতঃ সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজ-সংস্কারমূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সকল প্রবন্ধই প্রধানতঃ 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভ্রমর' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাদ্বয় স্বয়ং সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা করিয়া সঞ্জীবচন্দ্র তৎকালে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদনাকালেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত 'বঙ্গদর্শনে'র নিজস্ব পূর্বতন গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল।

সঞ্জীবচন্দ্র গ্রাম্য-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। পল্লী-বাংলার যাত্রা-গান সম্পর্কে তাঁহার গভীর কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় 'যাত্রা-সমালোচনা' নামক প্রবন্ধ হইতে লাভ করা যায়। এই প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্রের এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধে দেশীয় সকল প্রকার যাত্রাভিনয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া মুখ্যতঃ কৃষ্ণযাত্রা ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রার তুলনামূলক আলোচনায় ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার বিশ্লেষণনৈপুণ্যে উভয়শ্রেণীর যাত্রার স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য সম্যক্‌ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বক্তব্য বিষয় সহজভাবে পরিবেশন করিবার এক দুর্লভ শিল্প-ক্ষমতা সঞ্জীবচন্দ্রের ছিল। কবিত্বসুলভ সরল অনাড়ম্বর ভাষাও তাঁহার সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান গুণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'নায়ক-নায়িকাদিগের প্রেমালাপ, বিচ্ছেদ, মিলন ইত্যাদির অভিনয় করিয়া শ্রোতাদিগের চিত্তরঞ্জন করা প্রায় সকল যাত্রার উদ্দেশ্য। কি কাব্য, কি নাটক, কি নাটকাভিনয় এ সকলেরই উদ্দেশ্য মনুষ্যহৃদয়ের চিত্র। * * * বিদ্যাসুন্দর যাত্রারও সেই উদ্দেশ্য।'[২]

১ 'জীবন-স্মৃতি', (বিশ্বভারতী, ১৩৪৪), পৃঃ ২৬২

২ 'যাত্রা-সমালোচনা' [illegible]

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল—বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ 'চিরঞ্জীব শর্মা' নামে সমধিক পরিচিত হইয়াছেন; এই ছদ্মনামেই তাঁহার সর্ববিধ রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা লাভ করিয়া আজীবন ধর্ম-প্রচারেই ব্রতী হইয়াছিলেন। আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মমত ও বিশ্বাসের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ও আস্থা ছিল এবং তিনি কেশবচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত ও অন্যতম বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের 'চিরঞ্জীব শর্মা' এই ছদ্মনামটিও কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

উপন্যাস, কাব্য, নাটক ব্যতীত ত্রৈলোক্যনাথ বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। অনুবাদমূলক রচনা-কর্মেও তাঁহার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'জগতের বাল্য ইতিহাস' (১৮৭৫) নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ত্রৈলোক্যনাথ পাশ্চাত্ত্য লেখক এড্ওয়াড্ ক্লডের *Childhood of the World* গ্রন্থটিকে মুখ্যতঃ অবলম্বন করিলেও ইহার মধ্যে তাঁহার মৌলিক চিন্তার পরিচয়ও দুর্লভ নহে। নূতন বিষয় সন্নিবেশ ও উপাদান সংযোজনার ফলে এই গ্রন্থটি ত্রৈলোক্যনাথের নিজস্ব ঐতিহাসিক চেতনা ও বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

ত্রৈলোক্যনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধই চরিত বিষয়াশ্রিত। যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্যদেব, কেশবচন্দ্র, সাধু অঘোরনাথ প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের জীবন ও তাঁহাদের ধর্মমত অবলম্বন করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ কয়েকটি বিশিষ্ট পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তাঁহার ধর্ম, দর্শন ও ইতিহাস সম্পর্কিত প্রবন্ধেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'নব্যভারত' নামক বিশিষ্ট মাসিক পত্রেই ত্রৈলোক্যনাথের অধিকাংশ রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

ত্রৈলোক্যনাথ প্রণীত মৌলিক প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'ভক্তিচৈতন্য-চন্দ্রিকা' (১৮৮২), ২। 'ঈশা চরিতামৃত' (১৮৮৩), ৩। 'কেশব চরিত' (১৮৮৪), ৪। 'সাধু অঘোরনাথের জীবন চরিত' (১৮৮৫) ও ৫। 'ব্রহ্মগীতা' ১ম-৩য় খণ্ড, (১৯০১)। ত্রৈলোক্যনাথের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'কেশব চরিত'ই তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

ত্রৈলোক্যনাথের 'কেশব চরিত' গ্রন্থটি আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্যক্তিজীবন ও ধর্মমতের পর্যালোচনা। এই পুস্তিকায় তিনি কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনের সহিত তাঁহার ধর্মীয় জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীর সমন্বয় সাধন করিয়া তাহা অতিশয় নিষ্ঠাসহকারে ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্ণনা করিতে প্রয়াসী

হইয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথের এই আলোচনাটি বহুবিধ অজ্ঞাত ও অভিনব তথ্যাদিতে সমৃদ্ধ হইয়াছে এবং কেশবচন্দ্রের চারিত্রিক মাহাত্ম্য-প্রচারে তিনি যথাসম্ভব ঐতিহাসিক সত্যের উপর নির্ভর করিয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথ ঘনিষ্ঠ-ভাবে কেশবচন্দ্রের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। বিজ্ঞানসম্মতভাবে কেশবচন্দ্রের চরিত্রালোচনার গৌরব নিঃসন্দেহে ত্রৈলোক্যনাথেরই প্রাপ্য।

'কেশব চরিত' ত্রৈলোক্যনাথের অন্যতম বিশিষ্ট জীবন-বৃত্ত বিষয়ক প্রবন্ধ এবং ইহার রচনা-কর্মে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হইলেও তাহা সর্বত্র বা আনুপূর্বিক রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য গ্রন্থটি সম্পূর্ণ ত্রুটিশূন্য নহে। কেশবচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্য হইবার ফলে ত্রৈলোক্যনাথের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বা সংস্কারমুক্ত হইয়া কেশব-চরিত পর্যালোচনা করা সম্ভব ছিল না। 'কেশব চরিত' গ্রন্থের কোন কোন অংশ ত্রৈলোক্যনাথের একদেশদর্শিতা ও পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট হইয়াছে।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রবন্ধের ভাষা বিষয়ানুসারে সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। ধর্মভাব-গম্ভীর কেশবচন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁহার নিপুণ পরিবেশনগুণে সাধারণের নিকট সহজবোধ্য হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কেশব-চরিতের বিস্তৃত বিচার-বিশ্লেষণে ত্রৈলোক্যনাথের নিজস্ব চিন্তা ও গভীর ধর্মভাবোপলব্ধির পরিচয় লাভ করা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

'বিশুদ্ধ জ্ঞানবিচারে নিপুণ হইয়াও তিনি দেশীয় সদাচার এবং জাতীয় ধর্ম্মভাবের চিরদিন পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরাজি শিক্ষিত কৃতবিদ্যদলের মধ্যে এরূপ সামঞ্জস্যের ভাব অতীব বিরলদৃশ্য সন্দেহ নাই। কেশবের মত স্বদেশানুরাগী স্বজাতিপক্ষপাতি হিন্দু ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে নিতান্ত দুর্ল্লভ বলিয়া মনে হয়। অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের জীবন্ত শক্তিতে বিশ্বাস এবং প্রার্থনাতত্ত্ব তাঁহার জীবনের ভিত্তিভূমি ছিল'।[১]

ত্রৈলোক্যনাথের তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ 'ব্রহ্মগীতা' ধর্ম-দর্শনমূলক একটি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ হিসাবে জনসমাজে সমাদৃত হইয়াছে। ইহা তাঁহার গভীর দার্শনিক ভাব-চিন্তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এই গ্রন্থে কর্ম, জ্ঞান ও

১ 'কেশব চরিত,' (কলিকাতা, ১৮৮৪) পৃঃ ২২

ভক্তিযোগের জটিল তত্ত্বসমূহ ত্রৈলোক্যনাথের নিজস্ব দর্শন-চিন্তার আলোকে এক অভিনব রূপ লাভ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সংলাপাত্মক ভঙ্গিতে কবিত্বসুলভ সহজ ভাষায় পরিবেশনের ফলে 'ব্রহ্মগীতা'র নীরস ধর্মীয় তত্ত্বও সরস ও আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রবন্ধগত নীরস বিষয়কে চিত্তগ্রাহী করিয়া তুলিবার যে দুর্লভ ক্ষমতা ত্রৈলোক্যনাথের ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রফুল্লচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র একজন বিশিষ্ট প্রবন্ধ-লেখক ছিলেন। বিবিধ জ্ঞানগর্ভ গবেষণামূলক প্রবন্ধের তিনি রচয়িতা এবং বিশেষতঃ পুরাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার জন্যই তাঁহার সমধিক খ্যাতি হইয়াছিল।

প্রফুল্লচন্দ্র অধ্যবসায়ী গবেষক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। ভাষা-বিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল এবং তিনি ইংরাজী, ল্যাটিন্, গ্রীক্, সংস্কৃত, ওড়িয়া, তেলেগু প্রভৃতি ইউরোপীয় ও ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের সর্ববিধ প্রবন্ধই যুক্তিগর্ভ এবং সারবহুল। তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধই অধিক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধসমূহ অভিনব প্রণালীতে লিখিত এবং গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের রচনার অন্যতম প্রধান ত্রুটি এই যে, তাহা যথাযথভাবে সাহিত্যগুণ সমন্বিত হইতে পারে নাই এবং ফলে, তাঁহার প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত নীরস হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষাও অধিকতর সংস্কৃতভাবাপন্ন এবং রচনার মধ্যে আভিধানিক জটিল শব্দের বহুল প্রয়োগে প্রবন্ধের বিষয় সুললিত ও সহজবোধ্য হয় নাই।

প্রফুল্লচন্দ্র প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত' (১৮৭৬), ২। 'গ্রীক্ ও হিন্দু' (১৮৮৪), ৩। 'মণিহারী' (১৮৮৮), ও ৪। 'অনুভূতি' (১৮৯০)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, প্রফুল্লচন্দ্রের 'মণিহারী' গ্রন্থে তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইলেও তাহা মুখ্যতঃ বিবিধ বিষয়ক রচনার একটি সংকলন। এই গ্রন্থের সমুদয় রচনাকে প্রফুল্লচন্দ্র কয়েকটি বিভাগে বিন্যস্ত করিয়াছেন। 'স্বস্তি নিত্যম্' রচনাটি অনুবাদ এবং 'খেলেনা' ও 'মণ্ডমোদক' পর্য্যায়ের রচনাগুলি লঘু কৌতুকরসাত্মক—প্রবন্ধ অপেক্ষা ইহাদিগকে 'রস-রচনা' নামে অভিহিত করাই অধিকতর সঙ্গত হয়। অতএব

'মণিহারী' গ্রন্থের সকল রচনাই প্রবন্ধ নহে। এতদ্ব্যতীত বিবিধ সাময়িক পত্রেও প্রফুল্লচন্দ্রের বহু মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি সংকলিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভের সুযোগ পায় নাই।

প্রফুল্লচন্দ্রের নৃ-তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনাভিত্তিক প্রবন্ধগ্রন্থ 'গ্রীক্ ও হিন্দু'ই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এই জাতীয় ব্যাপক গবেষণাপূর্ণ মৌলিক চিন্তাশীল রচনা বাংলা সাহিত্যে কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়। 'গ্রীক্ ও হিন্দু' গ্রন্থে এই উভয় সম্প্রদায়ের জাতিগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য এবং তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পারস্পরিক তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা প্রফুল্লচন্দ্র গ্রীক্ ও হিন্দুর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার গবেষণামূলক সিদ্ধান্ত এই যে, গ্রীক্ এবং হিন্দু সমবংশজ। কালানুক্রমে ও অনিবার্য প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলেই উভয় জাতির বিবিধ স্বভাবান্তর ঘটিয়াছে এবং উভয়ের প্রকৃতি-ধর্ম, কর্মক্ষেত্র ও চিন্তাধারায় বহুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে মাত্র। প্রফুল্লচন্দ্রের এই গ্রন্থটি অভিনব তত্ত্ব ও তথ্যে বিশেষ সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আলোচনার মধ্যে যেমন চিন্তার গভীরতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি তাহা প্রফুল্লচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও মৌলিক গবেষণার নিদর্শনরূপে সার্থক হইয়াছে। 'গ্রীক্ ও হিন্দু' গ্রন্থের 'তত্ত্ববিদ্যা' অধ্যায়টি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ এবং ইহা হইতে প্রফুল্লচন্দ্রের গভীর দার্শনিক দৃষ্টি ও ভাবুকতার পরিচয় লাভ করা যায়। গ্রীক্ ও হিন্দুর নাস্তিক-তত্ত্ববিদ্যা প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের আলোচনা হইতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'সমগ্র ধরিতে গেলে, এখানকার (গ্রীক্) নাস্তিকতা মাধুর্য্যগুণময়ী। হিন্দুর সেরূপ নহে। গ্রীকের চিন্তাশক্তি ক্ষীণ, বাহ্যদর্শন শক্তি তীব্র এবং বৈজ্ঞানিক, সুতরাং আত্মিক সংসারে ইহাদের তত্ত্ব সঙ্কীর্ণায়তন অথচ সুসজ্জিত; কাজেই ইহা মাধুর্য্যময় হওয়ার কথা। হিন্দুর চিন্তাশক্তি গগনভেদী, প্রত্যক্ষ প্রমাণপ্রিয়তা হেতু যদিও তীক্ষ্ণ বাহ্যদর্শনের আবশ্যক তথাপি চিন্তাশক্তির আতিশয্যে ইচ্ছা সত্ত্বেও ইহার মন তদ্বিষয়ে অনন্যমনা ও অবৈজ্ঞানিক; এ নিমিত্ত হিন্দুর তত্ত্ব বৃহদায়তন, শৃঙ্খলমুক্ত উন্মাদমূর্ত্তি, তত্ত্বও অনুরূপ বীভৎস ভাবাপন্ন'।[১]

১ 'গ্রীক্ ও হিন্দু', (কলিকাতা, ১২৯১), পৃঃ ১৮৯-৯০

বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব ও জটিলতা অনুসারে প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষাও অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও দুর্বোধ্য হইয়াছে। সম্ভবতঃ বিষয়ের জটিলতা বা তত্ত্বগত গভীরতার জন্যই ভাষার স্বচ্ছতা বা সুস্পষ্টতা তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধেই পরিলক্ষিত হয় না।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আশ্চর্য রূপান্তর সাধনে যে সকল বিশিষ্ট মনীষীর ভাবধারা ও কর্ম-প্রেরণা সক্রিয়ভাবে সহায়তা করিয়াছে, দ্বারকানাথ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি মুখ্যতঃ একজন সাংবাদিক; কিন্তু রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজ-সংস্কারক হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। 'অবলাবন্ধু', 'সমালোচক', 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতি কয়েকটি সাময়িক পত্রিকার সুষ্ঠু সম্পাদনা হইতে তাঁহার সাংবাদিক জীবনের সাফল্য ও কৃতিত্বের পরিচয় লাভ করা যায়। দ্বারকানাথ বিবিধ প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। স্ব-সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে প্রধানতঃ কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাদিগের উপর সামাজিক অবিচার এবং আসামের চা-বাগানের কুলিদের দাসত্ব ও দুরবস্থা সম্পর্কে তাঁহার লিখিত অগ্নিগর্ভ প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বারকানাথ এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনা করিয়া তৎকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কিন্তু তাঁহার বহু সমাদৃত প্রবন্ধসমূহ গ্রন্থাকারে আজও প্রকাশ লাভের সুযোগ পায় নাই। প্রবন্ধ ব্যতীত দ্বারকানাথ উপন্যাস এবং বিবিধ সঙ্গীতও রচনা করিয়াছেন। 'সুরুচির কুটীর' তাঁহার একটি বহুল প্রচারিত উপন্যাস।

দ্বারকানাথের একমাত্র চরিতাশ্রিত প্রবন্ধ পুস্তিকা 'জীবনালেখ্য' ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী সরলপ্রাণা ব্রহ্মময়ী দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবন-কথাই 'জীবনালেখ্য' গ্রন্থের বিষয়বস্তু। দ্বারকানাথ শ্রীমতী ব্রহ্মময়ীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য ব্রহ্মময়ীর জীবনের বিবিধ ঘটনা ও কর্মকৃতি তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। দ্বারকানাথ ব্রহ্মময়ী দেবীর বিচিত্র কর্মকৃতির মধ্য দিয়াই তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করিয়াছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দ্বারকানাথের রচনায় তথ্য বিকৃতির কোন অবকাশ ঘটে নাই। 'জীবনালেখ্যে'র রচনাকৌশল এবং বিষয়-বিন্যাস প্রণালী প্রশংসনীয়। দ্বারকানাথের অনলঙ্কৃত রচনারীতি ও ভাষার সাবলীল গতির জন্য বক্তব্য বিষয় কোথাও ক্লান্তিকর হইয়া উঠে নাই। দ্বারকানাথ ব্রহ্মময়ী দেবীর জীবন-বৃত্তান্তের সহিত তৎকালীন দেশের সামাজিক পরিবেশের বহুবিধ চিত্রও সুকৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন। তথ্যনিষ্ঠ ও উচ্ছ্বাসহীন বর্ণনায় গ্রন্থটি

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কয়েকটি সুনির্বাচিত অথচ সংক্ষিপ্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া দ্বারকানাথ ব্রহ্মময়ী দেবীর যে সরলতা ও চারিত্রিক মহানুভবতার পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই তাঁহার সূক্ষ্ম নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও সহৃদয় রচনানৈপুণ্যের গুণেই সম্ভবপর হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্বারকানাথের 'জীবনালেখ্য' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'ব্রহ্মময়ীর সমপদস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি যেরূপ, দীনভাবাপন্ন ইতরজাতীয় লোকদিগের প্রতিও সেইরূপ সহানুভূতি ছিল। * * * একদা তিনি একজন অতি ইতর জাতীয় স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহার কোন পালিতা কন্যা তাঁহাকে কহিলেন, "আপনার কি আর আলাপ করিবার লোক নাই? আপনি ইহার সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন?" ব্রহ্মময়ী শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং অনুযোগকারিণীকে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "ইহারা কি মানুষ নয়? * * * ইহা স্মরণ রাখিও, ছোটলোক, বড়লোক সকলেই আমার নিকট সমান"।'[১]

শিবনাথ শাস্ত্রী—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম বিশিষ্ট ধর্মাচার্য হিসাবে নামোল্লেখ করিলেই শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয় না—তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যস্রষ্টা ও রসিক বোদ্ধা ছিলেন। শিবনাথের কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি মৌলিক সৃষ্টিধর্মী রচনা দ্বারা বাংলা সাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। প্রবন্ধকাররূপেও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার যে একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে, তাহাও কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। শিবনাথের প্রবন্ধ রচনারীতি সহজ ও প্রাঞ্জল এবং তাঁহার রচনা মধ্যে কোনরূপ কষ্টসাধ্য বা কৃত্রিম অলঙ্কার প্রয়োগের প্রয়াস নাই। বক্তব্য বিষয়ের সরসতা ও ভাষার প্রসাদগুণ সর্বত্র রক্ষিত হওয়ায় শিবনাথের প্রবন্ধ অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও সমাদৃত হইয়াছে।

শিবনাথ মুখ্যতঃ ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ ও চরিত বিষয়ক প্রবন্ধই রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক। শিবনাথের সর্ববিধ প্রবন্ধই তাঁহার গভীর চিন্তালব্ধ ও সত্যসন্ধ প্রজ্ঞানে মণ্ডিত হইয়াছে। শিবনাথ প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমে: ১। 'এই কি ব্রাহ্ম বিবাহ'? (১৮৭৮), ২। 'গৃহধর্ম' (১৮৮১), ৩। 'জাতিভেদ' (১৮৮৪), ৪। 'রামমোহন রায়', (১৮৮৬), ৫। 'বক্তৃতা-স্তবক' (১৮৮৮), ৬। 'মাঘোৎসবের উপদেশ' (১৯০২),

১ 'জীবনালেখ্য', (কলিকাতা, ১৮৭৬), পৃঃ ৭১-৭২

৭। 'মাঘোৎসবের বক্তৃতা' (১৯০৩), ৮। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৯০৪), ৯। 'প্রবন্ধাবলি', ১ম খণ্ড (১৯০৪), ১০। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র' (১৯১০), ধর্মজীবন, ১ম-৩য় খণ্ড (১৯১৪-১৬) ও 'আত্মচরিত' (১৯১৮)।

শিবনাথ লিখিত 'ধর্ম কি?', 'ঈশ্বর অচেতন শক্তি কি সচেতন পুরুষ', 'ঈশ্বরান্বেষণ', 'ধর্ম্মজীবনের উপাদান' প্রভৃতি ধর্মমূলক প্রবন্ধগুলি সাধারণতঃ ব্রাহ্মসমাজে পঠিত তাঁহার ধর্ম সংক্রান্ত উপদেশ ও বক্তৃতা। এই রচনাসমূহ একদিকে যেমন বিরোধী মত খণ্ডন এবং ব্যাখ্যায় বিশদীকৃত ও যুক্তিপ্রতিষ্ঠ, তেমনি লেখকের সহজাত কবি-কল্পনার দ্বারা সরস হইয়া উঠিয়াছে। শিবনাথের জনৈকা জীবনী-লেখিকার মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

'শিবনাথের বক্তৃতার ভিতর যেমন ভাবের গাম্ভীর্য্য, তেমনি ভাষার সৌন্দর্য্য, তেমনি ওজস্বিতা—বঙ্গসাহিত্যে এগুলি অপূর্ব্ব জিনিস।'[১]

শিবনাথের সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধের সংখ্যা তাঁহার অন্য বিষয়ক প্রবন্ধের তুলনায় পরিমাণে অল্প। সাহিত্যধর্ম ও কবিমানস সম্পর্কে তাঁহার যে আলোচনা, তাহার মধ্যেও শিবনাথের মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্য ও কবিত্বের স্বরূপ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার এক স্বতন্ত্র মনোভাব বা ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং শিবনাথের এই স্বতন্ত্র বোধ বা চিন্তার মধ্যে যেমন তাঁহার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা আছে, তেমনি এক পরিণত রসিক চিত্তের গভীর অনুভূতির পরিচয়ও প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার 'ঋষিত্ব ও কবিত্ব', 'কাব্য ও কবিত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহ হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। কবির প্রধান লক্ষণ যে তন্ময়তা এবং তন্ময়তাই যে কাব্যসৃষ্টির মূল উৎসস্বরূপ, সে সম্পর্কে শিবনাথের চিন্তাগর্ভ ও রসগ্রাহী আলোচনা উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার 'কাব্য ও কবিত্ব' প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'এই তন্ময়তা শক্তি কবি-হৃদয়ে দুইভাবে কার্য্য করে। প্রথম সৌন্দর্য্য চিত্রণে, দ্বিতীয় সৌন্দর্য্য গঠনে। কবির এইটুকু বিশেষত্ব যে, তিনি সৃষ্টির গূঢ় সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রবেশ করেন। মধুকর যেরূপ পুষ্পোপরি বসিয়া তাহার অসার ভাগ বর্জ্জনপূর্ব্বক একেবারে তাহার মধুতে গিয়া উপনীত হয়, তেমনি

[১] হেমলতা দেবী, 'পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত', (কলিকাতা, ১৩২৭), পৃঃ ৩৪৪

কবিচিত্ত সৃষ্টির উপরে পড়িয়া তাহার অস্থি মজ্জাস্থিত সৌন্দর্য্যে গিয়া উপনীত হয়।'[১]

শিবনাথের সাহিত্যজীবনের সর্বাপেক্ষা দুইটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং 'আত্মচরিত'। এই গ্রন্থ দুইটি পরস্পরের পরিপূরক এবং নিঃসন্দেহে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে ইহারা শিবনাথের মূল্যবান্ সংযোজনা। তাঁহার 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থটি আদর্শ পুরুষ রামতনুকে উপলক্ষ্য করিয়া সমকালীন বাঙ্গালী সমাজের এক বিশিষ্ট চিত্ররূপ। রামতনু চারিত্রিক ঔদার্য ও বিনয়ে প্রকৃতই মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আদর্শ পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া শিবনাথ উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসমাজের গৌরবোজ্জ্বল ঘটনাসমূহ নিরপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁহার গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজ ও ধর্মজীবন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দ্বারা কি ভাবে প্রভাবিত ও আন্দোলিত হইয়াছে, তাহা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। শিবনাথের তথ্যনিষ্ঠ এবং সরস ও সুষ্ঠু বর্ণনাকৌশলে ইহা মনোজ্ঞ ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার চিত্তাকর্ষক প্রাঞ্জল ভাষা ও বিশিষ্ট রচনারীতির জন্য গ্রন্থটি কেবলমাত্র ইতিহাসের নীরস তথ্য সঙ্কলনেই পরিণতি লাভ করে নাই; বরং সাহিত্যের স্বাদে ও সুরভিতে মধুস্বাদী হইয়াছে।

আত্মজীবনাশ্রিত প্রবন্ধগ্রন্থ হিসাবে শিবনাথের 'আত্মচরিতে'র ন্যায় সমতুল্য গ্রন্থও বাংলা সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট। এই গ্রন্থটি কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গুণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শিবনাথের দীর্ঘ একষট্টি বৎসরের কর্মবহুল জীবনের বিচিত্র ঘটনা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার এই আত্মকাহিনী কোন আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিবিশেষের ইতিকথা হয় নাই, তাহা সমগ্র বাংলাদেশের এক গৌরবময় যুগের স্বরূপ-প্রকাশের ইতিবৃত্ত হইয়া উঠিয়াছে। শিবনাথের আশ্চর্য-সুন্দর রচনাগুণে ইহাতে যেমন তাঁহার ব্যক্তিগত অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও অকুণ্ঠ সত্যভাষণে আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তাব্যঞ্জক রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, তেমনি উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক অবস্থার এক মনোজ্ঞ ছবিও ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার উচ্ছ্বাসহীন সরল সংযত বর্ণনায় গ্রন্থটি দুর্লভ

১ 'প্রবন্ধাবলি' ১ম খণ্ড, (কলিকাতা, ১৩:১), পৃঃ ১২৩

ঐশ্বর্যগুণে মণ্ডিত হইয়াছে। শিবনাথের 'আত্মচরিতে'র একটি উল্লেখজনক বৈশিষ্ট্য যে, ইহা আনুপূর্বিক এক মৃদু পরিহাসরসিকতায় সমুজ্জ্বল এবং কৌতুকমধুর বিবিধ ঘটনার বর্ণনায় অধিকতর সরস ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত—বঙ্কিমচন্দ্রের অনুগামী লেখক হিসাবে রমেশচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে মুখ্যতঃ ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস-রচয়িতারূপেই তিনি সমধিক খ্যাত হইয়াছেন। উপন্যাসের তুলনায় রমেশচন্দ্র বাংলা প্রবন্ধ অতি অল্পই রচনা করিয়াছেন। পরিমাণে অল্প হইলেও তাহার মধ্য দিয়াই রমেশচন্দ্রের প্রবন্ধ-রচনানৈপুণ্যের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। রমেশচন্দ্র ইংরাজী-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার ইতিহাস, ধর্ম, সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রধানতঃ ইংরাজী ভাষাতেই লিখিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত রমেশচন্দ্রের কোন প্রবন্ধগ্রন্থের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তিনি যে কয়েকটি নাতিদীর্ঘ বাংলা প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহাও সংকলিত হইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে মুদ্রিত হয় নাই।

রমেশচন্দ্রের প্রবন্ধের ভাষা সহজ ও সংযত। সমকালীন গদ্যভাষা ও রীতি অনুযায়ী তাঁহার রচনা দীর্ঘ সমাস বা কৃত্রিম অলংকার বাহুল্যে ভারাক্রান্ত নহে। উপন্যাসসুলভ মাধুর্যমণ্ডিত ভাষা রমেশচন্দ্রের প্রবন্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রমেশচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনাত্মক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে 'বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য' এবং 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধ দুইটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধদ্বয় ১৩০১ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান কয়েকটি সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া তাঁহার অসামান্য মৌলিক সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে 'আধুনিক বাঙ্গালীর চিন্তা ও কল্পনা, উদ্যম ও উন্নত আশা'র কথাই তাঁহার সর্ববিধ রচনা মধ্যে প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন, মুখ্যতঃ তাহাই এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে অতি নৈপুণ্যসহকারে বিবৃত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র তাঁহার 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে দুই প্রাচীন কবির তুলনামূলক আলোচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। উভয় কবির কাব্যগুণ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি শেষে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মুকুন্দরামের কবিতা মৌলিকতা ও স্বাভাবিকতায় ভারতচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রমেশচন্দ্রের এই

আলোচনা মধ্যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা না থাকিলেও, তিনি সুনির্বাচিত কাব্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া উভয় কবির যে দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য ও কাব্য-বিচারসূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা দ্বারা রমেশচন্দ্রের পরিণত রসবোধের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

'মুকুন্দরামের নায়ক, নায়িকার ন্যায় নরনারী আমরা প্রতিদিন বিশ্বসংসারে দেখিতে পাই। ধনপতির ন্যায় বিষয়ী, লহনা ও খুল্লনার ন্যায় সপত্নী, ভাঁড়ু দত্তের ন্যায় প্রবঞ্চক, দুর্ব্বলার ন্যায় দাসী, আমরা সংসারে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। সংসার দেখিয়া মুকুন্দরাম নায়ক নায়িকা চিত্রিত করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র অসাধারণ পণ্ডিত, অসাধারণ চতুর, বাক্যবিন্যাসে অসাধারণ ক্ষমতাশালী, কিন্তু তাঁহার নায়ক নায়িকাগুলি কি সংসারের নরনারী, হীরার ন্যায় চতুরা মালিনী, সুন্দরের ন্যায় বিলাসপরায়ণ নায়ক, বিদ্যার ন্যায় বিলাসিনী নায়িকা সংসারের সচরাচর নরনারী নহে।' [১]

প্রবন্ধগত বিষয়ের প্রতি রমেশচন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এবং সেইজন্য তাঁহার রচনা অপ্রাসঙ্গিকতা বা বাহুল্য দোষে দুষ্ট নহে। বক্তব্য বিষয়ের সংযত ও সুচারু বিন্যাসে রমেশচন্দ্রের রচনাগত স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কেশবচন্দ্র সেন—কেশবচন্দ্র ব্রহ্মবাদী ধর্মযাজক ও অলোকসামান্য বাগ্মীপুরুষ হিসাবে বাঙ্গালী, তথা ভারতবাসীর নিকট সুপরিচিত। চরিত্রের অসাধারণ দৃঢ়তা, অসীম কর্মপ্রেরণা এবং ভগবৎ প্রেমের এক অভিনব আদর্শ স্থাপনের মধ্য দিয়া কেশবচন্দ্রের মহত্ত্ব ও কর্মকৃতি সমগ্র বিশ্বেও প্রচার লাভ করিয়াছে।

কেশবচন্দ্রের অসামান্য মনীষা মুখ্যতঃ দেশের ধর্ম এবং সমাজ-সংস্কারগত প্রয়োজনেই নিযুক্ত হইয়াছিল। বাগ্মিতা, সংবাদপত্র-পরিচালনা ও ধর্মোপদেশাশ্রিত রচনা তাঁহার লোকোত্তর প্রজ্ঞার সার্থক নিদর্শন। কেশবচন্দ্র প্রধানতঃ ধর্মতাত্ত্বিক ছিলেন। তাঁহার নিত্য নূতন ধর্মীয় চিন্তাধারা বিবিধ ধর্মমূলক প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে এবং বাংলা ভাষায় কেশবচন্দ্র যে অভিনব ভঙ্গি ও বাক্য-গ্রন্থনের সরল কৌশল প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার এক স্বতন্ত্র সাহিত্যিক রূপও উন্মোচিত হইয়াছে। বঙ্কিম-পর্বে

[১] 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, মাঘ, ১৩০১, পৃঃ ১৬৮

কেশবচন্দ্রের এই স্বতন্ত্র সাহিত্যিক গদ্যরীতিও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিবার নহে।

কেশবচন্দ্রের গদ্যরীতি ও ভাষার ক্ষেত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব কিয়ৎপরিমাণে অনুভূত হয়। মহর্ষির দ্বারা প্রভাবিত হইলেও কেশবচন্দ্রের রচনারীতি ও ভাষায় তাঁহার নিজস্বতাও অগোচর নহে। ভাব-বৈষম্য ও সিদ্ধান্ত প্রকাশের তারতম্যও উভয়ের গদ্যরীতি ও ভাষাকে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত করিয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও আচার্য কেশবচন্দ্র উভয় মনীষীই ব্রহ্মবাদী হইলেও তাঁহাদের ধর্মমত ও আদর্শের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। উভয়ের ধর্মীয় প্রবন্ধগুলি হইতে তাঁহাদের ধর্মভাবের স্বরূপ ও প্রকৃতির সহিত পরিচয় লাভ করা যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ জীবাত্মায় পরামাত্মার প্রকাশই বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছেন। আত্মারাজ্যে ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় রূপাভিব্যক্তির প্রসঙ্গই মহর্ষির ধর্মীয় প্রবন্ধসমূহে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যদিও এই জাতীয় ব্যাখ্যা কেশবচন্দ্রের রচনা মধ্যেও লক্ষণীয়; তথাপি ইহা ছাড়াও তাঁহার অতিরিক্ত বক্তব্যও আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পরমাত্মাকে জীবাত্মার প্রাণরূপেই সর্বদা উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের মতে, পরমাত্মা কেবল আত্মার প্রাণ নহেন—পরমাত্মা আত্মার চালকস্বরূপ এবং মানুষের ধর্মজীবনের একমাত্র পথ-নির্দেশক। জীবাত্মার বিবেকের মধ্য দিয়া পরমাত্মার উপলব্ধি বা ব্রহ্মদর্শনই কেশবচন্দ্রের ধর্মীয় মতাদর্শের বিশেষত্ব। তাঁহার ধর্ম সংক্রান্ত উপদেশমূলক প্রবন্ধসমূহের মধ্য দিয়া মুখ্যতঃ এই ধর্মচিন্তাই প্রকাশিত হইয়াছে।

কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধের ভাষা কৃত্রিম বাক্যালঙ্কারে ভারাক্রান্ত হয় নাই। তদানীন্তনকালে বাংলা গদ্য-ভাষায় সংস্কৃতের গভীর প্রভাব থাকা সত্ত্বেও সহজ সরল বাক্যভঙ্গির প্রবর্তনা এবং বিশেষতঃ স্ব-সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্র 'সুলভ সমাচারে' চলিত ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা বা আলোচনা প্রধানতঃ ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক। তাঁহার এই ধর্মালোচনার মধ্যে যথার্থ প্রবন্ধসুলভ যুক্তিধর্মিতা এবং প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ চিন্তা ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করা যায়। কেশবচন্দ্রের এই রচনাগুলি বাংলা ধর্মীয় প্রবন্ধের ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াছে।

কেশবচন্দ্রের রচনা সম্পর্কে এ'কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, তাঁহার বাংলা কোন রচনাই স্বয়ং প্রণীত নহে। তাঁহার সর্ববিধ বক্তৃতা বা

ধর্মোপদেশ অনুগত শিষ্যগণ কর্তৃক অনুলিখিত হইয়াছে। যদিও কেশবচন্দ্র সংশোধন ও পরিমার্জন করিয়া তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি ইহা স্বীকার্য যে, মৌলিক রচনার তুলনায় এই অনুলিখিত রচনার ভাব-গাম্ভীর্য ও ভাষা-সৌন্দর্য স্বভাবতই কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাহত বা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধগ্রন্থ-সমূহ যথাক্রমে: ১। 'সেবকের নিবেদন' (১৮৮০), ২। 'জীবনবেদ' (১৮৮৪), ৩। 'দৈনিক প্রার্থনা' (১৮৮৪-৮৫), ৪। 'ব্রহ্মগীতোপনিষৎ' (১৮৮৬, ১৮৯৩), ৫। 'ব্রাহ্মিকদিগের :প্রতি উপদেশ' (১৮৮৭), ৬। 'সাধু সমাগম' (১৮৮৭), ৭। 'মাঘোৎসব'(১৮৮৮), ৮। 'ব্রহ্মোপাসনা' (১৯০১), ৯। 'প্রতিমা' (১৯১২), ১০। 'দৈনিকউপাসনা' (১৯১৬), ১১। 'আচার্য্যের উপদেশ' (১৯১৬-১৮) ও ১২। 'সঙ্গত' (১ম ভাগ, ১৯১৬, ২য় ভাগ, ১৯৩৮)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বহু উপদেশ বা বক্তৃতা কেশবচন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত হইবার দীর্ঘকাল পরে তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

কেশবচন্দ্রের প্রতিটি বক্তৃতা বা আলোচনা ধর্মবিষয়াশ্রিত। কোন কোন আলোচনা, বক্তৃতা বা প্রার্থনায় শিক্ষা ও সমাজের প্রসঙ্গও বিবৃত হইয়াছে। বক্তব্য বিষয় দুরূহ তত্ত্বমূলক হইলেও কেশবচন্দ্রের অনাড়ম্বর সহজ ব্যাখ্যানে তাহা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে। নীরস ধর্মীয় রচনা অর্থাৎ তত্ত্বগত আলোচনার মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহজাত কবিচিত্তের অনায়াস প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কেশবচন্দ্রের ধর্মচিত্তের সহিত কবিচিত্তের এই অপূর্ব মিলন সাধনের ফলে তাঁহার ধর্মমূলক প্রবন্ধসমূহ সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

কেশবচন্দ্রের প্রতিটি রচনাই তাঁহার গভীর ধর্মচিন্তার পরিচায়ক। ভাবের গাম্ভীর্য, ভাষার সারল্য ও ভক্তহৃদয়ের অন্তর্গূঢ় মাধুর্যে তাঁহার রচনাসমূহ সমুজ্জ্বল। ব্রহ্মতত্ত্বের ন্যায় জটিল বিষয়ও কেশবচন্দ্রের অপরূপ রচনানৈপুণ্যে সহজ ও রসদ্যোতক হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কেশবচন্দ্রের 'ভক্তি' নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'ভক্তি কি? হৃদয়ের কোমল অনুরাগ ভক্তি। কোন্ প্রকারের পদার্থ অবলম্বন করিয়া ভক্তি উদিত হয়? সত্যং শিবং সুন্দরং পদার্থ। যে পদার্থ কেন সত্য শিব সুন্দর ভাবথাকুক না, তাহা দেখিয়াই ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। ফলতঃ ভক্তি ভাববিশেষ। সত্য, শিব, সুন্দর এই তিন গুণ উহার উদ্দীপক। ভক্তি এই তিন গুণ ভিন্ন আর কিছু চায় না। যেখানে এই তিন গুণের একটিরও

অভাব আছে, সেখানে ভাবের পূর্ণতার ব্যাঘাত এবং ভক্তির বিকার উপস্থিত হয়।'[১]

কেশবচন্দ্রের আত্মজীবনাশ্রিত প্রবন্ধগ্রন্থ 'জীবনবেদ'। ইহাকে প্রথাসিদ্ধ জীবনীগ্রন্থের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। 'জীবনবেদে' কেশবচন্দ্রের বৈষয়িক বা ব্যক্তিগত সাংসারিক জীবনের কোনরূপ পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা ও ক্রমবিকাশ এবং তাহার অপূর্ব মহিমাই প্রধানতঃ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সনাতন সত্যনিষ্ঠ ধর্মভাবের একনিষ্ঠ সাধনায় কেশবচন্দ্রের লোকোত্তর জীবন মহিমময়। 'জীবনবেদ' এই নামকরণের মধ্যেও একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। বেদের অর্থ মুখ্যতঃ জ্ঞান। যে জ্ঞান সচরাচর অন্য সাধারণ গ্রন্থে দুর্লভ, অর্থাৎ যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে এবং যে জ্ঞান পরমতত্ত্ব বিষয়ক, তাহাই সাধারণতঃ 'বেদ' নামে অভিহিত হয়। যে উৎস হইতে মোক্ষবস্তুর সন্ধান লাভ করা সম্ভব হয়, মুক্তির পথ যাহা দ্বারা নির্দেশিত হইয়া থাকে, তাহাই শাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্রই 'বেদ'। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, জীবনই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র ও সকল বেদের আদি বেদ এবং ইহাতে দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, প্রভৃতি সকল গূঢ়তত্ত্বই আলোচিত হয়। অতএব কেশবচন্দ্রের 'জীবনবেদ' গ্রন্থের নামকরণ অসার্থক হয় নাই। এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন—

'সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জীবন। বিশ্বাসীর জীবন, সাধকের জীবন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সকল বস্তু অপেক্ষা আদরণীয় আপনার জীবন। যদি ব্রহ্মাণ্ডপতি মনুষ্য-জীবনকে বেদ বেদান্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া থাকেন, তবে বিশ্বাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য, জীবনের কথা ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিবৃত করেন। সেইজন্য পরমপিতার আদেশে এই বক্তার জীবনের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।'[২]

'জীবনবেদ' গ্রন্থটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে মুখ্যতঃ কেশবচন্দ্রের বিশুদ্ধ অধ্যাত্মজীবনের বিচিত্র প্রসঙ্গ থাকিলেও তাহা দ্বারা মানুষ কেশবচন্দ্রের পরিচয় সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই। 'জীবনবেদে'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেশবচন্দ্র যে সাধারণ মানুষ ছিলেন

১ 'ব্রহ্মগীতোপনিষৎ', (কলিকাতা, ১৮৫৩ শক), পৃঃ ৮

২ 'জীবনবেদ', (কলিকাতা, ১৮০৬ শক,) পৃঃ ১

এবং সাধারণের ন্যায় মানবিক সকল স্থূল প্রবৃত্তির জ্বালাও তিনি যে অনুভব করিয়াছেন, তাহার পরিচয়ও 'জীবনবেদ' হইতে লাভ করা যায়। মানুষ কেশবচন্দ্র ক্রমান্বয়ে যে সাধক পুরুষে রূপান্তরিত হইয়াছেন, তাহার বর্ণনায় 'জীবনবেদ' অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

কেশবচন্দ্র তাঁহার ধর্মনিষ্ঠ কর্মবহুল জীবনের নানাক্ষেত্রে বিবিধ প্রসঙ্গে অসংখ্য পত্রও লিখিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন পত্র জগতের ধর্মোন্নতির মহান্ আদর্শ পরিকল্পনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত কেশবচন্দ্রের পত্রসমূহ প্রবন্ধ-লক্ষণাক্রান্ত ও পত্রগৌরবে শ্রেষ্ঠ। ভাষার সৌষ্ঠব, ভাবের গাম্ভীর্য ও আদর্শের সার্বভৌমিকতা কেশবচন্দ্রের এই পত্রসমূহকে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যিক মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছে।

পূর্ণচন্দ্র বসু—পূর্ণচন্দ্র বঙ্কিম-পর্বের অন্যতম কৃতী প্রবন্ধকার। ভারতীয় হিন্দুসমাজ, ধর্ম ও দর্শন প্রসঙ্গে তিনি বিবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধসমূহ যুক্তিবহুল এবং অপেক্ষাকৃত শাস্ত্রালোচনায় পরিপূর্ণ। ভারতীয় বিবিধ ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণাদিতে পূর্ণচন্দ্র গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং ফলে, প্রাচ্যদেশীয় সমাজ-পদ্ধতি ও ধর্ম-সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ-প্রকৃতি তাঁহার নিকট সম্যক্‌ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। পূর্ণচন্দ্র ইউরোপীয় সমাজধর্ম ও সভ্যতার সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার হিন্দুসমাজ ও ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের অধিকাংশই পাশ্চাত্ত্য ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই লিখিত হইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধের মধ্য দিয়া তিনি নানাভাবে মানুষের বাস্তবজীবনে ভারতীয় হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন বা প্রতিষ্ঠা করিতেই প্রয়াসী হইয়াছেন। পূর্ণচন্দ্র বর্ণভেদ, জাতিভেদ, কৌলীন্য-প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা প্রসঙ্গেও আলোচনা করিয়াছেন। বিতর্কমূলক সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে তাঁহার অভিমত বা সিদ্ধান্ত সনাতনধর্মী হইলেও তাহা সুগ্রথিত যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত। যুক্তি-তর্ক ও শাস্ত্রীয় তথ্য সমাবেশের ফলে মূল্যবান্ হইলেও পূর্ণচন্দ্রের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারমূলক প্রবন্ধগুলি যে অপেক্ষাকৃত নীরস হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমাজ ও ধর্ম সংক্রান্ত প্রবন্ধ ব্যতীত পূর্ণচন্দ্র সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে গভীর রসবোধ, ভূয়োদর্শিতা ও নিজস্ব

বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ণচন্দ্র তদানীন্তন কালে একজন সুদক্ষ সাহিত্য-সমালোচক হিসাবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

পূর্ণচন্দ্র প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'কাব্যসুন্দরী' (১৮৮০), ২। 'সমাজচিন্তা' (১৮৮২), ৩। 'সাহিত্যচিন্তা' (১৮৯৬), ৪। 'কাব্যচিন্তা' (১৯০০), ৫। 'সমাজ-তত্ত্ব' (১৯০২), ৬। 'হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ' (১৯০৩), ৭। 'সৃষ্টিবিজ্ঞান' (১৯০৪), ৮। 'ফলশ্রুতি' (১৯০৫) ও ৯। 'দেবসুন্দরী' (?)। পূর্ণচন্দ্রের প্রতিটি গ্রন্থই বিষয়গৌরবে ও তাঁহার নিজস্ব রচনাকৌশলে সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

পূর্ণচন্দ্র সাহিত্য-সমালোচনা ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য সমালোচন-রীতি অনুসরণ করিলেও তাহা দ্বারা তাঁহার স্বাধীন রসবোধ ও স্বকীয় বিচার-বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য কোথাও ম্লান হয় নাই। ইউরোপীয় সাহিত্য-সমালোচনার বিচার-পদ্ধতিকে একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করিয়া তিনি কখনও প্রাচ্য-সাহিত্যের আলোচনায় নিয়োজিত হন নাই। প্রাচ্যদেশীয় পৌরাণিক সাহিত্যের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ণচন্দ্রের এক স্বতন্ত্র মনোভাব ছিল এবং ভারতীয় সংস্কৃতি বা প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য হইতে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হইয়াছিলেন, প্রধানতঃ তাহা দ্বারাই তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনা-কর্ম সম্পন্ন হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক মহাকাব্যের সৌন্দর্য, গূঢ় রসব্যঞ্জনা ও তাৎপর্যাদি পূর্ণচন্দ্র তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে সুনিপুণ বিশ্লেষণ-শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমালোচনার একটি বিশেষ ত্রুটিও লক্ষণীয়। পূর্ণচন্দ্র তাঁহার রসগ্রাহী বিশুদ্ধ সাহিত্যিক আলোচনার মধ্যেও হিন্দুর আদর্শ ও ধর্ম-সাধননিষ্ঠার অনুসন্ধান করিয়া তাহার পরিচয় প্রকাশে প্রয়াসী হইয়াছেন এবং কোন কোন প্রবন্ধে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সহিত প্রাচ্য কাব্যগ্রন্থাদির তুলনা করিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা ও একদেশদর্শিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুধর্ম প্রভাবিত ভারতীয় সাহিত্যের সমর্থনকল্পে পূর্ণচন্দ্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রতি অবিচার করিয়াছেন এবং তাঁহার সমালোচনার সর্বত্র নিরপেক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গির ঔদার্য প্রকাশ পায় নাই। মুখ্যতঃ পূর্ণচন্দ্রের 'সাহিত্যচিন্তা'র প্রবন্ধগুলি হইতে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

পূর্ণচন্দ্রের আলোচনায় পক্ষপাতসুলভ ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেও তিনি যে একজন প্রকৃতই রসজ্ঞ সমালোচক ছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণে সহজ অনুকরণবৃত্তি ত্যাগ করিয়া তিনি নিজস্ব ভঙ্গি প্রবর্তন করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের কবিদৃষ্টির সহিত কবি কালিদাসের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া পূর্ণচন্দ্র অতি নৈপুণ্যসহকারে ভারতচন্দ্রের কবিত্বের অন্তর্নিহিত মৌল সত্যের দ্যোতনা ও তাহার যথার্থ পরিচয় উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তাঁহার এই সমালোচনা প্রখর রসদৃষ্টি, কলাসৌন্দর্যবোধ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তির নিদর্শন। পূর্ণচন্দ্রের 'কাব্যসুন্দরী' ও 'কাব্যচিন্তা'র প্রবন্ধগুলি হইতেই তাঁহার যথার্থ রসজ্ঞ মনের পরিচয় লাভ করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার 'কাব্য—ভারতচন্দ্রে' প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল—

'কালিদাস, শকুন্তলার স্বাভাবিক নিরলঙ্কৃত সৌন্দর্য্য যেমন বর্ণন করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তেমন পারিতেন না। যে তাপস-কন্যা শকুন্তলা জন্মাবধি বনবাসিনী এবং যিনি সংসারাশ্রমের সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞা, সেই শকুন্তলার হৃদয়-সারল্য, * * * কালিদাস যেমন সুকুমার তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তেমন পারিতেন না। ভারতচন্দ্র যদি শকুন্তলার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন, যেখানে শকুন্তলা দুষ্মন্তের সহিত মিলিত হইয়াছেন, যখন শকুন্তলা রাজপ্রকৃতি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছেন, যখন শকুন্তলা রাজমহিষী-বেশে, রাজপ্রাসাদে অবস্থিত হইয়া ঐশ্বর্য্যের উন্মত্ততায় অরণ্যাশ্রম বিস্মৃত হইয়াছেন, * * * ভারতচন্দ্র মানবপ্রকৃতির এক বিশেষ ভাব চিত্রিত করিতে পারিতেন। তিনি মানবপ্রকৃতির অনিত্য ভাব ও বিশেষ ধর্ম্ম সকল উত্তমরূপে প্রদর্শন করিতে পারিতেন।'[১]

পূর্ণচন্দ্রের প্রবন্ধের ভাষা সরল ও সহজবোধ্য। দুরূহ শব্দ ও বাক্য যোজনা অথবা কৃত্রিম অলংকার দ্বারা তাঁহার ভাষা কোথাও আড়ষ্ট বা মন্থরগতি হয় নাই।

চন্দ্রনাথ বসু—সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের নায়কত্বে ও প্রবর্তনায় যে সকল চিন্তাশীল প্রবন্ধ-লেখকের অভ্যুদয় হইয়াছিল, চন্দ্রনাথ বসু তাঁহাদের অন্যতম। সমকালীন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশ বাঙ্গালীর ন্যায় তিনিও ইংরাজী রচনা দ্বারা তাঁহার সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত করেন। পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় চন্দ্রনাথ বাংলা প্রবন্ধ রচনায়

১ 'কাব্যচিন্তা' (কলিকাতা, ১৩০৭), পৃঃ ১৪৬-৪৭

নিয়োজিত হইয়াছেন। তাঁহার সর্ববিধ রচনার মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের সুস্পষ্ট প্রভাব অনুভূত হয়। চন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধই 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার', 'নবজীবন', 'সাহিত্য' প্রভৃতি তৎকালীন বিশিষ্ট সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

চন্দ্রনাথ বিচিত্র প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। প্রধানতঃ তাঁহার সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক। সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শের ক্ষেত্রে চন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল ছিলেন। হিন্দুধর্ম ও সমাজ প্রসঙ্গে লিখিত প্রবন্ধসমূহ হইতে তাঁহার অহেতুক হিন্দু প্রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু চন্দ্রনাথের এই জাতীয় হিন্দুধর্ম ও সমাজপ্রীতি বা অনুরাগের পশ্চাতে কোন সুদৃঢ় যুক্তিনিষ্ঠা ছিল না। সামাজিক কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ভূদেবকে অনুসরণ করিলেও, ভূদেবের ন্যায় মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাশীলতা তাঁহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। চন্দ্রনাথের সাহিত্য তত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থসমূহের মধ্যে 'শকুন্তলাতত্ত্ব' উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের মধ্যে সংস্কৃত নাট্যকাব্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলমে'র বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যে সমালোচকরূপেই সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কালিদাসের কাব্য প্রসঙ্গে এই জাতীয় অভিনব দার্শনিক আলোচনা ইতিপূর্বে লিখিত হয় নাই। চন্দ্রনাথের অধিকাংশ সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধই তাঁহার দার্শনিক তত্ত্ব-দৃষ্টির আলোকে বিচারিত হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহার এই সকল প্রবন্ধ তথ্য ও তত্ত্বে যেমন ভারাক্রান্ত হইয়াছে, তদনুযায়ী সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ হয় নাই।

চন্দ্রনাথ প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'শকুন্তলাতত্ত্ব' (১৮৮১), ২। 'ফুল ও ফল' (১৮৮৫), ৩। 'হিন্দু বিবাহ' (১৮৮৭), ৪। 'ত্রিধারা' (১৮৯১), ৫। 'হিন্দুত্ব' (১৮৯২), ৬। 'কঃ পন্থা' (১৮৯৮), ৭। 'বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি' (১৮৯৯), ৮। 'সাবিত্রীতত্ত্ব' (১৯০০), ৯। 'সংযম শিক্ষা বা নিম্নতম সোপান' (১৯০৪) ও ১০। 'পৃথিবীর সুখ দুঃখ' (১৯০৯)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, চন্দ্রনাথের 'ত্রিধারা' গ্রন্থের অন্তর্গত সকল রচনাই যথার্থ প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত নহে, ইহার অধিকাংশই 'রস-রচনা'র অন্তর্গত। 'ফুল ও ফল' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি রূপকধর্মী—ইহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় লেখকের বর্ণনাবাহুল্যে ও অতিভাষণ দোষে দুষ্ট হইয়াছে।

চন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ভাষা প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণসম্পন্ন। সংস্কৃত বাক্য-বিন্যাসের আড়ম্বর ও সমাসবাহুল্যে তাঁহার ভাষা দুরূহ বা জটিল হয় নাই।

চন্দ্রনাথের সহজ গতিশীল রচনারীতির মধ্যে বঙ্কিমী রীতির প্রভাব অনুভূত হইলেও তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও সুমুদ্রিত হইয়াছে। চন্দ্রনাথ সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা ও যথার্থ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দান করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য বিশ্লেষণধর্মী সমালোচনার প্রতি তাঁহার অনুরাগ বা পক্ষপাতিত্ব থাকিলেও ভারতীয় রসতত্ত্বও চন্দ্রনাথের নিকট উপেক্ষিত হয় নাই। তাঁহার প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় সমালোচন-রীতি বা আদর্শেরই অঙ্গীকরণ ঘটিয়াছে।

চন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ দার্শনিক যুক্তিবাদী বিশ্লেষণধর্মী মনের অধিকারী ছিলেন। সূক্ষ্ম দর্শন ও নৈয়ায়িক বিচারনিষ্ঠ মানসিকতার পরিচয়ে বিশেষতঃ তাঁহার সাহিত্য-মূলক প্রবন্ধসমূহ চিহ্নিত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাসের অমর সৃষ্টি 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলমে'র সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাখ্যা-বিচারে চন্দ্রনাথ যে মৌলিক চিন্তা, স্বাধীন দার্শনিক দৃষ্টি ও মননশীলতার পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা দ্বারা বঙ্কিম-পর্বের বাংলা সাহিত্যে অবশ্যই তিনি বিশিষ্ট আসন লাভের যোগ্য। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' যে কাব্যাকারে ভারতীয় 'সাংখ্যদর্শনে'র প্রতিরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই চন্দ্রনাথ অনুসন্ধানী দৃষ্টি ও বিচার-বুদ্ধির সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। চন্দ্রনাথ নায়িকা শকুন্তলা ও নায়ক রাজা দুষ্মন্ত চরিত্রের মধ্যে 'সাংখ্যদর্শনে'র প্রকৃতি ও পুরুষ-তত্ত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় নিয়োজিত হইয়াছেন এবং কালিদাসের কাব্যের অন্তর্নিহিত দার্শনিক সত্য আবিষ্কার করিয়া অভিনবভাবে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বক্তব্য বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে সূক্ষ্মদর্শিতা ও গভীর মনস্বিতা প্রকাশ পাইলেও চন্দ্রনাথের সমগ্র প্রবন্ধ যথাযথ সাহিত্যগুণে ভূষিত হইতে পারে নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'অভিজ্ঞানশকুন্তলমে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিত তাঁহার প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'মহাকবি দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার চরিত্র যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা পুরুষ এবং প্রকৃতির প্রতিকৃতি। পুরুষের অর্থ—জগতের সূক্ষ্ম অনপলাপ্য অপরিবর্ত্তনীয় উপাদান; প্রকৃতির অর্থ—জগতের স্থূল, অনপলাপ্য পরিবর্ত্তনশীল উপাদান। * * * দুষ্মন্ত জ্ঞানপ্রধান এবং তাঁহার মনের এমন একটি ভাব আছে যে, তিনি নানাবিধ অবস্থায় পড়িয়াও সেই ভাবটি রক্ষা করেন। তিনি যখনি কোন মোহে অভিভূত হইতেছেন, তখনি তিনি সেই মোহ কাটাইয়া তাঁহার পৌরুষভাব ধারণ

করিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিলেই বোধ হয় যেন তাঁহাতে এমন একটি ভাব আছে যাহা অপরিবর্ত্তনীয় এবং অনপলাপ্য। কিন্তু শকুন্তলাতে আমরা সেরকম কোন ভাব দেখিতে পাই না।'[১]

'পৃথিবীর সুখ দুঃখ' নামক রচনাটি চন্দ্রনাথের আত্মচরিতাশ্রিত প্রবন্ধ পুস্তিকা হিসাবে প্রচারিত হইয়াছে। আত্মকথা অতি সামান্য বর্ণিত হইলেও পূর্ণাঙ্গ আত্মচরিত গ্রন্থের পর্যায়ে ইহা উন্নীত হয় নাই। বরং আত্মকথা অপেক্ষা পরলোক সম্পর্কিত দার্শনিক তত্ত্বের প্রসঙ্গই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অন্যতমা জ্যেষ্ঠা সহোদরা স্বর্ণকুমারী বাংলা সাহিত্যের একজন স্বনামধন্যা লেখিকা। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগই তাঁহার বিবিধ রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ কাব্যগ্রন্থ ও উপন্যাসের সংখ্যাই স্বর্ণকুমারীর সর্বাধিক এবং বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম প্রকৃত মহিলা ঔপন্যাসিকের গৌরব তাঁহারই প্রাপ্য। স্বর্ণকুমারী দীর্ঘকালব্যাপী প্রথম শ্রেণীর বাংলা মাসিক পত্রিকা 'ভারতী'র সম্পাদনা-কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়া তাঁহার সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে এক গৌরবময় কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং বাংলা সাময়িক পত্র জগতেও এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী হইয়াছেন। স্বর্ণকুমারী বাঙ্গালী মহিলাদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় গবেষণাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াও খ্যাতি অর্জন করেন।

স্বর্ণকুমারী বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভ্রমণ ও আত্মকথা প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রায় অধিকাংশ প্রবন্ধই 'ভারতী' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বর্ণকুমারীর বিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'পৃথিবী' ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আটটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এই বিজ্ঞান-পুস্তকটিতে পৃথিবীর উৎপত্তি, গতি-প্রকৃতি, ভূগর্ভ, ভূপঞ্জর প্রভৃতি পৃথিবী সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় তথ্য-প্রমাণসহ মনোরম ভঙ্গিতে আলোচিত হইয়াছে। জ্যোতিষ ও ভূ-বিদ্যা সংক্রান্ত প্রাচীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিবৃত্ত সংগ্রহে লেখিকার উদ্যম ও অধ্যয়ননিষ্ঠ মনের পরিচয় লাভ করা যায়। প্রাচ্যদেশীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি অর্থাৎ বেদে উল্লেখিত সময় হইতে ভারতবর্ষের বিজ্ঞানানুশীলনের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিলেও স্বর্ণকুমারী তাঁহার রচনায় পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানকেই অধিক প্রাধান্য

১ 'শকুন্তলাতত্ত্ব', (কলিকাতা, ১৮৮১), পৃঃ ১০০-১০১

দিয়াছেন। তিনি প্রধানতঃ নর্মান লকিয়ার, গড্‌ফ্রে, নিউকাম ব্যালফোর ষ্টুয়াট, ফিগুয়ে প্রভৃতি শ্রুতকীর্তি পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণের গ্রন্থসমূহ তাঁহার বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বসমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি বহু সংস্কৃত শব্দ নির্বাচন করিয়া বাংলায় তাহা সার্থকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

স্বর্ণকুমারীর প্রবন্ধের ভাষা সরল ও সহজবোধ্য। নীরস বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গও তাঁহার বর্ণনাশৈলীগুণে সরস ও মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ করিয়াও তিনি তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক পরিমণ্ডল রচনা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। স্বর্ণকুমারীর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের কোন কোন অংশ সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ ও পাঠোপভোগ্য হইয়াছে। তাঁহার এই জাতীয় প্রবন্ধে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার প্রভাব সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বর্ণকুমারীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল—

'পৃথিবী এবং অপর কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ লইয়া একটি পরিবার—সূর্য্য এই পরিবারের কর্ত্তা। এইরূপ কত লক্ষ লক্ষ জ্যোতিষ্ক-পরিবারের কর্ত্তা কত লক্ষ লক্ষ সূর্য্য ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান তাহার সংখ্যা নাই। * * * আকাশের কটি-বন্ধস্বরূপ ব্রহ্ম-কটাহের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তব্যাপী মৃদু জ্যোতিঃশালী যে সঙ্কীর্ণ আলোক-পথ আমরা দেখিতে পাই, যাহাকে আমরা ছায়াপথ বলি, সেই ছায়াপথ অতলস্পর্শ অসীম-গভীর একটি তারকাসমুদ্র।'[১]

বীরেশ্বর পাঁড়ে—বঙ্কিম সমকালীন বিশিষ্ট প্রবন্ধকার হিসাবে বীরেশ্বর পাঁড়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বিবিধ সারগর্ভ প্রবন্ধগ্রন্থের রচয়িতা। 'জ্ঞানাঙ্কুর', 'আর্য্যদর্শন' প্রভৃতি তৎকালীন বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকাসমূহের নিয়মিত লেখক ও সমালোচকরূপেও বীরেশ্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বীরেশ্বর এককালীন বিভিন্ন প্রকারের তিনটি সাময়িক পত্রিকা 'সহচরী', 'জাহ্নবী' ও 'বিজ্ঞান-দর্পণে'র সম্পাদনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনটি ভিন্ন শ্রেণীর পত্রিকা অর্থাৎ 'সহচরী' মুখ্যতঃ কথা-সাহিত্য সম্পর্কিত, 'জাহ্নবী' প্রধানতঃ ধর্ম-দর্শনমূলক এবং

১ 'পৃথিবী', (কলিকাতা, ১২৮৯), পৃঃ ২-৩

'বিজ্ঞান-দর্পণ' কেবলমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা-সম্ভার লইয়া প্রকাশিত হইত।

বীরেশ্বর প্রধানতঃ ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য-সমালোচনা প্রসঙ্গেই অধিকাংশ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমে : ১। 'মানবতত্ত্ব' (১৮৮৩), ২। 'ধর্ম্মবিজ্ঞান' (১৮৯০), ৩। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' (১৮৯৭) ও ৪। 'ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্ব ও কর্ত্তব্যবিচার' (১৯০৫)। এতদ্ব্যতীত বীরেশ্বরের অন্যান্য প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং এই সকল প্রবন্ধ অদ্যাপি সংকলিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

বীরেশ্বর নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্বধর্মে তাঁহার সুদৃঢ় আস্থা ও গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল এবং হিন্দু শাস্ত্রানুগত সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপের প্রতি তিনি প্রবল অনুরাগ পোষণ করিতেন। বীরেশ্বরের প্রায় সর্ববিধ প্রবন্ধের মধ্য দিয়া এক নিষ্ঠাব্রতী, সদাচারী হিন্দুরূপের বিকাশ ঘটিয়াছে। ইহা অনস্বীকার্য যে, তাঁহার চিন্তাধারা, আচরণ ও মনোভাবে পূর্বসূরী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব বহুল পরিমাণে ছায়াপাত করিয়াছে। পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের তুলনায় হিন্দুধর্ম যে নিকৃষ্ট নহে, বরং অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম, তাহা বীরেশ্বর তীক্ষ্ণ যুক্তিসহকারে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। এ'কথা সত্য যে, হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বীরেশ্বরের রচনায় অতিশয়োক্তি বা কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব থাকিলেও তাঁহার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা-নৈপুণ্যে তাহা সহজ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বীরেশ্বর তাঁহার প্রবন্ধের একাংশে লিখিয়াছেন—

'হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ যুক্তি ও বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কোন কথাই নাই। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে সকল কথাই দর্শনশাস্ত্রকারেরা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। * * * হিন্দুধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন ও শিব সংহার করেন। যিনি জন্ম দেন, তিনিই সংহার করেন, একথা জনসাধারণের হৃদ্গত হয় না, এবং এরূপ ঈশ্বরের নিকট কামনা সম্ভবে না, তাই ঈশ্বর ত্রিমূর্ত্তি—তাই তেত্রিশ কোটি দেবতা। এইরূপে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের সৃষ্টি প্রকরণ, ব্রহ্মতত্ত্ব, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য ও মুক্তি-তত্ত্ব প্রভৃতি সকল কথাই যুক্তি ও বিজ্ঞান-সম্মত।'[১]

১ 'ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্ব ও কর্ত্তব্যবিচার', (কলিকাতা, ১৯০৫), পৃঃ ১৮০-৮১

বীরেশ্বরের প্রবন্ধে যেমন গভীর আত্মদৃষ্টি ও সুনিপুণ বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় রহিয়াছে, তেমনি তাঁহার চিন্তার পশ্চাতে বিস্তৃত শাস্ত্রজ্ঞান ও ভূয়োদর্শনের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। তাঁহার প্রবন্ধ গূঢ় বক্তব্যবহুল হইলেও ভাষার সারল্য ও স্বচ্ছতায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বীরেশ্বরের পরিমিতিবোধসূচক সংযত-গম্ভীর রচনারীতি ভাব বা বিষয়ের গৌরব অনুসারে সঙ্গত ও সার্থক হইয়াছে।

ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, বীরেশ্বর প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। ধর্মগত রক্ষণশীলতা তাঁহার সর্ববিধ রচনাকেই বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে এবং ফলে, বীরেশ্বরের রচনায় বিশুদ্ধ সাহিত্যগত ঔদার্যগুণ বা শিল্পিসুলভ নিরপেক্ষতা সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় নাই। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাঁহার হিন্দুধর্মাদর্শ প্রণোদিত মনোভাবের কোনরূপ শৈথিল্য প্রকাশ পায় নাই এবং তাহা তাঁহার সংকীর্ণ, একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক। হিন্দুধর্ম ও সমাজ অনুমোদিত আদর্শের মর্যাদা যে সকল রচনায় ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, বীরেশ্বর তাহারই তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং তাহা দ্বারা তাঁহার সমালোচনা বহুল ক্ষেত্রেই শাশ্বত সাহিত্য-শিল্পের মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' এই কাব্যত্রয়ের সমালোচনায় বীরেশ্বরের উদার সাহিত্যদৃষ্টি অপেক্ষা হিন্দুধর্মীয় রক্ষণশীল মনোভাবেরই অধিক প্রাধান্য ঘটিয়াছে। বীরেশ্বরের মতে, কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যগ্রন্থত্রয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের যথোচিত মর্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই। নবীনচন্দ্রের কল্পনার স্বেচ্ছাচারিতা ও পুরাণ বিরোধী ভাব-চিন্তার প্রতি তিনি তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন। বীরেশ্বরের সাহিত্যালোচনা বিশুদ্ধ শিল্পসম্মত সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই, পরন্তু হিন্দুধর্মাদর্শের জয়গান করিতে গিয়া তাহা স্বভাবতই প্রচারধর্মী হইয়া উঠিয়াছে এবং ফলে, তাঁহার সমালোচনা-ধর্ম বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বীরেশ্বরের প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'কাব্যাংশেও এই কাব্যত্রয় কিছুই নয়। কেননা ঘটনা সকলের ও চরিত্র সকলের মধ্যে কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই, এবং কোন রসই পরিস্ফুট হয় নাই। * * * কবি শান্তি রসের আবির্ভাবের চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধ্বংসনীতি ও বিবর্ত্তনবাদের সহিত জড়িত হইয়া শান্তি অশান্তিতেই পরিণত হইয়াছে।

ভক্তিরস ও দাম্পত্য প্রেম অপাত্রে ন্যস্ত হওয়ায়, তাহা হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে নাই। বীভৎস রসের যে অবতারণা করিয়াছেন, তাহা হিন্দুধর্মের বিরোধী ভিন্ন আর কাহারই হৃদয়ে আনন্দ দিতে পারে না।'[১]

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—অক্ষয়কুমার বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য ঐতিহাসিক। অধিকন্তু তিনি কবি ও সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন। অক্ষয় কুমারের মন ও প্রাণ প্রধানতঃ বাংলার ইতিহাস-অনুসন্ধানের মধ্যেই নিয়োজিত হইয়াছিল। পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার তাঁহার শ্রম ও সাধনার বিস্ময়কর স্বাক্ষর চিহ্নিত করিয়াছেন।

অক্ষয়কুমার বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইতিহাস-আলোচনার অন্যতম পথিকৃৎ। ঐতিহাসিক সত্যকে কিছুমাত্র বিকৃত না করিয়া বাংলার ইতিবৃত্ত রচনার সার্থক প্রয়াস তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের প্রকৃত ঐতিহাসিক রূপ-চিত্র প্রকাশ করিতে অক্ষয়কুমার গভীর নিষ্ঠা ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পরিচয় দান করিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাস সম্পর্কিত রচনা তথাকথিত সাধারণ ঐতিহাসিকের ন্যায় বিবৃতিসর্বস্ব ছিল না। অক্ষয়কুমারের রচনা-পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, ঐতিহাসিক বিষয় বা চরিত্রের সম্যক্ বিচার-বিশ্লেষণে তিনি প্রথমতঃ বাস্তব ঘটনাগুলি নির্বাচন বা নির্ধারণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার স্বকীয় সত্যসন্ধানী ঐতিহাসিক বোধের দ্বারা ঘটনাসমূহের গুরুত্ব নির্ণয় করিয়াছেন এবং পরিশেষে, বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ও নিজস্ব বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তায় ঘটনার ঐতিহাসিক সততা নিষ্পন্ন করিয়াছেন ঐতিহাসিক বিষয় নির্বাচন এবং পরিপাটিভাবে তাহার বিন্যাসের মধ্য দিয়া অক্ষয়কুমারের সাহিত্যিক রুচি ও পরিচ্ছন্নতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধসমূহ হইতেই প্রমাণিত হয় যে, অক্ষয়কুমার কেবলমাত্র ইতিহাসের নীরস গবেষক নহেন, তিনি একজন সাহিত্যশিল্পীও ছিলেন।

অক্ষয়কুমার সাময়িক পত্র পরিচালন-কর্মেও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামক ত্রৈমাসিক পত্রের মাধ্যমে তিনি দেশ ও জাতির সর্বতোমুখী আত্মপ্রকাশের পথ প্রশস্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক প্রবন্ধসমূহ হইতে অক্ষয়কুমারের এইরূপ দুরূহ ব্রতাচরণের সম্যক্

১ 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত', (কলিকাতা, ১৮৯৭), পৃঃ ২২১

পরিচয় লাভ করা সম্ভব হয়। অক্ষয়কুমার মুখ্যতঃ তাঁহার পত্রিকার সহায়তায় বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ সম্পর্কে গবেষণালব্ধ বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্য, বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থসমূহের সমালোচনা ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক অভিনব আলোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক পত্রিকা সম্পাদনায় তাঁহার অসাধারণ সাফল্য সুধীসমাজে ইহার স্বীকৃতি ও জনপ্রিয়তা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। সার্থক সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস আলোচনার ন্যায় দুরূহ কর্মের প্রতি অক্ষয়কুমারের গভীর প্রীতিবোধ ও নিষ্ঠা ছিল। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ অক্ষয়কুমার উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী ও বাংলাদেশকে সমুন্নত করিতে হইলে দেশ ও জাতির গৌরবময় ঐতিহ্য প্রচার করিতে হইবে। সেইজন্য দেশের জনসাধারণের মধ্যে ঐতিহাসিক চেতনা ও স্বাদেশিকতাবোধ জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বিবিধ প্রমাণনির্ভর ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের ইতিহাস সাধনার পশ্চাতে এক মহান্ আদর্শের প্রেরণা ছিল বলিয়াই উপন্যাস রচনার সুলভ খ্যাতি ত্যাগ করিয়া তিনি ঐতিহাসিক গবেষণার খ্যাতি-চিহ্নহীন পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং বাংলার তরুণ সমাজকে এই পথে আহ্বান করিয়া অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন—

'উপন্যাস লেখা সহজ কথা,—একটু ভিত্তি পাইলেই হইল; তারপর ঘরে বসিয়া তামাকের ধূমরেখা অবলম্বন করিয়া অবশিষ্ট অংশ গড়িয়া তুলিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু ইতিহাস লেখা সেরূপ সহজসাধ্য নহে। সময়, অর্থ, শ্রম,—উৎসাহ, অনুরাগ, অধ্যবসায়, সকলগুলিই হয়ত নষ্ট হইতে পারে। নষ্ট হয় হউক, কিন্তু তথাপি স্বদেশের সাহিত্যসেবকদিগকে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অনুরোধ করি, তোমরা কেহ স্বদেশের বিলুপ্ত কাহিনী উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া দেখ। ইহাতে অর্থাগম হইবে না। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের তালিকা বৃদ্ধি হইবে না; কিন্তু কেহ যদি যত্ন চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালীর ললাট কলঙ্ক দূর করিতে পার, আমরা দশজনে মিলিয়া তাঁহার ললাটে জয়মাল্য বাঁধিয়া দিব।'[১]

অক্ষয়কুমারের ঐতিহাসিক চরিতাশ্রিত প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রসঙ্গেও তিনি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধের মধ্যে 'সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বিশেষত্ব', 'কাব্য-

১ 'সীতারাম রায়', (কলিকাতা, ১৩০৫), পৃঃ ৮

সমালোচনা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অক্ষয়কুমারের বহুবিধ প্রবন্ধই 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী', 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', 'সাহিত্য' প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার এই সকল প্রবন্ধ অদ্যাপি সংকলিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ করে নাই। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধসমূহ যথাক্রমে: ১। 'সমরসিংহ' (১৮৮৩), ২। 'সিরাজদ্দৌলা' (১৮৯৮), ৩। 'সীতারাম রায়' (১৮৯৮), ৪। 'মীরকাশিম' (১৯০৬), ৫। 'ফিরিঙ্গি বণিক' (১৯২২) ও ৬। 'অজ্ঞেয়বাদ' (১৯২৮)। এই গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'অজ্ঞেয়বাদ' ব্যতীত অন্যান্য সকল রচনাই বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তিচরিত্র আশ্রয় করিয়া লিখিত হইয়াছে। অক্ষয়কুমারের 'অজ্ঞেয়বাদ' গ্রন্থটি বিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার প্রচারিত মতবাদের ভিত্তিতে এক সরল আলোচনা। ইহাতে অজ্ঞেয়-তত্ত্ববিদ্যা (Agnosticism) অর্থাৎ 'মূলীভূত সত্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া না লইলে, এই পরিবর্ত্তনময় জগতের কোন দৃশ্যই মানবজ্ঞান বুঝিতে পারে না'—এই মতবাদই সমুচিত যুক্তি-ব্যাখ্যাসহকারে বিবৃত হইয়াছে। বিতর্কবহুল দুরূহ প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমারের স্বাধীন চিন্তাগর্ভ সমালোচনা হইতে তাঁহার সূক্ষ্ম দার্শনিক মনেরও পরিচয় লাভ করা যায়।

অক্ষয়কুমার বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবন-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া দেশ ও জাতির রূপ-চিত্র অতি সার্থক ও নৈপুণ্যসহকারে অঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহার এই অভিনব আলোচনা-পদ্ধতি বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। অক্ষয়কুমারের লিখনভঙ্গি যেমন সরস তেমনি ভাষাও কবিত্বসুলভ। গবেষণানির্ভর প্রবন্ধেও তাঁহার ভাষা কোথাও দুর্বোধ্য বা নীরস হয় নাই। অক্ষয়কুমারের ঐতিহাসিক প্রবন্ধের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে, এই প্রকার মনন ও চিন্তান্বিত রচনা মধ্যেও লেখকের সুস্থ ঔদার্য (open mind) ও ব্যক্তিত্বের অন্তরঙ্গ স্পর্শজনিত আবেগ-স্পন্দন অনুভব করা যায়। সুমিত ও সংযত রচনারীতির দ্বারা অক্ষয়কুমারের সকল প্রবন্ধই সমুজ্জ্বল হইয়াছে। প্রবন্ধগত বক্তব্য বিষয়ের যথাযথ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতে অক্ষয়কুমার বহু বিরোধী মন্তব্য ও অপ্রিয় সত্য-সমালোচনার আশ্রয় লইয়াছেন এবং বিদেশী ঐতিহাসিকগণ প্রচারিত ও প্রচলিত মিথ্যাচার সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার প্রবন্ধের কোথাও অশোভন অসংযম বা অসৌজন্য প্রকাশ পায় নাই।

ঐতিহাসিক বিশিষ্ট কয়েকজন রাজনীতিজ্ঞের জীবন-চরিত অবলম্বনে লিখিত অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধগ্রন্থসমূহের মধ্যে 'সিরাজদ্দৌলা' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও প্রামাণ্য রচনা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ সিরাজদ্দৌলাকে নরশোণিত-লোলুপ, নৃশংস নরপতিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ও তাঁহাদের রচনায় সিরাজের চারিত্রিক বহুবিধ ত্রুটির কথাই কেবলমাত্র উল্লেখিত হইয়াছে। অক্ষয়কুমারই সর্বপ্রথম বাঙ্গালী ঐতিহাসিক, যিনি সিরাজের ব্যক্তি-জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও রাজনৈতিক বিবিধ কার্যকলাপের ভিত্তিতে তাঁহার চরিত্রগত গুণাগুণ পর্যালোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, অক্ষয়কুমার বহুসংখ্যক পুরাতন রাজকীয় নথিপত্রের সাহায্যে সিরাজদ্দৌলার উপর আরোপিত কলঙ্ক ও কুকীর্তিকে ভিত্তিহীন বা অসার প্রতিপন্ন করিয়াছেন। হল্‌ওয়েল সাহেবের প্রচারিত অন্ধকূপহত্যা যে একটি কাল্পনিক ও অমূলক কাহিনী মাত্র, তাহাও অক্ষয়কুমারের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। অক্ষয়কুমারের তীক্ষ্ণশাণিত যুক্তিজ্ঞান ও সূক্ষ্ম ইতিহাস-দৃষ্টির নিদর্শন স্বরূপ 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'অন্ধকূপহত্যা কাহিনী কবে কাহার কৃপায় জনসমাজে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল,—সে ইতিহাসও সবিশেষ রহস্য-পরিপূর্ণ। হল্‌ওয়েল সাহেব তাঁহার প্রথম প্রচারক। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হল্‌ওয়েল তাঁহার প্রিয়বন্ধু উইলিয়ম ডেভিস্‌কে যে পত্র লিখেন, তাহাতেই অন্ধকূপহত্যার প্রথম ও শেষ পরিচয়। হল্‌ওয়েল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'সাইরেণ' নামক পোতারোহণে বিলাত যাত্রাকালে অনন্যকর্মা হইয়া এই বিষাদ কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহা যে জনসমাজে পরিচিত হইয়াছিল, সেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পলাশির যুদ্ধাবসানে ভারতপ্রবাসী ইংরাজ-বণিকের অপকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া ইংলণ্ডের নরনারী যখন তুমুল কোলাহল উপস্থিত করিল, সেই সময়ে (তৎপূর্ব্বে নহে!) এই পত্রখানি জনসাধারণের নিকট প্রথম প্রকাশিত হইল। ইংলণ্ডের নরনারী নরপিশাচ সিরাজদ্দৌলার নামে শিহরিয়া উঠিল;—ইংরাজের কুকীর্ত্তির কথা কোথায় বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া গেল;—সিরাজদ্দৌলার সভ্যজগৎ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।'[১]

১ 'সিরাজদ্দৌলা', (কলিকাতা, ১৩০৫), পৃঃ ২০৭-২০৮

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়— চন্দ্রশেখর রাজসাহী হইতে প্রকাশিত 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামক মাসিক পত্রে একটি মাত্র প্রবন্ধ রচনা করিয়াই সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধ ও উৎসাহে তিনি 'বঙ্গদর্শনে' নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধ ব্যতীত সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগও তাঁহার বিবিধ সাহিত্যকর্ম দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। বঙ্কিম-সমকালীন অন্যতম সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক হিসাবে নিঃসন্দেহে চন্দ্রশেখরের নাম উল্লেখযোগ্য। সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকরূপেও তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হয়। 'মাসিক সমালোচক' ও 'উপাসনা' নামক এই দুইটি মাসিক পত্র চন্দ্রশেখরের সুষ্ঠু পরিচালনায় তৎকালীন সাময়িক পত্র জগতে বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিল।

চন্দ্রশেখর একজন সুপণ্ডিত ও সুরসিক সমালোচক ছিলেন। বিভিন্ন ভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং বিশেষতঃ সংস্কৃত, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'অদৃষ্টবাদ', 'বিবাহের উৎপত্তি' প্রভৃতি চন্দ্রশেখরের বিচিত্র বিষয়ক জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রবন্ধ বৈদেশিক বিভিন্ন মনীষীর ভাবধারার আলোকে লিখিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধে রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ব সম্পর্কেও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। ওয়ালেস্, ডারুইন, স্পেন্সার্, কোম্ত, মিল্ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মনস্বী ব্যক্তিগণের দার্শনিক মতবাদের সহিত তাঁহার যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধিত হইয়াছিল, তাহা চন্দ্রশেখরের এই সকল মতাদর্শের প্রেরণায় লিখিত প্রবন্ধগুলি হইতেই প্রমাণিত হয়।

চন্দ্রশেখরের নিজস্ব রচনারীতি সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার মুনশীয়ানার এক বিশিষ্ট স্বাক্ষর। ভাবোচ্ছলতার আধিক্য থাকিলেও তাঁহার প্রবন্ধ যেমন ভূয়োদর্শন ও বহুপঠিত মননের পরিচয়স্বরূপ, তেমনি তাঁহার সুনিপুণ বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা দ্বারা তাহা সুচিহ্নিত। ভাব ও ভাষার এক আশ্চর্য-সুন্দর সমন্বয়ের ফলে তাঁহার গদ্যরীতি এক দুর্লভ আকর্ষণীশক্তি অর্জন করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় নিরপেক্ষ কঠোর সমালোচকও চন্দ্রশেখরের গদ্যরীতি ও ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া 'বঙ্গদর্শনে' তাহার সপ্রশংস আলোচনা করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের সর্ববিধ রচনারই ভাষা যেমন সরস ও সুন্দর, তেমনি মনোজ্ঞ ও মর্মস্পর্শী হইয়াছে।

চন্দ্রশেখর প্রণীত 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' প্রিয়া-বিয়োগে ব্যথিত হৃদয়ের এক শোক-গাথা। তাঁহার এই গ্রন্থটি ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ একটি গদ্যকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই রচনা দ্বারা সমকালীন জনসমাজে চন্দ্রশেখর বিশেষভাবে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন।

'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' গ্রন্থটি সাতটি প্রস্তাবে বিরচিত। কোন কোন সমালোচক ইহার প্রতিটি প্রস্তাব এক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই অভিধা এই গ্রন্থ সম্পর্কে যথাযথভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না। চন্দ্রশেখরের এই রচনায় প্রবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির অভাব পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ের সংযত প্রকাশ ও সংহত গুণধর্ম ইহাতে নাই। সুপ্রণালীবদ্ধ উচ্ছ্বাস-সংযত, সুভাবিত ও সারগর্ভ ভাবসমন্বিত রচনাই সাধারণতঃ প্রবন্ধ নামে আখ্যাত হয়। কিন্তু 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' অতিরেক উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত এবং অতি-রঞ্জন, অতিবর্ণন ও অপ্রাসঙ্গিকতায় ইহার বক্তব্য বিষয় বহুলাংশে আচ্ছন্ন হইয়াছে। অতএব চন্দ্রশেখরের এই রচনাকে প্রবন্ধ অপেক্ষা 'লিবিকধর্মী গদ্যকাব্য' নামে অভিহিত করাই অধিক সঙ্গত।

চন্দ্রশেখর প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'সারস্বত কুঞ্জ' (১৮৮৫) ও ২। 'স্ত্রী-চরিত্র' (১৮৯০)। তাঁহার অন্যান্য অধিকাংশ প্রবন্ধই 'বঙ্গদর্শন', 'বান্ধব', 'জ্ঞানাঙ্কুর', 'মাসিক সমালোচক', 'সাহিত্য', 'মালঞ্চ' 'প্রতিমা', 'জন্মভূমি', 'উপাসনা', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে—এই সকল প্রবন্ধ সংকলিত হইয়া গ্রন্থাকারে আজও প্রকাশিত হয় নাই। 'সারস্বত-কুঞ্জ' চন্দ্রশেখরের বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধের একটি সংকলন। এই সংগ্রহ-গ্রন্থের একটি মাত্র রচনা 'বাঙ্গালীর জন্য নূতন ধর্ম্ম' যথার্থ প্রবন্ধের পর্যায়ে উন্নীত হয় নাই। স্ত্রীলোকই দেবতা এবং স্ত্রী-সেবাই বর্তমানে বাঙ্গালীর নূতন এক ধর্ম হইয়া উঠিয়াছে—এইরূপ কৌতুকজনক মন্তব্য করিয়া চন্দ্রশেখর তাঁহার রচনা মধ্যে কেবলমাত্র স্ত্রী-বন্দনা করিয়াছেন। এই রচনাটি চন্দ্রশেখরের 'মসলা-বাঁধা কাগজ' গ্রন্থে সংকলিত রস-রচনাসমূহেরই সগোত্র।

বঙ্কিম-পর্বে চন্দ্রশেখর একজন সাহিত্য-সমালোচকরূপেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কাব্য ও উপন্যাস সম্পর্কে তাঁহার রসগ্রাহী আলোচনা হইতে তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনাত্মক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে 'রাম বসুর বিরহ', 'মৃন্ময়ী', 'রসসাগর', 'ভার্গববিজয়' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি উল্লেখ-যোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট কবিওয়ালা রাম বসুর বিরহ-গীত সম্পর্কে চন্দ্রশেখরের নাতিদীর্ঘ আলোচনাটি তাঁহার রসসংবেদনশীল শিল্পীমনের পরিচায়ক। রাম বসুর সঙ্গীতের মধ্য দিয়া তৎকালীন সমাজ-জীবনের যে প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, চন্দ্রশেখর তাঁহার সমালোচনায় অতি সুকৌশলে বিবিধ

দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাহারও পরিচয় দান করিয়াছেন। বৈষ্ণব কাব্যের তুলনায় রাম বসুর বিরহ-সঙ্গীতের ভাব-বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে চন্দ্রশেখরের মন্তব্য যথাযথ ও প্রণিধানযোগ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'রাম বসুর বিরহ' প্রবন্ধ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইল—

'রাম বসুর বিরহ সঙ্গীতে যেরূপ বিরহের বর্ণনা, তাহাকে আমরা বিরহ না বলিলেও না বলিতে পারি। এ বিরহ. না প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের বিরহ, না অধুনাতন নাটকোপন্যাস লেখকদিগের বিরহ। ইহাতে ব্যাকুলতা নাই, আত্ম-বিস্মৃতি নাই, স্মৃতিদংশন নাই, মর্ম্মদাহ নাই, তন্ময়তা নাই। ইহাতে হাহাকার নাই, চক্ষের জল নাই, ভূপতন নাই, মূর্চ্ছা নাই, মৃত্যু নাই। আছে কেবল প্রগল্‌ভার বাক্‌চাতুরী। তীব্র ব্যঙ্গ এবং অগ্নিময় শ্লেষ ইহার প্রাণ।'[১]

অশ্বিনীকুমার দত্ত—অশ্বিনীকুমার একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সমাজ-সেবী হিসাবে বাংলাদেশে সুপরিচিত হইয়াছেন। দেশের সামাজিক ও নৈতিক জীবনকে উন্নত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্যই তাঁহার সমগ্র জীবনের কর্মকৃতি ও রচনাসমূহের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। দেশহিতৈষী অশ্বিনীকুমার একজন ধর্মানুরাগী ভক্ত ও ভাবুক এবং চিন্তাশীল প্রবন্ধ-লেখক ছিলেন। অসাধারণ বাগ্মী হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। মুখ্যতঃ বিভিন্ন প্রসঙ্গে অশ্বিনীকুমারের বক্তৃতাসমূহই লিপিবদ্ধ হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অশ্বিনীকুমার দেশী ও বিদেশী বিবিধ ধর্মশাস্ত্রসমূহ গভীরভাবে অনুশীলন করেন। তাঁহার ধর্ম ও নীতিতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধগুলি অসামান্য পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। অশ্বিনীকুমার বহুভাষাবিদ্ একজন মনস্বী ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজী, সংস্কৃত, পারসী, হিন্দী মারাঠি, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষাসমূহে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি লাভের পরিচয় পাওয়া যায়।

অশ্বিনীকুমার প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'ভক্তিযোগ' (১৮৮৭) ২। 'দুর্গোৎসব-তত্ত্ব' (১৮৯০), ৩। 'প্রেম' (১৮৯৩), ৪। 'কর্ম্মযোগ' (১৯২২) ও ৫। 'আত্মপ্রতিষ্ঠা' (?)। কেবলমাত্র 'আত্মপ্রতিষ্ঠা' নামক রচনা ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থসমূহ ধর্ম ও নীতিতত্ত্ব বিষয়ক। অশ্বিনীকুমার

১ 'সারস্বত কুঞ্জ', (কলিকাতা, ১৮৮৫), পৃঃ ২

তাঁহার 'আত্মপ্রতিষ্ঠা' গ্রন্থে রাজনীতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার রাজনীতি-চর্চার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিস্তৃত পরিচয় ইহাতে বিধৃত হইয়াছে।

বিশুদ্ধ সাহিত্য-শিল্প ও সৌন্দর্যের মানদণ্ডে বিচার করিলে যদিও অশ্বিনীকুমারের প্রবন্ধ উচ্চশ্রেণীর রসসম্মত রচনার পর্যায়ে উন্নীত হয় নাই, তথাপি তাঁহার রচনারও যে একটা সাধারণ সাহিত্যিক আবেদন আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আধ্যাত্মিক ভাব ও তত্ত্বসমূহ শাস্ত্র-যুক্তিসম্মতভাবে সহজ ভাষায় পরিবেশন করিয়া অশ্বিনীকুমার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে গভীর দার্শনিক চিন্তা ব্যবহারিক (Practical) দৃষ্টান্তসহ অতি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাধারণতঃ এই জাতীয় জটিল তত্ত্ব সংক্রান্ত রচনা তিক্ত ও নীরস হইয়া থাকে। কিন্তু অশ্বিনীকুমারের লেখনীগুণে ও অভিনব ব্যাখ্যাকৌশলে তাহা সুস্পষ্ট ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে।

'ভক্তিযোগ' অশ্বিনীকুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। এই একটি মাত্র গ্রন্থদ্বারাই তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থে অশ্বিনীকুমারের আধ্যাত্মিক জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুন্দর ও স্বচ্ছ প্রকাশ ঘটিয়াছে। ভক্তির স্বরূপ ও মূলতত্ত্ব, অধিকারী ভেদে ভক্তির প্রকারভেদ, ভক্তির মান ও উৎকর্ষ ইত্যাদি ভক্তিতত্ত্ব সম্পর্কিত বিবিধ প্রসঙ্গই অশ্বিনীকুমারের এই 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়াছে। অশ্বিনীকুমার বিবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন ও নিজস্ব অভিজ্ঞতা হইতে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সকল ধর্মই অভিন্ন এবং ভক্তিই ঈশ্বর প্রাপ্তির একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। ভক্তিতত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনকল্পে অশ্বিনীকুমার বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে প্রামাণ্য যুক্তি-তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রবন্ধে তাহা সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম বা নীতিতত্ত্বমূলক প্রবন্ধের মধ্য দিয়া যে নীতি বা ধর্মোপদেশ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা অশ্বিনীকুমার বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মহান্ আদর্শের প্রেরণা ও তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে সংঘটিত ঘটনালব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে লাভ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধই বিভিন্ন নীতিগর্ভ দৃষ্টান্তের সহায়তায় সরস ও রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। অশ্বিনীকুমারের 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থটি এরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, ইংরাজী ভাষা ছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়া প্রচারিত হয়। অশ্বিনীকুমার

তাঁহার প্রবন্ধগত বিষয় দৃষ্টান্ত সহযোগে কিরূপ পরিপাটিভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় স্বরূপ 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত বিদ্যা ভিন্নও যে ভগবদ্ভক্তি সম্ভব, সে সম্পর্কে অশ্বিনীকুমার লিখিয়াছেন—

'বাহিরের বিদ্যা ভিন্নও ভগবদ্ভক্তি সম্ভবে। তবে বিদ্যা যে ভক্তিপথের সহায়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বিদ্যা ভিন্ন যে ভক্তি হইতে পারে না, তাহা নহে। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহার বিদ্যা কি ছিল? কিন্তু তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ক'জন? * * * ঈশ্বর সকলের পিতামাতা। পিতামাতাকে ডাকিতে কি কাহারও কোন বিদ্যার প্রয়োজন হয়? মা বলিয়া ডাকিতে কাহারও বিজ্ঞান কি কূটশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া লইতে হয় না। নিরক্ষর ভক্ত সরল প্রাণে মাকে ডাকিতে আরম্ভ করেন, ক্রমে মায়ের লীলা এমনই প্রতিভাত হইতে থাকে যে, তাহা নিরীক্ষণ করিতে করিতে এবং তাহার আলোচনা করিতে করিতে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চিত হয়।'[১]

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—বঙ্কিম-পর্বে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় অন্যতম সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। রঙ্গ-ব্যঙ্গমূলক রচনাতেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন। 'পাক্ষিক সমালোচকে'র ন্যায় বিশিষ্ট সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদনা-কর্মেও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ সাহিত্যে তাঁহার গভীর অনুধ্যান ও একনিষ্ঠ অনুশীলন দ্বারা ঠাকুরদাস এক দুর্লভ সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুরদাসের নিরপেক্ষ স্বভাবসুলভ সংযত বুদ্ধি, বিচার-বিশ্লেষণপ্রবণ মনোভাব ও উদার সৌন্দর্যবোধ সাহিত্য-বিচারমূলক প্রবন্ধসমূহকে এক বিশিষ্ট মহিমা দান করিয়াছে এবং তাহা দ্বারা বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা-বিভাগ বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। 'পাক্ষিক সমালোচক' ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'মালঞ্চ', 'বঙ্গবাসী', 'বঙ্গনিবাসী' প্রভৃতি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা-গুলিতে তিনি যে একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন, তাহাই নহে—এই সকল পত্রিকার সমুন্নতি ও পরিচালন-কার্যেও প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। ঠাকুরদাসের ছদ্মনামেও বিবিধ রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার 'ষড়ানন্দ' এই ছদ্মনামটিও সুপরিচিত।

---

১ 'ভক্তিযোগ', (কলিকাতা, ১৯৫৬), পৃঃ ২২-২৩

ঠাকুরদাস পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত চিন্তাশীল প্রবন্ধ-লেখক ছিলেন। তিনি বিবিধ প্রসঙ্গে বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ঠাকুরদাসের সাহিত্য-রূপ ও তত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক। সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় ঠাকুরদাস মুখ্যতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাদর্শ ই অনুসরণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় তিনিও গভীর রসানুভূতি ও কাব্য-সৌন্দর্যবোধের অধিকারী ছিলেন। ঠাকুরদাসের সাহিত্যপ্রীতি ও রুচির মধ্যে কোনরূপ অনুদারতা ছিল না। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য গভীরভাবে অনুশীলন করিয়া তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য-সমালোচনা-ধর্ম ও রীতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় সমালোচন-রীতির আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করিয়া তিনি তাঁহার প্রবন্ধে নিজস্ব বিচার-বুদ্ধিরও পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ১২৯১ বঙ্গাব্দে 'পাক্ষিক সমালোচক' পত্রিকায় প্রকাশিত ঠাকুরদাসের 'সমালোচনা-সাহিত্য' নামক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সাহিত্য-বিচারমূলক প্রবন্ধগুলির অপরিমেয় মূল্য অস্বীকার করা যায় না। কাব্যরসগ্রাহী হৃদয়বান্ সমালোচক ঠাকুরদাস সাহিত্য-সৌন্দর্যের স্বরূপ নির্ধারণকল্পে এমন গভীর চিন্তারাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার এই জাতীয় প্রবন্ধ বহুলক্ষেত্রেই অপ্রত্যাশিতরূপে দীর্ঘ ও তত্ত্বকণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরদাসের প্রবন্ধের বাচনভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা-কৌশলের মধ্যেও অভিনবত্ব লক্ষণীয়। ঠাকুরদাসের গদ্য ভাষা ও রীতির অন্যতম ত্রুটি এই যে, রচনার মধ্যে তাঁহার অবিচ্ছিন্ন অনুপ্রাস ব্যবহারে তাহা অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল ও জটিল হইয়াছে। চলিত ও সাধু ভাষার ক্রিয়াপদ প্রয়োগেও যথাযথ সামঞ্জস্যের অভাব হেতু ঠাকুরদাসের রচনা শ্রুতিসুখকর হয় নাই। কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর আলোচনায় অভিনবত্ব ও চিন্তার মৌলিকতার জন্য তাঁহার প্রবন্ধগুলি মূল্যবান্ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়াছে।

সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত ঠাকুরদাসের অধিকাংশ প্রবন্ধই পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রহিয়া গিয়াছে। 'সাহিত্য-মঙ্গল' (১৮৮৮) তাঁহার একমাত্র প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ। ইহা ঠাকুরদাসের একটি বিশিষ্ট সাহিত্যকীর্তি। আচার্য কেশবচন্দ্র ও সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা, সাহিত্যদৃষ্টি ও ধর্মচিন্তার তুলনা-মূলক পরিচয় প্রদানই গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয়। পাঁচটি পরিচ্ছেদ সম্বলিত এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পুস্তিকায় ঠাকুরদাসের গভীর পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা,

বিচার-বিতর্কের তীক্ষ্ণতা এবং উদার বিচক্ষণ সমালোচনা-শক্তির নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে সাহিত্য ও ধর্মের ক্ষেত্রে যে নূতন জোয়ার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্রের দান কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি সাধনে যে শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং যে ভাবে তাঁহার এই শিল্প-প্রতিভার সাহায্যে দেশের ধর্মগত ঐতিহ্যের স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে এবং আচার্য কেশবচন্দ্রের ধর্ম সাধনার মাধ্যমে যেরূপ বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্পাদিত হইয়াছে, ঠাকুরদাস তাঁহার 'সাহিত্যমঙ্গল' গ্রন্থে তাহাই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আজীবন সাহিত্যসেবী ও আজীবন ধর্মসেবী এই পরস্পর বিপরীতধর্মী ব্যক্তিদ্বয়ের ভাবচিন্তা ও রচনারীতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ ঠাকুরদাসের প্রবন্ধের মধ্যে সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র বাহ্যতঃ সমধর্মী না হইলেও, পরিশেষে তাঁহারা যে একই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইয়া সমভাব-পরিণতি লাভ করিয়াছেন, তাহা ঠাকুরদাস আশ্চর্য-নিপুণ বিজ্ঞতা সহকারে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

ঠাকুরদাসের 'সাহিত্যমঙ্গল' প্রবন্ধগ্রন্থটি যেমন সারগর্ভ, তেমনি মৌলিক-চিন্তারও পরিচায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র এই দুইজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবনাদর্শ ও সাহিত্যকৃতির বিস্তৃত পরিচয় প্রকাশে ঠাকুরদাসের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না এবং তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতা ও শ্রমসিদ্ধ গবেষণার ফলেই উভয় প্রতিভার অনাবিষ্কৃত দিক উদ্ঘাটিত হইয়াছে। যুগান্তকারী দুই মনীষীর সাহিত্যকৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে ঠাকুরদাস প্রাসঙ্গিকভাবে সাহিত্যধর্ম ও কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে যে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার এই আলোচনার মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও তীক্ষ্ণ যুক্তিবোধ এবং গভীর রসানুভূতির পরিচয় বর্তমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঠাকুরদাসের প্রবন্ধ হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল—

'কাব্যের উদ্দেশ্য একপক্ষে চিত্ত-রঞ্জন বটে, কিন্তু চিত্ত-রঞ্জন ব্যতীত ইহার মহত্তর উদ্দেশ্য আছে, আর সেই উদ্দেশ্যের জন্যই কাব্যের কাব্যত্ব। যাহা চিত্ত-রঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত-শুদ্ধি সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে কাব্য। কবির কলমের ন্যায় চিত্রকরের তুলিকাও কাব্য উৎপন্ন করিতে পারে। কাব্য যেখানে যেরূপ যে আকারে যদ্দারাই উৎপাদিত

হউক, যাহাতে চিত্ত-রঞ্জক দ্রব্য সংশ্লিষ্ট চিত্ত-শুদ্ধিকর পদার্থ আছে তাহাই কাব্য বটে।'[১]

ঠাকুরদাসের সাহিত্য-চিন্তা যে অপেক্ষাকৃত সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের পদানুসারী, উল্লিখিত সমালোচনার দৃষ্টান্ত হইতে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য—বঙ্কিম-পর্বের কৃতবিদ্য চিন্তাশীল প্রবন্ধ-লেখকদিগের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য অন্যতম। তিনি সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতিপত্তি ও প্রখ্যাতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্য প্রসঙ্গে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুদীর্ঘ আলোচনা ত্রৈলোক্যনাথের পূর্বে লক্ষ্য করা যায় না। যদিও সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বন করিয়া বাংলা ভাষায় ইতস্ততঃ বহু বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে কোনরূপ ধারাবাহিক আলোচনার অভাব পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম ধারাবাহিক সরস ইতিবৃত্ত রচনার গৌরব ত্রৈলোক্যনাথেরই প্রাপ্য। তিনি মুখ্যতঃ সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি প্রসঙ্গে বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধই গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নাই। ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রতিটি রচনাই গবেষণামূলক।

ত্রৈলোক্যনাথ প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম ভাগ, (১৮৮৮), ২। 'কবি বিদ্যাপতি' (১৮৯৫) ও ৩। 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা' (১৮৯৬)। এই তিনখানি গ্রন্থই তাঁহার পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণ বিচারশক্তির পরিচায়ক। 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থ রচনাই ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁহার গভীর গবেষণার পরিচয় এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় প্রকাশ পাইয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার গ্রন্থে বৈদিক সংহিতার সূচনা হইতে উপনিষদ্ রচনা পর্যন্ত এক ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রচনায় প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু কেবল ইতিবৃত্ত বা তালিকা প্রণয়নের মধ্যেই তাঁহার রচনা সমাপ্ত হয় নাই, সংস্কৃত সাহিত্যের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-বিশ্লেষণ দ্বারা ত্রৈলোক্যনাথের প্রবন্ধ সরস, মার্জিত ও শিল্প-সুষমামণ্ডিত হইয়াছে। সাহিত্যের সহিত সমাজের চিরন্তন এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আছে। সাহিত্যসৃষ্টির পশ্চাৎপটে যে সমাজধর্ম বর্তমান, তাহার

১ 'সাহিত্যমঙ্গল', (কলিকাতা, ১৮৮৮), পৃঃ ৪৪

সম্যক্ পরিচয় প্রকাশের মধ্যেই সাহিত্যের সার্থক মূল্য নিরূপিত হয়। রচনার সাহিত্যিক মূল্যায়ন সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথ সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং সেইজন্য তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনার পটভূমিকায় ভারতীয় আর্যজাতির সমাজ ও মনোধর্মের এক সত্যনিষ্ঠ বিবরণ দান করিয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথ প্রসঙ্গতঃ ও প্রয়োজনানুসারে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় অধিকতর মূল্যবান্ করিয়া তুলিয়াছেন। নির্ভুল তথ্য-পরিবেশনে, যুগচিন্তাসম্মত আলোচনা-নৈপুণ্যে ও বক্তব্য বিষয়ের সহজ সাবলীল প্রকাশ-কর্মে ত্রৈলোক্যনাথ সিদ্ধকাম ছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও ত্রৈলোক্যনাথের ভাষা সুস্পষ্ট, সরল ও আড়ম্বরবর্জিত হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত আলোচনার প্রাক্কালে ত্রৈলোক্যনাথের সম্মুখে এই জাতীয় গ্রন্থের কোন দৃষ্টান্ত বা আদর্শ (Model) ছিল না। তথাপি এই নূতন গ্রন্থ রচনায় তিনি তাঁহার নিজস্ব চিন্তা ও অভিনব পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া কৃতকার্য হইয়াছেন। 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' রচনার মধ্য দিয়া ত্রৈলোক্যনাথের একাগ্রতা, নির্ভীক সত্যসন্ধানী দৃষ্টি ও সুমার্জিত সাহিত্যরুচির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সচেতনতাবোধ ও সূক্ষ্ম দার্শনিক স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি দ্বারা ত্রৈলোক্যনাথের প্রবন্ধসমূহ সমুদ্দীপ্ত হইয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের রচনার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। সুপণ্ডিত প্রাচীন আর্যঋষিগণ বিরচিত ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে নানাবিধ সামাজিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বৃত্তান্তাদি লিপিবদ্ধ থাকায়, তাহাদের বিষয়-গত নীরসতা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। যজ্ঞ সম্বন্ধীয় নানাবিধ ব্যবস্থা, প্রতি যজ্ঞের প্রত্যেক অঙ্গের প্রয়োজনীয়তা, তাৎপর্য ও নিগূঢ় রহস্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বৈদিক সূত্র গ্রন্থসমূহে বিবৃত ও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থেই তাহার প্রথম পরিস্ফুরণ দৃষ্ট হয়। * * * ব্রাহ্মণগ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী বহুতর গাথা, আখ্যান ও ব্রাহ্মণের উদ্ধৃত অংশ দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহ পূর্ব্বতন যাজ্ঞিক, দার্শনিক, আখ্যানবিৎ, গাথাকার ও ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্গণের ধারাবাহিক চিন্তা-প্রবাহের একীভূত সংগ্রহমাত্র।'[১]

---

১ 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম ভাগ, (কলিকাতা, ১৮৮৮), পৃঃ ১২৯-৩০

ত্রৈলোক্যনাথ মুখ্যতঃ সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক বিবিধ মূল্যবান্ প্রবন্ধ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়গত গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় সার্থকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা' গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধই প্রাচীন সংস্কৃত কবি বা মনীষীর জীবন-বৃত্তান্ত ও তাঁহাদের রচনাসমূহের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের এই সকল প্রবন্ধের মধ্যে 'মহাকবি ভবভূতি', 'শঙ্করাচার্য্য' ও 'কবি ভর্ত্তৃহরি' নামক তিনটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মীর মশাররফ হোসেন—বিখ্যাত ঐতিহাসিক গদ্য-কাব্যোপন্যাস 'বিষাদ-সিন্ধু'র রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেন বঙ্কিম সমকালীন কৃতী লেখকদিগের অন্যতম। মুসলমান লেখকদিগের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগই মীর মশাররফের অল্পবিস্তর রচনাদ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। মুখ্যতঃ ঔপন্যাসিক রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করিলেও মশাররফ কবিতা, নাটক, প্রহসন, সংগীত এবং প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সাংবাদিক হিসাবেও মশাররফের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সাংবাদিক জীবনে 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' এই দুই সংবাদ পত্রের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়াছিলেন। মশাররফ স্বয়ং 'আজীজন্ নেহার' নামক একটি মাসিক পত্রও সম্পাদনা করিয়াছেন এবং তাঁহার এই পত্রিকাটি সাময়িক পত্র জগতে মুসলমান-সম্পাদিত প্রথম সাহিত্যপত্রের গৌরব লাভ করিয়াছে।

মীর মশাররফের প্রবন্ধ সাধারণতঃ ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম ও জীবন-চরিত অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। প্রবন্ধসমূহে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গভীর গবেষণার পরিচয় না থাকিলেও, তাহাদ্বারা লেখকের যে সহজ বুদ্ধিমত্তা ও নিরপেক্ষ বিচার-শক্তির নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় না। মীর মশাররফের প্রবন্ধের ভাষা ও রচনারীতির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ প্রভাব অনুভূত হয়। বঙ্কিম প্রভাবিত হইলেও তাঁহার রচনায় এক স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যও লক্ষ্য করা যায়। মশাররফের গদ্য-ভাষা অপেক্ষাকৃত সংস্কৃতানুগামী, কিন্তু তাহা কোথাও দীর্ঘ সমাস বা সন্ধি দ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া জটিল বা দুর্বোধ্য হয় নাই। সহজ সাবলীল গতি ও ওজস্বিতা মশাররফের রচনাকে

এক বিশিষ্ট মহিমা দান করিয়াছে। তাঁহার বিশুদ্ধ, মার্জিত বাংলা গদ্য-ভাষার শৈল্পিক উৎকর্ষ সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রেরও প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল।

মীর মশার্‌রফ প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমে: ১। 'গো-জীবন' (১৮৮৯), ২। 'হজরত বেলালের জীবনী' (১৯০৫), ও ৩। 'আমার জীবনী' (১৯০৯-১০)। মশার্‌রফের ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত প্রবন্ধসমূহের অন্যতম বিশেষত্ব এই যে, ইহার মধ্য দিয়া তাঁহার কোন সাম্প্রদায়িক চিন্তা বা অনুদার মনোভাব প্রকাশিত হয় নাই। মশার্‌রফ তাঁহার নিজ ধর্ম বা সমাজবিরোধী প্রসঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্রেও সমসাময়িক লেখকগণের তুলনায় অধিক সংযম ও শালীনতার পরিচয় দান করিয়াছেন। তিনি যেমন ব্যক্তিগত আচার-আচরণে তেমনি সাহিত্য-জীবনেও সকল সাম্প্রদায়িকতা বা সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ছিলেন। মশার্‌রফের রচনার মধ্যে এক উদার মানবিকতাবোধ ও সরল শিল্পিসুলভ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

মশার্‌রফের 'গো-জীবন' প্রবন্ধগ্রন্থটি মুসলমানদিগের ধর্মীয় বা সামাজিক আচারগত গুণাগুণের ভিত্তিতে লিখিত। গো-মাংস মুসলমানদিগের বিশেষ আহার্য বস্তু। কিন্তু মশার্‌রফ স্বয়ং ইসলাম্ মতাবলম্বী হইয়াও ইহার বিরোধী ছিলেন। 'গো-জীবন' গ্রন্থে লেখক গো-জাতির বিবিধ উপকারিতার উল্লেখ করিয়া গো-হত্যার বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। এতদ্ব্যতীত গো-হত্যাকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনরূপ বিরোধের সূত্রপাত না হয়, তাহার প্রতিও মশার্‌রফ নূতনভাবে আলোকপাত করিয়াছেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে ঐক্য ও ঘনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহারই সচেতন প্রয়াস 'গো-জীবন' গ্রন্থের সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। এইরূপ সমস্যামূলক বিষয়ও তাঁহার অন্তরঙ্গ বাচনভঙ্গিতে সহজ ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মশার্‌রফের প্রবন্ধগ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'গো-দুগ্ধেই আমাদের জীবন। দশমাস মায়ের উদরে বাস করিয়া জগতের মুখ দেখিতেই যেমন ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিতে থাকি, সে সময়,—হায়! অমন কঠিন সময় কিসে আমাদের প্রাণরক্ষা হয়? * * * গো-রসই বঙ্গের উপাদেয় খাদ্য। সুস্থ অসুস্থ শরীরে, এমন কি, প্রাণসঞ্চার হইতে বিয়োগ পর্য্যন্ত দুগ্ধের প্রয়োজন। সেই দুগ্ধের মূল গো-ধনকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিলে আর কি রক্ষা আছে!! * * * এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু মোসল্মান উভয় জাতিই প্রধান।

পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্ম্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্ম্মে এবং কর্ম্মে এক –সংসার কার্য্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। * * * এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গী যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি ?'[১]

মীর মশার্‌রফের আত্মচরিতমূলক প্রবন্ধগ্রন্থ 'আমার জীবন' একটি উপভোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার প্রথম বিবাহ পর্যন্ত জীবনের বিচিত্র ঘটনা অতি সহজ ও সরল নাটকীয় ভঙ্গিতে বর্ণনা করিয়াছেন। মশার্‌রফ তাহার আত্মজীবনী রচনায় সম্ভবতঃ কবি নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' (১ম ভাগ) গ্রন্থের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথও একজন সুলেখক ছিলেন। ইতিহাস, দর্শন, শিল্প ও সাহিত্যে তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল এবং এই সকল বিষয় অবলম্বনে তিনি বিবিধ প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের যথার্থ পাণ্ডিত্যের তুলনায় তাঁহার মৌলিক রচনার সংখ্যা আশানুরূপ নহে। সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁহার জীবনেব অধিকাংশ সময় বোম্বাই শহরে অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। অতএব স্বাভাবিক ভাবেই বোম্বাই প্রদেশ সম্পর্কে তাঁহার যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছিল, সত্যেন্দ্রনাথ তাহারই পরিচয় তৎকালীন এক বিশিষ্ট সাময়িক পত্রে খণ্ড খণ্ড প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল রচনাই পরবর্তী কালে একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের এক গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ছিল। এই বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ অনুধ্যান ও অনুশীলনের পরিচয় 'বৌদ্ধধর্ম্ম' গ্রন্থ হইতে লাভ করা যায়। ধর্ম বিষয়ক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হিসাবে তাঁহার এই গ্রন্থটির স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা যায় না। যথাযথ ও মনোজ্ঞ উদ্ধৃতি এবং সহজ রচনারীতির দ্বারা সত্যেন্দ্রনাথের 'বৌদ্ধধর্ম্ম' গ্রন্থটির তত্ত্ব সংক্রান্ত জটিলতাও সহজবোধ্য ও সুস্পষ্ট হইয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথ প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'বোম্বাই চিত্র' (১৮৮৯), ২। 'বৌদ্ধধর্ম্ম' (১৯০১) ও ৩। 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' (১৯১৫)। সত্যেন্দ্রনাথের এই গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা সমাদৃত ও উপভোগ্য রচনা। এই গ্রন্থের প্রথমার্ধ

১ 'গো-জীবন', (টাঙ্গাইল, ১২৯৫), পৃঃ ৬-৭

অর্থাৎ 'আমার বাল্যকথা' অংশটি অপেক্ষাকৃত আত্মজীবনীর পর্যায়ভুক্ত। যদিও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে ইহাকে যথার্থ আত্মজীবনীর মর্যাদায় ভূষিত করা যায় না। কারণ, সত্যেন্দ্রনাথের নিজ জীবনের অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ অতি সামান্যই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। সতেন্দ্রনাথ তাঁহার কর্মবহুল জীবনে যে সকল বিদগ্ধ মনীষীর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন, প্রধানতঃ তাঁহাদেরই প্রাণবান্ চরিত্র-চিত্রে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। এই গ্রন্থের শেষার্ধ অর্থাৎ 'আমার বোম্বাই প্রবাস' অংশটির বক্তব্য বিষয়ের অধিকাংশই সত্যোন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'বোম্বাই চিত্রে'রই অনুরূপ। 'বোম্বাই চিত্র' ও 'আমার বোম্বাই প্রবাস' রচনাদ্বয় সাধারণ প্রচলিত ভ্রমণ-কাহিনীর অনুবৃত্তি নহে। সত্যোন্দ্রনাথের এই দুই ভ্রমণ বিষয়ক রচনার মধ্যে দাক্ষিণাত্যের ইতিবৃত্ত, ধর্ম, সাহিত্য ও সমাজ প্রসঙ্গে বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অতি সুনিপুণভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল বিচিত্র তথ্য সত্যোন্দ্রনাথের উদার-ব্যাপ্ত দূরদৃষ্টির আলোকে তাৎপর্য-চিহ্নিত হইয়া খণ্ড খণ্ড প্রবন্ধের আকারধারণ করিয়াছে। ভাষার সাবলীলতা ও অনায়াস স্বচ্ছন্দগতি সত্যোন্দ্রনাথের রচনাকে অধিক কৌতূহলজনক ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার রচনা মধ্যে সাধু ও চলিত ভাষার সহজ মিশ্রণও লক্ষ্য করা যায়। বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে তিনি এই উভয় ভাষারই আশ্রয় লইয়াছেন। সত্যোন্দ্রনাথ যে গীতিকবি ও সৌন্দর্যরসিক ছিলেন, তাহা যেমন তাঁহার বিবিধ ব্রহ্মসংগীত রচনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি সেই পরিচয় তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যেও অপ্রকাশিত থাকে নাই। বোম্বাই প্রদেশের দ্রষ্টব্য বস্তু-সামগ্রী সত্যোন্দ্রনাথ কেবলমাত্র তাঁহার গবেষণাধর্মী ঐতিহাসিক মননের দ্বারাই বিচার-বিশ্লেষণ করেন নাই—তাঁহার সহজাত শিল্পিহৃদয়ের গভীর অনুভূতি ও কবিত্বসুলভ বর্ণনার দ্বারা তাহা বহুলক্ষেত্রেই সরস সাহিত্যগুণান্বিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সত্যোন্দ্রনাথের গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'বোম্বাই সহরের প্রাকৃতিক শোভা ব্যাখ্যার যোগ্য। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যে দুই প্রধান উপকরণ পাহাড় ও সমুদ্র, তাহা বোম্বায়ের নিজস্ব সম্পত্তি। একদিকে মালাবার শৈল, অন্যদিকে সমুদ্র তীরবর্ত্তী বন্দরনিকর। * * * যখন অস্তোন্মুখ দিনকর-কিরণে এই দৃশ্য সমুজ্জ্বলিত হয়, তখন তাহার শোভা অতি চমৎকার। পশ্চিমের আকাশ চিত্র-বিচিত্র মেঘজালে রঞ্জিত, নীচে উপসাগরের শাখাদ্বয় সূর্য্যের কনক বিম্বে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, তাহার ক্রোড়ে মুম্বাপুরী শয়ান; সাগরবক্ষে দ্বীপপুঞ্জ ভাসমান, বন্দরে নোঙরবদ্ধ নানা জাতীয়

তরণী, কখনও বা এক একটি নৌকা পাল ভরে চলিয়াছে। স্থলে নারিকেল বৃক্ষবাজি, মধ্যভাগে তরুরাজির অভ্যন্তরে বিরাজিত সুরাগরঞ্জিত হর্ম্ম্যাবলী, দূর হইতে একাকারে এক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশিত।'[১]

সত্যেন্দ্রনাথের রচনারীতি ও ভাষায় তাঁহার পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিঃসংশয়িত প্রেরণা ও প্রভাব অনুভব করা যায়।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুরেশচন্দ্র ছোট গল্পের লেখক অপেক্ষা তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন সাহিত্য-সমালোচক হিসাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রভাবশালী সুযোগ্য সম্পাদক ও সাংবাদিক রূপেও তিনি সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তৎকালীন 'সাহিত্য' (১৮৯০) নামক একটি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র সম্পাদনায় তাঁহার অভাবনীয় সাফল্য ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, 'বসুমতী', 'সন্ধ্যা', 'নায়ক', 'বাঙ্গালী' প্রভৃতি সংবাদ পত্রসমূহের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া এই সকল পত্রিকার পরিচালন-কার্যে সহায়তা করিয়াছেন এবং ইহা হইতে সুরেশচন্দ্রের গভীর সাহিত্যপ্রীতি ও অসাধারণ কর্মনিষ্ঠার পরিচয় লাভ করা যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধনই তাঁহার সমগ্র জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল এবং সুরেশচন্দ্র আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, সাহিত্যের সার্থক সমুন্নতির উপরই জাতীয় সমৃদ্ধি নির্ভর করে। জীবনব্যাপী সাহিত্য-চর্যায় নিয়োজিত থাকিলেও সুরেশচন্দ্রের নিজস্ব মৌলিক রচনার সংখ্যা পরিমাণে নিতান্তই অল্প। বাংলা সাহিত্যে এই স্বল্প দানের দ্বারা তাঁহার সাহিত্যিক ক্ষমতার যথোচিত পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই। সুরেশচন্দ্র মুখ্যতঃ সাহিত্যসৃষ্টি অপেক্ষা সাহিত্যিক সৃষ্টির প্রতি অধিক মনোযোগ দান করিয়াছিলেন। সমকালীন নূতন লেখকদিগের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের সুপ্ত মনীষার সম্যক্ পরিস্ফুতি সাধনেই সুরেশচন্দ্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সমসাময়িক সাহিত্যিক সমাজে এই ভূয়োদর্শী সম্পাদক 'সমাজপতি' নামেই সমধিক পরিচিত হইয়াছিলেন; বস্তুতঃ সাহিত্যক্ষেত্রে সমাজপতি অর্থাৎ সাহিত্যগুরু হইবার যথেষ্ট যোগ্য অধিকার বা গুণাবলী সুরেশচন্দ্রের ছিল।

সুরেশচন্দ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। সম্ভবতঃ সাহিত্যের প্রতি এই সুদৃঢ় নিষ্ঠা ও প্রীতিবোধ তিনি তাঁহার মাতামহ পণ্ডিত

[১] 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', (কলিকাতা, ১৯১৫), পৃঃ ৮৯

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্যধর্মেও সুরেশচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের অনুসরণকারী ছিলেন এবং তাঁহার ভাব ও ভাবনার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের গভীর প্রভাবও অনুভব করা যায়। সাহিত্যে অশ্লীলতা, অসংযম ও অশালীনতার প্রতি সুরেশচন্দ্রের অপরিসীম বিদ্বেষ ছিল। সাহিত্য ক্ষেত্রে চিরন্তন সত্য আদর্শের যেখানেই বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, সেইখানেই সুরেশচন্দ্র শাশ্বত সত্য ও ন্যায়ধর্মের প্রতিনিধি হইয়া কঠোর সমালোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা ও নির্ভীকতাই তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। সুরেশচন্দ্রের সমালোচনা কেবল নির্মম শ্লেষ-বিদ্রূপ মাত্রেই পর্যবসিত হয় নাই—ইহার মধ্য দিয়া যেমন তাঁহার উদারতা ও আন্তরিকতা প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি প্রতিপাদ্য ভাব বা বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণেও তাঁহার পারদর্শিতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয়ও পাওয়া যায়। স্বচ্ছন্দ লিখনভঙ্গি ও সংযত পরিহাস রসিকতায় সুরেশচন্দ্রের প্রবন্ধ বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার সমালোচনা-ধর্ম সম্পর্কে স্বনামধন্য ঐতিহাসিক-সমালোচক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন—

'সাহিত্যের সমালোচনা 'সাহিত্যে'র বিশিষ্ট গৌরব বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাহাতে অকুণ্ঠিতভাবে তিরস্কার পুরস্কার বিতরিত হইত। সাহিত্যকে অনাবিল রসের আধার করিবার আন্তরিক আকুলতাই 'সাহিত্য'-সম্পাদককে সমালোচনায় সীমাশূন্য, ক্ষমাশূন্য কশাঘাত প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মমত্ববোধ যত আন্তরিক হয়, অনধিকার চর্চ্চাকে সুশাসিত করিবার ইচ্ছা ততই প্রবল হইয়া থাকে।'[১]

সুরেশচন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধ রচনায় অপেক্ষাকৃত সংস্কৃতানুগ সাধুভাষারই পক্ষপাতী ছিলেন। চলিত ভাষার প্রতি তাঁহার কোনরূপ শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃতানুসারী গদ্যভাষার ব্যবহারই অধিকতর সঙ্গত বা সমীচীন মনে করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার একান্ত ভক্ত হইলেও সুরেশচন্দ্রের রচনা কোথাও সংস্কৃত সন্ধি বা সমাস দ্বারা জটিল হইয়া উঠে নাই। বরং সরল বাক্যবিন্যাস ও শব্দচয়ননৈপুণ্যে তাঁহার রচনা শ্রুতিমধুর ও আবেগপূর্ণ হইয়াছে। একথা অনস্বীকার্য যে, সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের সহিত সুরেশচন্দ্রের আশৈশব সুনিবিড় পরিচয় ও তাঁহার সহজাত রসবোধ

১ 'সুরেশ-স্মৃতি', 'সাহিত্য', ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৭, পৃঃ ৬৫৯

এবং সর্বোপরি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির আদর্শ তাঁহার রচনারীতি ও ভাষার গঠন বা প্রসাধনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। বিষয়ানুসারে সুরেশচন্দ্রের ভাষায় বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার ভাষা কোথাও গম্ভীর অথচ প্রাঞ্জল, ওজস্বিনী অথচ আবেগময়ী এবং কোথাও বা অম্লমধুর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সমুজ্জ্বল।

সুরেশচন্দ্র বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় বিবিধ প্রসঙ্গে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনামূলক প্রবন্ধের অধিকাংশই স্ব-সম্পাদিত 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার এই সকল প্রবন্ধ একত্র সংকলিত হইয়া আজও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। সাময়িক পত্রিকাসমূহে সুরেশচন্দ্রের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে সকল প্রবন্ধ রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে 'মেঘদূত', '৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়', 'শিশুপাঠ্য সাহিত্য', 'নবীনচন্দ্র', 'গিরিশচন্দ্র', 'মহাকবি মধুসূদন', 'রামেন্দ্রসুন্দর' ও 'সেকাল একাল' প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুরেশচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার সমালোচনাত্মক প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'সমস্ত মেঘদূত পড়িয়া আমাদের মনে হয়, যেন কি এক অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষার উচ্ছ্বাস, কি এক অপূর্ণ সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা, সমস্ত কবিতার মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। * * * কালিদাস প্রথমেই যক্ষের দেবত্ব কাড়িয়া লইয়া, তাহাকে মানুষ করিয়া আঁকিয়াছেন, এবং সুন্দর ও সরল ভাষায়, সত্য সত্য মানুষের বিরহের মধ্যে কতখানি শারীরিক সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা বর্ত্তমান, তাহা দেখাইয়াছেন। যাঁহারা মানুষের প্রেম হইতে শারীরিক সৌন্দর্য্য-লালসা একেবারে বাদ্ দিয়া, একটা অতি উচ্চরকম মানসজাত (ideal) ভালবাসা নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাদের সহিত, এ ক্ষেত্রে কালিদাসের খুব অল্প সহানুভূতি। হয়ত তাঁহারা একটা সুন্দর আদর্শ দেখাইয়া সামাজিক মঙ্গল সাধন করিবার প্রয়াস পান, কিন্তু তাঁহারা যে পার্থিব কিছুই আঁকেন না, সেকথাও ঠিক; তাঁহারা যে মস্তিষ্কের ছায়া লইয়া খেলা করেন, তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। কালিদাস এরূপ কোনও গভীর দার্শনিকতাপূর্ণ শাসনের বশীভূত হইয়া কাব্য লিখিতে বসেন নাই।'[১]

সুরেশচন্দ্র যে একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন, তাহা তাঁহার সমালোচনাত্মক প্রবন্ধসমূহ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

---

১ 'মেঘদূত', 'সাহিত্য', ভাদ্র ১২৯৮, পৃঃ ২১৭-১৮

রবীন্দ্র-পর্ব

(১৮৯১—১৯৪৬)

সূচনা

বঙ্কিম-পর্বে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর যে চিন্তাধারা বা ভাবধর্মের আত্মপ্রকাশ সূচিত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর হইতে তাহাই নূতন ভঙ্গিতে, আকারে ও রূপে প্রকাশিত হইয়া অধিকতর পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার অসামান্য শক্তির সহায়তায় পাশ্চাত্ত্য জীবন-রসবোধ ও বাঙ্গালীর জাতিগত ভাব-চিন্তা একত্র সমাবিষ্ট হইয়া আকাঙ্ক্ষিত পথে অগ্রসর হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ হইতেই ভাব ও বিষয়-চিন্তার বৈচিত্র্যে, ব্যক্তিমানসের সুস্পষ্ট প্রতিফলনে এবং রূপকল্প ও বাণীভঙ্গির অভিনবত্বে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে যুগান্তকারী মাসিক পত্রিকা সাধনা'র অভ্যুদয় হইতেই রবীন্দ্রনাথ স্ব-শক্তিতে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হইয়া অজস্র সৃষ্টি-কর্ম দ্বারা সাহিত্যের সর্ববিভাগ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন এবং বাংলা সাহিত্যে ক্রমান্বয়ে তাঁহার ভাব ও রচনারীতির অনিবার্য প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা-দীপ্তিতে দেশ ও জাতির সাংস্কৃতিক জীবন ও সাহিত্য অভিনব রসরূপ লাভ করিয়া সর্বাঙ্গে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদ্বারা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি নূতন পর্বের সূচনা হইয়াছে। অতএব এই নূতন পর্বটিকে 'রবীন্দ্র-পর্ব' নামে চিহ্নিত করাই সম্পূর্ণ সঙ্গত ও সার্থক।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি এবং কবির অন্যান্য সাহিত্যসৃষ্টি তাঁহার গভীরতর কবিসত্তা ও কবিমানসেরই বিকশিত রূপ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের সহজাত কবি-প্রকৃতি প্রবন্ধগত ভাব ও ভাবনার মধ্যেও অল্পবিস্তর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কবির কোমল হৃদয়বৃত্তির মাধুর্যে ও বাচনভঙ্গির অভিনব কৌশলে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্য সার্থক-সুন্দর সৃষ্টি হইয়া পূর্ববর্তী প্রচলিত প্রবন্ধ ধারা হইতে ভিন্ন এক স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই প্রথম সার্থকভাবে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য নৈর্ব্যক্তিক বাতাবরণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ব্যক্তিচৈতন্যলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে। পূর্ববর্তী পর্বসমূহের প্রবন্ধ হইতে

রবীন্দ্র-পর্বের প্রবন্ধ-সাহিত্যের চরিত্রগত প্রধান পার্থক্য যে, এই পর্বে প্রবন্ধ মুখ্যতঃ বিষয়নিষ্ঠ না হইয়া অধিক পরিমাণে ভাব-নির্ভর হইয়াছে এবং বক্তব্য বিষয় বা ভাব ম্লান করিয়া প্রবন্ধের রচনাকৌশল অর্থাৎ প্রকাশরীতিই বহুলাংশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং সর্বোপরি বাংলা প্রবন্ধ সর্বপ্রথম একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পকর্মের মর্যাদায় ভূষিত হইয়াছে। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা বা প্রবাহে এবংবিধ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন রবীন্দ্র-পর্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী সাহিত্য-জীবনে বিচিত্র বিষয়াশ্রিত প্রবন্ধ-রচনার দ্বারা বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য যেমন সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার প্রভাবিত বহু প্রবন্ধ-লেখকের মূল্যবান্ রচনার দ্বারাও সাহিত্যের এই বিভাগটি বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়া প্রসার লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্র-সমকালবর্তী বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের মূলে যে এক নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা এই সকল প্রবন্ধের রচনাকৌশল, বাচনভঙ্গি, বিষয় উপস্থাপনার চাতুর্য ও চিন্তাধারার বৈচিত্র্য হইতে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। এই পর্বে রবীন্দ্র-সম্পাদিত 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়) ব্যতীত 'হিতবাদী', 'বসুমতী', 'প্রদীপ', 'উদ্বোধন', 'সবুজপত্র', 'নারায়ণ' প্রভৃতি সাহিত্য-পত্রিকাসমূহে বিবিধ বিষয়ক সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

রবীন্দ্র-পর্ব অর্ধশতাধিক কাল বিস্তৃত। এই দীর্ঘ পর্বের প্রথমার্ধে বাংলা প্রবন্ধের যে রীতি, ভাব-চিন্তা ও কল্পনা-শক্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে, শেষার্ধে সেই ভাবধারার পূর্ণতর পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ প্রবন্ধকারগণের ভাবদৃষ্টি ও চৈতন্যবোধ প্রথমতঃ মুখ্যভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির বাস্তব অবস্থা ও কর্মকৃতির মধ্যেই সীমায়ত ছিল। কিন্তু শেষভাগে, বিশেষতঃ 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশের পর হইতে বাঙ্গালী লেখকগণের দৃষ্টিশক্তির বিস্তৃতি ও বিশ্বচৈতন্যবোধের পরিব্যাপ্তি ঘটিয়াছে এবং অনিবার্যভাবেই প্রবন্ধগত ভাব ও ভাষার অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ রচনার দ্বারাই প্রধানতঃ এই পর্বের প্রবন্ধ-সাহিত্য স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, স্বাতন্ত্র্যে প্রখর ও বৈশিষ্ট্যে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী অংশে ইঁহাদের প্রত্যেকেরই প্রবন্ধের বিস্তৃত ও স্বতন্ত্র আলোচনা হইয়াছে। 'বিবিধ' চিহ্নিত অধ্যায়ে রবীন্দ্র-পর্বের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধকারগণের প্রবন্ধসমূহ সংক্ষেপে বিচার-বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

রবীন্দ্র-পর্বেও পূর্ববর্তী বঙ্কিম-পর্বের ন্যায় বিচিত্র বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। সমাজ, ধর্ম, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, জীবন-চরিত, রাজনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি প্রায় সর্ববিষয়ক প্রবন্ধই ভিন্নতর রীতি ও রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সাহিত্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গাত্মক প্রবন্ধসমূহের উৎকর্ষ-সাধন এই পর্বে বিশেষভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। স্মৃতিনিষ্ঠ, ভ্রমণাত্মক ও পত্রাকারে লিখিত প্রবন্ধের অভাবিত সমৃদ্ধি রবীন্দ্র-পর্বেই লক্ষ্য করা যায়। সার্থকভাবে কথ্যভাষাশ্রিত প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাতও এই পর্বেই সংঘটিত হইয়াছে। মৌলিক বিষয় বা ভাবের অনুসন্ধানে, প্রকাশের অভিনবত্বে এবং চিন্তার গভীরতায় ও বৈচিত্র্যে রবীন্দ্র-পর্বের প্রবন্ধ-সাহিত্য একটি স্থায়ী গৌরবদৃপ্ত মহিমা অর্জন করিয়াছে।

রবীন্দ্র-পর্বের প্রবন্ধ-সাহিত্যের মর্মমূলে সমকালীন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংস্কারমূলক আন্দোলন এবং ধর্ম বা শিক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ প্রগতিশীল ঘটনা সক্রিয় প্রভাবও ছায়াপাত করিয়াছে। রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবাদ ক্রমশঃ উদ্বুদ্ধ হইবার ফলে বিদেশী শাসনের বহুবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতিমূলক কার্যকারিতার বিরুদ্ধে ভারতবাসীর অসন্তোষ প্রকাশ পাইয়াছে এবং প্রধানতঃ বাঙ্গালী দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক আন্দোলনেরই নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছে। বিদেশী সরকার বাঙ্গালীর নেতৃত্ব ও সংগঠন-শক্তিতে সর্বদাই শঙ্কিত হইয়াছে এবং সেইজন্য বাংলাদেশকে সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বলতর করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সমবায়ে সংগঠিত বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং সরকারের স্বেচ্ছা ও সংকল্প অনুসারে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। ব্রিটিশ সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ রূপে যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সুরু হইয়াছিল, তাহাই পরাধীন দেশবাসীর রাজনৈতিক প্রস্তুতি বা চেতনার অন্যতম বিশিষ্ট সোপান হিসাবে উল্লেখ করা যায়। বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডনের ফলে দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে যে পট পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র-পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের সমাজ ও সাহিত্যকেও গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। সমকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন মনীষী ব্যক্তির রাষ্ট্র-সংস্কার বা রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনার মূলে যে এই আন্দোলনের প্রেরণা ছিল, তাহা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তী কালে প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধও (১৯১৭) সমগ্র ভারতবর্ষে

রাজনীতি ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচনা করিয়াছে। এইভাবে ভারতবাসী এবং বিশেষতঃ বাঙ্গালীর নিকট আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে ও তাঁহারা নিজ অবস্থা ও ক্ষমতা সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হইয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাব প্রবলভাবে অনুভব করিয়াছে। রবীন্দ্র-পর্বে দেশের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি প্রসঙ্গে যে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে এই জাতীয় রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা পবিবেশের ব্যাপক প্রভাব সুমুদ্রিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ মনীষী ব্যক্তিগণের রাজনীতি বা অর্থ নৈতিক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব সুগভীর ও প্রত্যক্ষগোচর হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্র-পর্বে বাংলাদেশের সমাজ, ধর্ম ও চরিত্রনীতির আদর্শ সংকীর্ণ পরিধি অতিক্রম করিয়া এক কল্যাণকর উচ্চতর মানবিকতার পথে অগ্রসর হইয়াছে। বিরোধী সমাজ বা ধর্মের সহিত স্বধর্ম বা স্বসমাজের সমন্বয় সাধনই দেশের সমকালীন সমাজ বা ধর্ম-সংস্কারকগণের মুখ্য চিন্তা বা সংকল্প হইয়াছিল। আচায কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের প্রভাব অপেক্ষা সর্বধর্মসমন্বয়কারী চিন্তার প্রতিভূস্বরূপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ব্যক্তিত্ব ও বাণীমন্ত্রই তৎকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালীর দ্বিধাদ্বন্দ্বযুক্ত অন্তরদেশ আলোড়িত করিয়া সহজ সমাধান-পন্থা নির্দেশ করিয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বাণী ও তাঁহার উদার ধর্মমতের প্রচারকল্পে স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যুদয় রবীন্দ্র-পর্বের অন্যতম প্রধান ঘটনা। এই পর্বে সাধারণতঃ সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরমত সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতির আদর্শ প্রচারিত হওয়ায় এক সর্বজনীন ঐক্যের ভাব জাগ্রত হইয়াছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে ভেদবুদ্ধি, অনৈক্য এবং আচার-ব্যবহারে যে অমূলক কঠোরতা বা নির্দয়তা বর্তমান ছিল, তাহা ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হইয়া সমাজের সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির মনে এক উদার মৈত্রীর ভাব প্রসার লাভ করিয়াছে। এই পর্বের ভাবুক ও মনীষী ব্যক্তিগণ সমাজ, ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়া সামাজিক বিধি-বিধান, ধর্মাদর্শ ও আধ্যাত্মিক ভাব-সাধনার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনে সহায়তা করিয়াছেন এবং এক অভিনব সাধন-মন্ত্রের প্রেরণায় আদর্শ মানবধর্মেরই বাণী তাঁহাদের সর্ববিধ রচনায় প্রচারিত হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজ ও ধর্মতত্ত্ব এবং বিবিধ দার্শনিক মতবাদসমূহের ব্যাপক অনুশীলন ও নির্ভরযোগ্য আলোচনা রবীন্দ্র-পর্বেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ,

উমেশচন্দ্র বটব্যাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বিদ্বজ্জন প্রণীত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধই তাহা প্রমাণিত করিয়াছে। সামাজিক, ধর্মীয় বা দার্শনিক জটিল তত্ত্বের তুলনামূলক সরস ব্যাখ্যায় এই জাতীয় প্রবন্ধের বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ এই পর্বে বিশেষভাবে সাধিত হইয়াছে।

রবীন্দ্র-পর্বে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন দ্রুততর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি, বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্মশক্তির অধিকতর সমুন্নতি লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বসাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব জাতির মনোভূমিকে এক সর্বসংস্কারমুক্ত দিব্য ভাবাবেশে সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে এবং বাঙ্গালী সুমহান্ এক সার্বভৌমিক সত্যের মানদণ্ডে জীবনের সর্ববিধ কর্মকৃতির বিচার-বিশ্লেষণের প্রেরণা অনুভব করিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কৃতির সহিত গভীরতর পরিচয় সাধনের ফলে বাঙ্গালী সাহিত্যিক-গণের জীবন-দৃষ্টি, চিন্তা বা কল্পনাশক্তির পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে এবং বাংলা সাহিত্যও অভিনব রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী কালে বাঙ্গালীর জীবনে কর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্র সমধিক প্রসার লাভ করে নাই। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে মানুষের সাহিত্যদৃষ্টি ও রসানুভূতি যেমন বিস্তৃত ও গভীর হয় না, তেমনি সৃষ্টি-শক্তির বিচিত্র লীলাপ্রসূত শ্রী ও সৌন্দর্য যথার্থ প্রকাশ-পদ্ধতির অভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। জীবন ও জগতের উদার-বিস্তৃত বৈচিত্র্যময় পরিসরে মানব-চিত্ত যথোচিতভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ লাভ করিলে প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভবপর হয়। রবীন্দ্র-পর্বে বাঙ্গালীর কর্মজীবনে ও চিত্তলোকে জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে যে বিচিত্র চিন্তা বা ভাবের জোয়ার আসিয়াছিল, সাহিত্যের বিবিধ শাখার মধ্য দিয়া তাহার সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বেই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ ভাবের প্রাচুর্যে, সৌন্দর্যজ্ঞানে, রসবোধের গভীরতায় এবং ভাষার লালিত্যে ও অভিনব অর্থ-ব্যঞ্জনায় সুমণ্ডিত হইয়াছে। সার্থক রসসমৃদ্ধ কাব্য, উপন্যাস, ছোট গল্প সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক সৃজনীসম্মত সমালোচনাত্মক প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়াও লেখকগণ অত্যাশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দান করিয়াছেন। সাহিত্য-সমালোচনা-মূলক রচনাও যে মৌলিক সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের ন্যায় আপন স্বাতন্ত্র্যে মহীয়ান্ হইয়া উচ্চতর শিল্পরূপ গ্রহণ করিতে পারে, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনামূলক প্রবন্ধই তাহা প্রমাণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিয়া এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনায়

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রিয়নাথ সেন প্রমুখ লেখকগণের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। রবীন্দ্র-পর্বেই বিশুদ্ধ সাহিত্য-শিল্পতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রবন্ধ রচনার প্রাচুর্য ও ইহার অভাবনীয় সমৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

রবীন্দ্র-পর্বে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রধানতঃ ব্যক্তিমানসের স্বাতন্ত্র্য বা অবাধ মুক্তিপ্রবণতা ও স্বাধীন ব্যষ্টিরূপের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যে মুখ্যতঃ ইউরোপীয় ভাববাদ প্রভাবিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (individual self) কল্যাণে অন্তর্মুখী কিংবা নিছক ব্যক্তিগত ভাব বা চিন্তাশ্রিত রচনা (Personal Essay) প্রসার ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। এই পর্বের শেষার্ধে, বিশেষতঃ সাহিত্য-চিন্তামূলক প্রবন্ধসমূহের ভাব ও রূপবৈচিত্র্যে ইউরোপীয় প্রভাব গভীরভাবে অনুভূত হয়। মন্‌টেইন্ (Montaigne), ল্যাম্ব (Lamb), চেষ্টারটন (Chesterton) প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য লেখকগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনাপ্রকরণ এবং প্রধানতঃ ফরাসী লেখক মন্‌টেইনের জীবন-দর্শন ও রচনারীতির দ্বারা বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য অধিক পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। মন্‌টেইনের প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধসমূহে লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্র-পর্বে বিষয়-বৈচিত্র্যের সহিত রূপ-বন্ধনের বিবিধ কৌশল, দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্ব এবং ভাষার লালিত্য ও আলঙ্কারিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য পরিণত যৌবনের প্রবল শক্তি অর্জন করিয়া জীবনের গভীর অনুভূতি ও রসিক শিল্পীর বিচিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাহার অধিকার-সীমা সুষ্ঠুভাবে প্রসারিত করিয়াছে।

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

✓রবীন্দ্রনাথ কবি এবং প্রধানতঃ রোমাণ্টিক কবি—এই পরিচয়ের দ্বারাই তিনি সমগ্র বিশ্বে বিশ্রুতকীর্তি হইয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভা কেবলমাত্র কাব্যের ক্ষেত্রেই সীমায়িত ছিল না, তাহা সহজ-সুন্দর রসময় ভঙ্গিতে প্রবাহিত হইয়া বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগই দুর্লভ ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, সংগীত, প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের যে বিভাগই তিনি স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাই রূপে, রসে, ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া শতদলের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম কবি-মনীষার উজ্জ্বল দীপ্তিতে তাঁহার অন্যবিধ সাহিত্য-কর্ম অপেক্ষাকৃত ম্লান হইলেও ইহা অনস্বীকার্য যে, বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ একটি উচ্চশ্রেণীর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং তাঁহার সম্পূর্ণ নবতম ভাব বা শিল্পসৃষ্টির দ্বারা বাংলা প্রবন্ধের বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এমন বিরল প্রতিভার মণিকাঞ্চনযোগে অধুনা বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যে আন্তর্জাতিক গৌরবময় স্তরে উন্নীত হইয়াছে।✓ রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী কবি-প্রকৃতি প্রবন্ধ রচনাকালেও সম্পূর্ণভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকে নাই। তাঁহার রোমাণ্টিক ভাবধর্মী সৃজনকুশলী কবিমন প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ কেবলমাত্র বস্তুধর্মী নীরস তত্ত্ব বা তথ্য বিশ্লেষণেই পর্যবসিত হয় নাই, তাহা তাঁহার অনুভূতি-স্নিগ্ধ কবিমনের মধুর স্পর্শে এক রসসমৃদ্ধ অভিনব সাহিত্য-কর্ম হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অনুপম সৃজনী-প্রতিভার প্রকাশ ভাবে ও রূপে যেমন স্বতন্ত্র ও বিচিত্র, তেমনি তাহা বহুমুখী ধারায় বিকশিত হইয়াছে। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যও তাঁহার অপরিমিত দানে সমৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। শিল্প ও সাহিত্য-জিজ্ঞাসা, রাজনৈতিক চিন্তা, সমাজ-সংস্কার সম্পর্কিত সমস্যা, ছন্দ, অলংকার বা বৈয়াকরণিক তত্ত্বের অভিনব গবেষণা, বিজ্ঞান, শিক্ষানীতি, ইতিহাস ও ধর্ম-দর্শনের জটিল বিচার-বিতর্ক প্রভৃতি সকল বিষয়ই রবীন্দ্রনাথের

নিজস্ব কল্পনা ও স্বকীয় অনুভূতির রূপ ও রসে অনুরঞ্জিত হইয়াছে। বিদগ্ধ মনন-চিন্তা ও গভীর সৌন্দর্যবোধের অপূর্ব সমন্বয়ে তাঁহার সর্ববিধ প্রবন্ধ মধুস্বাদী ও রসদ্যোতক হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্র-প্রবন্ধ প্রচলিত বাংলা প্রবন্ধ ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বতন্ত্র। সাধারণ প্রবন্ধ প্রধানতঃ তথ্য ও তত্ত্বে সুসংবদ্ধ এবং সুশৃঙ্খল যুক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতায় সমৃদ্ধ। সুসঙ্গত চিন্তাপ্রসূত কোন বিশেষ ভাব-সত্য বা উদ্দেশ্যই সাধারণতঃ প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। অতএব যুক্তি ও বিচাররীতির পারম্পর্য ও চাতুর্য, ভাব, ভাষা ও চিন্তাধারায় অনুচ্ছ্বসিত স্বচ্ছতা ও সংগতি এবং তথ্য ও তত্ত্বের সুপ্রণালীবদ্ধ সমাবেশ ও পরিবেশনাই রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই জাতীয় প্রবন্ধ ইংরাজী সাহিত্যে Literature of Knowledge অর্থাৎ জ্ঞানের সাহিত্য নামে পরিচিত হইয়াছে। রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী বাঙ্গালী প্রবন্ধকারগণ মুখ্যতঃ এই শ্রেণীর প্রবন্ধই রচনা করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ প্রচলিত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ধারার অন্তর্গত নহে। তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে যদিও চিন্তাগর্ভ বিষয়ের গৌরব ও মহিমা বর্তমান, কিন্তু তাহা লেখকের আত্মগত ভাবরসে এমনভাবে জারিত হইয়াছে যে, তাহা দ্বারা কোন তথ্য-তত্ত্ব সমন্বিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান বা সত্য প্রচারিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের সকল বিষয়ই গভীর হৃদয়ানুভূতি, সহজাত ভাব-কল্পনা ও স্বকীয় জীবন-দৃষ্টির মধ্য দিয়া যেভাবে তাঁহার চিত্তলোকে প্রতিভাত হইয়াছে, তাঁহার সর্ববিধ প্রবন্ধের মাধ্যমেও সেইভাবেই তাহা রূপ লাভ করিয়াছে। সাধারণ তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধের রচনাদর্শের বিরোধিতা করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে যে নূতন রীতি আশ্রয় করিয়াছেন, তাহা ইংরাজীতে Literature of Pleasure বা Power অর্থাৎ আনন্দময় বা রসসমৃদ্ধ সাহিত্য নামে পরিচিত। এই নবতম রূপকল্পের আধারেই তাঁহার প্রবন্ধগত ভাব বা বিষয় বিলসিত হইয়াছে। এবং ইহা দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী প্রবন্ধকারগণের রচনা হইতে তাঁহার প্রবন্ধের মৌলিক পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ভাষা সরস, সুললিত ও অলংকৃত এবং তাঁহার রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি তাঁহার প্রবন্ধগত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও সহজ ও সহৃদয় সামাজিকের ন্যায় সাধারণ্যে এমন সুন্দরভাবে পরিবেশন করিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বসূরী কোন প্রবন্ধকারের মধ্য দিয়া তাহা সার্থক

হইতে পারে নাই। রবীন্দ্র-প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য, মূল রহস্য ও রসবৈচিত্র্য যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুরসিক সমালোচক অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন—

'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ। সাহিত্যের সমালোচনায়, কি রাষ্ট্র ও সামাজিক সমস্যার আলোচনায়, বাংলা কবিতার ছন্দবিচারে, কি বাংলা ব্যাকরণের রীতি ও বাংলা শব্দতত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে—সর্বত্র পড়েছে মহাকবির মনের ছাপ, সর্বত্র মহাকবির বাগ্‌বৈভব। বিচারে যুক্তির মধ্যে হঠাৎ এল উপমা। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ান্তরের স্পর্শে অদ্ভুত ঐক্যের আলোর চমক পথ আলো ক'রে দিল। * * * ভাষা ও প্রকাশকে অমুদ্‌বেজিত রেখে শ্রোতার মনে আবেগ-সঞ্চারের যে কৌশল মহাকবির আয়ত্ত তার দোলা এ সব প্রবন্ধে লেগেছে। * * * এ রকম প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ; এ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।'[১]

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার যে বিশেষ স্বতন্ত্র ও নিগূঢ় ভঙ্গি এবং রসসৃষ্টির যে কৌশল, তাহা দ্বারা জটিল দার্শনিক বা জ্ঞানাত্মক রচনাও সহজ ও সরস হইয়া সৃজনীমূলক সাহিত্যের (Creative Literature) মর্যাদা লাভ করিয়াছে। তাঁহার সর্ববিধ প্রবন্ধই জীবন-প্রত্যয়ের গভীরে প্রসারিত ও বিশুদ্ধ সাহিত্য-শিল্পরসে অভিষিক্ত। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি এবং তাঁহার কবি-কল্পনা ভাব ও বস্তু, চিন্তা ও অনুভূতির রূপ ও রসে বিশিষ্টভাবে রূপায়িত ও অনুরঞ্জিত এবং এক অপূর্ব-সুন্দর গীতিধর্মে অনুপ্রাণিত। এইপ্রকার গীতিধর্মী, সৃষ্টিকুশলী কবি-মানসের মহিমায় রবীন্দ্রনাথের সকল রচনাই এক অভিনব শিল্পরূপ লাভ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সর্ববিধ সাহিত্য-কর্মই তাঁহার কবিসত্তার বিকল্প রূপ বা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সদাজাগ্রত সুমহান্ ভাবনার সহিত সুনিপুণ ভাবগ্রাহিতা, সর্বতোমুখী বুদ্ধিবৃত্তির সহিত অন্তরঙ্গ হৃদয়ানুভূতি এবং শ্রমসাধ্য জ্ঞান সাধনার সহিত গভীর সৌন্দর্যচেতনার দুর্লভ সমন্বয় সাধনের ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসমূহ স্বয়ম্প্রকাশ ও সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা যেমন বিষয়ের বিপুল-ব্যাপ্ত পরিধি, বৈচিত্র্য ও আশ্চর্য যুগান্তকারী গম্ভীর মহিমায় মহিমান্বিত, তেমনি ভাবপ্রকাশের নিত্য অভিনব ভঙ্গি ও তাহার বিস্ময়কর

১ প্রমথ চৌধুরী প্রণীত 'প্রবন্ধ-সংগ্রহে'র (১ম খণ্ড) ভূমিকা, (বিশ্বভারতী, ১৯৫২), পৃঃ ৵৹

সৌন্দর্যময়তার ভাস্বরে দীপ্তিময়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জটিল বিষয়াত্মক প্রবন্ধও অপূর্ব গীতিরস ধারায় স্নাত ও সিক্ত হইয়া যে বাণীরূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা যেমন অভিজাত রুচিসম্পন্ন প্রসাধনকলায় মণ্ডিত তেমনি বিচিত্র অলংকারে সজ্জিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সতত নূতন ভাব-চিন্তা ও প্রকাশ-পদ্ধতির অনন্য সাধারণত্বই তাঁহার প্রবন্ধ-সাহিত্যকে সার্থক-সুন্দর ও চিত্তগ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ যেমন গভীর রসবোদ্ধা, তেমনি একজন রূপরসিক প্রবন্ধকার। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে অভিনব রূপকল্পের এক অনন্য রূপকার। তাঁহার প্রবন্ধ রচনার রূপ ও রীতিতে আত্মবৈশিষ্ট্যের গভীর চিহ্ন সুমুদ্রিত। এই প্রকার ব্যক্তি-স্বতন্ত্র আত্মনিষ্ঠ রচনাভঙ্গি বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথেরই সার্থক ও সফল সংযোজনা। সাধারণ প্রচলিত প্রবন্ধ-দেহের গঠন-সৌষ্ঠবের সহিত রবীন্দ্র-প্রবন্ধের বিশেষ পার্থক্য ইহা দ্বারাই সহজে সুস্পষ্ট গোচর হয় এবং পূর্ববর্তী প্রবন্ধকারগণের রচনারীতি হইতে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার রূপ ও রীতির স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করা যায়। তাঁহার সর্ববিধ প্রবন্ধেই কবির ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতম প্রকাশ ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধির উপাদান বা তথ্য-সামগ্রী দ্বারা তাঁহার কোন প্রবন্ধই ভারাক্রান্ত করেন নাই। সিদ্ধান্তমুখী যুক্তিবিচারনিষ্ঠ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের কৌশল ত্যাগ করিয়া তিনি অন্তরানুভূতির জারকরসে বুদ্ধিগ্রাহ্য উপাদানসমূহ স্নিগ্ধ, কমনীয় ও প্রসাদগুণান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। কবি-হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভবের রসসিদ্ধ প্রকাশই রবীন্দ্র-প্রবন্ধের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। ইহা অনস্বীকার্য যে, মননশীল যুক্তিগর্ভ বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রচলিত ধারায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিনিষ্ঠ সুনিবিড় ভাবদৃষ্টিজাত প্রবন্ধ অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

রবীন্দ্র-প্রবন্ধের রূপভঙ্গি বক্রোক্তি, উৎপ্রেক্ষা, উপমা ইত্যাদি বিভিন্ন অলংকারের যথোচিত প্রয়োগনৈপুণ্যে অধিক সমৃদ্ধিশালী ও প্রাণবন্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, এক সূক্ষ্ম স্নিগ্ধ সহজ মৃদুল রসিকতায় রবীন্দ্রনাথের সকল বিষয়ক প্রবন্ধই 'সহৃদয় হৃদয়সংবেদ্য' হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্র-প্রবন্ধ গভীর মননশীলতা ও অসীম সৌন্দর্যানুভূতির আশ্চর্য সমন্বয়ে যেমন অপরূপ, তেমনি তাহা কবির অভিনব গদ্যভাষার শৈল্পিক রূপায়ণে অনবদ্য হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগত আঙ্গিক বা রচনারীতির মাধুর্য সর্বত্র উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধের ভাব-সম্পদ ও ভাষা-শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব কাহারও অস্বীকার

করিবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি ও ভাষার বিস্ময়কর অভিব্যক্তি তাঁহার সুদীর্ঘ কালব্যাপী একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনার ফল। তাঁহার গদ্যভঙ্গি ও ভাষার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ তিনটি পৃথক্ স্তর সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা মুখ্যতঃ বিভিন্ন সাময়িক পত্রের অনিবার্য প্রেরণা ও প্রভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বিবিধ সাহিত্য-পত্রের সম্পাদক হিসাবেও খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় 'ভারতী', 'সাধনা', 'ভাণ্ডার', 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়) প্রভৃতি সাময়িক পত্রসমূহ বিশেষভাবে সমাদৃত ও জনপ্রিয় হয়। স্ব-সম্পাদিত পত্রিকা ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ সমকালীন অন্যান্য বহুসংখ্যক সাহিত্য-পত্রিকার সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সংস্পর্শে কয়েকটি পত্রিকার অভাবনীয় সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্র-প্রবন্ধের প্রকাশরীতি ও ভাষা-শিল্পের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে যে বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে, তাহা সাময়িক পত্রিকাসমূহের ভিত্তি বা পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ করাই অধিক সঙ্গত ও সুবিধাজনক। কারণ, সাময়িক পত্রিকার যুগোচিত প্রেরণা ও প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গদ্যভাষা ও রীতির পরিবর্তন ও পরিমার্জনে অধিকতর সচেষ্ট হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি ও ভাষাগত বিভিন্ন পরিবর্তন কেবলমাত্র তাঁহার প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই লক্ষণীয় নহে, তাহা তাঁহার অন্যবিধ সকল সাহিত্য-কর্মেই সমভাবে সংসাধিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ রচনা প্রধানতঃ 'ভারতী' পত্রিকাকে আশ্রয় করিয়াই সুরু হইয়াছে। 'ভারতী' (১৮৭৭) পর্বে তাঁহার প্রবন্ধসমূহে যে রীতি ও ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম ভাষা-স্তর হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। পরবর্তী কালে যথাক্রমে 'সাধনা' (১৮৯১), 'বঙ্গদর্শন', [নবপর্যায়] (১৯০১) ও 'সবুজপত্র' (১৯১৪) পর্বে রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষা ও রীতির ক্ষেত্রে বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং উল্লিখিত দুই পর্বের রচনাসমূহ তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাষা-স্তরের দৃষ্টান্ত স্বরূপে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের আদি পর্যায়ের প্রবন্ধের ভাষা ও রচনারীতি অপেক্ষাকৃত অনুকরণজাত ও অপরিণত এবং প্রবন্ধগত বিষয়ও উচ্ছ্বাসের বাহুল্য ও ভাষাতিশয্যে ভারাক্রান্ত। কিন্তু অনতিকাল পরেই রবীন্দ্র-প্রবন্ধ পরিণত গদ্যরীতি এবং ভাষার সংযম ও মাধুর্য লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং ভাব-চিন্তাও সংযত ও শান্তরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

সমকালীন কাব্যগ্রন্থাদির আলোচনা ও দেশের সাম্প্রতিক বিবিধ সমস্যাসমূহের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত হইয়াছে। এ কথা সত্য যে, আদি পর্যায়ের প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রচনা-সৌন্দর্যের অভিনবত্ব সম্পূর্ণভাবে অপরিস্ফুট থাকে নাই। আদি পর্যায়ের সর্ববিধ প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে উচ্ছ্বাসপ্রবণতা বা আলোচনার অযথা বিস্তৃতির জন্য তাঁহার ভাবগত যে মৌলিক বা অন্তর্নিহিত শক্তি ও কাব্যগুণ, তাহা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায় নাই। কেবলমাত্র বাগাড়ম্বর অর্থাৎ তাৎপর্যশূন্য অপ্রাসঙ্গিক বাক্-প্রপঞ্চে তাঁহার প্রবন্ধ বহুলক্ষেত্রেই অনাবশ্যক দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'সমালোচনা' গ্রন্থে সংকলিত অধিকাংশ প্রবন্ধেই এই জাতীয় ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। ইহা অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথের আদি পর্যায়ের প্রবন্ধের ভাষায় যথোচিত সৌষম্য বা সুষ্ঠু সংগতি লক্ষ্য করা যায় না। তাঁহার শব্দ, পদ বা বাক্যগ্রন্থন-পদ্ধতির মধ্যে যথাযথ নৈপুণ্যের অভাব দৃষ্ট হয়। সাধু ভাষার বাক্যগঠনভঙ্গির সহিত কথ্য ভাষা বা ভঙ্গির নির্বিচার ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনার সাবলীল গতিবেগ ব্যাহত হইয়াছে এবং বাক্য-বন্ধনে এই প্রকার অসতর্কতা ও শৈথিল্যবশতঃ তাঁহার প্রবন্ধের ভাষা কোথাও সুষ্ঠু ও সংহতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের আদি পর্যায়ের প্রবন্ধসমূহে এই জাতীয় বাক্যগ্রন্থন বা ভাষাগত বিবিধ ত্রুটি পরিলক্ষিত হইয়াছে।

'সাধনা-বঙ্গদর্শন' পর্ব অর্থাৎ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সবুজপত্র' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধে মুখ্যতঃ যে স্টাইল অর্থাৎ রচনারীতি ও ভাষার অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভাষার ক্রমোন্নতির দ্বিতীয় স্তর হিসাবে উল্লেখ করা যায়। এই স্তরে রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গি ও ভাষা লালিত্য, ঔজ্জ্বল্য ও সরসতায় সমৃদ্ধ; ভাবাবেগ ও ভাবাবেশের পরিমিতিবোধে হৃদ্য ও মধুর এবং ব্যঞ্জনা, চিত্রকল্প ও অলংকারের প্রয়োগনৈপুণ্যে অধিকতর দ্যুতিময়। এই দ্বিতীয় স্তরের ভাষা-শিল্পে রবীন্দ্র-প্রবন্ধের সপ্রাণতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি'। 'জীবন-স্মৃতি'র ভাষা ও রচনারীতি রবীন্দ্রনাথের প্রকাশধর্ম বা ভাষা-শিল্পের পরাকাষ্ঠা হিসাবে সাহিত্য-সমালোচক বর্গের প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ভাবার্থের শুচি স্নিগ্ধতায় ও প্রকাশধর্মের প্রসন্নতায় রবীন্দ্রনাথের সর্ববিধ রচনাই সমুজ্জ্বল এবং উৎকৃষ্ট

রূপক ও উপমার হরগৌরী মিলনে রবীন্দ্র-প্রবন্ধের দ্বিতীয় স্তরের ভাষাপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত লাবণ্যময় ও রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্র-প্রবন্ধের তৃতীয় বা শেষ ভাষা-স্তর অর্থাৎ 'সবুজপত্র' পর্বে রবীন্দ্রনাথের ভাষা-শিল্পের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্ববর্তী পর্বের কাব্যধর্মী অলঙ্কারবহুল সাধু ভাষার পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ এক্ষণে সাহিত্যিক রূপসৃষ্টির অন্যতম বাহন হিসাবে সতেজ ও সুস্পষ্ট কথ্য ভাষা ও রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ যদিও তাঁহার সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভকালীন কয়েকটি রচনায় কথ্য ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে অধুনাতন ব্যবহৃত কথ্য ভাষাগত প্রাণশক্তির তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতার অভাব ছিল এবং শাণিত-সুন্দর তরবারির ন্যায় তাহার সতেজ দীপ্তিও ছিল না। চলিত ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম প্রয়োগনৈপুণ্যই রবীন্দ্রনাথের এই গদ্যরীতির একমাত্র অবলম্বন নহে—ইহার সর্বাপেক্ষা প্রধান বৈশিষ্ট্য যে, ইহাতে সুবিস্তৃত, দূরবিলম্বিত, অবসরভাবমণ্ডিত ব্যঞ্জনারূপ কিংবা অলংকার, চিত্রকল্প ও ভাবাবেগের বাহুল্য কোথাও নাই এবং সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগও ইহাতে অপেক্ষাকৃত কম। সহজ সরল অথচ যথাযথ উপমা ও রূপকাদি অর্থ-ব্যঞ্জনার সহিত রমণীয় আঙ্গিক আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথের কথ্য গদ্যরীতি ও ভাষাকে অনবদ্য করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' গ্রন্থের ভাষা-রূপ ও রীতি ইহার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। কথ্যভাষা ও রীতি যে অসীম প্রাণশক্তির অধিকারী, তাহা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের শেষ পর্বে লিখিত প্রবন্ধাদি ও অন্যান্য সফল গদ্য-রচনা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার বিভিন্ন পর্বে লিখিত প্রবন্ধসমূহের মধ্য দিয়া উল্লিখিত তাঁহার ত্রিবিধ ভাষা-রূপ ও রীতি প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে প্রায় সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং একমাত্র তাঁহার সম্পর্কেই এই উক্তি সার্থক যে, বাংলা সাহিত্যের এমন বিভাগ বা বিষয় বিরল, যাহা রবীন্দ্র-প্রতিভার দ্বারা আলোকিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থের সংখ্যাও পরিমাণে অল্প নহে। কতকগুলি প্রবন্ধ একত্র করিয়া বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্র-প্রবন্ধের বহু সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধ-সংগ্রহে বহুল ক্ষেত্রেই কোন নির্দিষ্ট বিষয়ক প্রবন্ধের একত্র গ্রন্থন সম্ভবপর হয় নাই এবং সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের

কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলনগ্রন্থকে কোন বিশেষ বিষয়ক প্রবন্ধ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের সর্ববিধ প্রবন্ধের বিচার-বিশ্লেষণের সুবিধার্থে তাঁহার প্রবন্ধ-সমূহকে যথাক্রমেঃ ১। সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা, ২। ধর্ম ও দর্শন, ৩। সমাজ, ইতিহাস ও রাজনীতি, ৪। শিক্ষা, ৫। চরিত কথা ও আত্মস্মৃতি, ৬। বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব, ৭। পর্যটন ও চিঠিপত্র এবং ৮। বিবিধ—এইরূপ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্য-সমালোচক রূপে রবীন্দ্রনাথ প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ১২৮৩ বঙ্গাব্দে 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামক মাসিক পত্রিকায় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', রাজকৃষ্ণ রায়ের 'অবসর সরোজিনী' ও হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'দুঃখসঙ্গিনী' নামক তিনখানি কাব্যগ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা করেন। ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত সাহিত্য-সমালোচনা। তাঁহার এই আলোচনা-ভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধটি 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' শিরোনামায় 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী কালে ইহা রবীন্দ্রনাথের কোন প্রবন্ধ সংকলনগ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই প্রবন্ধে খণ্ড-কাব্য ও গীতিকাব্যের স্বরূপ বা প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য বিচার করিয়া মহাকাব্যের সহিত ইহাদের পার্থক্য নিরূপণে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'অবসরসরোজিনী' ও 'দুঃখসঙ্গিনী' এই কাব্যত্রয়ীর কোনটিতেই যে গীতিকাব্যোচিত লক্ষণ বা ধর্ম পরিস্ফুট হয় নাই, তাহা তিনি বিচক্ষণভাবে বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। সাহিত্য-সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রথমদিকে বিশ্লেষণধর্মী তুলনামূলক পদ্ধতি (analytic) অবলম্বন করিয়াছেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি', 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা', 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের আদি পর্বের প্রবন্ধসমূহে এই বিচার-রীতিই বিশেষভাবে অনুসৃত হইয়াছে। সমালোচনা ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতি বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনার আদি পর্বে সাহিত্য-সমালোচকশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করা যায়। এমন কি, প্রবন্ধের ভাষা ও বাগ্‌ভঙ্গিমাতেও উভয় মনীষীর সবিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' এবং রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' এই দুইটি প্রবন্ধের পরস্পর তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের অপরিমেয় প্রভাব সুস্পষ্টভাবে

উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখিত আদি পর্বের সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধে বঙ্কিমী সমালোচন-রীতি অনুসৃত হইলেও তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের ন্যায় সর্বতোভাবে যুক্তিনিষ্ঠ হইয়া উঠে নাই, তাহা মুখ্যতঃ আবেগপ্রধান হইয়াছে। কল্পনাতিশয্য, ভাবপ্রবণতা, দার্শনিকতা প্রভৃতি রবীন্দ্র-প্রবন্ধের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি রবীন্দ্রনাথের আদি পর্বের প্রবন্ধসমূহেও অঙ্কুরিত বা আভাসিত হইয়াছে। আদি পর্বে তাঁহার চিন্তাগর্ভ, মনন বা যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের সংখ্যা পরিমাণে অল্প। রবীন্দ্রনাথের আদি পর্বীয় যে কয়েকটি প্রবন্ধে নির্ভীক স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিশীলতার পরিচয় বর্তমান, তাহাও তাঁহার অপরিণত চিত্তের অস্থিরতা বা উষ্ণতা ও অপরিপক্ক বিচার-বুদ্ধির প্রগল্‌ভতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামক সমালোচনাত্মক প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'একটি মহৎ চরিত্র হৃদয়ে আপনা হইতে আবির্ভূত হইলে কবি যেরূপ আবেগের সহিত তাহা বর্ণনা করেন, মেঘনাদবধ কাব্যে তাহাই নাই। এখনকার যুগের মনুষ্য চরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাঁহার কল্পনায় উদিত হইলে, তিনি তাহা আর এক ছাঁদে লিখিতেন। তিনি হোমরের পশুবলগত আদর্শকেই চোখের সমুখে খাড়া রাখিয়াছেন। * * * মাইকেল ভাবিলেন, মহাকাব্য লিখিতে হইলে গোড়ায় সরস্বতার বর্ণনা করা আবশ্যক, কারণ হোমর তাহাই করিয়াছেন; অমনি সরস্বতীর বন্দনা সুরু করিলেন। মাইকেল জানেন, অনেক মহাকাব্যে স্বর্গ নরক বর্ণনা আছে, অমনি জোর-জবরদস্তি করিয়া কোনপ্রকার কায়ক্লেশে অতি সঙ্কীর্ণ, অতি বস্তুগত, অতি পার্থিব, অতি বীভৎস এক স্বর্গ নরক বর্ণনার অবতারণ করিলেন। মাইকেল জানেন, কোন কোন বিখ্যাত মহাকাব্যে পদে পদে স্তূপাকার উপমার ছড়াছড়ি দেখা যায়, অমনি তিনি তাঁহার কাতর পীড়িত কল্পনার কাছ হইতে টানা-হেঁচড়া করিয়া গোটাকতক দীনদরিদ্র উপমা ছিঁড়িয়া আনিয়া একত্র জোড়াতাড়া লাগাইয়াছেন।'[১]

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের ষোল বৎসর বয়সের রচনা এবং স্বভাবতঃই এই প্রবন্ধের ভাব ও-ভাষা বিন্যাসে তাঁহার অপরিণত মনের অসংযত পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। পরিণত রসবোধের অভাবে তাঁহার সমালোচনাটি যথার্থ সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই এবং পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাহা উপলব্ধি করিয়া উক্ত সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন—

১ 'সমালোচনা', (কলিকাতা, ১২৯৪), পৃঃ ৩৭-৩৮

'অল্প বয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম।'[১]

সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণাত্মক(analytic) সমালোচন-রীতি প্রথমতঃ আশ্রয় করিলেও রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনা-পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত অনুশীলন করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ও কবিমানস বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল এবং সেই কারণে, সাহিত্য-দৃষ্টির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-সমালোচন-রীতি ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হইয়া নিজস্ব স্বতন্ত্র ধারায় অগ্রসর হইয়াছে এবং স্বীয় প্রকৃতি ও রূপ-রীতির মধ্যে স্থিতি লাভ করিয়াছে। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের অভিনব সংশ্লেষাত্মক (synthetic) আলোচনাভঙ্গিই প্রধানতঃ তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনাত্মক প্রবন্ধসমূহে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই জাতীয় সমালোচনা প্রথাসিদ্ধভাবে বিষয় বা ভাবের যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ নহে। ইহা যেন প্রতিপাদ্য বিষয় বা ভাবের ক্ষেত্রে অভিনবভাবে এক সৌন্দর্য-রূপের সংযোজনা—কবি রবীন্দ্রনাথের ইহা এক সম্পূর্ণ নবতম সাহিত্যিক সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধে প্রচলিত সাহিত্য-সমালোচনার সংজ্ঞানুসারে প্রতিপাদ্য ভাব বা বক্তব্য বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণ করেন নাই। তিনি মূল বিষয়ের গভীরতম প্রদেশে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন এবং 'আপন মনের মাধুরী' দিয়া এক নূতন রসলোক সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সাহিত্য-সমালোচনার এক নূতন দিগন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য রসিক-সমালোচকের ভাষায় এই জাতীয় সাহিত্যালোচনা —'A creation within a creation'.

রবীন্দ্রনাথের অভিনব পদ্ধতিতে সাহিত্য-বিচার বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তাঁহার এক মৌলিক দান হিসাবে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য। রস-গভীর ভাবানুযায়ী ভাষার লালিত্য ও শব্দঝঙ্কারে তাঁহার আলোচনার মৌলিকত্ব বা স্বাতন্ত্র্য অধিকত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্য বা কাব্যগ্রন্থ বিশেষের সমালোচনা অর্থাৎ ব্যাখ্যানিপুণ আলোচনা যে মৌলিক সৃষ্টিশীল রচনার ন্যায়

১ 'জীবন-স্মৃতি', (বিশ্বভারতী, ১৩৬৩), পৃঃ ৮৩

সরস-সুন্দর হইতে পারে, তাহা রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রায় অজ্ঞাত ছিল এবং রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোক-সাহিত্য' ও 'আধুনিক সাহিত্যে'র নির্যাস তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার জারকে জীর্ণ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে এক নব সৃষ্টির রস পাঠক-সমাজকে দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের আদি পর্বীয় সাহিত্য-সমালোচনাত্মক প্রবন্ধসমূহের অধিকাংশই তাঁহার 'সমালোচনা' (১৮৮৮) নামক প্রবন্ধ-সংগ্রহগ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। পরবর্তী কালে তাঁহার প্রণীত সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধের সংকলনগ্রন্থ যথাক্রমে : ১। 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭), ২। 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭), ৩। 'সাহিত্য' (১৯০৭), ৪। 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯০৭), ৫। 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) ও ৬। 'সাহিত্যের স্বরূপ' (১৯৪৩) ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোক-সাহিত্য' ও 'আধুনিক সাহিত্য' এই তিন গ্রন্থে সংকলিত অধিকাংশ প্রবন্ধের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-ধর্মের বিচার-বিশ্লেষণগুণ অপেক্ষা কাব্যগুণই অধিক সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথের রসসিক্ত মনোভূমিতে যে ভাবপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহা দ্বারাই তিনি সাহিত্যের শাশ্বত সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর বেদীমূলে অর্ঘ নিবেদন করিয়াছেন। শুচিস্নাত উদারচিত্তে কোন বিষয় বা ভাবের অনুচিন্তা, তাঁহার মতে পূজারই বিকল্প রূপায়ণ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-ধর্মের প্রধান রহস্য ইহার মধ্যেই নিহিত। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সাহিত্য-সমালোচনার স্বরূপ প্রসঙ্গে তাঁহার 'রামায়ণ' প্রবন্ধের একাংশে লিখিয়াছেন—

'পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা, এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। * * * যথার্থ সমালোচনা পূজা—সমালোচক পূজারি পুরোহিত—তিনি নিজের অথবা সর্ব-সাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।'[১]

রবীন্দ্রনাথের কাব্যমদিরময় সরস আলোচনায় 'প্রাচীন সাহিত্য' কবির এক অভিনব সাহিত্যিক সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। বাল্মীকি, কালিদাস, বাণভট্ট, প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় কবিগণের সাহিত্যকৃতিই 'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্য-রাজ্যের এই মনোরম কাব্য-উপবনে ভাবমুগ্ধ

'প্রাচীন সাহিত্য', (বিশ্বভারতী, ১৩৫৬), পৃঃ ৭-৮

কবির বিচিত্র লীলাবিলাস ঘটিয়াছে এবং এই লীলাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া কবি এক কল্যাণময় শাশ্বত সৌন্দর্যের বন্দনা-গীতিই রচনা করিয়াছেন। 'রামায়ণ', 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', 'কাদম্বরীচিত্র', 'ধম্মপদং' প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ প্রাচীন ভারতবর্ষের বিরাট প্রাণশক্তিকে গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন এবং তাহার সত্যনিষ্ঠ আদর্শ ও মর্মপ্রকৃতির স্বরূপ উদঘাটন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে ভারতীয় গভীর অধ্যাত্মবোধ ও বৃহৎ জীবনাদর্শের যে মহান্ আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের ঋষিদৃষ্টি দ্বারা উন্মোচিত হইয়াছে। পূজারী—পুরোহিতের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধসমূহে নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গিতে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যগত বিচিত্র ঐশ্বর্যের রূপই প্রকাশ করিয়াছেন।

'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রবন্ধ পর্যালোচনা করিলে লক্ষ্য করা যায় যে, ইহাতে রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতসত্তার এক অপূর্ব সমন্বয় অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ মিলন ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন ধ্যানযোগী রসবেত্তা দ্রষ্টাপুরুষ, তেমনি স্বয়ং স্রষ্টা ও একজন কৃতী শিল্পী। একদিকে যেমন তিনি রস ও সৌন্দর্যের গহনরাজ্যে প্রবেশ করিয়া রসপিয়াসী মনের পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছেন, তেমনি অপরদিকে তাঁহার অতি সূক্ষ্ম-অন্তর্দৃষ্টি, ঔদার্যবোধ এবং গভীর অনুভূতির সহায়তায় শিল্পীর সৃষ্টি-মহিমা ও সৃষ্টি-কৌশল যথার্থরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এই যে, তিনি রসানুভূতির অনিবার্য প্রেরণায় উপলব্ধ বিষয়বস্তুকে তাঁহার অনবদ্য অলংকৃত ভাষায় প্রকাশ করিয়া এক নূতন সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করিয়াছেন। কবিমানস ক্ষেত্রে স্রষ্টা এবং ভোক্তা এই দুই রূপই ক্রিয়াশীল থাকায় রবীন্দ্রনাথের এই সকল প্রবন্ধ রসশূন্য, বিবৃতিসর্বস্ব আলোচনায় কিংবা গীতিধর্মের অহেতুক ভাবাতিশয্যে পর্যবসিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের রস-বিচারক্ষমতা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি এবং সর্বোপরি গভীর পাণ্ডিত্য ও অতলস্পর্শী অন্তর্দৃষ্টির ফলে তাঁহার বক্তব্য বিষয় কোথাও জটিল ও গুরুভার হইয়া উঠে নাই; বরং বক্তব্য ও বাচনভঙ্গির আশ্চর্য-সুন্দর সমন্বয়ে এক রসমধুর ব্যঞ্জনা প্রতিপাদ্য বিষয়ের আস্বাদনকে অপূর্ব করিয়া তুলিয়াছে।

দূরত্বের অস্পষ্ট আবরণে রহস্যময় অতীতের প্রতি রোমাণ্টিক কবিগণ সর্বদাই এক গভীর আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন। কবি রবীন্দ্রনাথও সুদূর অতীত লোকের রস-পিয়াসী। ভারতবর্ষের অতীত জীবনের রূপ ও রস তাঁহার

কবিমানসে মহিমময়ভাবে জাগ্রত হইয়াছে। ভারতের আদি কবি বাল্মীকির 'রামায়ণ' কাব্যের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের এক চিরন্তন রূপ-মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছেন এবং ভারতীয় সনাতন সত্যাদর্শের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিপ্রেক্ষিতেই আধুনিক বস্তুবাদী ইউরোপীয় আদর্শ ও মতবাদের বিচার-বিশ্লেষণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। 'রামায়ণে'র মহনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি কবির রসিকজনোচিত দৃষ্টি-রশ্মিতে নূতন তাৎপর্যসহ সাধারণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

'রামায়ণ' প্রবন্ধে এই বিশিষ্ট মহাকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, রামায়ণ কেবলমাত্র এক রসসমৃদ্ধ মহাকাব্য নহে—ইহাতে ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস বিধৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বা সময়ানুক্রমিক তালিকা লিপিবদ্ধ না হইলেও ইহার মধ্য দিয়া ভারতের চিরন্তন বাণী সজীব মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ভারতবর্ষের আশা-আকাঙ্খা ও মহান্ আদর্শ ই মহর্ষি বাল্মীকির অপূর্ব কাব্যগাথায় প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণকে শান্তরসের কাব্য—ভারতীয় গৃহাশ্রমের এক অপূর্ব আলেখ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, রাম-রাবণের যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা এই কাব্য বীররস-প্রধান হইয়া উঠে নাই—পশুবলের প্রতিষ্ঠা, রক্তাক্ত বিপ্লব এই মহাকাব্যের শেষ পরিণতি বা লক্ষ্য নহে। রামায়ণ সাধারণ মানুষের কাব্য, ইহা মানব-প্রেম মহিমারই এক বিজয় গাথা।

'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মেঘদূত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও মাধুর্যের পরিচয় অতি নৈপুণ্যসহকারে পরিবেশন করিয়াছেন। মহাকবির সৌন্দর্যবোধের সহিত কবি রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনার সার্থক-সুন্দর সমন্বয়ে ইহা এক অভিনব মেঘদূত হইয়া উঠিয়াছে। মূল 'মেঘদূত' কাব্যের নির্বাসিত বিরহী যক্ষের বেদনা কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্লোকে প্রাচীন ভারতবর্ষের সৌন্দর্যজগত হইতে চিরকালের জন্য নির্বাসিত মানুষের অতলস্পর্শ বিরহ-বাণীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। কল্পনার মেঘদূত আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন যুগের সৌন্দর্যমধুর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন এবং দেশ ও কালের অনন্ত ব্যবধান সত্ত্বেও এক শাশ্বত মানবাত্মার নিবিড় ঐক্য অনুভব করিয়া পুলকিত হইয়াছেন। এই নিবিড় রহস্যময় অনুভূতি ও রোমান্টিক কল্পনা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত।

'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' এবং 'শকুন্তলা' প্রবন্ধদ্বয়ে রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাসের কবিমানসের স্বরূপ-প্রকৃতি উদ্ঘাটন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং কালিদাসের কবিধর্মের মূল প্রেরণার উৎস সন্ধানে নিয়োজিত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে কালিদাস কেবলমাত্র সৌন্দর্য-সম্ভোগেরই কবি নহেন, ভোগ-বিরতিরও কবি। প্রকৃত প্রেমের প্রতিষ্ঠা ত্যাগের তপস্যায়, সংযমের মাধুর্যে ও কল্যাণের আদর্শে। যে প্রেম কেবল প্রেমাস্পদেরই প্রতীক্ষা করে, পুত্রকে কামনা করে না—তাহা চঞ্চল সাময়িক মোহ মাত্র। বিশ্বের কল্যাণাদর্শই প্রেমকে গৌরবান্বিত করে, মহিমময় স্তরে উন্নীত করে। দুঃখের দুরূহ তপস্যার কষ্টিপাথরেই প্রকৃত প্রেমের মূল্য নির্ধারিত হয় এবং তাহা দ্বারাই প্রেম সত্যকার অপরূপত্ব বা অমরতা লাভ করে। কিন্তু যে প্রেম দেহ-সৌন্দর্যের বিভ্রমে সাময়িক উত্তেজনায় ভ্রষ্ট, সে প্রেম প্রকৃত প্রেমের গৌরব হইতে বঞ্চিত, অনর্থক—তাহা মনের ক্ষণস্থায়ী চাঞ্চল্য মাত্র। কল্যাণবুদ্ধিময় শান্ত-সংযত এক মহৎ আদর্শনিষ্ঠ প্রেমের সাধনাই ভারতবর্ষের সাধনা। কালিদাসের সৌন্দর্য-সম্ভোগের দৃষ্টি এই ভারতীয় কল্যাণধর্মের প্রেরণাজাত এবং তাহারই শুভ্রদীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কবিধর্ম বা সৌন্দর্য-দৃষ্টি প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'ভারতবর্ষীয় সংহিতায় নরনারীর সংযত সম্বন্ধ কঠিন অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই সৌন্দর্যের উপকরণে গঠিত। সেই সৌন্দর্য শ্রী, হ্রী এবং কল্যাণে উদ্ভাসমান, তাহা গভীরতার দিকে নিতান্ত একাগ্র এবং ব্যাপ্তির দিকে বিশ্বের আশ্রয় স্থল। তাহা ত্যাগের দ্বারা পরিপূর্ণ, দুঃখের দ্বারা চরিতার্থ এবং ধর্মের দ্বারা ধ্রুব। সেই সৌন্দর্যে নরনারীর দুর্নিবার দুরন্ত প্রেমের প্রলয় বেগ আপনাকে সংযত করিয়া মঙ্গল মহাসমুদ্রের মধ্যে পরম স্তব্ধতা লাভ করিয়াছে—এইজন্য তাহা বন্ধনবিহীন দুর্ধর্ষ প্রেমের অপেক্ষা মহান্ ও বিস্ময়কর।'[১]

'কাদম্বরীচিত্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত কবি বাণভট্টের গদ্যকাব্য 'কাদম্বরী'র ভাষাচিত্রের আতিশয্য ও বর্ণনার ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে ভারতীয় জীবনের বৈরাগ্যের স্বরূপ ও মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন। জীবনের সর্ববিধ আশা-

১ 'প্রাচীন সাহিত্য,' (বিশ্বভারতী, ১৩৫৬), পৃঃ ২৮

আকাঙ্ক্ষা, সুখ-স্বপ্ন সম্পর্কে যে বৈরাগ্য-দর্শন ভারতীয় জীবনযাত্রায় বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহাতে বিশেষতঃ ভারতের গভীর নিরাসক্তি-যোগ প্রসঙ্গই বর্ণিত হইয়াছে। সুখ-স্বপ্নের নীড় নির্দয়চিত্তে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করিয়া বৈরাগ্যধর্মে স্থিতি লাভের পরিকল্পনা একমাত্র ভারতবাসীর জীবনেই সম্ভবপর হইয়াছে। 'কাদম্বরী' গদ্যকাব্যে অবিচ্ছিন্ন আখ্যানের অভাবের কারণস্বরূপে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় বিষয়-নিস্পৃহতার উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের বিষয়গত অননুরক্তি, নিরাসক্ত বৈরাগ্যভাবের সহজসিদ্ধ স্বরূপটি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কাদম্বরীচিত্র' প্রবন্ধে অতি সুস্পষ্ট অথচ সরসভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ এক গভীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধার দৃষ্টি লইয়া পূজারীর বেশে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্য-বিতানে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি মূলতঃ কবি এবং সেইজন্য তাহার চিন্তা বা দৃষ্টি প্রধানতঃ আত্মমুখী। ফলে, 'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রবন্ধসমূহে রবীন্দ্রনাথের স্বেচ্ছামানস-পরিক্রমার চিত্রই পরিস্ফুট হইয়াছে—কোন বৈজ্ঞানিকসুলভ সমালোচনা ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কয়েকজন উপেক্ষিতা, অনাদৃতা নারী-চরিত্রের প্রসঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন, মূল কাব্যজগতে তাঁহাদের ভূমিকার মূল্যায়ন বা গুরুত্ব নির্ণয়ই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হয় নাই। সহৃদয় কবি-প্রাণতায় উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ এই সকল নারী-চরিত্র অবলম্বন করিয়া নারী-হৃদয়ের নিগূঢ়, অব্যক্ত ব্যথা-বেদনাকে আবিষ্কার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। 'রামায়ণ' কাব্যের উর্মিলা, 'শকুন্তলা' নাটকের অনসূয়া, প্রিয়ংবদা এবং 'কাদম্বরী' উপাখ্যানের পত্রলেখা মূল কাব্যসমূহে অতি সংকীর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিতা হইলেও তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব বা মাহাত্ম্যের বিস্তৃত চিত্র রবীন্দ্রনাথ নূতনভাবে পরিবেশন করিয়াছেন এবং তাঁহার আলোচনানৈপুণ্যে প্রতিটি চরিত্র এক অনাস্বাদিত সূক্ষ্ম সুকুমার সৌন্দর্যের আধার হইয়া উঠিয়াছে।

'ধম্মপদং' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সহিত প্রাচ্য, বিশেষতঃ ভারতীয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনায় ব্রতী হইয়াছেন। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ 'ধম্মপদ' স্বয়ং বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বাণীর সমষ্টি। ভারতীয় ভাবধারার একটি সুস্পষ্ট পরিচয় এই গ্রন্থের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'ধম্মপদ'কে উপলক্ষ্য করিয়া ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা ইউরোপীয় ধারা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ধর্মই ভারতীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি স্বরূপ। কিন্তু ইউরোপে ধর্ম অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় স্বার্থই প্রধান হইয়াছে এবং ইউরোপ ধর্মকে রাষ্ট্রগত প্রয়োজনের সহায়ক হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছে। কর্ম হইতে মুক্তির উদ্দেশ্যে কর্ম-সাধনই ভারতের ধর্ম। কিন্তু ইউরোপে কর্মই একমাত্র উপায় ও লক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষ ব্যক্তিগত লাভ অপেক্ষা সমষ্টিগত কল্যাণকে, প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কেই সাধনা বা ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'ধম্মপদং' প্রবন্ধে ভারতীয় আদর্শ, নীতিধর্ম ও নিষ্কাম কর্মব্রতের মাহাত্ম্যই সুললিত ভাষায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' তাঁহার সাতটি প্রবন্ধের একটি সংকলনগ্রন্থ। এই সকল প্রবন্ধের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের বিশিষ্ট প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থাদির পর্যালোচনা করিয়া ভারতীয় জীবনের মহৎ ও কল্যাণকর আদর্শের চিত্রই রূপায়িত করিয়াছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ জাতীয় ঐতিহ্য ও জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের সুষ্ঠু পরিচয় দানের প্রয়াসে তাঁহার 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি রচনা করিয়াছেন। বাংলার লোক-সাহিত্যের মূল্যায়নে ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং পল্লী-সংগীতের মধ্যে যে উচ্চাঙ্গের কাব্যসম্মত-জীবন-রসধারা প্রবাহিত, তাহাও তাঁহার দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্বনাশী গ্রাসে বাংলার লোক-সংস্কৃতির প্রভাব দেশের সমাজ-জীবন হইতে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। অথচ এই লোক-সংস্কৃতির মধ্যেই জাতির সত্যকার পরিচয় নিহিত। রবীন্দ্রনাথ এই সত্য গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া লোক-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য প্রচারকল্পে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁহার 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি সেই উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছে। 'ছেলেভুলানো ছড়া', 'কবি-সংগীত', 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধসমূহে রবীন্দ্রনাথের লোক-সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরক্তি ও শ্রদ্ধাবোধের সহিত তাঁহার লোক-সাহিত্যের সার্থক রস-বিচারশক্তির পরিচয়ও প্রকাশ পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলির মধ্যেও তাঁহার গভীর রসবোধ, শাণিত বিচারবুদ্ধি ও নিরপেক্ষ উদার দৃষ্টির পরিচয় লাভ করা যায়। এই প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের

অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও সমকালীন খ্যাতনামা লেখকগণের রচিত কাব্য-উপন্যাস প্রভৃতি বিচিত্র সাহিত্য-কর্মের আলোচনা। বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল, সঞ্জীবচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শরৎকুমারী চৌধুরাণী প্রমুখ লেখক-লেখিকাগণের সাহিত্যিক প্রতিভার যথার্থ পরিচয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বিজ্ঞানসম্মত সুতীক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণদ্বারা রচনাসমূহের গুণাগুণ অনুসন্ধানই রবীন্দ্র-সমালোচনার লক্ষ্য বা বৈশিষ্ট্য নহে। বরং সাহিত্য বা শিল্প-কর্মের অন্তস্তলপ্রবাহী রসের সহৃদয় ব্যাখ্যাই তাঁহার আলোচনায় অধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'বিহারীলাল', 'সঞ্জীবচন্দ্র', 'ফুলজানি', 'যুগান্তর', 'আর্যগাথা', 'শুভবিবাহ', প্রভৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সাহিত্যিকগণের বিচিত্র সাহিত্য-কর্ম হইতে যে অন্তর্গূঢ় রসলোকের সন্ধান দান করিয়াছেন, তাহা দ্বারা সাহিত্যরসপ্রমাতা রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট পরিচয় অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-প্রতিভা কেবলমাত্র প্রাচীন ও আধুনিক কালের সাহিত্যস্রষ্টাগণের শিল্প বা সাহিত্য-কর্মের সরস আলোচনার মধ্যেই সীমিত থাকে নাই—তিনি তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধে সাহিত্যের স্বরূপ, ধর্ম ও রসতত্ত্ব সম্পর্কেও বিস্তৃত সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আদি পর্বীয় প্রবন্ধ-সংকলন গ্রন্থে তাঁহার সাহিত্যতত্ত্বমূলক কয়েকটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অপরিণত বয়সে লিখিত উক্ত প্রবন্ধসমূহে তাঁহার রসদৃষ্টির গভীরতা ও তীক্ষ্ণ মননশীলতার অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী কালে তাঁহার 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে সাহিত্যের স্বধর্ম ও প্রকৃতি-বিচারে তিনি যে গভীর প্রজ্ঞা, সৌন্দর্যবোধ ও রসানুভূতির পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির অভিনব রূপকল্প, বিষয়, উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে চিন্তা ও ধারণা পোষণ বা অনুশীলন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার বিভিন্ন সময়ে লিখিত ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

[রবীন্দ্রনাথ প্রথমতঃ, সাহিত্য ও শিল্পকলার উৎসক্ষেত্র অনুসন্ধান করিয়া শেষ পর্যন্ত এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মানুষের সম্মুখে দুইটি জগতের অস্তিত্ব বর্তমান এবং তাহা একটি বাহিরের বিশ্বজগৎ ও অপরটি মানুষের নিজেরই সৃষ্টি অর্থাৎ অন্তরের জগৎ। তিনি 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর-একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ, আকৃতি, ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে—তাহার সঙ্গে আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত—তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।'[১]

মানুষ তাহার হৃদয়বৃত্তিসমূহের বিচিত্র রসের সহযোগিতায় বাহিরের বিশ্বজগত হইতেই একটি নূতন অন্তর্জগত সৃষ্টির প্রেরণা অনুভব করিয়া থাকে এবং তাহার এই নূতন মানসচিন্তাকে পুনরায় বাহিরে রূপ দানের যে প্রয়াস, কিংবা যথাযথভাবে তাহা পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে মানুষের যে প্রবৃত্তি বা প্রেরণা, তাহাই সর্ববিধ সাহিত্য বা ললিতকলা সৃষ্টির মূল উৎসস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ তাঁহার 'সাহিত্যের তাৎপর্য' নামক প্রবন্ধে শিল্প বা সাহিত্যসৃষ্টি প্রসঙ্গে মানুষের আপন জগত অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের জগতের (The world of Personality) গুরুত্ব ও প্রাধান্য অতি নৈপুণ্যসহকারে আলোচনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রকার সাহিত্যিক উদ্যম বা সাহিত্য-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া সাহিত্য-শিল্পীর যে একটি বিশিষ্ট মনোভাবের পবিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও অন্তর্নিহিত প্রেরণা এই যে, মানুষ সাধ্যানুসারে তাহার জীবনের অধিকার-সীমা বিস্তার করিতে চাহিয়াছে এবং সাহিত্যের মাধ্যমে তাহার চিরস্থায়িত্বের বা অমরতার আস্বাদ অনুভব করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে মানুষের এই সহজ প্রবৃত্তির স্বরূপ ও কার্যকারিতার যে চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল—

'আমাদের মনের ভাবের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই, সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করিতে চায়। প্রকৃতিতে আমরা দেখি—ব্যাপ্ত হইবার জন্য, টিকিয়া থাকিবার জন্য, প্রাণীদের মধ্যে সর্বদা একটা চেষ্টা চলিতেছে। যে-জীব সন্তানের দ্বারা আপনাকে যত বহুগুণিত করিয়া যত বেশি জায়গা জুড়িতে পারে তাহার জীবনের অধিকার তত বেশি বাড়িয়া যায়, নিজের অস্তিত্বকে সে যেন তত অধিক সত্য করিয়া তোলে। মানুষের মনোভাবের মধ্যেও সেইরকমের একটা

'সাহিত্য', (বিশ্বভারতী, ১৩৫২), পৃঃ

চেষ্টা আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, প্রাণের অধিকার দেশে ও কালে, মনোভাবের অধিকার মনে এবং কালে। মনোভাবের চেষ্টা বহুকাল ধরিয়া বহুমনকে আয়ত্ত করা।'[১]

তৃতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যে প্রধানতঃ হৃদয়ের কথা ও ভাবের প্রসঙ্গই বিশেষভাবে অবলম্বনীয়। কারণ, হৃদয়ভাবের কথা অনন্তকালের—তাহা কখনও পুরাতন বা নীরস হয় না। কিন্তু জ্ঞানের বিষয় প্রচারিত হইলেই তাহার আবেদন লুপ্ত হইয়া যায়—মানবমনকে তাহা নূতনভাবে চিরকাল আকর্ষণ করিতে পারে না। সেইজন্য সাহিত্যের উপাদান বা উপকরণ মুখ্যতঃ ভাবের বিষয়—জ্ঞানের বিষয় নহে। কিন্তু এই ভাবের বিষয়কেও বিভিন্ন মনে সঞ্চারিত করিতে হইলে লেখকের নানাবিধ কলাকৌশল এবং আভাস-ইঙ্গিতবাহী রূপকল্প সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধের একাংশে লিখিয়াছেন—

'এই কলাকৌশলপূর্ণ রচনা, ভাবের দেহের মতো। এই দেহের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যকারের পরিচয়। এই দেহের প্রকৃতি ও গঠন অনুসারেই তাহার আশ্রিত ভাব মানুষের কাছে আদর পায়; ইহার শক্তি অনুসারেই তাহা হৃদয়ে ও কালে ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে।'[২]

সাহিত্যের ভাব, বিষয় ও তত্ত্ব সর্বসাধারণের; কিন্তু 'স্টাইল' অর্থাৎ রচনাভঙ্গি সাহিত্যকারের নিজস্ব বস্তু। এই রচনারীতির বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্বের ভিত্তিতেই লেখকের কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়। লেখকের অনবদ্য রূপভঙ্গি বা রচনাকৌশলের দ্বারা আলোচ্য বিষয় বা ভাব একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়া সর্বকালের সকল মানুষেরই আনন্দের সামগ্রী হইয়া উঠে এবং সৃষ্টি-কর্মও যথার্থ রূপ ও রসে ব্যঞ্জিত হইয়া সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের 'ষ্টাইল' বা রচনারীতি সম্পর্কে 'সাহিত্যধর্ম' নামক প্রবন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

চতুর্থ বা শেষতঃ, রবীন্দ্রনাথের অভিমত বা সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, সার্থক সাহিত্য-কর্মের মধ্য দিয়া মানুষ এক বিশুদ্ধ আনন্দানুভূতির আস্বাদ লাভ করে এবং সাহিত্যগত এই আনন্দভাবের উপর রবীন্দ্রনাথ সমধিক গুরুত্ব

১ 'সাহিত্য', (বিশ্বভারতী, ১৩৫২), পৃঃ ১২

২ ঐ, পৃঃ ১৬

আরোপ করিয়াছেন। মহৎ সাহিত্যে সত্য, শিব ও সুন্দরের সুষ্ঠু সমন্বয়ের প্রতীক্ স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের মাত্রা,' 'সৌন্দর্যবোধ,' 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে শাশ্বত সাহিত্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বা মহিমা তাঁহার সূক্ষ্ম রসদৃষ্টি ও বিশ্লেষণ-শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। লেখকের মহান্ ভাব-কল্পনা ও তাহার সার্থক রসসম্মত প্রকাশনৈপুণ্যেই সাহিত্য সত্য, শিব ও সুন্দরের পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং সত্য ও সুন্দর শিব অর্থাৎ মঙ্গল ভাবে পরিণতি লাভ করে। অতএব সৌন্দর্যের সহিত সত্য এবং কল্যাণ অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। সুতরাং সত্যের যথার্থ উপলব্ধি মাত্রেই আনন্দ এবং তাহাই চরম সৌন্দর্যের আকর। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোজ্ঞ আলোচনাসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার 'সৌন্দর্যবোধ' নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'যথার্থ যে-মঙ্গল তাহা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে এবং তাহা সুন্দর; অর্থাৎ প্রয়োজন সাধনের ঊর্ধ্বেও তাহার একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে। নীতি পণ্ডিতেরা জগতের প্রয়োজনের দিক হইতে নীতি উপদেশ দিয়া মঙ্গল প্রচার করিতে চেষ্টা করেন এবং কবিরা মঙ্গলকে তাহার অনির্বচনীয় সৌন্দর্যমূর্তিতে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকেন। বস্তুত, মঙ্গল যে সুন্দর সে আমাদের প্রয়োজন সাধন করে বলিয়া নহে। * * * কারণ, মঙ্গল মাত্রেরই সমস্ত জগতের সঙ্গে একটা গভীরতম সামঞ্জস্য আছে, সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহার নিগূঢ় মিল আছে। সত্যের সঙ্গে মঙ্গলের সেই পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেই তাহার সৌন্দর্য আর আমাদের অগোচর থাকে না।'[১]

মহৎ অর্থাৎ প্রকৃত সাহিত্যে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের একত্র সমাবেশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে কেবলমাত্র মানুষের অবসর-বিনোদনের অন্যতম উপায় বা সামগ্রী রূপেই প্রচার করেন নাই। সত্যকার সাহিত্যের মর্মমূলে যে একটি গভীর তাৎপর্য নিহিত থাকে, সে সম্পর্কে তিনি সর্বদাই সচেতন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-শিল্পের মৌল সত্যের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া যে রসরুচির অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বিভিন্ন সাহিত্যতত্ত্বমূলক প্রবন্ধসমূহ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে।

১ 'সাহিত্য', (বিশ্বভারতী, ১৩৫২), পৃঃ ৪২-৪৩

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য,' 'সাহিত্যের পথে' ও 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থসমূহে সংকলিত বিভিন্ন প্রবন্ধে সাহিত্যের স্বরূপ, ধর্ম বা মাত্রাবোধের পরিচয়ই কেবলমাত্র প্রকাশিত হয় নাই, সাহিত্যে বাস্তবগুণ, আধুনিকতা ইত্যাদি বিতর্কবহুল আলোচনারও যুক্তিসম্মত বিচার ও মীমাংসা সম্পাদিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত তিনটি সংকলনগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধসমূহ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের বিভিন্ন পর্বে লিখিত এবং সেইজন্য এই সকল গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধের রচনাকালের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। ফলে, সাহিত্যের কোন বিশিষ্ট বিষয় অবলম্বনে লিখিত ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে লেখকের সিদ্ধান্ত বা মতামতের অল্পবিস্তর পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। যদিও এই পার্থক্য লেখকের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি বা ভাব-কল্পনার সম্পূর্ণ পরিবর্তনজাত নহে, তথাপি সাহিত্যের কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম লিখিত প্রবন্ধগত সিদ্ধান্ত বা ধারণা পরবর্তী কালে লিখিত প্রবন্ধে যে অধিকতর সুস্পষ্ট, বিস্তৃত ও গভীর হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাহিত্যে বাস্তবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে অভিমত তাঁহার বিভিন্ন সময়ে লিখিত দুইটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, এখানে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে সংকলিত 'বাস্তব' নামক প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে বাস্তবতা সম্পর্কে যে আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত অপরিণত, অসম্পূর্ণ ও অগভীর। কিন্তু উক্ত সংকলনগ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত 'সাহিত্যতত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে বাস্তবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পুনর্বার যে বক্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সাহিত্যে বাস্তবতা বিষয়ক তাঁহার পূর্ববর্তী ধারণা বা উপলব্ধি অধিক পূর্ণতা ও গভীরতা লাভ করিয়াছে এবং তাহা সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানের ফলেই সম্ভবপর হইয়াছে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধটি তাঁহার পূর্ববর্তী 'বাস্তব' প্রবন্ধের প্রায় উনিশ বৎসর পরে লিখিত। 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে বাস্তবতার সংজ্ঞা বিচার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'মানুষ আপন হৃদয়ানুভূতিকে কর্মের দায় থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে কল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে দেয়, যেখানে অনুভূতির রসটুকুই তার নিঃস্বার্থ উপভোগের লক্ষ্য, যেখানে আপন অনুভূতিকে প্রকাশ করবার প্রেরণায় ফল লাভের অত্যাবশ্যকতাকে সে বিস্মৃত হয়ে যায়। * * * সে আপন ব্যক্তিরূপের দোসরকে পায় বস্তুতে নয়, তত্ত্বে নয়। লীলাময়কে সে পায় আকাশ যেখানে নীল, শ্যামল যেখানে

নব দুর্বাদল। ফুলে যেখানে সৌন্দর্য, ফলে যেখানে মধুরতা, জীবের প্রতি যেখানে আছে করুণা, ভূমার প্রতি যেখানে আছে আত্মনিবেদন, সেখানে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের চিরন্তন যোগ অনুভব করি হৃদয়ে। একেই বলি বাস্তব, যে বাস্তবে সত্য হয়েছে আমার আপন।'[১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে সাহিত্যে বাস্তবতা সম্পর্কে যে যুক্তিসম্মত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সাহিত্যগত বাস্তবের যথার্থ স্বরূপ ও ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণীয়। 'বাস্তব' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থাৎ সাধারণ অর্থ বস্তুগত সত্য। কিন্তু সাহিত্যে এই সত্য নিছক ঘটনা বা বস্তুর উপরই নির্ভরশীল নহে। রবীন্দ্রনাথের মতে, অনুভবে বা হৃদয়ে যে ভাব ও বিষয় সত্য, সাহিত্যে তাহাই বাস্তব রূপে সমাদৃত হইবার যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' ও 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলিতে প্রধানতঃ সাহিত্যের বিচিত্র তত্ত্ব ও রূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই সকল প্রবন্ধে যেভাবে বিবিধ সাহিত্য-জিজ্ঞাসার অবতারণা করিয়া তাহার সুষ্ঠু মীমাংসা বা সমাধানে সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইলেও তিনি যে মুখ্যতঃ প্রাচীন ভারতীয় রসবাদ ও পাশ্চাত্ত্য রোমাণ্টিক সাহিত্য-দর্শনকেই অনুশীলন করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ কেবল বিশুদ্ধ ধর্মচিন্তা বা প্রথাগত দার্শনিক তত্ত্বের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব নহে। তাঁহার এই সকল প্রবন্ধ ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয়ে এক স্বতন্ত্র সাহিত্যিক রূপ হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধ সুদৃঢ় ও সুনিবিড় এবং ইহারা উভয়েই পরস্পরের পরিপূরক। ধর্মচিন্তায় মুখ্যতঃ আধ্যাত্মিক ভাব-জাত অনুভূতি ও উপলব্ধি এবং দার্শনিক চিন্তায় আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক তত্ত্বের বিচারসাপেক্ষ জ্ঞানই প্রকাশিত হয়। ধর্ম ও দর্শনের উদ্দেশ্য ও তাহাদের বিষয়ীভূত ভাব বা তত্ত্ব সাধারণতঃ অভিন্ন এবং রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তায় ইহাদের মূলগত কোনরূপ পার্থক্য লক্ষ্যগোচর হয় না।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও দর্শনমূলক প্রবন্ধগ্রন্থ যথাক্রমে: ১। 'ব্রহ্মোপনিষদ' (১৮৯৯), ২। 'ব্রহ্মমন্ত্র' (১৯০০), ৩। 'উপনিষদ ব্রহ্ম' (১৯০১), ৪। 'ধর্ম'

১ 'সাহিত্যের পথে,' (বিশ্বভারতী, ১৩৫৬), পৃঃ ১৩০-৩১

(১৯০৯), ৫। 'শান্তিনিকেতন', ১ম খণ্ড—৮ম খণ্ড (১৯০৯), ৯ম খণ্ড—১৩শ খণ্ড (১৯১০-১১), ১৪শ খণ্ড—১৭শ খণ্ড (১৯১৫-১৬), ৬। 'ধর্মের অধিকার' (১৯১২), ৭। 'সঞ্চয়' (১৯১৬) ও ৮। 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত 'ধর্মের অধিকার' নামক প্রবন্ধটি পরবর্তী কালে প্রকাশিত তাঁহার 'সঞ্চয়' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধে ঈশ্বর-চেতনা বা ধর্মবোধজাত বিবিধ তত্ত্বের সমাবেশ ঘটিয়াছে এবং তাহা নানাভাবে বিচার-বিশ্লেষিত হইয়াছে। এই বিচার-বিশ্লেষণ প্রথাগত শাস্ত্রসম্মত নহে—ইহা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধর্মচিন্তা ও স্বীয় বিশিষ্ট অন্তরানুভূতির ব্যাখ্যান মাত্র। সেইজন্য কোন বিশিষ্ট ধর্মমতের সুনির্দিষ্ট কোন মানদণ্ড দিয়া রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার স্বরূপ বা প্রকৃতি বিচার করা সম্ভব হয় না। ব্যক্তিগত জীবনাচরণ ও মনন-চিন্তার মধ্য দিয়া যে সকল ধর্মানুভূতি সত্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এবং বাহ্যজগতের সহিত অন্তর্জগতের সংঘাতে যে অধ্যাত্ম-চেতনা উদ্ভূত হইয়া অদৃশ্য ঐশীশক্তির অভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে, তাহাই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম বা দর্শনমূলক বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে বিচিত্র সাহিত্যিক রূপ ও রসে মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ঐশীচেতনা বা দৃষ্টি প্রসঙ্গে 'দেখা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'আলোক তাই প্রত্যহই আমাদের চক্ষুকে নিদ্রালসতা থেকে ধৌত করে দিয়ে বলছে, "তুমি স্পষ্ট করে দেখো, পদ্ম যে রকম সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে সূর্যকে দেখে তেমনি করে দেখো।" কাকে দেখবে? তাঁকে, যাঁকে ধ্যানে দেখা যায়? না তাঁকে না, যাঁকে চোখে দেখা যায় তাঁকেই। সেই রূপের নিকেতনকে, যাঁর থেকে গণনাতীত রূপের ধারা অনন্তকাল থেকে ঝরে পড়ছে। * * * সেই অপরূপ অনন্তরূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই যখন দেখব তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে, আমাদের প্রতিদিনকার আলোকের অভিষেক চরিতার্থ হবে।'[১]

রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি তাঁহার নিজস্ব ধর্মভাবের সম্যক্ ব্যাখ্যা হইলেও, তাহা উপনিষদ্ বা কোন প্রচলিত শাস্ত্রীয় মন্ত্রের

১ 'শান্তিনিকেতন' ১ম খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৩৫৬), পৃঃ ৫৬-৫৭

বিচার-বিশ্লেষণে ভারাক্রান্ত নহে। কবির সত্যানুভূতি বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতির সহিত গভীরভাবে যোগযুক্ত হইয়া যে ধর্মালোক কবির অন্তর্লোক আলোকিত করিয়াছে, 'শান্তিনিকেতনে'র প্রবন্ধগুলিতে তাহারই সার্থক বহিপ্রর্কাশ ঘটিয়াছে। ঈশ্বরানুভূতি ও সহজাত কাব্যানুভূতির একত্র মিলনের ফলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক অপূর্ব ধর্মভাবের বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বংশধারানুসারে বাহ্যতঃ ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সুষ্ঠু পরিবেশে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিলেও উক্ত সমাজ বা সম্প্রদায়ের বিশেষ ধর্মবিধি, অনুশাসন, আচার-পদ্ধতি তিনি কখনই সম্পূর্ণভাবে অনুশীলন করেন নাই। যদিও উপনিষদের ব্রহ্মবাদের সাহচর্যে তাঁহার ধর্মচেতনা পরিপুষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এই ব্রহ্মজ্ঞান ও তত্ত্বকে সামগ্রিকভাবে বা ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্তিত গতানুগতিক ধারা অনুসারে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই। ব্রাহ্ম-ধর্মের মধ্যে যখনই তিনি কোন আচারগত সংকীর্ণতা লক্ষ্য করিয়াছেন, তখনই তাঁহার নিকট তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সর্ববিধ সংস্কারের ঊর্ধ্বে ধর্মের এক বিশুদ্ধ সার্বভৌমিক রূপ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার ধর্মভাব স্বীয় জীবনের ক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত হইয়া একটি বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই, সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা।'[১]

রবীন্দ্রনাথ ধর্মভাবের ক্ষেত্রে এক উদার উচ্চ মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। যে ধর্ম সকল জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে জনপ্রিয় হইয়া উঠিবে এবং যে ধর্মমত মানুষ গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবে না—ধর্মের সেই মহান্, উদার সর্বজনীনত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার ধর্মচিন্তায় এই জাতীয় মনোভাবেরই অধিক প্রাধান্য ঘটিয়াছে। ইহা অনস্বীকার্য যে, প্রকৃত ধর্ম বিশেষ কোন সমাজ বা সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারে না এবং কোন বিধিবদ্ধ আচার-ব্যবহার ও উপাসনা-প্রণালীর দ্বারা তাহা চিহ্নিত হয় না। ধর্মের শক্তি প্রবল এবং এই অসীম শক্তির প্রভাবেই সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য, বিরোধ ও

১ 'আত্মপরিচয়', (বিশ্বভারতী. ১৩৫২), পৃঃ ৫৬

বিচ্ছেদের পরিবর্তে ঐক্য, শান্তি ও মিলনের সুর ধ্বনিত হয়। ধর্মের সনাতন সত্য আদর্শ অনুসরণ করিয়া মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্ব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে এবং অন্তরে-বাহিরে সর্বাংশে এক অখণ্ড মানবতাবোধে উদ্ধুদ্ধ হয়। এই বৃহৎ মানবতাবোধ হইতে বঞ্চিত হইলে মানুষ স্বীয় জীবনে সত্যকার পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না—সর্বাঙ্গীণ সমুন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া তাহার সৌন্দর্যহানি ঘটে। রবীন্দ্রনাথের মতে, ধর্মের আদর্শ বা নীতি কোন গীর্জা, মন্দির বা মস্‌জিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে—সমগ্র বিশ্বসংসারেই তাহার মহান্ আদর্শের গতিবেগ প্রবাহিত। রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে পাশ্চাত্ত্য Religion-র সহিত অভিন্ন করেন নাই—ধর্ম কোন খণ্ড ভাব বা সংকীর্ণ মতাদর্শের প্রচার-বাহী নহে। সত্য বা নিত্য ধর্মের প্রকৃতি ও স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সুচিন্তিত ধর্মনিষ্ঠ দার্শনিক প্রবন্ধের মধ্যে সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ধর্মপ্রচার' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে—তাহা পলিটিক্‌স হইতে তিরস্কৃত, যুদ্ধ হইতে বহিষ্কৃত, ব্যবসায় হইতে নির্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্তী নহে। সমাজের কোনো বিশেষ অংশে তাহাকে প্রাচীরবদ্ধ করিয়া মানুষের আরাম-আমোদ হইতে কাব্য-কলা হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে তাহার সীমানা-রক্ষার জন্য সর্বদা পাহারা দাড়াইয়া নাই। ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ বাণপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমগুলি এই ধর্মকেই জীবনের মধ্যে সংসারের মধ্যে সর্বতোভাবে সার্থক করিবার সোপান। ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনার জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্ম সাধনের জন্য।'[১]

রবীন্দ্রনাথ নিত্য ধর্ম অর্থাৎ শাশ্বত মানবধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। ভৌগোলিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক ব্যবধানে ধর্মের চিরন্তন সত্য-রূপের কোন পরিবর্তন হয় না। ধর্ম সাধারণতঃ মানুষের অন্তর্নিহিত সহজ স্বভাব আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে এবং সর্বজনীন এক মানবিক মহিমায় ভূষিত হয়। সনাতন ধর্মের ঔদার্য ও ইহার সর্বজনীন মানবিক আবেদনের প্রতি রবীন্দ্রনাথ অধিক আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন। সুচিন্তা, সুকর্ম ও রসানন্দই ধর্মের মূল প্রেরণাস্বরূপ এবং আদর্শ ধর্মের রূপ বা বৈশিষ্ট্য ইহা

১ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ১৩শ খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৩৪৯), পৃঃ ৩৭৯

হইতে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। যে ধর্ম কল্যাণশূন্য, বিচারহীন, সংস্কারমূঢ় প্রথা বা আচারের মধ্যে বদ্ধ হইয়া জীবনের সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত করে এবং যাহা দ্বারা মানুষের পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বের বিনাশ ঘটে, রবীন্দ্রনাথের মতে, তাহা কখনই ধর্মপদবাচ্য হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের প্রশস্ত উদার ধর্মচিন্তায় চিরন্তন শাশ্বত ধর্মের রূপই আভাসিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধগ্রন্থে এই শাশ্বত অর্থাৎ নিত্যকালীন ধর্মকে মানুষের ধর্ম রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিত্য ধর্মের প্রকৃতি ও আদর্শ আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত ধর্মের বিকৃতি অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতা, আচারগত সংকীর্ণতার বিস্তৃত আলোচনায় প্রয়াসী হইয়াছেন। মানুষের প্রকৃত ধর্মানুভূতি, সত্যোপলব্ধির সম্যক্ পরিচয়স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আজীবন দেশ-কাল ও সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতা ও সংস্কারের ঊর্ধ্বে এক অভিনব মানবধর্মের পরিকল্পনাই রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই জাতীয় ধর্মচিন্তা বিভিন্ন দর্শন-ধর্মমূলক প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। জীবনের অগ্রগতির সহিত যে ধর্ম মানুষের সর্ববিধ শক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অগ্রগামী হয় এবং জ্ঞানে, কর্মে ও প্রেমভাবে যে ধর্ম সতত সক্রিয় ও প্রাণবন্ত, সেই ধর্ম প্রচারেই রবীন্দ্রনাথ ব্রতী হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ভগবদনুভূতি অর্থাৎ তাঁহার নিজস্ব আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যে সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মেরই এক আশ্চর্য-সুন্দর সম্মিলিত রূপ লক্ষ্য করা যায়। ঔপনিষদিক সত্য ও সৌন্দর্যদৃষ্টি, বুদ্ধদেব প্রচারিত বিশ্বমৈত্রী ও করুণা এবং বৈষ্ণব ও খ্রীষ্টধর্মজাত কল্যাণ ও প্রেমভাব প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠীয় বা সাম্প্রদায়িক ধর্মেরই উৎকৃষ্ট গুণের একত্র সমাবেশে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা পরিপুষ্ট হইয়াছে। তাঁহার এই বিশিষ্ট সার্বভৌমিক ধর্মের মূল প্রেরণা বিশ্বমানবতাবোধ। চিত্তের ঔদার্য, অন্তরের পবিত্রতা এবং সকল মানুষের কল্যাণ-চিন্তা ও ঐক্যভাবেরই উপর এই অভিনব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানুষে মানুষে ঐক্যবোধ ও মানুষের পারস্পরিক অন্তরঙ্গ সৌহার্দের দ্বারা ঈশ্বর-সাধনা ফলপ্রসূ হয়। প্রতি মানুষের মধ্যে ভগবানের আত্মপ্রকাশেই এই অভিনব মানবধর্মের সত্যকার সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা। 'ধর্মের নবযুগ' নামক প্রবন্ধের একাংশে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'বস্তুত পরমাত্মাকে এই আত্মার মধ্যে দেখার জন্যই মানুষের চিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। কেননা আত্মার সঙ্গেই আত্মার স্বাভাবিক যোগ সকলের চেয়ে

সত্য; সেইখানেই মানুষের গভীরতম মিল। আর সর্বত্র নানাপ্রকার বাধা। বাহিরের আচার বিচার অনুষ্ঠান কল্পনাকাহিনীতে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের অন্ত নাই; কিন্তু মানুষের আত্মায় আত্মায় এক হইয়া আছে—সেইখানেই যখন পরমাত্মাকে দেখি তখন সমস্ত মানবাত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখি, কোনো বিশেষ জাতিকুল-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখি না।'[১]

রবীন্দ্রনাথের ধর্মোপলব্ধি বা ঈশ্বর-চেতনা যে সকল প্রবন্ধের মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রকাশভঙ্গি ও ভাষার বিন্যাস অতুলনীয়। সুগভীর দার্শনিক চিন্তা গভীর সুরে অথচ সহজবোধ্য মনোহর ভঙ্গিতে প্রকাশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ লেখনী-শক্তির স্বাক্ষর সুচিহ্নিত হইয়াছে। তাঁহার এই জাতীয় প্রবন্ধ, বিশেষতঃ 'শান্তিনিকেতনে'র কাব্যমধুর ব্যাখ্যাসমন্বিত রচনা-সমূহে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম-ব্যাখ্যানিপুণ প্রবন্ধের প্রভাব অনুভব করা যায়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ অধিকতর কাব্যধর্মী ও চিত্তগ্রাহী হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ রূপরসিক ও সৌন্দর্যপিয়াসী প্রেমিক কবি। অতএব তিনি ধর্মীয় তত্ত্ব-দর্শনকে কখনই অমূর্ত চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া অস্পষ্ট বা নীরস করিয়া তুলেন নাই। নির্বিশেষ নিরুপাধিক পরমসত্তাকে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও কল্পনা-শক্তির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধে মূর্তিদান করিয়া প্রত্যক্ষ-গোচর করিয়াছেন—অরূপ এক বিচিত্র রূপের আশ্রয় লাভ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। অরণ্যপ্রকৃতির মধ্যে যে নিগূঢ় প্রাণশক্তি সতত সঞ্চারমান্, সেই প্রচ্ছন্ন সত্তা রবীন্দ্রনাথের নিকট অরণ্যলক্ষ্মীর রূপমূর্তিতে প্রতিভাত হইয়াছে। নিসর্গের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে কবি সৌন্দর্য দেবতার মহিমময় রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য উপমা ও সাদৃশ্য-বঞ্জনায় সকল অমূর্ত ভাব ও চিন্তা মূর্ত হইয়া সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ একজন বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ও চিন্তাশীল মনীষী। সুচিন্তিত ধর্মভিত্তিক দার্শনিক প্রবন্ধসমূহে তাঁহার গভীর ধর্মপ্রাণতা ও মনীষার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই ধর্ম বা দর্শনমূলক প্রবন্ধেও তাঁহার সহজাত কবি-প্রকৃতির স্বরূপ আচ্ছন্ন হয় নাই। কবির আবেগানুভূতি ও কল্পনার উষ্ণ স্পর্শে শুষ্ক নৈর্ব্যক্তিক ধর্ম বা দর্শনতত্ত্বও সরস ও আকর্ষণীয় হইয়াছে। পরমসত্তার

১ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ১৮শ খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৩৬১), পৃঃ ৩৫৪

শক্তি ও সত্য-রূপ রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাঁহার কবিত্ব-ময় অন্তর্গূঢ় হৃদয়রসে তর্কবুদ্ধিজাত ধর্মজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্ব এক অপূর্ব গীতিকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঐশীশক্তির মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য যখন মনেপ্রাণে অনুভব করিয়াছেন, ভূমার সুর যখন বৃহৎ আনন্দের রাগিণীতে আত্মার মধ্যে মন্দ্রিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি অপরূপ রসময় ভঙ্গিতে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'জাগরণ' প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! কেবল আমার একলার বীণা নয়—লোকে লোকে জীবনবীণা বাজে। * * * এই আমিটুকুর তান কত সূর্যের আলোয় বাজছে, কত লোকে লোকে জন্মমরণের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিস্তীর্ণ হচ্ছে, কত নব নব নিবিড় বেদনার মধ্য দিয়ে অভাবনীয় রূপে বিচিত্র হয়ে উঠছে; সকল-আমির বিশ্বব্যাপী বিরাট্‌বীণায় এই আমি এবং আমার মতো এমন কত আমির তার আকাশে আকাশে ঝংকৃত হয়ে উঠছে।'[১]

রবীন্দ্রনাথের সমাজ সংক্রান্ত প্রবন্ধে তাঁহার গভীর সমাজচিন্তার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। রোমান্টিক ভাবপ্রবণ কবি যে এক প্রগাঢ় সমাজচৈতন্যবোধের অধিকারী ছিলেন, তাঁহার বিবিধ সামাজিক সমস্যামূলক রচনাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপে উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'সমাজ' (১৯০৮) নামক সংকলন-গ্রন্থে তাঁহার কয়েকটি বিশিষ্ট সামাজিক প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, তাঁহার অন্যান্য প্রবন্ধ-সংগ্রহেও কতকগুলি সমাজচিন্তামূলক প্রবন্ধের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দেশের সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে প্রগতিশীল ও সংস্কারধর্মী মননের পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা যে-কোন বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদের চিন্তাধারার সগোত্র। রবীন্দ্রনাথের মতে, যুগধর্ম ও কালের অগ্রগতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া দেশের সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। সতত প্রবহমান কালস্রোতের সহিত সঙ্গতি রক্ষায় অসমর্থ হইলে প্রচলিত সামাজিক বিধি-বিধান মানুষের সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। হিন্দুসমাজের বিবিধ আচার-অনুশাসনের মধ্যে যুগোচিত পরিবর্তন বা সংস্কারের অভাব লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি 'সমুদ্রযাত্রা' নামক প্রবন্ধের একাংশে লিখিয়াছেন—

১ 'শান্তিনিকেতন' ২য় খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৩৫৬), পৃঃ ১৬১

'আমাদের সমাজে কোনোপ্রকার স্বাধীনতার কোনো অবসর নাই। আমরা নিশ্চেষ্ট নিশ্চল অন্ধভাবে সমাজের অন্ধকূপে এক অবস্থায় পড়িয়া থাকিব, লোকাচারের এই বধান। মৃত্যুর ন্যায় শান্ত অবস্থা আর নাই, সেই অগাধ শান্তিলাভ করিবার জন্য যতদূর সম্ভব আমাদের জীবনীশক্তি লোপ করা হইয়াছে। * * * আমাদের জীবন্ত মনুষ্যত্বের উপরে নিয়মের পর নিয়ম পাষাণ ইষ্টকের ন্যায় স্তরে স্তরে গাঁথিয়া তুলিয়া একটি দেশব্যাপী অপূর্ব প্রকাণ্ড কারাপুরী নির্মাণ করা হইয়াছে। * * * আমাদের সমাজ জীবন্ত নহে, তাহার হ্রাসবৃদ্ধি পরিবর্তন নাই, তাহা সুসম্বদ্ধ, পরিপাটি প্রকাণ্ড জড় অট্টালিকা।'[১]

হিন্দু সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা এবং ক্রমশঃ ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন। তিনি জাতিভেদ, পণপ্রথা, বর্ণাশ্রমিক অনুশাসন ও ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি অসার সামাজিক প্রথাসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন এবং এই সকল কুপ্রথার সংশোধন বা আমূল পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট হইয়াছেন। সমাজ-সংস্কারমূলক প্রবন্ধসমূহে রবীন্দ্রনাথের গভীর সমাজদৃষ্টি ও সুনিপুণ বিচার-শক্তির পরিচয় লাভ করা যায়। তাঁহার এই জাতীয় প্রবন্ধ প্রধানতঃ নির্মম শ্লেষ-বিদ্রূপোক্তিতে পূর্ণ হইলেও তাহা এক সহৃদয় বন্ধুজনোচিত আন্তরিকতার স্পর্শে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'বিলাসের ফাঁস' প্রবন্ধ তাঁহার এক যুগান্তকারী সৃষ্টি। ইউরোপীয় সভ্যতার অনিষ্টমূলক ভোগস্পৃহা ও আড়ম্বরপ্রিয়তা অন্ধভাবে অনুসরণের ফলে বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে যে ঘোর অমানিশার আবির্ভাব ঘটিয়াছে, এই প্রবন্ধ মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বিদেশী প্রভাবজাত নবাবিয়ানা, সাহেবিয়ানা বা বাবুয়ানাকে প্রত্যহ উগ্র করিয়া বাঙ্গালী আপন জীবনে 'বিলাসের মহামারী' সৃষ্টি করিয়াছে এবং প্রচলিত দেশীয় কুপ্রথাগুলিকে ভোগসর্বস্বতার অধীন করিয়া অতীব স্বার্থমূলক ও নিষ্ঠুর করিয়া তুলিয়াছে। হিন্দুসমাজে প্রচলিত পণপ্রথা বিদেশী সভ্যতাসৃষ্ট বিলাসিতার প্রশ্রয় লাভ করিয়া অধিকতর অনিষ্টকারী হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'বিলাসের ফাঁস' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'একদিকে ভোগের আদর্শ উচ্চ হইয়া সংসারযাত্রা বহু ব্যয়সাধ্য ও অপরদিকে কন্যামাত্রকেই নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিবাহ দিতে বাধ্য হইলে পাত্রের আর্থিক মূল্য

১ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ১২শ খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৩৪৯), পৃঃ ২১৫

না বাড়িয়া গিয়া থাকিতে পারে না। অথচ এমন লজ্জাকর ও অপমানকর প্রথা আর নাই। জীবনের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দোকানদারি দিয়া আরম্ভ করা, যাহারা আজ বাদে কাল আমার আত্মীয় শ্রেণীতে গণ্য হইবে, আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন লইয়া তাহাদের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে নির্মমভাবে দরদাম করিতে থাকা ---এমন দুঃসহ নীচতা যে-সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, সে-সমাজের কল্যাণ নাই।'[১]

এই জাতীয় সকল প্রবন্ধেই সামাজিক সমস্যা সমাধানে রবীন্দ্রনাথের গভীর চিন্তা, আন্তরিক সংবেদনশীলতা ও ব্যাপক বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় লাভ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কেও বিশেষ অবহিত ছিলেন এবং পাশ্চাত্ত্য দেশের সামাজিক জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বাঙ্গালী তথা ভারতীয় সমাজে প্রচলিত জীবনধারা, আচার-পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পর্যালোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রাচ্য সমাজের দৃঢ়তর ভিত্তি-গঠন মানসে পাশ্চাত্ত্য সমাজের প্রগতিমূলক চিন্তাধারা গ্রহণের অপেক্ষাকৃত পক্ষপাতী ছিলেন। প্রধানতঃ বিদেশী সমাজে ব্যাপকভাবে নারী-শিক্ষা তাঁহার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে এবং সামাজিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টির মূলে নারীর যে মূল্যবান্ ভূমিকা রহিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। সমাজ-জীবনে স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগিতা ও প্রভাব সম্পর্কে তাঁহার কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবন্ধের মাধ্যমে নূতনভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মতে সমাজ-জীবনের অর্ধাঙ্গ হইল নারী এবং সেই বিশিষ্ট অঙ্গ যদি বিচারহীন, মূঢ়, মিথ্যা সংস্কারে ভারাক্রান্ত হইয়া নিষ্ক্রিয়তা লাভ করে, তাহা হইলে সেই সমাজ কখনও উন্নত বা অগ্রসর হইতে পারে না—অচিরেই তাহার বিনাশপ্রাপ্তি ঘটে। রবীন্দ্রনাথ দেশীয় সমাজ-জীবনে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য ও বিমুখতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সমাজ-সমস্যামূলক প্রবন্ধে এই সম্পর্কে চিন্তাগর্ভ যুক্তিসম্মত আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। সমাজ-সৌধের ভিত্তি গঠনে ও ইহার ভারসাম্য যথোচিতভাবে রক্ষাকল্পে নারী-শিক্ষা ও শক্তি যে অবশ্যম্ভাবী, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

১ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ১২শ খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৩৪৯), পৃঃ ২২১

'আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা পরিবর্তন আবশ্যক এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। কেবলমাত্র গৃহলুণ্ঠিত কোমল হৃদয়রাশি হয়ে থাকলে চলবে না, মেরুদণ্ডের উপর ভর করে উন্নত উৎসাহীভাবে স্বামীর পার্শ্বচারিণী হতে হবে। অতএব, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হলে বর্তমান শিক্ষিত সমাজে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়।'[১]

রবীন্দ্রনাথের সমাজ-সংস্কারমূলক মনোভাবের পশ্চাতে যে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার চিন্তা পরিচ্ছন্ন এবং ভাষাও তদনুযায়ী সহজবোধ্য হইয়াছে। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের রচনারীতি সাধারণতঃ কল্পনাপ্রবণ আবেগের রীতি। সেইজন্য তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধসমূহ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকীর্ণ হইলেও কবির আবেগময়ী ভাষণে বহুলক্ষেত্রেই কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক প্রবন্ধসমূহ হইতে তাঁহার সার্বভৌম প্রতিভার অপর একটি বিশিষ্ট দিকের পরিচয় লাভ করা যায়। প্রধানতঃ 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬) ও 'স্বদেশ' (১৯০৮) প্রবন্ধ-সংগ্রহদ্বয়ে রবীন্দ্রনাথের গবেষণাধর্মী ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রবন্ধ-সংগ্রহেও তাঁহার কয়েকটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক কালে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধ সংকলনগ্রন্থ হইতে তাঁহার বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া 'ইতিহাস' (১৯৫৫) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় প্রবন্ধে ভারতীয় ইতিহাসের বহু স্বল্পালোকিত বিষয় তাঁহার প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। প্রচলিত ইতিহাস অর্থে যে রচনা বুঝায়, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সেই নিছক সন-তারিখ সংবলিত ইতিবৃত্ত নহে। এই বিষয়ে তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক চিন্তাধারার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসমূহ হইতে তাঁহার সত্যনিষ্ঠ মননশীল এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির সহিত পরিচয়ের সুযোগ হয়। তাঁহার গবেষণাসুলভ ইতিহাসনিষ্ঠ দৃষ্টিতে তথাকথিত বিদেশী ঐতিহাসিকগণের স্বকল্পিত বিবরণের অসারতা প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মতে বিদেশী ঐতিহাসিক লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস 'ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র।'

১ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ১২শ খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৩৪৯), পৃঃ ২৪৫

ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের প্রকৃত অর্থাৎ সত্য ইতিবৃত্ত গোপন রাখিয়া তাহার পরিবর্তে তাঁহাদের রচনায় যে সুলভ রোমাঞ্চকর মিথ্যা তথ্যাদি পরিবেশন করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ স্বরূপে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁহার 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জ্জনের সাম্রাজ্যগর্ব্বোদ্গার কাল পর্যন্ত যে-কিছু ইতিহাস কথা, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা—তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে তাহাতে আমাদের দেশের দিক্‌টাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়।'[১]

ইতিহাস-চিন্তা কেবলমাত্র রাজা বাদশাহদের কীর্তিকলাপে বা রাজবংশমালা ও তাহাদের জয়-পরাজয়ের দলিলপত্রাদি অনুসন্ধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। ইহা ছাড়াও ইতিহাস অনুশীলনের অন্যবিধ পদ্ধতি আছে এবং তাহা দ্বারাও যে দেশের পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক রূপের পরিচয় লাভ করা সম্ভবপর, রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-সাধনার মধ্যে সেই অভিনব পন্থারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধের একাংশে লিখিয়াছেন—

'ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফ্‌তর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়-পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিক্স নাই, সেখানে আবার হিষ্ট্রী কিসের, তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল ক্ষেতের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া যে-ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে, সেই প্রাজ্ঞ।'[২]

সাধারণ তথাকথিত ঐতিহাসিকগণের গবেষণা-পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ এক অভিনব ঐতিহাসিক দৃষ্টির সহায়তায় ভারতবর্ষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ-প্রকৃতির অনুসন্ধান-কর্মে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। আর্য-অনার্যের কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের ইতিবৃত্ত হইতে কয়েকটি প্রধান

---

১ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ৪র্থ খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৩৫২), পৃঃ ৩৭৯

২ ঐ, পৃঃ ৩৮০

অধ্যায় নির্বাচন করিয়া তিনি ভারতীয় ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের অভিনব ইতিহাস-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ঋষিসুলভ প্রজ্ঞাদৃষ্টির নিকট অধ্যাত্মভাব-প্রধান ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের এক শাশ্বতকালীন চিত্র চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক চিন্তার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইতিহাসের বিচিত্র বিবর্তনশীল বিবিধ ঘটনার ধারা তাঁহার নিকট কখনই খণ্ড বা বিচ্ছিন্নভাবে পরিদৃষ্ট হয় নাই। তিনি বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়াছিলেন যে, বিচিত্র ঘটনাপুঞ্জই দেশ ও জাতির সম্পূর্ণ বা অখণ্ড ইতিহাস নহে। ঐতিহাসিক ঘটনারাজিকে রবীন্দ্রনাথ জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নিগূঢ় মানসপ্রকৃতির নিছক বহিরঙ্গ প্রকাশ রূপেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি, চিরন্তন ঐতিহাসিক সত্য ও চরমতত্ত্বকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশনার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-অনুশীলনের সার্থকতা নিহিত রহিয়াছে। প্রাচীন মহাভারতের মধ্যে যে ঐতিহাসিক চরম সত্য ও তত্ত্ব বর্তমান, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গভীর ভাবদৃষ্টির সহায়তায় তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয় যোগ তাহাই সমস্ত ভারত ইতিহাসের চরমতত্ত্ব। * * * ইতিহাসের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্ত কোনো একটি চরম সত্যকে সন্ধান ও লাভ করিতেছে—নিজের এই সন্ধানকে ও সত্যকে সকল জাতি স্পষ্ট করিয়া জানে না, অনেকে মনে করে পথের ইতিহাসই ইতিহাস, মূল অভিপ্রায় ও চরম গম্যস্থান বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরমতত্ত্বকে দেখিয়াছিল। মানুষের ইতিহাসের জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম অনেক সময়ে স্বতন্ত্রভাবে, এমন কি পরস্পর বিরুদ্ধভাবে আপনার পথে চলে; * * * মানুষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে।'[১]

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় প্রবন্ধ যুক্তিধর্ম ও রসধর্মের এক বিস্ময়কর সম্মিলনে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

১ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ১৮শ খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৩৬১), পৃ: ৪৪১

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিধর্মী সমন্বয়সন্ধানী ঐতিহাসিক দৃষ্টি ভারতীয় ইতিহাসের গভীর অন্তর্দেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার ফলে, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সত্যকার স্বরূপ ও মর্মবাণীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রতীচ্যের ন্যায় প্রধানতঃ রাষ্ট্রশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও নির্ভরশীল নহে এবং উভয়ের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতীয় ও ইউরোপীয় সভ্যতার মূলগত পার্থক্য নির্ণয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহা বিবিধ যুক্তির ভিত্তিতে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা, তাহাই পোলিটিক্যাল্ উন্নতির ভিত্তি—এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধ বন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে-ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা বিরোধ-মূলক; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে-ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা মিলনমূলক।'[১]

রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি প্রবন্ধে মুখ্যতঃ কয়েকটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন। ইতিহাসের ঘটনারাজির যাথার্থ্য বিশ্লেষণে ও বিচিত্র ঐতিহাসিক তথ্যের নিগূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যানে তাঁহার বিস্ময়কর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর চিহ্নিত হইয়াছে। বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্য, যুক্তির বাহুল্য ও প্রামাণ্য তথ্য-সম্পদের পরিচয়বাহী হইলেও রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক প্রবন্ধে রসের স্পর্শ থাকায় তাহা নিছক তথ্য-ভারাক্রান্ত, যুক্তিনিষ্ঠ ইতিহাসেই পর্যবসিত হয় নাই, বরং রসসমৃদ্ধ সাহিত্যিক গৌরব অর্জন করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র বা রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ হইতে তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তার একটি বিশিষ্ট ধারার সহিত পরিচয় লাভ করা সম্ভব হয়। 'মন্ত্রি অভিষেক' তাঁহার লিখিত প্রথম বিশুদ্ধ রাজনৈতিক প্রবন্ধ এবং ইহা ১২৯৭ বঙ্গাব্দের 'ভারতী' নামক মাসিক পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে স্বদেশ তথা সমগ্র বিশ্বের বিবিধ রাজনৈতিক সমস্যা অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং এই সকল রাজনীতি বিষয়ক রচনা তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধ সংকলনগ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয়

১ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ৪র্থ খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৩৫২), পৃঃ ৩৮১

প্রবন্ধ পুস্তক বা পুস্তিকা যথাক্রমে : ১। 'আত্মশক্তি' (১৯০৫), ২। 'রাজাপ্রজা', (১৯০৮), ৩। 'সমূহ' (১৯০৮) ৪। 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' (১৯১৭), ৫। 'কালান্তর' (১৯৩৭), ৬। 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) ও ৭। 'সমবায়নীতি' (১৯৫৪)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের কোন কোন রাজনৈতিক প্রবন্ধ তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ-সংগ্রহে পুনর্গৃহীত হইয়াছে।

এ'কথা অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলির সহিত পরবর্তী কালে লিখিত প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার চিন্তার ক্রমপ্রসারতা বা পরিণতির ফলস্বরূপ ইহা স্বাভাবিকভাবেই সংঘটিত হইয়াছে। প্রথম পর্যায়ের রাজনৈতিক রচনা অপেক্ষা পরবর্তী কালে লিখিত এই জাতীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাব ও চিন্তা অধিকতর স্বচ্ছতা ও গভীরতা লাভ করিয়াছে এবং ইহাতে ব্যঙ্গপ্রিয়তা বা কৌতুক-রসিকতার প্রাধান্য হ্রাস পাইয়া ক্রমান্বয়ে সংযম ও পরিমিতিবোধের পরিচয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার প্রথম পর্যায় অপেক্ষা পরবর্তী পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রবন্ধসমূহেই দেশ বা রাষ্ট্রগত গভীরতর সত্য ও বিশ্বমানবতার সুমহান্ আদর্শ সম্যক্‌ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি-চিন্তা ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন তাঁহার দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে, তেমনি তাঁহার মৌলিক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে তাহা মহিমান্বিত হইয়াছে। গভীর স্বাজাত্যাভিমান ও বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যবোধই রবীন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে এবং বিবিধ প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে তাঁহার রাজনীতি-চিন্তা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধ-গুলি মুখ্যতঃ সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গ অর্থাৎ ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনা ও স্বাধীনতা আন্দোলনকে ভিত্তি করিয়া লিখিত এবং এই সাময়িক সংবাদপ্রধান প্রসঙ্গও তাঁহার অনন্যসাধারণ রচনাকৌশল ও সহজাত কবিদৃষ্টির দ্বারা স্থায়ী সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'আত্মশক্তি' গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধেরই মূল সুর নিজস্ব রাষ্ট্রীয় সাধনা, কর্মনিষ্ঠা ও শক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাস। দেশ ও জাতি গঠনের এক অভিনব পরিকল্পনা তাঁহার 'নেশন কী,' 'ভারতবর্ষীয় সমাজ,' 'স্বদেশী সমাজ,' 'সফলতার সদুপায়,' 'দেশীয় রাজ্য' প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। স্বদেশের জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া আত্মশক্তিতে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এক

স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনতন্ত্র রচনার চিন্তাই রবীন্দ্রনাথকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। বৃহত্তর বিদেশী সরকারকে রাজ্যচ্যুত করিতে হইলে ইহার অভ্যন্তরে যে সর্বাগ্রে একটি স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বদেশী সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

'রাজাপ্রজা' গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহেও রবীন্দ্রনাথ বিবিধ রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের সাধন-পন্থা নির্দেশে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার এই সংকলনগ্রন্থে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'ইংরাজ ও ভারতবাসী'। এই প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'সাধনা' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্বে লিখিত এই প্রবন্ধটির গভীর রাজনৈতিক মূল্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। ইহা ছাড়াও 'রাজনীতির দ্বিধা', 'অপমানের প্রতিকার,' 'সুবিচারের অধিকার,' 'কণ্ঠরোধ' প্রভৃতি প্রবন্ধ যে বাংলাদেশে জাতীয় আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রবীন্দ্রনাথ ইংরাজ সরকারের আমলাতন্ত্রীয় ঔদ্ধত্য ও হৃদয়হীন রাজ্যশাসন-নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীকে কেবলমাত্র নিষ্ঠুর শয়তান-সরকার আখ্যা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—ইংরাজ শাসনতন্ত্রের গতি-প্রকৃতি, গুণাগুণ সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইংরাজ সরকার প্রধানতঃ শাসক ও শাসিতের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান রক্ষা করিয়া বিশেষ গৌরববোধ করিয়াছে এবং ইহাই যে ইংরাজ রাজত্বকে ধ্বংসের অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিবে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে এক গভীর দূরদৃষ্টির সহায়তায় এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। কবির এই ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তী কালে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতীয় শাসকবর্গের রাজত্বের তুলনায় ইংরাজ শাসনের স্বরূপ ও নীতিধর্ম রবীন্দ্রনাথ অতি নৈপুণ্যসহকারে বর্ণনা করিয়াছেন। মোগল রাজত্বে শাসক সম্প্রদায় জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা যন্ত্র মাত্র ছিল না। কিন্তু ইংরাজ শাসনে দেশ ও জাতির সামগ্রিক জীবনাচরণের সহিত শাসকবর্গের নিছক একটা যান্ত্রিক সম্পর্কই স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরাজ রাজত্বে ভারতীয় প্রজাসাধারণের জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতি কি ভাবে বিপন্নপ্রায় হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে তাহারও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

মুসলমান রাজা অত্যাচারী ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে সমকক্ষতার সাম্য ছিল। আমাদের দর্শন কাব্য আমাদের কলাবিদ্যা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে রাজায় প্রজায় আদান প্রদান ছিল। সুতরাং মুসলমান আমাদিগকে পীড়ন করিতে পারিত, কিন্তু অসম্মান করা তাহার সাধ্য ছিল না। মনে মনে আমাদের আত্মসম্মানের কোনো লাঘব ছিল না, * * * খাদ্যরস এবং পাকরস মিশিয়া তবে আহার পরিপাক হয়, ইংরাজের সভ্যতা আমাদের পক্ষে খাদ্যমাত্র, কিন্তু তাহাতে রসের একান্ত অভাব হওয়াতে আমাদের মন তদুপযুক্ত পাকরস নিজের মধ্য হইতে যোগাইতে পারিতেছে না। লইতেছি মাত্র কিন্তু পাইতেছি না। ইংরাজের সকল কার্য্যের ফলভোগ করিতেছি, কিন্তু আমার করিতে পারিতেছি না, এবং করিবার আশাও নিরস্ত হইতেছে।'[১]

রবীন্দ্রনাথ পরাধীন ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিলেন। সেইজন্য বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনীতি আলোচনায় ভারতবাসীর স্বাধীনতালাভের প্রসঙ্গই তাঁহার প্রবন্ধে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধেরই প্রধান বক্তব্য বিষয় এই যে, ভারতবাসীকে সর্বাগ্রে আত্ম-নির্ভরশীল ও আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। নিজস্ব সঙ্গত দাবী ও অধিকার প্রাপ্তির জন্য রাজদরবারে বিনীত প্রার্থনা-পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথ কখনই অনুমোদন করেন নাই এবং তাহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জাতীয় মুক্তি, উন্নতি বা অগ্রগতি সম্ভবপর নহে। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে বারংবার স্বদেশবাসীর নিকট তাঁহার এই সুচিন্তিত নির্দেশ দান করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ রাজনৈতিক প্রবন্ধই ইংরাজদিগের বিনিন্দিত কার্যকলাপ অপেক্ষা স্বদেশ ও স্বজাতির দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটির বিচার-বিশ্লেষণেই পূর্ণ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি-চিন্তার পশ্চাতে একটি সত্যকার গঠনমূলক পরিকল্পনা ছিল এবং এই জাতীয় প্রবন্ধসমূহে তাঁহার গভীর রাষ্ট্রচেতনা ও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম বা জাতিবিদ্বেষ ও মতানৈক্য যে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বৃহৎ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, সে-বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের গভীর মনন-চিন্তায় পরিচয় লাভ করা যায়। তিনি 'সমস্যা', 'হিন্দুমুসলমান' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে

[১] 'রাজাপ্রজা', (বিশ্বভারতী, ১৯২০), পৃঃ ১৩-১৪

বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তাহার সমাধান-পন্থাও নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে উভয় সম্প্রদায়ের অনুদার এবং আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবই উভয়ের মিলনের অন্তরায় হইয়াছে। এই সংকীর্ণ মনোবৃত্তি পরিত্যক্ত হইলে হিন্দু মুসলমানের অন্তরঙ্গ ঐক্য যে সম্ভবপর হইবে, সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি সমস্যা' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'আমরা হিন্দু ও মুসলমান, আমরা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় হিন্দুজাতি এক জায়গায় বাস করিতেছি বটে, কিন্তু মানুষ মানুষকে রুটির চেয়ে যে উচ্চতর খাদ্য জোগাইয়া প্রাণে শক্তিতে আনন্দে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে আমরা পরস্পরকে সেই খাদ্য হইতেই বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছি। * * * সেই কারণে আমরা দ্বীপপুঞ্জের মতোই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছি, মহাদেশের মতো ব্যাপ্ত বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই।'[১]

ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি-চিন্তা কোন বিশিষ্ট রাজনৈতিক দল বা মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় নাই। এ বিষয়ে তাঁহার এক নিজস্ব নিরপেক্ষ উদার দৃষ্টি ছিল। সর্বক্ষেত্রে জাতির প্রাণস্ফূর্তিকেই তিনি রাজনীতির সফল ক্রিয়া হিসাবে অনুভব করিযাছেন। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ মানবপ্রেমিক কবি এবং এই মানবপ্রেম অর্থাৎ মানবতাবাদ দ্বারা তাঁহার রাজনৈতিক চেতনাও পরিপুষ্ট হইয়াছে। তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদকেও কখনই সমর্থন করেন নাই এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর হইতে তাঁহার জাতীয় চেতনায় আন্তর্জাতিকতার সুরই সুস্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ অর্থে কোন সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক চিহ্নিত ভূখণ্ডকে স্বীকার করিতে দ্বিধা করিয়াছেন। দেশবাসীর প্রতি ইংরাজ শাসকবর্গের ঘৃণা ও জুগুপ্সার তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং তাহার মধ্য দিয়া তাঁহার ভারতীয়ত্ব অপেক্ষা সমগ্র মানবজাতির প্রতি, তথা নিপীড়িত পরাধীন জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল কবিপ্রাণের অকুণ্ঠ মমতা ও প্রীতির পরিচয়ই অধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছে। পৃথিবীর যে অংশেই পশুশক্তির নিকট নিরীহ অসহায় জাতিসমূহ অত্যাচারে মর্মপীড়িত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের নির্ভীক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ সেইখানেই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকায় নিগ্রোদের প্রতি অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ

১ 'রাজাপ্রজা', (বিশ্বভারতী, ১৯২০), পৃঃ ১৫৯

করিয়াছেন এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের নিষ্ঠুর শাসনে পর্যুদস্ত কোরিয়াবাসীদের প্রতিও তাঁহার গভীর সমবেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি-চিন্তা ভারতবর্ষের ক্ষেত্র হইতে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সীমানায় প্রসার লাভ করিয়াছে। তাঁহার 'কালান্তরে'র প্রবন্ধগুলিতে প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ বিচার-বিশ্লেষিত হইয়াছে।

'কালান্তর' রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রবন্ধের একটি সংকলনগ্রন্থ। এই সংকলনের প্রতিটি প্রবন্ধের রাজনীতিগত বক্তব্য বিষয় ইতিহাস, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত পেশাদারী রাজনীতিবিদ্ ছিলেন না এবং তাঁহার বাচনভঙ্গি ও ভাষাও প্রচলিত রাজনীতির ভাষা হয় নাই—কিন্তু তাঁহার রাষ্ট্রনীতি-বিশ্লেষণ প্রায়ক্ষেত্রেই নির্ভুল ও সত্যনিষ্ঠ হইয়াছে। ১৩২১ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩৪৩ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব-কাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ তেইশ বৎসরের রাজনৈতিক চিন্তাধারার এক সুস্পষ্ট পরিচয় 'কালান্তরে'র প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং 'কালান্তর' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি-চিন্তার এক দুর্লভ অভিজ্ঞান।

রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'কালান্তর' এবং এই প্রবন্ধের নামানুসারেই সমগ্র গ্রন্থটির নামকরণ করা হইয়াছে। 'কালান্তর' শব্দটি বিশিষ্ট অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। কালান্তরে অর্থাৎ কালের ব্যবধানে স্বদেশ তথা সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্রীয় জীবনে যে রূপান্তর বা পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রসচেতন মানসলোকে এক গভীর উদ্দীপনা ও আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। 'কালান্তরে'র বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের এই উত্তেজিত অথচ পরিণত চিন্তাসম্মত রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধির পরিচয়ই প্রকাশ পাইয়াছে।

যুদ্ধ-পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা ও কর্মধারার সহিত যুদ্ধোত্তর কালে তাহার যে বিরোধ ঘটিয়াছে, সেই বিরোধের মূল কারণসমূহ রবীন্দ্রনাথ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করিয়াছেন। ইউরোপের সংস্কৃতি, তাহার মানবিক ও অধ্যাত্ম-ঐতিহ্য, তাহার কল্যাণকামী সুস্থ কর্মপ্রচেষ্টা কালধর্মে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া এক হীন পাশবিক বর্বরতার আশ্রয় লইয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতা

মনুষ্যত্বের মহান্ আদর্শ ভূলুণ্ঠিত করিয়া পরজাতি-ধর্ম-বর্ণদ্বেষ ও বস্তুলোভ-সর্বস্ব আত্মবিস্তারের উন্মত্ততায় পর্যবসিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কালান্তর' প্রবন্ধে ইউরোপীয় সভ্যতার শূন্যগর্ভ আস্ফালন, দুর্নিবার পশুবলের স্বরূপ নগ্নভাবে উন্মোচন করিয়া লিখিয়াছেন—

'য়ুরোপের শুভবুদ্ধি আপনার' পরে বিশ্বাস হারিয়েছে, আজ সে স্পর্দ্ধা ক'রে কল্যাণের আদর্শকে উপহাস করতে উদ্যত। আজ তার লজ্জা গেছে ভেঙে; একদা ইংরেজের সংস্রবে আমরা যে-য়ুরোপকে জানতুম, কুৎসিতের সম্বন্ধে তার একটা সঙ্কোচ ছিল, আজ সে লজ্জা দিচ্চে সেই সঙ্কোচকেই। আজকাল দেখছি আপনাকে ভদ্র প্রমাণ করবার জন্যে সভ্যতার দায়িত্ববোধ যাচ্চে চলে। অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখা দিচ্চে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে।'[১]

রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তির উন্মত্ত বর্বরতা অনাবৃত করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের প্রতিও তাহার হৃদয়হীন নির্মম আচরণের পরিচয় প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ভারতবাসী বিদেশী শাসনের প্রতি বাহ্যতঃ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু তাহা তাহার সাময়িক উত্তেজনাজাত—আভ্যন্তরীণ স্থির-সংযত, প্রস্তুতিপূর্ণ ক্ষমতার কোন প্রতিবাদ বা আন্দোলন নহে। রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, স্বদেশের সর্বক্ষেত্রেই অন্ধ-সংস্কার, রক্ষণশীল মনোভাব জাতীয় জীবন ও চরিত্রকে পঙ্গু করিয়া তাহার অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়াছে। দেশের সমাজ-সংস্কৃতি, সভ্যতা ও শিক্ষাধারার মধ্যে কোনরূপ বৈচিত্র্য নাই—এক কৃত্রিম সনাতন সংস্কার-চক্রে আবর্তিত হইয়া দেশের নিগূঢ় প্রাণশক্তির অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বিবেচনা ও অবিবেচনা', 'লোকহিত', 'ছোটো ও বড়ো' প্রভৃতি প্রবন্ধের মাধ্যমে দেশের প্রাণহীন সংস্কারাবদ্ধ স্থবির জীবনযাত্রাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছেন এবং রক্ষণশীলতার নাগপাশমুক্ত এক সহজ যৌবনশক্তিকে আবাহন জানাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই সকল প্রবন্ধে শ্লেষ-বিদ্রূপের অন্তরালে তাঁহার এক গভীর মর্মবেদনার সুরও ধ্বনিত হইয়াছে।

ইউরোপ ও ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরস্পর হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র এবং সেইজন্য উভয়ের রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান-পন্থা নির্দেশকরণ একই পদ্ধতিতে

---

১ 'কালান্তর', (বিশ্বভারতী, ১৩৪৪), পৃঃ ১৩

সম্ভবপর নহে। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমস্যাগুলির অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া অভিমত দিয়াছেন যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাব অপেক্ষা সামাজিক বিবিধ আচরণ বা সংস্কারই দেশের সমস্যাসমূহকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে এবং দেশের জনশক্তির অগ্রগমনকে ব্যাহত করিয়াছে। 'সমস্যা', 'শক্তিপূজা', 'হিন্দুমুসলমান' প্রভৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় সমস্যার কথাই সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

'বাতায়নিকের পত্র' রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ। এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি তাঁহার পাঁচটি পত্রের সমষ্টি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রে'র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে ক্রমান্বয়ে যে পাঁচটি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাই সাহিত্যক্ষেত্রে 'বাতায়নিকের পত্র' নামে সুপরিচিত হইয়াছে। এই পত্র-প্রবন্ধগুলিতে সমকালীন ভারতবর্ষের তথা সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সমস্যাবলী রবীন্দ্রনাথের মনে যে প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহারই পরিচয় লাভ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধান্তের পটভূমিকায় ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার মূল মর্মকথা অর্থাৎ আমলারাজতন্ত্রজাত ঘৃণ্য পররাজ্য-লালসা ও বর্বরতম শক্তি অর্জনের নির্লজ্জ প্রতিযোগিতার স্বরূপ তিনি 'কালান্তর', 'লড়াইয়ের মূল' প্রভৃতি প্রবন্ধে যে ভাবে উদ্ঘাটন করিয়াছেন, বাতায়নিকের পত্র'টিও তাহারই অধিকতর সুষ্ঠুতম ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ ও মূল্যবান্ হইয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল ত্রুটি কোথায়, কি তাহার পরিণতি, কোথায় তাহার মীমাংসা বা সমাধান, কোথায় সকল মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি—এই সকল বিবিধ প্রশ্নই 'বাতায়নিকের পত্রে'র মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সর্ববিধ সমস্যার এক সামগ্রিক রূপ তাঁহার সত্যদ্রষ্টার পূতস্নিগ্ধ বেদীভূমি হইতে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীর সামরিক ও বাহ্যিক শক্তি সঞ্চয় এবং উপকরণ বা বস্তুগত সম্পদ লাভের জন্য তাহার অত্যুগ্র লালসা ও প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'যারা শক্তিকেই চরম ব'লে জানে তারা আয়তনে বড়ো হোতে চায়। টাকার সংখ্যা, লোকের সংখ্যা, উপকরণের সংখ্যা, সমস্তকেই তারা কেবল বহুগুণিত করতে থাকে। * * * এইজন্যেই সিদ্ধিলাভের কামনায় এরা

অন্যের অর্থ, অন্যের প্রাণ, অন্যের অধিকারকে বলি দেয়। শক্তি-পূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান। সেই বলির রক্তে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে।'[১]

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীর বীভৎস লালসা মানব-সভ্যতার ক্ষেত্রে যে সংকট সৃষ্টি করিয়াছে এবং মানবজীবনের শাশ্বত সনাতন আদর্শকে মসীলিপ্ত ও রক্ত-কলঙ্কিত করিয়াছে, শেষজীবনে লিখিত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ পুস্তিকায়ও বিশ্বমানবপ্রেমিক সত্যসন্ধানী কবি রবীন্দ্রনাথ তাহা নির্ভীকভাবে প্রচার ও প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে যেমন গভীর মননশীলতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি তাহাতে রাষ্ট্রীয় বিবিধ সমস্যানুসারে যুক্তি-বিচারসম্মত সিদ্ধান্তও প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার এই শ্রেণীর প্রবন্ধের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রতিপক্ষ মতাদর্শের বিরুদ্ধাচরণ বা সমালোচনা করিলেও রবীন্দ্রনাথের রচনা কোথাও সংযম ও শালীনতার সীমা অতিক্রম করে নাই। যদিও তাঁহার বক্তব্য বা আলোচনা বহুল ক্ষেত্রেই ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে তীব্র বা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহা দ্বারা বিজাতীয় ঘৃণা বা নীচ মনোবৃত্তিসুলভ অশ্লীল ইঙ্গিতের পরিচয় প্রকাশ পায় নাই।

রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কবিগুরুই নহেন, তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাগুরুও ছিলেন। যথার্থ শিক্ষা জাতির জীবন ও চরিত্রের ভিত্তি স্বরূপ, অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত পৃথিবীতে কোন জাতি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। শিক্ষাই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ বিকাশে ও চরম চিত্তোৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হয় এবং মানুষের সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করে। সেইজন্য দেশ ও জাতির শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে শিক্ষোৎসাহী রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কখনও বিচ্ছিন্ন রাখেন নাই। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধসমূহে দেশের বিবিধ শিক্ষা-সমস্যা, শিক্ষাদান-পদ্ধতি, শিক্ষাধারার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁহার গভীর বিচার-বিশ্লেষণ ও সুচিন্তিত মীমাংসার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ পুস্তিকা বা সংকলনগ্রন্থ যথাক্রমে : ১। 'শিক্ষা' (১৯০৮), ২। 'শিক্ষার মিলন' (১৯২১), ৩। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ'

১ 'কালান্তর', (বিশ্বভারতী, ১৩৪৪), পৃঃ ১১৫

(১৯৩৩), ৪। 'শিক্ষার বিকিরণ' (১৯৩৩), ৫। 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' (১৯৩৬), ৬। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (১৯৪১) ও ৭। 'বিশ্বভারতী' (১৯৫১)।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শিক্ষাব্রতী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই প্রবন্ধসমূহ রচনা করিয়াছেন। শিক্ষাবিদ্ হিসাবেও তাঁহার যে স্বতন্ত্র পরিচয় আছে, অর্থাৎ শিক্ষানীতি সম্পর্কে তাঁহার মৌলিক দর্শন-চিন্তার যে গভীর স্বাক্ষর সুচিহ্নিত, তাহা এই জাতীয় প্রবন্ধসমূহ হইতে লাভ করা যায়। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, রবীন্দ্রনাথও আদর্শ শিক্ষানীতি প্রচার করিয়া রুশো, পেস্টালৎজি, ফ্রয়েবেল, মন্তেসরী, ডিউঈ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ্গণের ন্যায় এক বিশিষ্ট গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ দেশের প্রচলিত শিক্ষাধারার মৌলিক ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, ত্রুটিবহুল নীরস শিক্ষা-পদ্ধতির জন্যই শিক্ষার্থীর সমগ্র ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব হয় না। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষার মধ্যে কোনরূপ বৈচিত্র্য বা আনন্দ নাই এবং সেই কারণে, সে শিক্ষা শিক্ষার্থীর অন্তর ও স্বভাবের সহিত কখনই সুষ্ঠুভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না—তাহা কেবল মানসিক শক্তিই হ্রাস করে মাত্র। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষার এই জাতীয় ত্রুটি নির্দেশ করিয়া 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধের একাংশে লিখিয়াছেন—

'বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্তই আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। * * * আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বল লাভ করে। কিন্তু এই মানসিক শক্তি-হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত বাঙালি কী করিয়া এড়াইবে, কিছুতেই ভাবিয়া পাওয়া যায় না।'[১]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রতিটি প্রবন্ধই চিন্তার প্রসার, গভীরতা ও প্রত্যয়ঘনতায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে। শিক্ষার নানামুখী সমস্যা ও যথার্থ শিক্ষার সমুচিত পন্থা বিচার-বিবেচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ শিক্ষানীতি সম্পর্কে যে অভিমত

১ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ১২শ খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৩৪৯), পৃঃ ২৭৯

প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় বিশেষ মূল্যবান্। বর্তমান কালে দেশের প্রচলিত শিক্ষার সহিত দেশীয় জনসাধারণের ব্যবহারিক জীবনের কোনরূপ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না এবং অধীত বিদ্যা ও তাহার ব্যবহারের মধ্যে যে অনন্ত ব্যবধান থাকিয়া যায়, তাহার মূল কারণ তিনি অতি বিচক্ষণভাবে অনুসন্ধান করিয়াছেন। দেশের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির অন্যতম বিশেষ ত্রুটি এই যে, সর্ববিধ শিক্ষা-কর্মই মাতৃভাষার পরিবর্তে বিদেশী অর্থাৎ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অথচ সত্যকার শিক্ষার ভিত্তি মাতৃভাষা ও সাহিত্যের উপরই স্থাপিত হইয়া থাকে। শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ তুল্য—এই সহজ সত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'শিক্ষা-সংস্কার' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'আমাদের মন তেরো চোদ্দো বছর বয়স হইতেই জ্ঞানের আলোক এবং ভাবের রস গ্রহণ করিবার জন্য ফুটিবার উপক্রম করিতে থাকে, সেই সময়েই অহরহ যদি তাহার উপর বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং মুখস্থ বিদ্যার শিলাবৃষ্টি বর্ষণ হইতে থাকে, তবে তাহা পুষ্টিলাভ করিবে কী করিয়া। * * * যাহা গ্রহণ করি, তাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিতে থাকিলে তবেই ধারণাটা পাকা হয়। পরের ভাষায় গ্রহণ করাও শক্ত প্রকাশ করাও কঠিন।'[১]

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যভিত্তিক এই জাতীয় প্রবন্ধও ইঙ্গিতধর্মী এবং সরস উপমা ও তীক্ষ্ণ বিচার-বোধের বিদ্যুৎ চমকে দীপ্তিময় হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি ও আদর্শ বর্তমান দেশের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিশ্বপ্রকৃতির সহযোগে শিক্ষাদান-রীতি তাঁহার নিকট বিশেষ-ভাবে সমাদৃত হইয়াছে এবং শিক্ষার্থীদের তপোবনসুলভ শিক্ষা-গ্রহণের এই জাতীয় আদর্শ রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য কোন শিক্ষাব্রতী মনীষী প্রবর্তিত শিক্ষানীতির অনুশীলন দ্বারা অর্জন করেন নাই। বরং এই প্রকার শিক্ষাদানের প্রেরণা তিনি ভারতবর্ষের মহান্ ঐতিহ্য হইতেই লাভ করিয়াছেন। বিশাল ভারতের সংস্কৃতি-সাধনার অমৃত রসধারা নিঃশেষে পান করিয়া রবীন্দ্রনাথ সত্যকার সংস্কৃতিবান্ ভারতীয় সাধক হইয়াছেন। অতএব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার ধ্যান-ধারণার মধ্যে ভারতের সনাতন শিক্ষা-ঐতিহ্যের যথার্থ রূপটি প্রকাশ লাভের সুযোগ

১ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ১২শ খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৩৪৯), পৃঃ ২৯২

পাইয়াছে। শ্যামল-স্নিগ্ধ উদার বিস্তৃত প্রকৃতির মধ্যে গভীরভাবে আত্মনিমগ্ন হইয়া যে শিক্ষা-সাধনা, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষারীতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা অনস্বীকার্য যে, বিশ্বপ্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য ও মাধুর্য হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিয়া কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকাবদ্ধ বিষয়াত্মক শিক্ষার দ্বারাই মানব-মন যথোচিতভাবে প্রসারিত ও বিকশিত হইতে পারে না। বাহিরের প্রাকৃত জগৎ ও ভিতরের মানসিক জগৎ এই উভয়ের সার্থক সম্মিলনেই মানুষের সকল চিত্তবৃত্তির সম্যক্ স্ফূর্তিলাভ ঘটিয়া থাকে এবং মানবীয় চিত্তবৃত্তি-সমূহের সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি ও বিকাশই যে প্রকৃত শিক্ষা, তাহা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্র-নাথের 'শিক্ষা সমস্যা' নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'খোলা আকাশ খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীর মনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার এ-কথা বোধহয় কেজো লোকেরাও একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। * * * যে জল স্থল-আকাশ-বায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি, তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃস্তন্যের মতো তাহার অমৃত রস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি, তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব। * * * আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই।'[১]

শিক্ষার্থীর চরিত্রের বিকাশ ও পরিপুষ্টির জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক পরিবেশের অপরিমেয় প্রভাব ও প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা-চিন্তায় প্রাকৃতিক পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান্ হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যালয় বা শিক্ষায়তন স্থাপনে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাহার সম্পর্কশূন্যতা রবীন্দ্রনাথের নিকট কল্পনাতীত ছিল। প্রকৃতির সজীব সক্রিয়তা তিনি গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং বিদ্যায়তনে বিশ্বপ্রকৃতির উপস্থিতি যে নিষ্ক্রিয় জড় উপস্থিতি নহে ও শিক্ষার্থীর জীবনে বিশ্বপ্রকৃতির যে অমোঘ প্রভাব বর্তমান, তাহা রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতী' প্রবন্ধ পুস্তিকায় অধিকতর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

১ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ১২শ খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৩৪৯) পৃঃ ৬০৩-৬০৪

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শমূলক প্রবন্ধ যেমন কাব্যরসে সমৃদ্ধ, তেমনি তাহা গভীর আন্তরিকতায় অভিষিক্ত হইয়াছে। তাঁহার শিক্ষানীতি বা আদর্শ নিছক ভাববাদী কবির স্বপ্ন-বিলাস মাত্রেই পর্যবসিত হয় নাই। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র শিক্ষাতত্ত্বের উদ্‌গাতা ও শিক্ষানীতির স্রষ্টাই ছিলেন না—তিনি স্বয়ং একজন শিক্ষক ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব, রীতি-নীতি ও প্রয়োগ-পদ্ধতি কেবলমাত্র প্রবন্ধ রচনা-কর্মেই নিঃশেষিত হয় নাই, তিনি তাঁহার ভাবাদর্শের বাস্তব রূপায়ণে ও ব্যবহারিক প্রয়োগেও সচেষ্ট হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আজীবন শিক্ষা-সাধনারই অন্যতম সার্থক বাস্তব ফলশ্রুতি বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন। মানুষের সমগ্র মন ও চিত্তের স্বচ্ছন্দ বিকাশ-পন্থার সুষ্ঠু নির্দেশই মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ প্রধানতঃ তাঁহার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা ও গভীর মনন-ধর্মে সমৃদ্ধ। তাঁহার এই জাতীয় প্রবন্ধ যেমন চিন্তাগর্ভ ও উপদেশাত্মক, তেমনি কবি-হৃদয়ের আন্তরিক স্পর্শে ও বাচনভঙ্গির অভিনব নৈপুণ্যে চিত্তাকর্ষক। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রবন্ধের অন্যতম উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ এই যে, ইহার মধ্যে যেমন উপমা ও যথাযথ দৃষ্টান্তের আশ্চর্য-সুন্দর প্রয়োগ-দক্ষতা লক্ষ্য করা গিয়াছে, তেমনি ইহার স্থানে স্থানে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ বা কৌতুকরস প্রবাহিত হওয়ায় এই জাতীয় প্রবন্ধ জনসমাজে অধিকতর রমণীয় ও উপভোগ্য হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন সুদক্ষ শিল্পী। বিশিষ্ট ব্যক্তিচরিত্র চিত্রণেও তাঁহার অসামান্য লিপি-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্র-চিত্র সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পুস্তিকা যথাক্রমে : ১। 'চারিত্রপূজা' (১৯০৭), ২। 'প্রসাদ' (১৯৩৯) ও ৩। 'মহাত্মা গান্ধী' (১৯৪৮)। তাঁহার 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থটি ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থে রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—বাংলাদেশের এই তিনজন বিশিষ্ট মনীষীর অতন্দ্র কর্মকৃতি ও তাঁহাদের দীপ্তোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের এক মহান্ পরিচয় অতি সংক্ষিপ্তরূপে প্রদান করিয়াছেন। এই মনীষিগণ যে দেশ ও জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ, তাহা তাঁহার তিনটি পৃথক্ প্রবন্ধে চমৎকারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এবংবিধ

প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে, তথাকথিত জীবনচিত্রের ন্যায় বক্ষ্যমাণ মহাপুরুষ-গণের ব্যবহারিক জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ইহাতে প্রকাশিত হয় নাই, কেবলমাত্র চরিত্রগত আদর্শের অন্তর্নিহিত শক্তির স্বরূপ ও তাহার কার্যক্রমের পরিচয়ই ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। যে বলিষ্ঠ আদর্শবাদের মধ্য দিয়া মহাত্মাদিগের জীবন ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া সমগ্র জাতি ও সমাজের পথ নির্দিষ্ট এবং আলোকিত করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থে তাহারই নাতিদীর্ঘ অথচ সারগর্ভ মনোজ্ঞ আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' নামক প্রবন্ধে রামমোহনের আদর্শ যে ভারতীয় সাধনগত ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই রূপায়িত হইয়াছে, তাহা অতি নৈপুণ্যসহকারে রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করিয়াছেন। রামমোহনের অসাধারণ চরিত্রশক্তি, দুরূহ কর্মকৃতি ও সমুদ্ধত পৌরুষ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষেরই একটি বিশিষ্ট পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' প্রবন্ধের একাংশে লিখিয়াছেন—

'ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন সাধনায় নয়। এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধুনিক কালে রামমোহন রায়। * * * তাঁর সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়, তিনি ভারতের সত্য পরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। ভারতের সত্য পরিচয় সেই মানুষে, যে মানুষের মধ্যে সকল মানুষের সম্মান আছে স্বীকৃতি আছে।'[১]

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় সকল প্রবন্ধই যেমন তাঁহার শ্রদ্ধা, ভক্তিবিগলিত অনুরাগে রঞ্জিত, তেমনি গভীর মননশীলতার দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

'জীবন-স্মৃতি' (১৯১২), 'ছেলেবেলা' (১৯৪০) ও 'আত্মপরিচয়' (১৯৪৩)—রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয়মূলক তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যে আত্মকাহিনী হিসাবে 'জীবন-স্মৃতির' স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। আত্মপ্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া এইরূপ অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টি রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় না। সাধারণতঃ আত্মজীবনী ও জীবন-চরিতের মধ্যে একটি স্থূল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জীবন-চরিতে মুখ্যতঃ বিভিন্ন ঘটনা ও বিবিধ তথ্যাদির আলোচনা হইতে প্রতিপাদ্য

১ 'চারিত্রপূজা', (বিশ্বভারতী, ১৩৬১), পৃঃ ৬৩-৬৪

ব্যক্তিপুরুষের বহিরঙ্গীয় দিক সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা হইতে পারে; কিন্তু তাহার অন্তর্লোকের রহস্য বা স্বরূপ যথার্থভাবে উদ্ঘাটিত হয় না। ব্যক্তির অন্তর্জীবনের যথার্থ চিত্রণ কেবলমাত্র আত্মজীবনীতেই সম্ভবপর হয়। অতএব জীবন-চরিত ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বস্তুধর্মী (objective) রচনা, অপরপক্ষে আত্মজীবনী বস্তুগৌণ ব্যক্তি-মানসজাত (subjective) সৃষ্টি।

সাহিত্য ক্ষেত্রে ব্যক্তির জীবনধারা ও মনের স্বাতন্ত্র্য এবং রচনারীতির বিভিন্নতা অনুসারে আত্মজীবনী রচনার মধ্যেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সেইজন্য আত্মজীবনীর যথাযথ সংজ্ঞা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি'র উল্লেখ করা যায়। বাংলা সাহিত্যে ইহা এক বিচিত্র অভিনব আত্মজীবনী। 'জীবন-স্মৃতি'র প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য হইতেই ইহার স্বাতন্ত্র্য ও স্বরূপ-রহস্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রং পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে, সে রং তাহার নিজের ভাণ্ডারের;' সে রং তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে—।'[১]

আত্মজীবনীর বিচিত্র রূপ ও প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া ইহার বিভিন্ন সংজ্ঞা সাহিত্যে প্রচলিত হইয়াছে। বিভিন্ন জাতীয় আত্মজীবনীর পরিপ্রেক্ষিতে 'জীবন-স্মৃতি'র রূপ-বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গতঃ আলোচনীয়। ব্যক্তিপুরুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখমিশ্রিত জীবনের যথাযথ রূপায়ণও আত্মজীবনী এবং বিশ্বসাহিত্যে এবংবিধ বহু বিশিষ্ট আত্মজীবনীরও সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু 'জীবন-স্মৃতি' এই পর্যায়েরও আত্মজীবনী নহে। ইহাতে রবীন্দ্র-জীবনের অধিকাংশ অংশই অলিখিত রহিয়া গিয়াছে এবং যে অংশ মাত্র ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও রবীন্দ্রনাথের দোষ-গুণ, পাপ-পুণ্য সমন্বিত ব্যক্তিজীবনের কোন চিত্রই উদ্ঘাটিত হয় নাই।

ব্যক্তির কেবলমাত্র আত্মোদ্ঘাটনই নহে—কোন কোন আত্মজীবনীতে ব্যক্তিপুরুষের আত্মোদ্ঘাটনের সহিত সমান্তরালভাবে দেশের তৎকালীন সমাজ-

১ 'জীবন-স্মৃতি', (বিশ্বভারতী, ১৩৬৩), পৃঃ ১

জীবন তথা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার বিস্তৃত বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর আত্মজীবনীর মানদণ্ডেও 'জীবন-স্মৃতি' বিচার্য নহে। কারণ, ইহাতে দেশ-কালের যে সামান্য চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দ্বারা দেশের সমসাময়িক জীবন বা সমাজের অখণ্ড পরিচয় লাভ করাও সম্ভব হয় না।

কোন কোন আত্মজীবনী ব্যক্তি বিশেষের সমগ্র শিল্পি-সত্তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা। বিশ্বসাহিত্যে এই জাতীয় আত্মজীবনীর সংখ্যা পরিমাণে আশানুরূপ নহে। 'জীবন-স্মৃতি'তেও রবীন্দ্রনাথের শিল্পী বা কবি-জীবনের ক্রমবিকাশের পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার কাব্য-জীবনের প্রাথমিক পর্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা রচনার কাল হইতে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ রচনা পর্যন্ত তাঁহার কবিত্ব উন্মেষের পরিচয়ই ইহাতে বিধৃত হইয়াছে। 'জীবন-স্মৃতি' রবীন্দ্র-কবিমানসের উন্মেষ পর্বের একটি সার্থক-সুন্দর রূপচিত্র। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের যে কবিমনের পরিণত রূপ ও তাঁহার কাব্যের যে অনন্ত বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি, তাহার কোন বিবরণই 'জীবন-স্মৃতি'তে লিপিবদ্ধ হয় নাই। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে গভীর কৌতূহল ও অনন্ত জিজ্ঞাসা, বিশ্বজাগতিক নিয়ম-বিধির ঊর্ধ্বে দুর্নিরীক্ষ্য ঐশী-শক্তি সম্পর্কে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি, মানব-স্বভাবসুলভ একান্ত মর্ত্যপ্রীতি, বিশ্বপ্রকৃতির অসীম সৌন্দর্যের প্রতি সুনিবিড় আকর্ষণ, সাংস্কৃতিক বিষয় বা শিল্পকলার প্রতি অনুরাগ এবং নিয়ন্ত্রীশক্তি বা জীবনদেবতার অনিবার ইঙ্গিতে অধ্যাত্ম অভিসার প্রভৃতি বৃহত্তর বিষয়-বৈচিত্র্যের মধ্যে নিত্য অভিনব অনুভূতি-প্রখর কবিচিত্তের যে প্রোজ্জ্বল অভিব্যক্তি ঘটিতেছিল, সেই বিশেষ মুহূর্তে বা সন্ধিক্ষণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'র সমাপ্তি ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার কবি-জীবনের রূপান্তর বা পালা-বদলের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কবিত্বসুলভ ভাষায় লিখিয়াছেন—

'এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। * * * এখানে কত ভাঙ্গাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন! এই সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবন-দেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই। * * * মূর্তিকে

বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না। অতএব খাসমহালের দরজার কাছে পর্যন্ত আসিয়া এইখানেই আমার জীবন-স্মৃতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায়গ্রহণ করিলাম।'[১]

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের শিল্পী বা কবি-জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হইতেই এই গ্রন্থখানি বঞ্চিত হইয়াছে। অতএব 'জীবন-স্মৃতি' অখণ্ড অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ কবি-জীবনের বিশদ ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ আত্মজীবনীর গৌরব লাভ করিতেও সমর্থ হয় নাই।

সাহিত্য ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের স্মৃতি-চিত্রবহুল গ্রন্থও আত্মজীবনী অভিধা লাভ করিয়াছে। এই মানদণ্ডে বিচার করিয়া 'জীবন-স্মৃতি'কে নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট আত্মজীবনীর মর্যাদায় ভূষিত করা যায়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখিয়াছেন—

'স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। * * * বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।'[২]

'জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্র-জীবনের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণিত হয় নাই। ইহার প্রতিটি পৃষ্ঠাই কবির অতীত স্মৃতির এক একটি অপূর্ব আলেখ্য। স্মৃতি-চিত্র অঙ্কনেও রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পীর ক্ষমতাও অর্জন করিয়াছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে বিচিত্র স্মৃতি-সূত্র অবলম্বন করিয়া তিনি বিগত কালের স্বপ্নমধুর বঙান দিনের রেখাচিত্র অতি নৈপুণ্যসহকারে অঙ্কন করিয়াছেন। ভৃত্য-শাসনাধীন বাল্যজীবন, বিবিধ বিদ্যাশিক্ষার অনুকূল আয়োজন, সৌম্য-গম্ভীর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রভাব, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত প্রথম পরিচয়জাত বিস্ময়বিহ্বলতা, বৌঠাকুরাণীর স্নেহ-নির্ঝর ধারায় অভিষিক্ত শৈশবের চপল-মুখর মুহূর্ত, স্বাদেশিকতার মোহময় এক গভীর উত্তেজনা, বর্ষা ও শরতের অনন্ত মেঘলোকে কবিমনের নিরুদ্দেশযাত্রা প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের শৈশবকালীন বিচিত্র রসমধুর চিত্র কবি-শিল্পীর অনুপম রঙে ও রেখায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' যেন এক বিরাট চিত্রশালা। ইহার 'এক একটি ছবির চারিদিকে প্রচুর কারুকার্য-বিশিষ্ট বহু বিস্তৃত ভাষার সোনার ফ্রেম দেওয়া।'

১ 'জীবন-স্মৃতি', (বিশ্বভারতী, ১৩৬৩), পৃঃ ১৫১-৫২

২ ঐ, পৃঃ ১

'জীবন-স্মৃতি' স্মৃতি আশ্রিত চিত্ররস এবং বিভিন্ন চিত্রসমূহের বিচিত্র বর্ণরাগে অনুরঞ্জিত হইয়াছে। স্মৃতি চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মসৃণ-চিকণ সূক্ষ্ম বয়নজাত কাব্যধর্মী ভাষাও তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর শিল্প-দক্ষতা প্রমাণ করিয়াছে। বস্তুতঃ, 'জীবন-স্মৃতি' কবি রবীন্দ্রনাথের অতীত স্মৃতির এক বিশিষ্ট চিত্ররূপ।

আত্মপরিচয়মুখর 'জীবন-স্মৃতি'র একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার সর্বত্র লেখকের গভীর নিরাসক্তি ও মাত্রা-সচেতন আত্মসংযম বর্তমান। স্ব-পরিচয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অহংচেতনা কোথাও অনাবশ্যকভাবে প্রকটিত হইয়া রচনার ভাব-মাধুর্য ও গতি-স্বাচ্ছন্দ্যের ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ করে নাই। কবি-জীবনের প্রাথমিক পর্বে লিখিত কাব্যগ্রন্থসমূহের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিরপেক্ষ সমালোচনা-দৃষ্টির এক বিস্ময়কর পরিচয় দান করিয়াছেন। এই গ্রন্থে আনুপূর্বিক কবির প্রশান্ত উদার রসদৃষ্টি রচনার সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতা অনাবিল রাখিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি'র মুখ্য অংশই কবির শৈশবের বিচিত্র স্মৃতিকথায় পূর্ণ। বিবিধ প্রাণবন্ত চিত্রের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের শৈশবকালীন আমিত্বের স্বরূপ অপূর্ব সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বিগত দিনের চিরঅম্লান ঘটনারাজি কবির অনবদ্য রচনাকৌশলে প্রত্যক্ষ চিত্ররূপ লাভ করিয়াছে। কবির অতীত কালের বিচিত্র ঘটনা কোথাও পরিহাসরসিকতায় মুখর, কোথাও বা করুণরসে বেদনাবিধুর হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন ও কবিমানস ক্ষেত্রে যে সকল বিশিষ্ট মনীষী ও আত্মীয়-পরিজনের প্রভাব গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল, তাঁহাদের চরিত্র-চিত্রও কবির 'জীবন-স্মৃতি'তে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কবির পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার বিদুষী পত্নী কাদম্বরী দেবী, মিস্ আন্না, শ্রীকণ্ঠ সিংহ প্রভৃতির প্রখর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের শৈশবজীবনে সর্বাপেক্ষা গভীর ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থে বিচিত্র ঘটনা বর্ণনার সহিত বিভিন্ন ব্যক্তিপুরুষের চরিত্র-চিত্র রূপায়ণেও অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দান করিয়াছেন। বিশেষতঃ, সংগীতরসিক শ্রীকণ্ঠ সিংহ ও কবির পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই উভয়ের চরিত্র চিত্রণ অপূর্ব-সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত এই দুইটি চরিত্ররূপ প্রসঙ্গে

সাহিত্য-সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। অজিত কুমার লিখিয়াছেন—

'একটি বৃদ্ধ শ্রীকণ্ঠ সিংহের চিত্র। অন্যটি কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের। এই চিত্র দুইটি কবির জীবনের ভাবের এবং কল্পনার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে বলিলে অসঙ্গত হয় না। * * * একটি চঞ্চল, অপরটি স্তব্ধ; একটি আত্মবিহ্বল, অপরটি আত্মসমাহিত; একটি লীলাময়, অপরটি যোগমগ্ন; একটি সজন, অপরটি নির্জ্জন। পূর্ণতার এই দুইটি দিকই কবির কাছে তুল্য আদরণীয়।' ১

রবীন্দ্র-জীবনে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিচরিত্রের ন্যায় কবির ভ্রাতৃজায়া বৌঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবীর চারিত্রিক প্রভাবও গভীরভাবে ছায়াপাত করিয়াছে। যদিও 'জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ পৃথক্ ও বিস্তৃতভাবে কোথাও বৌঠাকুরাণীর চরিত্র-পরিচিতি প্রকাশ করেন নাই, তথাপি প্রসঙ্গতঃ কবি তাঁহার যে চরিত্ররূপের সামান্য ইঙ্গিত দান করিয়াছেন, তাহা দ্বারা এই সুরসিকা মহিলার নিবিড় স্নেহ-প্রেমভাব ও কাব্যপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবি-জীবনের প্রাথমিক পর্বে বৌঠাকুরাণীর নিকট হইতে যে গভীর প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৌঠাকুরাণীর অকাল মৃত্যু রবীন্দ্র-চিত্তলোকে যে শূন্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল, 'জীবন-স্মৃতি'র পৃষ্ঠায় কবির বেদনাময় দীর্ঘশ্বাস হইতে তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

ঋতুর আবর্তনে বিশ্বপ্রকৃতির যে মোহময় বিচিত্র লীলা ও তাহার রূপময় অভিব্যক্তি, তাহাও 'জীবন-স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ্য চিত্রাঙ্কনী প্রতিভায় পরিস্ফুট হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত প্রকৃতি যেমন প্রাণবন্ত, তেমনি রূপ-বৈচিত্র্যে চিত্তহারী। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, স্মৃতি-চিত্রপ্রধান 'জীবন-স্মৃতি' বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের একক ও অনন্যসাধারণ সাহিত্যসৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের আড়ম্বরবর্জিত অথচ অনবদ্য সুমধুর ভাষাও 'জীবন-স্মৃতি'র এক দুর্লভ ঐশ্বর্য। কবির গদ্যভাষা কোথাও অনাবশ্যকরূপে পল্লবিত হইয়া এই স্মৃতি-চিত্রের রূপ ও মহিমা সমাচ্ছন্ন করে নাই। স্মৃতির সমতালে ভাষার শ্রুতিমধুর ঝঙ্কার গ্রন্থখানিকে অধিকতর সরস ও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

১ 'কাব্য-পরিক্রমা,' (বিশ্বভারতী, ১৩৪০) পৃঃ ৮৭-৮৮

অপরূপ রচনারীতির অননুকরণীয় কৌশলে ও শিল্প-বৈচিত্র্যময় ভাষানৈপুণ্যে 'জীবন-স্মৃতি' রবীন্দ্র-প্রতিভার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' গ্রন্থটি শিশু রবীন্দ্রনাথের এক চিত্তাকর্ষক আত্মকথা। শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পাঠোপযোগী করিবার উদ্দেশ্যেই মুখ্যতঃ এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি লিখিত হইয়াছে। বাল্যকালীন বিচিত্র পরিবেশে লালিত-পালিত বালক ও কিশোর রবীন্দ্রনাথের এক নিখুঁত চিত্র 'ছেলেবেলা' হইতে লাভ করা যায়। 'জীবন-স্মৃতি'তেও রবীন্দ্রনাথের শৈশব-স্মৃতি বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু 'ছেলেবেলা' গ্রন্থের শৈশব বর্ণনার সহিত তাহার এক বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে স্বয়ং লিখিয়াছেন—

'এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবন-স্মৃতিতে, কিন্তু তার স্বাদ আলাদা—সরোবরের সঙ্গে ঝরণার তফাতের মতো। সে হোলো কাহিনী, এ হোলো কাকলি; সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, এটা দেখা দিচ্ছে গাছে। ফলের সঙ্গে চারিদিকের ডালপালাকে মিলিয়ে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।'[১]

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন অর্থাৎ তৎকালীন কলিকাতার বর্ণনা দিয়া 'ছেলেবেলা'র রূপকথা রচনায় ব্রতী হইয়াছেন। রূপকথার মনোরম কাহিনীর ন্যায় কবির শৈশবকালীন বিচিত্র ঘটনাও প্রকাশভঙ্গির অনবদ্য কৌশলে উপভোগ্য ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। আবদুল মাঝি, ব্রজেশ্বর, কিশোরী চাটুয্যে, ভৃত্য শ্যাম প্রভৃতির চরিত্র-চিত্র সামান্য রেখাপাতেই সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়াছে। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উদার, স্নেহশীলা মাতৃদেবীর যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্য কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। মাতার নিকট শিশুপুত্র রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-সোহাগের এক প্রীতিপ্রদ মধুর চিত্র নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থটি মুখ্যতঃ কবির শৈশবকালীন কৌতুক-মধুর ঘটনাতেই পূর্ণ। কিন্তু ইহারও কোন কোন অংশে রবীন্দ্রনাথের বেদনাম্লান অনুভূতির স্পর্শও অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ব্যথাকাতর চিত্তে লিখিয়াছেন—

'জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে,

১ 'ছেলেবেলা', (বিশ্বভারতী, ১৩৫৩), পৃঃ ৪

শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাদরটার উপরে ফুল-কাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।'[১]

রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়' তাঁহার ছয়টি আত্মব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধের একটি সংকলনগ্রন্থ। রবীন্দ্র-কাব্যের ক্রম-বিবর্তন এবং কবির ব্যক্তিজীবনের লক্ষণীয় পরিবর্তন কি ভাবে সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে, 'আত্মপরিচয়ে'র প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাহারই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত অতি মনোজ্ঞভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। রবীন্দ্র-কাব্যের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাকরণে এই সকল প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক মূল্য অনস্বীকার্য। তৃতীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব ধর্মমতের এক সুষ্ঠু পরিচয় দান করিয়াছেন এবং তাঁহার পঞ্চম প্রবন্ধটি 'ছেলেবেলা' ও 'জীবন-স্মৃতি'র ন্যায় শৈশব-স্মৃতি বর্ণনায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। 'আত্মপরিচয়ে'র এই প্রবন্ধসমূহ হইতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি ও কবি-জীবনের একটি সামগ্রিক রূপের আভাষ পাওয়া যায়। অতএব রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে 'আত্মপরিচয়ে'রও যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র অনন্তকল্পনা বা ভাববৈচিত্র্যের দ্বারাই বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করেন নাই—ভাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন যে ভাষা এবং ভাষার প্রধান ঐশ্বর্য যে শব্দসম্পদ, তাহা অবলম্বন করিয়াও তিনি সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। শব্দের যথাযথ ব্যুৎপত্তি নির্ণয়, নূতন শব্দ-সৃষ্টি ও তাহার অর্থ-ব্যঞ্জনা, শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধীয় রবীন্দ্রনাথের গবেষণা বহুল ক্ষেত্রেই নূতন আলোকপাত করিয়াছে। 'বাংলা উচ্চারণ', 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ', 'বাংলা শব্দদ্বৈত' প্রভৃতি একাদশটি প্রবন্ধের সংকলন 'শব্দতত্ত্ব' (১৯০৯) গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় গবেষণামূলক আলোচনার সার্থক দৃষ্টান্ত।

ভাষাই মানুষের সকল প্রকার ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। অতএব ভাষায় জড়তা, অস্পষ্টতা বা অশুদ্ধতা থাকিলে ভাব-চিন্তার প্রকাশ যথাযথ ও পরিচ্ছন্ন হইতে পারে না। ভাষার কলাকৌশলে অতি জটিল দার্শনিক তত্ত্বও সুবোধ্য ও

[১] 'ছেলেবেলা,' (বিশ্বভারতী, ১৩৫৩), পৃঃ ৬০

চিত্তাকর্ষক হয়। বাংলাভাষার অন্তর্নিহিত স্বরূপ-প্রকৃতি ও রীতি অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার ভাষা সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতা-লব্ধ কতকগুলি মূল্যবান্ তথ্য বিধৃত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ সাধারণতঃ দুর্বোধ্য ও নীরস হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত ভাষা-বিজ্ঞানীর ন্যায় যথাযথ অনুশীলন-পদ্ধতি বা ভাষার প্রচলিত সূত্র ও ধারা অনুযায়ী ভাষাতত্ত্বের চর্চা করেন নাই—ভাষা সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি নিজস্ব অভিনব পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। 'বাংলাভাষা পরিচয়' (১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথের এই ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধগ্রন্থ। এই গ্রন্থে জ্ঞানের ভাষা ও ভাবের ভাষা প্রসঙ্গে পরস্পর তুলনামূলক আলোচনাটি যেমন রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিকসুলভ কৌতূহল ও জিজ্ঞাসায় পূর্ণ, তেমনি পরিবেশন-গুণে সরস ও উপভোগ্য হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাভাষা পরিচয়' গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'মানুষের বুদ্ধি-সাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে বিজ্ঞানে। হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ কাব্যে। দুইয়ের ভাষায় অনেক তফাৎ। জ্ঞানের ভাষা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই; তাতে ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার। সাজসজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়। কিন্তু ভাবের ভাষা কিছু যদি অস্পষ্ট থাকে, যদি সোজা করে না বলা হয়, যদি তাতে অলংকার থাকে উপযুক্ত মতো, তাতেই কাজ দেয় বেশি। জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ; ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাঁকা করে দিয়ে।'[১]

বাংলা সাহিত্যে ভাষাগত যে বিবিধ সমস্যা রহিয়াছে, সে সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন। বাংলায় লিখিত ভাষার দ্বিবিধ রূপ বা রীতি অর্থাৎ সাধু রীতি ও চলিত রীতি—এই উভয় রীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও তাঁহার সুবিস্তৃত যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চলিত ভাষা ও রীতির গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে তত্ত্বানুশীলন এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনাও সাধুভাষা ও রীতি দ্বারাও সার্থকভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের অভিনব

১ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ২৬শ খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৩৫৫) পৃঃ ৩৮০-৮১

রচনাকৌশলে তাঁহার ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধও সরস, প্রাঞ্জল ও রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলা ছন্দের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য সাধনে কবি রবীন্দ্রনাথের দান অপরিমেয়। তাঁহার প্রবর্তিত অভিনব ছন্দের ঐশ্বর্য ও সৌকর্য বাংলা কাব্যকে এক গৌরবময় উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। অধুনা বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে যে ব্যঞ্জনার সূক্ষ্মতা, মাধুর্য ও চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করা যায়, তাহা মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র ছন্দশিল্পীই ছিলেন না—ছন্দের স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতি প্রসঙ্গে তিনি বিজ্ঞানসম্মত প্রবন্ধাদিও রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থটি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে 'ছন্দের অর্থ', 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত', 'ছন্দের মাত্রা', 'বাঙ্‌লা ছন্দের প্রকৃতি' ও 'গদ্য ছন্দ' মোট পাঁচটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই প্রবন্ধসমূহে রবীন্দ্রনাথ ছন্দের গঠন-কৌশল ও তাহার মূল রীতি বা পদ্ধতিসমূহ সূত্রনিবদ্ধ করিয়া কেবলমাত্র প্রথাসিদ্ধ ছন্দস্তত্ত্ব আলোচনায় নিয়োজিত হন নাই,—বরং ছন্দের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁহার গভীর উপলব্ধির পরিচয়ই ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ছন্দের রূপ ও বৈচিত্র্য আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ভাষা অপেক্ষাকৃত কাব্যধর্মী হইলেও তাহা যুক্তি-বন্ধনে কোথাও শিথিল হইয়া পড়ে নাই। জটিল ছন্দো-বিজ্ঞানও যে সহজ ও সরস হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ হইতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ছন্দের প্রকৃত তাৎপর্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছন্দের অর্থ' নামক প্রবন্ধে যে সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'কাব্যের প্রধান উপকরণ হল কথা। সেতো সুরের মতো স্বপ্রকাশ নয়। কথা অর্থকে জানাচ্ছে। অতএব, কাব্যে এই অর্থকে নিয়ে কারবার করতেই হবে। তাই গোড়ায় দরকার, এই অর্থটা যেন রসমূলক হয়। অর্থাৎ, সেটা এমন কিছু হয় যা স্বতই আমাদের মনে স্পন্দন সঞ্চার করে, যাকে আমরা বলি আবেগ। কিন্তু যেহেতু কথা জিনিসটা স্বপ্রকাশ নয়, এইজন্যে সুরের মতো কথার সঙ্গে আমাদের চিত্তের সাধর্ম্য নেই। আমাদের চিত্ত বেগবান্, কিন্তু কথা স্থির। * * * কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করে তোলবার জন্যে ছন্দের দরকার।'[১]

---

১ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ২১শ খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৩৫৩), পৃঃ ২৯৯

রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবি হইয়াও এক অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞান-মানসের অধিকারী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ হইতে তাঁহার যথার্থ বৈজ্ঞানিক মনীষার পরিচয় লাভ করা সম্ভব হয়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে মুখ্যতঃ যে দুইজন চিন্তাশীল লেখক বৃত্তিতে বৈজ্ঞানিক না হইয়াও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার দ্বারা বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের একজন অক্ষয়কুমার দত্ত এবং অপরজন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁহাদের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক রচনাও সমভাবে এক গৌরবোজ্জ্বল মহিমা অর্জন করিয়াছে। বিচিত্র সাহিত্যিক আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপস্থাপনা বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন এবং তাঁহার এই ধারা রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় অতি সার্থকভাবেই অনুসরণ করিয়াছেন।

সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ভাব বা বিষয়বস্তুর মধ্যে যদিও একটি সাধারণ ঐক্য বর্তমান, অর্থাৎ জড় ও জীব-জগত উভয়েরই আলোচ্য বিষয়; তথাপি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চিন্তাপ্রবাহ এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই কারণে, কবি বা সাহিত্যিকের পক্ষে সার্থকভাবে বিজ্ঞান-আলোচনা সম্ভব হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার সহিত বস্তুসন্ধানী বৈজ্ঞানিক চিত্তের এক অপূর্ব মিলন লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব ও বাস্তব তথ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ বা আকর্ষণ সদা জাগ্রত ছিল এবং তিনি এক সহজ প্রেরণার বশেই বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতি শৈশবে পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাহচর্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে অনুশীলন বা শিক্ষা লাভ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেষ সাধনে সর্বাধিক সহায়তা করিয়াছে। 'বালক,' 'সাধনা' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞান-সংবাদ রচনা হইতেই রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-চর্চার সূত্রপাত হইয়াছে। তিনি মুখ্যতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান সম্পর্কেই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বিশ্ব-পরিচয়' (১৯৩৭)। তাঁহার এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্যের এক অতীব মূল্যবান্ সংযোজন। বিজ্ঞান-আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ও জনপ্রিয়তার প্রমাণ স্বরূপে উল্লেখ করা যায় যে, মাত্র দেড় বৎসরের ব্যবধানে তাঁহার 'বিশ্ব-পরিচয়' গ্রন্থের পাঁচটি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে।

সাহিত্যের সহায়তায় বিজ্ঞানকে কি ভাবে রসগ্রাহী করা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব-পরিচয়' তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই গ্রন্থটি 'পরমাণুলোক,' 'নক্ষত্রলোক,' 'সৌরজগৎ,' 'গ্রহলোক,' 'ভূলোক' ও 'উপসংহার' এই মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। রবীন্দ্রনাথ যে পৃথিবীর বিশিষ্ট বিজ্ঞানবিদ্‌গণের প্রামাণ্য রচনাসমূহ গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও চিন্তাধারার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, তাহা 'বিশ্ব-পরিচয়ে'র প্রবন্ধসমূহ হইতে প্রমাণিত হয়। রবীন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শে অতি নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক রহস্য ও দুরূহ তত্ত্ব অচিন্ত্যনীয়রূপে বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছে। 'বিশ্ব-পরিচয়ে'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যাদি উপমা-দৃষ্টান্ত সহযোগে এমনভাবে পরিবেশিত হইয়াছে যে, তাহাতে বিজ্ঞানের নীরস কাঠিন্য ও দুর্বোধ্যতার কোন অবকাশ থাকে নাই। অতি সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সত্যকে বাণীমূর্তিতে রূপায়িত করিয়াছেন। 'বিশ্ব-পরিচয়' গ্রন্থটি তাঁহার যুক্তিনিষ্ঠ বস্তুতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণশক্তির এক বলিষ্ঠ পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক রচনার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার 'গ্রহলোক' প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'ধূমকেতু শব্দের মানে ধোঁয়ার নিশান। ওর চেহারা দেখে নামটার উৎপত্তি। গোল মুণ্ড আর তার পিছনে উড়ছে উজ্জ্বল একটা লম্বা পুচ্ছ। সাধারণতঃ এই হল ওর আকার। এই পুচ্ছটা অতি সূক্ষ্ম বাষ্পের। এত সূক্ষ্ম যে কখনও কখনও তাকে মাড়িয়ে গিয়েছে পৃথিবী, তবু সেটা অনুভব করতে পারেনি। ওর মুণ্ডটা উল্কাপিণ্ড দিয়ে তৈরী।'[১]

রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে তাঁহার অন্তরঙ্গ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পত্র-পত্রিকা সম্পাদকগণের নিকট অসংখ্য পত্র লিখিয়াছেন। অধিকাংশ পত্রেই তিনি বিবিধ বিষয় সম্পর্কে তাঁহার মূল্যবান্ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন পত্র বিষয়গৌরবে এবং অনবদ্য প্রকাশকৌশলে সাহিত্য-গুণান্বিত এক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই ব্যাপকভাবে পত্র-সাহিত্যের অনুশীলন করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষিগণের কয়েকটি বিশিষ্ট পত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য।

১ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ২৫শ খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৩৫৫), পৃঃ ৩৯৪

কিন্তু তাঁহাদের পত্রসমূহ রবীন্দ্রনাথের ন্যায় যথার্থ সাহিত্যিক মর্যাদা লাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্যের আলোচনায় অনিবার্যভাবেই ইংরাজী পত্র-সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য—বিশেষতঃ, কীট্‌স, শেলী, ব্রিজেস, লরেন্স্ প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকগণের জগদ্বিখ্যাত পত্রসমূহের প্রসঙ্গ স্মরণ হয়। রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত পত্র-সংগ্রহ 'ছিন্নপত্র' তাঁহার জীবন ও কাব্যের বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ এবং অভিনব ব্যাখ্যায় এক দুর্লভ সাহিত্য-গুণ অর্জন করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় রোমান্টিক্ ইংরাজ কবি কীট্‌সের অধিকাংশ পত্রও তাঁহার কবিমনের বিচিত্রমুখী ভাব-ভাবনা ও ব্যক্তি-জীবনের বিবিধ তথ্যের সমাবেশে সমুজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথ ও কীট্‌স এই উভয় কবির পত্রসমূহের ভাবধারার মধ্যে এক আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ কিয়ৎপরিমাণে যে ইংরাজী পত্র-সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

বাংলা সাহিত্যে সাহিত্য-গুণসম্পন্ন পত্র-প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের এক অভিনব সংযোজনা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-পর্যটনকারী কবি। ভিন্ন ভিন্ন দেশে পর্যটনের অবকাশের মুহূর্তেই তাঁহার বিপুল পত্র-সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পত্র জাতীয় ভ্রমণাত্মক প্রবন্ধগ্রন্থ যথাক্রমে : ১। 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' (১৮৮১), ২।'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' ১ম খণ্ড (১৮৯১), ২য় খণ্ড (১৮৯৩), ৩। 'ছিন্নপত্র' (১৯১২) ৪। 'জাপান-যাত্রী' (১৯১৯), ৫। 'যাত্রী' (১৯২৯), ৬। রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১), ৭। 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৯৩৮) এবং ৮। 'পথের সঞ্চয়' (১৯৩৯)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের 'জাপান-যাত্রী' গ্রন্থটি তাঁহার পারস্যের ডায়ারির সহিত সংযুক্ত হইয়া একত্রে 'জাপানে-পারস্যে' (১৯৩৬) এবং 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' ও 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' (২য় খণ্ড) পরিবর্তিত আকারে 'পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণ' (১৯৩৬) নামে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' (১৯৪৫) ও 'চিঠিপত্র' ছয়টি খণ্ডে ১ম—৩য় খণ্ড (১৯৪২), ৪র্থ খণ্ড (১৯৪৩), ৫ম খণ্ড (১৯৪৫), ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৯৫৭) সম্পূর্ণ হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'চিঠিপত্রে' সংকলিত রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ পত্রই উৎকৃষ্ট পত্র-প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত নহে—পত্র-সাহিত্যের অন্তরঙ্গ সহজ সুর ও রসে সমৃদ্ধ এই পত্রসমূহে যথার্থ প্রবন্ধের সংহত গুণ বা মননশীলতার অভাব লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সংশ্লিষ্ট পুস্তকপুস্তিকার অধিকাংশই পত্রাকারে লিখিত। তাহার কয়েকটি গ্রন্থ ভ্রাম্যমাণ ডায়ারি জাতীয় রচনার পর্যায়ভুক্ত। ডায়ারির কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ তাহা সন-তারিখ চিহ্নিত এবং ডায়ারির প্রত্যক্ষতা ও সত্যনিষ্ঠা তাহাতে বর্তমান। ডায়ারির খণ্ড-বিক্ষিপ্ত ভাবনার চিত্রসম্পদে রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর রচনা চিত্তাকর্ষক ও উপভোগ্য হইয়াছে। এই জাতীয় কোন কোন গ্রন্থে আনুপূর্বিক একটি বিষয় বা ভাব সংহত ও সূত্রবদ্ধ হইয়া প্রবন্ধের আকার ধারণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ডায়ারি শ্রেণীর সুদীর্ঘ রচনার যেখানে কেন্দ্রগত ঐক্য শিথিল হইয়াছে, সেইখানে তাহার খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ভাব ও ভাবনাই এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। 'যাত্রী' গ্রন্থের 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' অংশে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম মহাদেশের আলোচনা প্রসঙ্গে বিবিধ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ এই গ্রন্থের একাংশে নারী ও পুরুষ উভয়ের স্বরূপ বা প্রকৃতিগত পার্থক্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা আলোচ্য গ্রন্থে কেন্দ্রীয় বিষয়ের অনুসঙ্গ বহির্ভূত হইয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধের রূপ ধারণ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'নারীপ্রকৃতি আপনার স্থিতিতে প্রতিষ্ঠ। সার্থকতার সন্ধানে তাকে দুর্গম পথে ছুটতে হয় না। জীবপ্রকৃতির একটা বিশেষ অভিপ্রায় তার মধ্যে চরম পরিণতি পেয়েছে। যে জীবধাত্রী, জীবপালিনী; তার সম্বন্ধে প্রকৃতির কোনো দ্বিধা নেই। প্রাণসৃষ্টি প্রাণপালন ও প্রাণতোষণের বিচিত্র ঐশ্বর্য তার দেহে মনে পর্যাপ্ত। এই প্রাণসৃষ্টি বিভাগে পুরুষের প্রয়োজন অত্যল্প, এইজন্যে প্রকৃতির একটা প্রবল তাগিদ থেকে পুরুষ মুক্ত। প্রাণের ক্ষেত্রে ছুটি পেয়েছে বলেই চিত্তক্ষেত্রে সে আপন সৃষ্টি-কার্যের পত্তন করতে পারলে। সাহিত্যে কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে বিধিব্যবস্থায় সব মিলিয়ে যাকে আমরা সভ্যতা বলি সে হল প্রাণপ্রকৃতির পলাতক ছেলে পুরুষের সৃষ্টি।'[১]

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণমূলক ডায়ারি শ্রেণীর গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য অবশিষ্ট ভ্রমণাত্মক রচনাও প্রধানতঃ পত্রাকারে লিখিত হইয়াছে। এই পত্ররূপী গ্রন্থ মধ্যে ভ্রমণ-কাহিনী অপেক্ষা সাহিত্য, শিল্প,, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ

১ 'যাত্রী', (বিশ্বভারতী, ১৩৫৩), পৃঃ ৪১

প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান্ অভিমত বা সিদ্ধান্তই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এই জাতীয় রচনার স্থানে স্থানে ভ্রমণপথ বা দেশবিশেষ কিংবা কোন বিশিষ্ট ঘটনার বর্ণনা হইতে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় যে, রবীন্দ্রনাথের এই সকল রচনা তাঁহার ভ্রমণের অবসর মুহূর্তে লিখিত। রবীন্দ্রনাথের এবংবিধ পত্রের অধিকাংশই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁহার বিচিত্র জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলই প্রকাশ করিয়াছে। এই সকল রচনা কেবল কবিসুলভ কল্পনাবিলাস বা রচনা-পারিপাট্যের জন্যই মনোরম নহে—পত্রগত বিবিধ বিষয় প্রসঙ্গে কবির অভিনব মন্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থগূঢ় ও গভীর চিন্তাগর্ভ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পত্রজাতীয় প্রবন্ধের একটি উল্লেখযোগ্য গুণ এই যে, ইহা সাধারণ তথ্য-প্রতিপাদক বা উপদেশাত্মক প্রবন্ধের ন্যায় নীরস হয় না—বরং কালগত ও বিষয়গত পরিবর্তনের অবকাশ হেতু ইহা অপেক্ষাকৃত কৌতূহলজনক ও রসদ্যোতক হইয়াছে। রচনাভঙ্গিতে পত্রসুলভ বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হইলেও বিষয়গৌরবে তাহা যে কোন সাধারণ প্রবন্ধের সমপর্যায়ভুক্ত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'আমার এখনকার সর্বপ্রধান দৈনিক খবর হচ্ছে ছবি আঁকা। রেখার মায়াজালে আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে। * * * কোনোকালে যে কবিতা লিখতুম সেকথা ভুলে গেছি। এই ব্যাপারটা মনকে এত করে যে আকর্ষণ করছে তার প্রধান কারণ এর অভাবনীয়তা। কবিতার বিষয়টা অস্পষ্টভাবেও গোড়াতেই মাথায় আসে; তারপরে শিবের জটা থেকে গোমুখী বেয়ে যেমন গঙ্গা নামে তেমনি করে কাব্যের ঝরণা কলমের মুখে তট রচনা করে, ছন্দ প্রবাহিত হোতে থাকে। আমি যেসব ছবি আঁকার চেষ্টা করি তাতে ঠিক তার উলটো প্রণালী-রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে, তার পরে যতই আকার ধারণ করে ততই সেটা পৌঁছতে থাকে মাথায়। এইরূপ সৃষ্টির বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে।'[১]

রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত বক্তব্য চিত্রশিল্প ও কাব্যের পার্থক্যসূচক একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধের রূপ ধারণ করিয়াছে এবং ইহা হইতে রবীন্দ্র-চিত্রকলার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা বা নির্দেশ লাভ করা সহজসাধ্য হইয়াছে।

১ 'পথে ও পথের প্রান্তে', (বিশ্বভারতী, ১৩৬৩), পৃঃ ৫১-৫২

রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' সর্বজন সমাদৃত একটি বিখ্যাত পত্র-সংকলন। এই গ্রন্থটি তাঁহার সাধারণ পত্রাত্মক রচনা হইতে পৃথক্ ও বৈশিষ্টাপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের পত্র-প্রবন্ধের অধিকাংশই মুখ্যতঃ ডায়ারিধর্মী এবং আত্মগত ভাব ও ভাবনায় বৈচিত্র্যময়। অতিকথন ও আলঙ্কারিক আতিশয্যে রবীন্দ্রনাথের পত্রগত বক্তব্য বিষয় অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছ অর্থাৎ ভাব বা বিষয়ের সুস্পষ্ট পরিণতি ইহাতে সাধারণতঃ লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু 'রাশিয়ার চিঠি' রবীন্দ্রনাথের পত্রাকারে লিখিত রচনাসমূহের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। ইহা বিশুদ্ধ বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের সগোত্র। সাধারণ প্রবন্ধের বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ বিষয়মুখীনতা, বিচার-বিশ্লেষণে তীক্ষ্ণতা ও প্রকাশের পরিচ্ছন্নতা দ্বারা 'রাশিয়ার চিঠি' সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ অতি বিচক্ষণভাবে রাশিয়ার সমাজ-জীবন, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং শিক্ষাদর্শের রূপ পরিদর্শন করিয়াছেন এবং 'রাশিয়ার চিঠি'তে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে তাঁহার যুক্তি-বিচারসম্মত আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আতিশয্যহীন পরিচ্ছন্ন ভাষায় পরিবেশিত রাশিয়া সম্পর্কিত বহুবিধ তথ্যই ইহাতে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। 'রাশিয়ার চিঠি' চৌদ্দটি পত্রের একটি সংকলন এবং তৎসহ একটি মনোজ্ঞ উপসংহারও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই পত্রসমূহের মধ্যে একটি কেন্দ্র-সংহত ঐক্যভাব বর্তমান এবং ফলে, 'রাশিয়ার চিঠি' একটি সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধের আকার ধারণ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অন্যবিধ পত্র-প্রবন্ধগ্রন্থের সহিত 'রাশিয়ার চিঠি'র পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। কবির অন্যান্য পত্র-সংকলনে পত্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিষয়গত ঐক্য সাধারণতঃ লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু 'রাশিয়ার চিঠি'র পত্রসমূহ পরস্পরের পরিপূরক এবং বক্তব্য বিষয়ের এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ইহাদের মধ্যে বর্তমান। একটি অনগ্রসর নিপীড়িত জাতি শিক্ষার দুর্লভ গুণে কি ভাবে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে যুগ-সঞ্চিত জড়তা ও অন্ধ কু-সংস্কারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে বিশ্বের দরবারে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' তাহারই একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্ররূপ।

'রাশিয়ার চিঠি'র একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ পরাধীন ভারতবর্ষেরও এক মর্মান্তিক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এবং ভারতবাসীর জীবনে তাহার নিদারুণ ব্যর্থতার ইতিবৃত্ত অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। একটি সদ্যোজাগ্রত

জাতির আদর্শসূচক শিক্ষাধারার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ভাগ্য-বিড়ম্বিত পরাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষারীতির উল্লেখ করিয়া তাহার দৈন্য ও দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। 'রাশিয়ার চিঠি'র মাধ্যমে ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষের সত্যকার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। রাশিয়া ও ভারতবর্ষ এই উভয় দেশের জীবনযাত্রা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা হইতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাসমৃদ্ধ সূক্ষ্ম মনন ও গভীর দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয়ানুসারে 'রাশিয়ার চিঠি'র ভাষাও সহজ-সাবলীল, পরিচ্ছন্ন ও বাহুল্যবর্জিত।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিচিত্র প্রবন্ধ-সংগ্রহকে কোন একটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে সন্নিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। সেইজন্য ইহাদের 'বিবিধ পর্যায়ে'র অন্তর্ভুক্ত করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় প্রবন্ধ-সংগ্রহ যথাক্রমে : ১। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩) ২। 'আলোচনা' (১৮৮৫), ৩। 'সমালোচনা' (১৮৮৮), ৪। 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭), ৫। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯০৭) ও ৬। 'পরিচয়' (১৯১৬)। প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র (১৯২২) কয়েকটি রচনার বিষয় এখানে উল্লেখ করা যায়। যদিও 'লিপিকা'র অধিকাংশ রচনাই কবিত্বময় কথিকা বিশেষ, তথাপি ইহার কোন কোন রচনার মূল সুর বিচার করিলে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের আস্বাদ লাভ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যে সুচিহ্নিত। ইহা কবির অভিনব আঙ্গিকে রচিত কয়েকটি অপূর্ব প্রবন্ধের একটি বিশিষ্ট সংকলন। জগৎ পঞ্চ উপাদানে গঠিত - ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। রবীন্দ্রনাথ এই পঞ্চভূতের সাধারণ স্বরূপ-ধর্ম গ্রহণ করিয়া পাঁচটি মনুষ্য চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং প্রতিটি চরিত্রই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র গৌরব অর্জন করিয়া দীপ্যমান্ হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের ন্যায় এই চরিত্রসমূহ নিজস্ব মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং নাটকীয় গুণের সন্নিবেশে 'পঞ্চভূতে'র বক্তব্য বিষয় অপেক্ষা ইহার অভিনব রচনাশৈলীই অধিকতর আকর্ষণীয় হইয়াছে। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে মুখ্যতঃ পাঁচটি চরিত্র। ইহাদের মধ্যে ক্ষিতি এবং ব্যোমের নাম পরিবর্তিত হয় নাই। কিন্তু অপ্, তেজ ও মরুৎ-এর নাম পরিবর্তন করিয়া রবীন্দ্রনাথ কবিসুলভ রসজ্ঞতারই পরিচয় দান করিয়াছেন। অপ্, তেজ ও মরুৎ যথাক্রমে স্রোতস্বিনী, দীপ্তি এবং সমীর নামে রূপান্তরিত হইয়াছে। অপ্ ও তেজ অর্থাৎ স্রোতস্বিনী ও দীপ্তিকে নারী-চরিত্রের মহিমা দান করিয়া রবীন্দ্রনাথ

চরিত্রগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনজন পুরুষ ও দুইজন নারীসহ স্বয়ং কবি ভূতনাথ নাম ধারণ করিয়া সাহিত্য, শিল্প, সমাজ ও জীবনের বিচিত্রমুখী সমস্যা আলোচনায় অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তাঁহাদের এই আলোচনা হইতেই 'পঞ্চভূতে'র অভিনব প্রবন্ধসমূহের উৎপত্তি। গুরু-লঘু বিবিধ বিষয়ের সুষ্ঠু বিচার-বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধই রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ধী-শক্তি ও মনীষার পরিচয় প্রকাশ করিয়াছে।

ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বিষয়বস্তু অপেক্ষা প্রকাশভঙ্গির মহিমা অর্থাৎ অভিনব রচনারীতিই 'পঞ্চভূতে'র অন্যতম আকর্ষণ। বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় দ্বিতীয় কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না এবং সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যেও 'পঞ্চভূত' একক, দোসরহীন সাহিত্যিক সৃষ্টি। 'পঞ্চভূতে'র আঙ্গিক বা রূপরীতি প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য অর্থাৎ মার্কিণ লেখক Oliver Wendell Holmes-র *Autocrat of the Breakfast Table*-গ্রন্থটি স্মরণীয়। ভাব বা রচনাগত ক্ষেত্রে 'পঞ্চভূতে'র সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আলোচনা-সভার মাধ্যমে অর্থাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে উল্লিখিত ইংরাজী গ্রন্থেও লেখকের মূল বক্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী গ্রন্থটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার আলোচনা-সভায় বক্তা মাত্র একজন এবং অন্য সকল চরিত্রই নীরব শ্রোতা মাত্র; অর্থাৎ আলোচনা-চক্রে তাঁহাদের কোন ভূমিকা বা বক্তব্য নাই। পরন্তু 'পঞ্চভূতে'র পাঞ্চভৌতিক সভায় রবীন্দ্রনাথ সকল চরিত্রকেই সমভাবে বিতর্কে যোগদানের সুযোগ দিয়াছেন এবং প্রতিটি চরিত্রই যুগপৎ বক্তা ও শ্রোতা। ঘরোয়া বৈঠকী রীতি উভয় গ্রন্থে অনুসৃত হইলেও ইহাদের মধ্যে পার্থক্যও অলক্ষ্যগোচর নহে। *Autocrat of the Breakfast Table*-গ্রন্থেও 'পঞ্চ-ভূতে'র ন্যায় বিবিধ প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে এবং এই আলোচনার ধারা 'পঞ্চভূত' হইতে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর (serious) ও গভীর চিন্তাশ্রিত। 'পঞ্চভূতের' রচনা-সমূহকে আপাতদৃষ্টিতে কবির খেয়ালী মনের বিচিত্র প্রকাশ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। বৈঠকী রচনারীতিই তাহার অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। ইহাতে সাধারণ মননশীল প্রবন্ধের আকার বা গঠন-সৌষ্ঠবও অনুসরণ করা হয় নাই। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করিলে ইহার ভাব বা চিন্তার সুস্পষ্ট ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করা যায়। চিন্তার স্বচ্ছতা, সূক্ষ্ম রসিকতা ও ভাবুকতার সম্যক্ পরিচয়ে 'পঞ্চভূতে'র প্রবন্ধগুলি দীপ্তিময়।

'পঞ্চভূত' প্রবন্ধ-সংগ্রহের দুইটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'পল্লিগ্রামে' ও 'মন'। কেবলমাত্র এই প্রবন্ধদ্বয়ে রবীন্দ্রনাথ বৈঠকী বা নাটকীয় রীতি অবলম্বন করেন নাই। 'পঞ্চভূতে'র অন্যান্য অবশিষ্ট রচনাসমূহে অর্থাৎ 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ', 'নরনারী'. 'মনুষ্য', 'কাব্যের তাৎপর্য', 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল' প্রভৃতি প্রবন্ধে সাহিত্য, সৌন্দর্য, দর্শন, সমাজ, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিচিত্র প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে লেখকের মননশীলতা, রসানুভূতি ও সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। বক্তব্য বিষয়কে সুস্পষ্ট ও সংহতভাবে পরিবেশনের উদ্দেশ্যে লেখক রূপকাশ্রিত পরস্পর বিভিন্নধর্মী চরিত্রের দৃষ্টিকোণ হইতে তাহার বিচার-বিশ্লেষণে ব্রতী হইয়াছেন। প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই লেখকের নিজস্ব মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত প্রকাশের প্রয়াসও ইহাতে লক্ষণীয়। 'পঞ্চভূতে'র রচনাসমূহ যে কবিমনের খেয়াল খুশিসম্মত অলস কল্পনা নহে, ইহাদেরও যে একটা সুস্পষ্ট পরিণতি আছে, তাহা বিভিন্ন প্রবন্ধ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। সাহিত্যের বিষয় শ্রেষ্ঠ, না ভঙ্গি শ্রেষ্ঠ— ইহার বিচার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'মনুষ্য' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'স্রোতস্বিনী কহিল, "এই জন্যই সাহিত্যে বহুকাল ধরিয়া একটা তর্ক চলিয়া আসিতেছে যে, বলিবার বিষয়টা বেশি না বলিবার ভঙ্গিটা বেশি।" ***

ব্যোম মাথাটা কড়িকাঠের দিকে তুলিয়া বলিতে লাগিল, সাহিত্যে বিষয়টা শ্রেষ্ঠ না ভঙ্গিটা শ্রেষ্ঠ, ইহা বিচার করিতে হইলে আমি দেখি কোন্‌টা অধিক রহস্যময়। বিষয়টা দেহ, ভঙ্গিটা জীবন। *** যতটুকু বিষয়রূপে প্রকাশ করিলে ততটুকু জড় দেহ মাত্র, ততটুকু সীমাবদ্ধ; যতটুকু ভঙ্গির দ্বারা তাহার মধ্যে সঞ্চার করিয়া দিলে তাহাই জীবন—তাহাতেই তাহার বৃদ্ধিশক্তি, তাহার চলৎশক্তি সূচনা করিয়া দেয়।"

সমীর কহিল, "সাহিত্যের বিষয়মাত্রই অতি পুরাতন, আকার গ্রহণ করিয়া সে নূতন হইয়া উঠে"।[১]

বৈঠকী অর্থাৎ ঘরোয়া নাটকীয় রীতিতে লিখিত হইলেও 'পঞ্চভূতে'র সকল প্রবন্ধই যুক্তিনিষ্ঠ ও মননসমৃদ্ধ। 'পঞ্চভূত' পরবর্তী কালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' নামক প্রবন্ধ-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' নামক সংকলনগ্রন্থে তাঁহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আত্মভাবনিষ্ঠ (Personal) প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই জাতীয় প্রবন্ধ

১ 'পঞ্চভূত', (বিশ্বভারতী, ১৩৫৫), পৃঃ ৫৭-৫৮

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের প্রাথমিক পর্বে প্রণীত 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'আলোচনা', 'সমালোচনা' প্রভৃতি বিভিন্ন প্রবন্ধ-সংগ্রহগ্রন্থেও লক্ষ্য করা যায়। আত্মভাবনিষ্ঠ এই সকল প্রবন্ধে বিষয় বা বস্তুভার অপেক্ষা ব্যক্তিগত ভাব বা বিষয়ীর গৌরবই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র রচনাগত সার্থকতা সম্পর্কে যথার্থ ই মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহার মূল্য 'বিষয়বস্তু গৌরবে নয়, রচনার রস-সম্ভোগে'। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র 'পাগল', 'বাজে কথা', 'নববর্ষা', 'কেকাধ্বনি', 'বসন্তযাপন', 'রুদ্ধগৃহ', 'পথপ্রান্তে', 'শ্রাবণসন্ধ্যা', 'আষাঢ়' প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহে বিষয়গত গাম্ভীর্য (seriousness) অপেক্ষাকৃত লঘু, প্রকাশভঙ্গির সৌন্দর্যেই ইহারা অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে এই সকল প্রবন্ধে ভাব বা বিষয়ের অসংলগ্নতা অর্থাৎ প্রসঙ্গচ্যুতি মনে হইলেও একটি কেন্দ্রীয় ভাব সর্বদাই প্রবন্ধের সৌষ্ঠব-গঠনে সহায়ক হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'আষাঢ়' প্রবন্ধটির বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'আষাঢ়' প্রবন্ধের মাধ্যমে মানবজীবনে কর্মশূন্যতা অর্থাৎ অবকাশের স্বরূপ বা মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। বিচিত্র প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম অর্থাৎ কর্মব্যস্ততা দ্বারা মানুষের বহুধা শক্তিমত্তার পরিচয় প্রকাশ পায় সত্য; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে মনুষ্যত্বের সুষ্ঠু রূপায়ণে ও চরম উৎকর্ষ সাধনে কর্মশূন্যতা বা অবকাশ মানুষের জীবনে অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধে এই মূল সত্য প্রচারকল্পে ষড়-ঋতু, বিশেষতঃ বর্ষা ঋতু অবলম্বন করিয়া বিচিত্র চিন্তা ও ভাবনার অপরূপ ইন্দ্রজাল বয়ন করিয়াছেন এবং তাহা আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন মনে হইলেও প্রবন্ধের কেন্দ্রগত ভাবের সহিত এক প্রচ্ছন্ন ঐক্যে বিধৃত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, 'লাইব্রেরী', 'মন্দির', 'রঙ্গমঞ্চ', 'ছবির অঙ্গ', 'সোনার কাঠি' প্রভৃতি 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্যান্য প্রবন্ধগুলি রচনাসৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তুর গৌরবেও অধিকতর মূল্যবান্ ও মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মানসপটে মানব-জীবনসুলভ মাধুর্যের যে ছায়াতপ রচিত হইয়াছে, রহস্যময় জগতের আলোছায়ার বিরঞ্জন কবির হৃদয়বীণায় যে অনন্ত সুর সৃষ্টি করিয়াছে, 'বিচিত্র প্রবন্ধ' তাহারই অপরিম্লান বিচিত্র স্বাক্ষরে দীপ্ত হইয়াছে। কবি-কল্পনার আবেগ-বিহ্বল মুহূর্তে ইহার প্রবন্ধগুলি রচিত হইলেও তাহা কোথাও সংযমের মাত্রা অতিক্রম করে নাই। সংযত-শোভন ভাব-বিন্যাস যে রবীন্দ্র-প্রবন্ধের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য, তাহা 'বিচিত্র প্রবন্ধে'ও অলক্ষ্যগোচর

নহে। উপমা, রূপক ও কবিত্বময় ভাষার দীপ্ত লাবণ্যে 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র প্রতিটি রচনাই অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বাংলা আত্মভাবনিষ্ঠ অর্থাৎ ব্যক্তিগত (Personal) প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এক অভিনব ও অবিস্মরণীয় সংযোজন। আত্মভাবনিষ্ঠ প্রবন্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে রচয়িতার আপন রসানন্দ অতি লঘু, অকিঞ্চিৎকর ভাব বা বিষয় অবলম্বন করিয়াও স্বচ্ছন্দভাবে প্রবন্ধের সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের দিব্য লেখনীস্পর্শে 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র রচনাসমূহ কবিমনের আবেগ-সংরাগে শুচিস্নাত হইয়া এক বিস্ময়কর অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ লাভ করিয়াছে। পরবর্তী কালে আত্মভাবনিষ্ঠ অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনার যে ব্যাপক প্রচলন সুরু হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথই যে তাহার অন্যতম সার্থক স্রষ্টা তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, রবীন্দ্র-প্রতিভা দ্বারা বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে বিচিত্র রসামৃত দান করিয়া তাহা সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। যে ভাষার প্রবন্ধ-সাহিত্যে কেবলমাত্র ক্ষীণধ্বনি একতারার সুর বাজিত, তাহাতে কবি বীণা-যন্ত্রের বিচিত্র সুর সংযোগ করিয়া বিশ্বজগতে পরিবেশনের যোগ্য ক্ষমতা দান করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধকার হিসাবেও রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে এক অসামান্য গৌরবের অধিকারী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের একজন সুনিপুণ ভাষা-শিল্পী ও ভাবমুগ্ধ প্রবন্ধকার। মাত্র উনত্রিশ বৎসরের স্বল্পস্থায়ী জীবনের সাহিত্য-কর্ম বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার নিঃসন্দিগ্ধ স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভ হইতেই বলেন্দ্রনাথের ভাষায় ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে এমন এক সযত্ন সংযত বাঁধুনি, সহজ সারল্য ও বিরল স্বাচ্ছন্দ্য বা সাবলীলতা ছিল যে, তাহা তৎকালীন বাংলা গদ্যরচনায় অতি সুলভ ছিল না। অপ্রাপ্ত বয়স্ক হইয়াও বলেন্দ্রনাথ যে বিবিধ প্রসঙ্গে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কোথাও তাঁহার বালসুলভ অপরিণতির চিহ্ন মাত্র নাই ; বরং বলেন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষায় পরিণত ও পূর্ণতামুখী সৃষ্টির বিস্ময়কর প্রকাশই পরিলক্ষিত হইয়াছে।

বলেন্দ্রনাথের রচনারীতি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে পরিপুষ্ট ও বিকশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অতি সান্নিধ্যে অবস্থান করিয়া বলেন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট সাহিত্য-শিক্ষানবিশী করিয়াছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার ছায়ালোকে বর্ধিত হইয়া বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-রচনাদর্শই যে অনুশীলন ও অনুসরণ করিবেন, তাহা একান্তভাবেই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। অতএব বলেন্দ্রনাথের গদ্যভাষা ও রচনারীতি রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচিত্র সৌন্দর্য ও দুর্লভ গুণাবলীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দ্বারা সুমণ্ডিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধসমূহে রূপতন্ময় কবি-শিল্পীর কোমল প্রাণময় স্পর্শ সর্বত্রই অনুভব করা যায়।

বলেন্দ্রনাথের ভাব ও প্রকাশভঙ্গিতে আত্মবৈশিষ্ট্যের চিহ্ন সুমুদ্রিত। তাঁহার প্রবন্ধ সাধারণ বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ-সাহিত্যের রূপ ও রীতির অনুগামী হয় নাই। বলেন্দ্রনাথের রসিক শিল্পী-নম্র ব্যক্তিত্ব তাঁহার প্রবন্ধের রূপ ও রীতির উপর একটি স্বতন্ত্র মহিমা দান করিয়াছে। আধুনিক বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এই জাতীয় ব্যক্তি-স্বতন্ত্র আত্মনিষ্ঠ রূপভঙ্গির প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রবীন্দ্র-প্রবন্ধ ধারারই সফল সার্থক অনুসৃতি। চিদ্বৃত্তির মুখ্য অর্থাৎ যথাযথ অনুশীলনই সাধারণতঃ প্রবন্ধের স্বরূপ-ধর্ম। প্রবন্ধ মুখ্যতঃ বিশ্লেষণধর্মী এবং যুক্তি-বিচার ও

তথ্যপূর্ণ হয়। মনন-চিন্তাসম্মত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত বা সত্য প্রতিষ্ঠার অভিমুখেই সাধারণ বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের স্থির অচঞ্চল লক্ষ্য। প্রবন্ধের এই সীমিত সংজ্ঞানুসারে রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সর্বত্র সমভাবে সাফল্য লাভ করে নাই। প্রচলিত মননশীল, যুক্তি-বিচারাশ্রিত বাংলা প্রবন্ধ ধারায় রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম উজ্জ্বল-মধুর ব্যক্তিগত স্পর্শ সমন্বিত ভাবদৃষ্টি বিলসিত করিয়াছেন। ফলে, প্রবন্ধের বস্তুগত প্রাধান্য কিয়দংশে ম্লান ও যুক্তির নিয়মনিষ্ঠ কঠিন বন্ধন কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল হইলেও বাংলা প্রবন্ধ সত্যকার শিল্প-স্তরে উন্নীত রসসমৃদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। বলেন্দ্রনাথের রচনা উল্লিখিত প্রবন্ধ-সাহিত্যের উদার মানদণ্ডেই বিচার্য। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ব্যঞ্জনাময়, অলংকৃত অথচ ঋজু, বলিষ্ঠ ভাষায় ও ভাবে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যগুণের অধিকারী হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক প্রযত্নে ও প্রভাবে অনুরঞ্জিত হইলেও বলেন্দ্রনাথের সৃষ্টিপ্রবাহে তাঁহার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তাও সম্পূর্ণ অলক্ষ্যগোচর নহে। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রধান ঐশ্বর্য ও অন্যতম আকর্ষণ তাঁহার ভাষা—এই জাতীয় ভাষার কারুকর্মে তাঁহার অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা-শিল্পে বলেন্দ্রনাথের অভিনবত্ব ও কৃতিত্ব এই যে, তাঁহার লেখনীস্পর্শে ভাষায় এক অপরূপ লাবণ্য ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষায় কেবলমাত্র একটি সঙ্গীত-রসপ্রবাহ বা সুনিপুণ চিত্রাঙ্কনী রেখাপাতই যথেষ্ট নহে—সুনির্বাচিত শব্দগত ধ্বনি ও ছন্দের অপূর্ব ঝংকার এবং গভীর ভাবরাজির নিখুঁত চিত্রাঙ্কন এই উভয়ের সার্থক সমন্বয়ে ভাষায় যে একটি অনবদ্য সৌন্দর্য-সুষমার সৃষ্টি হয়, তাহা কেবলমাত্র বিশিষ্ট ভাষা-শিল্পীর পক্ষেই সম্ভবপর ও সহজসাধ্য। এই বিষয়ে বলেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে একজন প্রথম শ্রেণীর ভাষা-শিল্পী, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বলেন্দ্রনাথ ভাষার বৈচিত্র্য সাধনেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধে বিষয়ের বিভিন্নতা অনুসারে ভাষাও ভিন্নধর্মী ও বিচিত্র রূপ আশ্রয় করিয়াছে। কখনও বলেন্দ্রনাথের ভাষা সূক্ষ্ম কারুকার্যময়, কখনও বা সরস-স্নিগ্ধ, কিংবা ভাব ও বোধির সমন্বয়ে তাঁহার ভাষা ঋজু-সংহত দীপ্তিময় অথচ মধুর রসঘন হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সর্ববিধ রচনারই অন্তরালে ভাব ও ভাষার মধ্যে এক আশ্চর্য-সুন্দর মিলনসূত্র অদৃশ্যভাবে বিরাজ করিয়াছে। বক্তব্য বিষয় বা ভাবরসে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নিষিক্ত করিয়া বলেন্দ্রনাথ যে লেখনী ধারণ করিতেন,

ভাষা ও রচনারীতির অভিনবত্ব বা বৈচিত্র্য হইতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। বলেন্দ্রনাথের বিচিত্র রূপধর্মী ভাষায় যে সহজ নৈপুণ্য, সারল্য, সংযম ও প্রশান্তি লক্ষ্য করা যায়, তাহা তাঁহার একাগ্র সাধনা ও প্রযত্নের সার্থক ফলশ্রুতি। যে কোন বিষয়ক রচনারই গঠন-সৌষ্ঠবের প্রতি বলেন্দ্রনাথের একনিষ্ঠা ও অচঞ্চল দৃঢ়তার ফলে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাগর্ভ ও অলংকৃত বর্ণাঢ্য ভাষা হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার রচনা কোথাও শিথিল বা মন্থরগতি হয় নাই ; বরং ভাষার বলয়িত গতি-মাধুর্য রচনাকে সর্বদাই অপূর্ব রূপ-লাবণ্যে ও সৃষ্টির রসোজ্জ্বল সুষমায় মহিমান্বিত করিয়াছে। বলেন্দ্রনাথের 'স্টাইল' অর্থাৎ রচনাশৈলী বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সুরসিক মনীষী আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন্দ্রনাথের ভাষা ও রচনাশৈলী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া 'স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী'র ভূমিকায় যে মূল্যবান্ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন—

'এই রচনাভঙ্গীই আমাকে প্রথমে আকর্ষণ করিয়াছিল ; এমন সযত্নে গাঁথা শব্দের মালা তাহার পূর্ব্বে আমি দেখি নাই। শুনিয়াছি, বলেন্দ্রের ভাষা তাঁহার সাধনার ফল ; শিক্ষানবিসী অবস্থায় কাটিয়া ছাঁটিয়া পালিশ করিয়া তিনি ভাবের উপযোগী ভাষা গড়িয়া লইয়াছিলেন। অলঙ্কারের বোঝা চাপাইয়া ভাষাকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা দিবার চেষ্টা করিতেন না ; কিন্তু শব্দগুলিকে বিশেষ বিবেচনার সহিত বাছিয়া লইয়া কোথায় কোন্‌টি বসিলে মানাইবে ভাল, তাহা স্থির করিয়া ও গাঁথনির দৃঢ়তার দিকে নজর রাখিয়া তিনি যত্নের সহিত শব্দের মালা গাঁথিতেন। কাজেই তাঁহার ভাষা কারিকরের হাতের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি অপেক্ষা সৌষ্ঠবের শ্রীছাঁদ দিবার চেষ্টা করিতেন ; তাহার জন্য যে সুরুচির, যে সামঞ্জস্যবুদ্ধির, যে সংযমের প্রয়োজন ছিল, তাহা প্রচুর পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাষার প্রতি এইরূপ যত্ন অতি দুর্লভ।'[১]

বলেন্দ্রনাথ বিবিধ প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া বহু সংখ্যক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রায় সকল রচনাই 'বালক', 'ভারতী ও বালক' এবং 'সাধনা' নামক তৎকালীন বিশিষ্ট মাসিক পত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। বলেন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায়

১ ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী'র ভূমিকা, (কলিকাতা, ১৯০৭), পৃঃ ২

'চিত্র ও কাব্য' (১৮৯৪) নামে তাঁহার সাহিত্য ও চিত্রকলা বিষয়ক আটটি প্রবন্ধের একটি মাত্র সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ লাভ করে। বলেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুর পর বিবিধ সাময়িক পত্রিকায় মুদ্রিত তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিচিত্র প্রবন্ধরাজি ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত হইয়া ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু উক্ত গ্রন্থাবলীর একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহাতে বলেন্দ্রনাথের সকল রচনাই সংগৃহীত হয় নাই এবং সংগৃহীত রচনাসমূহও কালানুক্রমে সজ্জিত নহে। সাম্প্রতিক কালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী' (১৯৫২) পূর্বোক্ত গ্রন্থাবলীর তুলনায় ত্রুটিমুক্ত হইয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে এবং বলেন্দ্রনাথের সর্ববিধ রচনাই এই নূতন গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ভাবের প্রাচুর্যে ও বিষয়-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। স্বল্পস্থায়ী সাহিত্য-জীবনে তিনি সমাজ ও সাহিত্যের নানা বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধসমূহকে কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়—১। সাহিত্য ও চিত্রশিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ, ২। সমাজ, ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত প্রবন্ধ, ৩। দেশীয় প্রথা ও আচারমূলক প্রবন্ধ, ৪। ঐতিহাসিক স্থান-মাহাত্ম্যসূচক প্রবন্ধ ও ৫। বিচিত্র আত্মভাবনিষ্ঠ (subjective) প্রবন্ধ। বলেন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধই সাহিত্য ও শিল্পকলা সংক্রান্ত রসগ্রাহী আলোচনা এবং এই সমালোচনা জাতীয় প্রবন্ধেই বলেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সর্বাধিক। বলেন্দ্রনাথের শিল্প-দৃষ্টির মধ্যে সর্বত্রই এক অখণ্ডতা, বিরল সৌন্দর্যবোধ ও সামঞ্জস্যশীলতা (harmony) পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং তাঁহার এই শিল্প-দৃষ্টিসম্ভূত সমালোচনা এক উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে।

বলেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনায় বিস্ময়কর নৈপুণ্যের পরিচয় দান করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল অর্থাৎ তিনি যে আবাল্য সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের বিচিত্র ভাবসম্পদ ও রূপ-রস দ্বারা বলেন্দ্র-নাথের সৌন্দর্য-সন্ধানী প্রতিভা যে পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাহা তাঁহার বিশিষ্ট সংস্কৃত কবি ও নাট্যকারগণের শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের সরস আলোচনা হইতে প্রমাণিত হয়।

বলেন্দ্রনাথের 'চিত্র ও কাব্য' গ্রন্থটি প্রধানতঃ সংস্কৃত সাহিত্য ও চিত্রশিল্পেরই রসগভীর আলোচনা। 'উত্তর চরিত' 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা', 'কাব্যে

প্রকৃতি', 'জয়দেব', 'পশুপ্রীতি,' 'মৃচ্ছকটিক' 'রবিবর্ম্মা' ও 'হিন্দু দেবদেবীর চিত্র' এই আটটি সুনির্বাচিত প্রবন্ধ হইতে বলেন্দ্রনাথের সুনিপুণ বিচার-ক্ষমতা ও পরিণত রসিকজনোচিত প্রশান্তি, উদার দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক পরিচয় লাভ করা যায়। বলেন্দ্রনাথ অখণ্ড শিল্প-দৃষ্টি ও নন্দনামোদী ভাব-কল্পনা দ্বারা তাঁহার সমালোচনাকে অতি সহজেই এক স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা বিশ্লেষণ-দক্ষতা ও সৌন্দর্যপ্রবণতার সুমিত সমন্বয়ে সার্থক হইয়াছে। আবেগময়ী অপরূপ কাব্যধর্মী বাক্য-বিন্যাসে অলৌকিক রসের কল্পজগত সৃষ্টি করাই বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের রসাস্বাদন করিয়া বলেন্দ্রনাথ তাঁহার রসোপলব্ধিকে কবিত্বপূর্ণ ভাষায় নূতনভাবে সৃষ্টি কবিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং সংস্কৃত কাব্যের সৌন্দর্যলোক তাঁহার দৈবী ভাষা-চিত্রের মধ্য দিয়া সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রচলিত সমালোচনার ন্যায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতিপাদ্য বক্তব্য বিষয় বা ভাবের প্রতিষ্ঠাই বলেন্দ্র-প্রবন্ধের স্বরূপ-ধর্ম বা লক্ষণ নহে। বলেন্দ্রনাথ রূপধ্যানী শিল্পী, রসস্রষ্টা—তিনি মুখ্যতঃ রসসাহিত্যেরই সুনিপুণ ভাষ্যকার ছিলেন। বলেন্দ্রনাথের এই জাতীয় সৃষ্টিমূলক সাহিত্য-সমালোচনা (constructive criticism) রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-পদ্ধতিরই সমধর্মী। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অপরূপ দীপ্তিময়ী ভাষা ও দিব্য কল্পনাবলে কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্টের সাহিত্য-কর্ম উপলক্ষ্য করিয়া যে অভিনব ও অবিস্মরণীয় সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই তুলনায় বলেন্দ্রনাথের সংস্কৃত সাহিত্যের রসাস্বাদন ও আলোচনা অপেক্ষাকৃত অপরিণত ও অনুজ্জ্বল হইয়াছে। রবীন্দ্র-সমকক্ষ না হইলেও বলেন্দ্রনাথের সমালোচনা মধ্যেও যে এক প্রগাঢ় রূপ-রসবিমুগ্ধ তন্ময়চিত্ত শিল্পীর সৌন্দর্যপ্রভা বিভাসিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

বলেন্দ্রনাথ সহজ সৌন্দর্যের নিষ্ঠাবান্ সাধক ছিলেন এবং এই প্রাণময় কমনীয় সৌন্দর্যের গভীর প্রেরণাই তাঁহার সকল সাহিত্য-কর্ম সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তিনি যথার্থই আবেগ-চঞ্চল কবি—তত্ত্ব বা তথ্য-বিচার নির্দেশক কুশলী সমালোচক নহেন। বস্তুনিষ্ঠ নিছক যুক্তিবাদ ও বিতর্কালোচনা বলেন্দ্রনাথের স্বভাব-ধর্ম নহে—তিনি প্রকৃত শিল্প-রসিক সমালোচক, সহৃদয় সুনিপুণ রসপ্রমাতা। 'উত্তর চরিত', 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা' প্রভৃতি প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের এই রস-সাহিত্যিক প্রকৃতির স্বরূপ-পরিচয় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ

পাইয়াছে। সংস্কৃত কবি-নাট্যকার ভবভূতি প্রণীত 'উত্তররামচরিতে'র বেদনাবিহ্বল, করুণ মর্মস্পর্শী দিকটি বলেন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবনায় ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় একটি নির্মল আনন্দরসের দিগন্ত উন্মোচন করিয়াছে। ভবভূতির কবি-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্য এবং মহাকবি কালিদাস হইতে তাঁহার পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্যও বলেন্দ্রনাথ তাঁহার 'উত্তর চরিত' প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে ও সুকৌশলে পরিবেশন করিয়াছেন। বলেন্দ্রনাথের ভাষার দীপ্তি ও অতুলনীয় প্রকাশভঙ্গিতে তাঁহার আলোচনাটি মনোজ্ঞ ও রসোপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সমাস-সন্ধি-অনুপ্রাসে বলেন্দ্রনাথের ভাষা কোথাও দুর্বোধ্য বা জটিল হয় নাই; বরং নূতন সুনির্বাচিত শব্দ, উপমা ও রূপকের সংযোজনায় তাঁহার ভাষায় এক সহজ গতিবেগ ও প্রশান্ত-সংযত গাম্ভীর্য লক্ষ্য করা যায়। বলেন্দ্রনাথের উত্তর চরিত' প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'ভবভূতির কাব্যে সুখও যেন অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়া অনেকটা দুঃখেরই মত হইয়া আসে। হয়, তাহার সহিত কতকগুলি দুঃখকাহিনী বিজড়িত, নয়, তাহার মধ্যে একটা অনির্দ্দেশ্য বিবশ ব্যাকুলতা—সুখ কি দুঃখ নির্ণয় করিয়া উঠা কঠিন; যদি বা মিলন হয়, মিলনের মাঝখানে যেন শতবর্ষের বিরহ জাগিয়া থাকে এবং মিলনান্ত উপসংহারেও পুরাতন বিরহ পরিতৃপ্ত হয় না। কালিদাসের কাব্যে যেমন দুঃখও বিলাস-অলসিত মোহনমধুর বেশে কতকগুলি সুন্দর চিত্রবদ্ধ হইয়া মোহ উদ্রেক করিয়া দেয়, ভবভূতির কাব্যে সুখ সেইরূপ মর্ম্মস্থলে বেদনাবিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত করুণ ও নিবিড় হইয়া উঠে।'[১] ✓

বলেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা দ্বারাই বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য সমৃদ্ধ করেন নাই—প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রসাস্বাদন ও তাহাদের যথাযথ মূল্য-নির্ধারণেও তাঁহার সযত্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। 'কুন্দনন্দিনী ও সূর্য্যমুখী', 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য', 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস', 'মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী', 'কৃত্তিবাস ও কাশীদাস', 'বঙ্গসাহিত্য: রামপ্রসাদের গান', 'রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর', 'ভারতচন্দ্র রায়', 'বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা', 'কেতকা-ক্ষেমানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি প্রাচীন বাংলা কাব্য ও আধুনিক বাংলা উপন্যাসের সাধারণ চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও রূপ-রীতির পরিচয়বাহী। সংস্কৃত

১ 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী', (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৯), পৃঃ ১৭

সাহিত্যের তুলনায় বলেন্দ্রনাথের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি সমালোচনা শক্তিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল। এই সকল প্রবন্ধে তাঁহার রস-বিচারসম্ভূত মৌলিক চিন্তার কোন পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। যদিও কোন কোন প্রবন্ধে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধের মাধুর্য আভাসিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা সুষ্ঠুভাবে পরিস্ফুট নহে।

প্রাচীন বাংলা কাব্য আলোচনায় বলেন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি বা মৃদু-মধুর হাস্যরসিকতার আশ্রয় লইয়াছেন। প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাঙ্গালী কবিগণের রচনার যে অংশে অসংগতি, অসংযম ও অশালীনতা প্রকাশ পাইয়াছে, বলেন্দ্রনাথ বঙ্কিম-কুটিল তীব্র কটাক্ষ সহকারে তাহার উল্লেখ করিয়া নিরপেক্ষ সমালোচনায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি 'মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী' নামক প্রবন্ধে মৃদুহাস্য-পরিহাস রসিকতা ও শ্লেষব্যঞ্জক মন্তব্য দ্বারা তাঁহার আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার এই আলোচনা আনুপূর্বিক অর্থাৎ শেষাবধি তাহাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই—মুকুন্দরামের কবি-প্রকৃতির স্বরূপ ও বাংলা কাব্য ধারায় তাঁহার যথাযথ স্থান নির্দেশ করিতেও বলেন্দ্রনাথ প্রয়াস পাইয়াছেন। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে তাঁহার গভীর রসগ্রাহিতা ও সরস যুক্তিপ্রিয়তার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। মুকুন্দরাম যে উন্নত, মহান্ গম্ভীর কল্পনালোকের কবি নহেন—তিনি যে সাধারণ দৈনন্দিন সংসারের খুঁটিনাটি ত্রুটি-বিচ্যুতির কবি, এই সত্য-পরিচয়ই বলেন্দ্রনাথের শিল্প-দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী' প্রবন্ধ হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল—

'মুকুন্দরামে ভাবের হিল্লোল কোথাও বড় খেলিতে পায় নাই, কবিত্ব বিকশিয়া উঠিয়া সৌন্দর্য্যের রহস্যদ্বার খুলিয়া দেয় না। বস্তুর অতীত প্রদেশে তাঁহার তেমন আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায় না—চর্ম্মচক্ষুতে যাহা যেরূপ দেখিয়াছেন, তিনি সেইরূপই বর্ণনা করিতে বসিয়াছেন। উচ্চদরের কবি তিনি নহেন, কিন্তু সাজাইয়া গল্প করিবার তাঁহার ক্ষমতা আছে।'[১]

বলেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ বাংলা সাহিত্যের বিবিধ প্রসঙ্গ আলোচনায় অতি অনাড়ম্বর, সরল সহজ ঘরোয়া ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন—তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্য

১ 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী', (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৯), পৃঃ ২০৮

সম্পর্কিত প্রবন্ধসমূহে ব্যবহৃত ভাষার ন্যায় তাহা ব্যঞ্জনাবহুল চিত্রসমৃদ্ধ, অলংকৃত ও শব্দ বা ধ্বনিগৌরবে মহিমান্বিত হয় নাই।

সাহিত্য-তত্ত্ব বা সমালোচনার রূপ ও রীতি সম্পর্কেও বলেন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। 'ইংরাজি বনাম বাঙ্গলা,' 'স্বভাব ও সাহিত্য,' 'জীবন-ট্র্যাজেডি' এবং 'কবি ও সেন্টিমেণ্ট্যাল' বলেন্দ্রনাথের সুচিন্তিত সাহিত্য-রূপ বা তত্ত্বনির্ভর প্রবন্ধ। বলেন্দ্রনাথের যে একটি নিজস্ব সাহিত্যমত ছিল, তাহা এই সকল প্রবন্ধ দ্বারা প্রমাণিত হয়। তাঁহার 'কবি ও সেন্টিমেণ্ট্যাল' প্রবন্ধটি চিন্তা-প্রাখর্যে ও বিশ্লেষণ নৈপুণ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলেন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে কবি ও সেন্টিমেণ্ট্যালের স্বরূপ-প্রকৃতি নির্দেশ করিয়া উভয়ের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। কাব্য-বিচার প্রসঙ্গে বহুলক্ষেত্রেই সেন্টি-মেণ্ট্যালের প্রতি কবি-অভিধা প্রযুক্ত হয়; অথচ সেন্টিমেণ্ট্যাল কবি নহেন এবং কবির সহিত তাহার চরিত্রগত বিশেষ পার্থক্যও আছে। কাল্পনিক কল্পনা ও সত্য কল্পনা অর্থাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগবিহ্বলতা এবং সংযত, সংহত কাব্য-মুক্তির মধ্যে যে প্রভেদ বর্তমান, বলেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে তাহা প্রদর্শন করিয়া উচ্চাঙ্গের বিশ্লেষণকুশলতা ও মননশীলতার পরিচয় দান করিয়াছেন। সুতীক্ষ্ণ বিচারবোধ ও সরস যুক্তিবাদে বলেন্দ্রনাথের 'কবি ও সেন্টিমেণ্ট্যাল' প্রবন্ধটি একটি স্থির-সিদ্ধান্তমুখী গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন্দ্রনাথের 'কবি ও সেন্টিমেণ্ট্যাল' নামক প্রবন্ধের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল—

'সত্যের সহিত সেন্টিমেণ্ট্যালদিগের সম্বন্ধ অল্পই। কবি সত্য সত্যই অনুভব করিয়া বলেন, এইজন্য তাঁহার কথার এত গুরুত্ব। সেন্টিমেণ্ট্যালদিগের ভাব অনুভবও অনেকটা কাল্পনিক। এইজন্য তাহা নির্জ্জীব অনর্থপ্রসূ মাত্র। কল্পনা সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কবিতা বাহির হয় না। কল্পনাও যখন কাল্পনিক হইয়া দাঁড়ায়, তখন রোগের উৎপত্তি সন্দেহ নাই। সেন্টিমেণ্ট্যালের অবস্থা রোগের-স্বভাবের নহে; বিকারের। কবি প্রকৃতির, সেন্টিমেণ্ট্যাল বিকৃতির; কবি স্বাধীনতার, সেন্টিমেণ্ট্যাল উচ্ছৃঙ্খলতার; কবি সরল প্রেমের, সেন্টিমেণ্ট্যাল রুগ্ন প্রেমাভিনয়ের।'[১]

বাংলা সাহিত্যে বলেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম ভারতীয় চিত্রকলা প্রসঙ্গে সমালোচনাত্মক প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত করেন। দেশের সমৃদ্ধ সাহিত্য যেমন

১ 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী', (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৩৫৯), পৃঃ ৪০

জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয়বাহী, তেমনি উন্নত চিত্রকলাও দেশের বিশিষ্ট ভাবরস ও রুচিরও প্রকাশক। পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় ভারতবাসীর চিত্রশিল্পের প্রতি উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যে বলেন্দ্রনাথ ব্যথিতচিত্ত হইয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলা তথা ভারতীয় চিত্রকলার যথোপযুক্ত অনুশীলন ও তাহার সহৃদয় সার্থক সমালোচনার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, বলেন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প সংক্রান্ত বিবিধ প্রবন্ধের মাধ্যমে তাহাই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 'রবি-বর্ম্মা', 'হিন্দুদেবদেবীর চিত্র', 'দিল্লীর চিত্রশালিকা', 'দেয়ালের ছবি', 'রঙ ও ভাব' শীর্ষক চিত্রকলা সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি বলেন্দ্রনাথের গভীর রূপচেতনা ও সূক্ষ্ম ভাবদৃষ্টির আলোকসম্পাতে সমুজ্জ্বল। চিত্রশিল্প অর্থাৎ রেখা ও বর্ণের শক্তি-সৌন্দর্যের গভীরতর প্রভাব প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ যেমন তথ্যবাহী, তেমনি তাঁহার মৌলিক চিন্তায় মূল্যবান্ হইয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশে বলেন্দ্রনাথই যে প্রথম সার্থক চিত্ররসিক সমালোচকের সম্মান লাভের অধিকারী, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

বলেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কল্পনাবিলাসী বা নিছক স্মৃতি-রোমন্থনপ্রিয় লেখক ছিলেন না। তাঁহার যেমন এক চিত্রধর্মী কবিমন ও কল্পদৃষ্টি ছিল, তেমনি তিনি এক গভীর ধর্মানুভূতি ও প্রখর সামাজিক চেতনারও অধিকারী ছিলেন। সমাজ ও ধর্মগত কয়েকটি জটিল সমস্যা তাঁহার কতকগুলি প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বস্তু। বলেন্দ্রনাথ 'ধর্ম্মজঙ্গল', 'ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম', 'স্ত্রী ও পুরুষ', 'মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ', 'মুসলমান সমাজ', 'অনার্য্য ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি প্রবন্ধে বাঙ্গালী তথা ভারতীয় হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস, অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের তুলনায় হিন্দু সমাজের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের ন্যায়সঙ্গত বিচার-বিশ্লেষণ অতি নিপুণভাবে সম্পন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বিচিত্র ধর্মীয় বিধি যে দেশের ধর্ম বা সমাজ ক্ষেত্রে বহুরূপী বিশৃঙ্খলার কারণ এবং রাজনৈতিক অব্যবস্থার ফলেই যে মূলতঃ ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়া থাকে, বলেন্দ্রনাথ তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধে সেই সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, শান্তিময় রাজনৈতিক পরিবেশই স্থির-সংযত কল্যাণকর জাতীয় ধর্ম গঠনের সহায়ক; নচেৎ বিভিন্নমুখী অনুশাসন ও লোকাচারে সত্যকার কল্যাণময়ী ধর্মের স্বরূপ আবৃত হইয়া তাহা এক বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে এই বিকৃতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বর্তমান পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুধর্ম যে অধিকতর জটিল সমস্যার

সম্মুখীন হইয়াছে, তাহার যুক্তিসম্মত আলোচনায় বলেন্দ্রনাথের 'ধর্ম্মজঙ্গল' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উক্ত প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'কি করিলে না করিলে হিন্দুধর্ম্ম পালন কিম্বা লঙ্ঘন করা হয়, বলা বাস্তবিকই বড় শক্ত। * * * নানাবিধ সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং বিরোধী মত ও বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, কাব্যদর্শন, বিজ্ঞান জ্যোতিষ, মন্ত্রতন্ত্র ইন্দ্রজাল যাহা কিছু কোনকালে এদেশে উদ্ভূত হইয়াছে, কিম্বা বিদেশ হইতে আসিয়া কালক্রমে এদেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাই নিঃশব্দে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহার কতটা বিশেষ কোন ধর্ম্মমতে বিশ্বাস, কতটা লোকাচার, কতটা শাস্ত্রপালন, কতটা জাতিভেদ, আহার বিহার সম্বন্ধে সমাজের নিয়মরক্ষা, আর কতটাই বা ব্যক্তির স্বাধীনতা, এ পর্য্যন্ত তাহা সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই।'[১]

বলেন্দ্রনাথের সমাজ বা ধর্ম-সংস্কারমূলক প্রবন্ধগুলি স্বপ্নতন্ময়, আবিষ্টচিত্ত কবির মোহময় পরিকল্পনা-জাত নহে, তাহা ধর্মীয় বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচকের মীমাংসা-নিপুণ আলোচনায় সমৃদ্ধ। বলেন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রবন্ধের তুলনায় এই জাতীয় প্রবন্ধগুলি অপেক্ষাকৃত বস্তুনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে মহিমোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

✓ বলেন্দ্রনাথ বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিবিধ সামাজিক প্রথা, আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়া কর্মানুষ্ঠানের প্রতি এক সুগভীর শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণ করিয়াছেন। ঐতিহ্যপ্রীতি ও স্বাদেশিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ কতকগুলি প্রবন্ধ হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। 'গুজরাটে গরবা', 'গৃহকোণ', 'নিমন্ত্রণ-সভা', 'প্রণাম', 'প্রাচ্য প্রসাধনকলা', 'শিবসুন্দর', 'শুভ উৎসব', 'সখ্য' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি হিন্দু গৃহস্থের অন্তঃপুরের মঙ্গলময় স্নিগ্ধ ভাবচ্ছবি রূপায়ণে এবং তাহার সামাজিক ও সাংসারিক জীবনে সদাচার, সদানুষ্ঠানের মধ্যে যে শুভ সংকল্প ও সদিচ্ছা বর্তমান, তাহারই আলোচনায় সমৃদ্ধ। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবমুক্ত সমাজ-জীবনে প্রচলিত স্নিগ্ধ-সুন্দর অথচ কল্যাণকর প্রাচীন প্রথা ও ক্রিয়া-কর্ম এবং বিজাতীয় ভাবাবিষ্ট, অন্তঃসারশূন্য, বণিকধর্মী আধুনিক সমাজ-জীবনের রীতিনীতি ও অনুষ্ঠান এই উভয়ের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া বলেন্দ্রনাথ স্বদেশের লুপ্ত রীতিনীতি বা অনুষ্ঠানাদিরই পুনরুজ্জীবন কামনা করিয়াছেন এবং তাঁহার

[১] 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী', (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৯), পৃঃ ৪৬৮

রচনাকৌশলের অনন্যসাধারণ নৈপুণ্যে ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বাংলার প্রাচীন সমাজের এক প্রাণময় উজ্জ্বল রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। দৈহিক রূপসজ্জা ও প্রসাধনের মধ্যেও যে প্রাচ্যদেশের একটি নিজস্ব সংযত-শোভন বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাও বলেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।৮ তিনি 'প্রাচ্য প্রসাধনকলা' নামক প্রবন্ধে প্রসাধনকলায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য অতি নৈপুণ্যসহকারে নির্দেশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে রমণীগণের প্রসাধন-বৈচিত্র্যের পরিধি বিস্তৃত এবং প্রাচ্যের তুলনায় পাশ্চাত্ত্য সমাজে সৌন্দর্য-তত্ত্ব সম্পর্কে অধিকতর আন্দোলন-আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও প্রাচ্য দেশের ন্যায় তাহা কাব্যের বিষয়ীভূত হইয়া কোন স্থায়ী আনন্দরূপ বা কল্যাণসুন্দর সত্তা লাভ করে নাই। প্রাচ্য প্রসাধনকলার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা প্রাকৃতিক অর্থাৎ বিভিন্ন ঋতুগত নৈসর্গিক রূপ-লাবণ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এক কমনীয় সহজ-সুন্দর গার্হস্থ্য ভাব দ্বারা মহিমান্বিত হইয়াছে। প্রাচ্য প্রসাধনকলার স্বরূপ-রহস্য সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করিয়া বলেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধে তাহা সুন্দরভাবে পরিবেশন করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে রূপসজ্জায় বা প্রসাধনকলায় প্রাচ্যের ন্যায় প্রকৃতির এক সহজ স্বাভাবিক অনিবার্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। আধুনিক কালে প্রাচ্যের জনসমাজ সর্বক্ষেত্রেই পাশ্চাত্ত্যের পুচ্ছগ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রসাধনকলার ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ফলে, বর্তমানে প্রাচ্য প্রসাধনকলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা মহিমা বিলুপ্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালা হিন্দুর যুগপ্রচলিত বিবিধ উৎসবসমূহের প্রেরণা ও প্রকৃতি সম্বন্ধেও বলেন্দ্রনাথ তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘর্ষে বিচিত্র উৎসব-অনুষ্ঠানাদির ভাব-গম্ভীর সৌন্দর্য ও মাধুর্য বিপর্যস্ত হইয়া ক্রমান্বয়ে লুপ্ত হইয়াছে। বর্তমান যন্ত্রযুগে উৎসবের অনাবিল আনন্দ ও ঔদার্যগুণ ক্ষুণ্ন হইয়া বহিরঙ্গীয় রূপ-সমারোহই অধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু মানুষের পারস্পরিক 'কল্যাণী ইচ্ছা'ই প্রধানতঃ উৎসবের প্রাণস্বরূপ—বাহ্যিক আড়ম্বর বা সমারোহই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। উৎসবের সর্বজনীনত্ব ও মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ 'শুভ উৎসব' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'আমার আনন্দ সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই, তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি—এই

কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ। * * * সাবিত্রীব্রত, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জামাতৃষষ্ঠী উপলক্ষ্যে আপন প্রিয়জন ও স্নেহাস্পদগণকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া নিজেকে ধন্য মনে হয়, বিধাতা আমাকে যে এত সৌভাগ্যসুখ দিয়াছেন, ইহা সকলের সহিত বণ্টন করিয়া না লইলে ইহার সফলতা কোথায়? উৎসব ইহারই উপলক্ষ্য। সেইজন্য আমাদের উৎসবে ভাবেরই প্রাধান্য—বাহিরের সমারোহ তাহার প্রধান অঙ্গ নহে।'[১]

বাংলাদেশের বিচিত্র ব্রত-পার্বণ ও উৎসব-মহিমার সুনির্মল আনন্দ-বিভায় বলেন্দ্রনাথের 'শুভ উৎসব' প্রবন্ধটি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বর্তমান কালে উৎসবের রীতিনীতি এবং ভাব বা রসরুচির আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়া যে বিকৃত রূপান্তর ঘটিয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহাও লেখকের বেদনাঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাসসহ প্রকাশিত হইয়াছে। বলেন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর প্রবন্ধসমূহের সর্বত্রই এক স্পর্শকাতর হিন্দুর জাতীয়তাবাদী মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

বাঙ্গালীর বিদেশী ভাব ও রুচির প্রতি প্রবল আসক্তি বা অন্ধ আনুগত্য প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথের অধিকাংশ সামাজিক প্রবন্ধেই লঘু হাস্যরস ও তীব্র শ্লেষ-বিদ্রূপও প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার পরিহাস-রসিকতা কখনই সংকীর্ণ-কুটিল ঈর্ষা-দ্বেষে মালিন্যগ্রস্ত হয় নাই—তির্যক কটাক্ষ ও ভর্ৎসনার মধ্যেও বলেন্দ্রনাথের স্নেহপ্রবণ সহৃদয়তা ও মোহমুক্ত মনের অনাবিল সুষমা এবং ঔদার্যের স্পর্শ অনুভব করা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে লঘুরসের মধ্য দিয়া প্রবন্ধগত বক্তব্য পরিবেশিত হইলেও বলেন্দ্রনাথের চিন্তাধারার গুরুত্ব কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই এবং তাহাতে কোন উপদেশ বা নীতিও প্রধান হইয়া উঠে নাই। বরং লেখকের অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও অকপট সত্যভাষণে তাহা উপদেশ বা নীতির স্তর অতিক্রম করিয়া সরস সাহিত্যের মর্যাদায় ভূষিত হইয়াছে।

বলেন্দ্রনাথের সুরসিক মন প্রধানত রোমাণ্টিক ধর্মে আচ্ছন্ন ছিল। সেইজন্য বিগতযুগের প্রাচীন যে কোন বিষয়ের প্রতি তিনি এক গভীর আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহাসিক কীর্তি বা শিল্প-বৈভব বলেন্দ্রনাথের

১ 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী', (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৯), পৃঃ ৫৮৪-৮৫

রূপধ্যানী শিল্পি-সত্তাকে জাগ্রত করিয়া দেশের ঐতিহ্যাশ্রিত প্রবন্ধ রচনায় প্রবুদ্ধ করিয়াছে। 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র', 'খণ্ডগিরি', 'কণারক', 'প্রাচীন উড়িষ্যা', 'বারাণসী' ইত্যাদি প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের গভীর ইতিহাস-প্রীতি ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার এই শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি সাধারণ প্রচলিত অর্থাৎ বিশুদ্ধ তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সগোত্র নহে। কারণ, ইহাতে বলেন্দ্রনাথের শিল্পি-সত্তা প্রামাণ্য ঐতিহাসিক যুক্তি-শৃঙ্খলা কিংবা বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া প্রকাশ লাভ করে নাই—ইতিহাসের অস্পষ্ট স্মৃতিবিলাসী কল্পনার মধ্যেই তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। বলেন্দ্রনাথের রোমান্স্‌ধর্মী সহজাত কবিমনের নিকট ইতিহাসের গবেষণামূলক বস্তু অংশের কোন আবেদন ছিল না এবং ফলে, তাহার এই শ্রেণীর প্রবন্ধ প্রমাণ-নির্ভর ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ বা মনন-শীলতায় দীপ্তোজ্জ্বল হয় নাই। ঐতিহাসিক ভাব বা বিষয় তাঁহার হৃদ্‌গত রোমান্স্‌রসে জারিত করিয়া বলেন্দ্রনাথ তাহা এমন অপূর্ব ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহাতে ইতিহাসের বস্তুগৌরব অপেক্ষা সত্যনিষ্ঠ প্রখর কল্পনার সৌন্দর্য-মধুর চিত্ররূপই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই বলেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক বিষয়াশ্রিত প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

প্রাচীন উড়িষ্যাকে কেন্দ্র করিয়াই বলেন্দ্রনাথের অধিকাংশ ঐতিহ্যমূলক প্রবন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে। উড়িষ্যার প্রতি তিনি এক অস্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন। তাহার কারণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ভারতবর্ষের মধ্যে উড়িষ্যাই একমাত্র দেশ, যেখানে মুসলমান নৃপতিগণের বিধ্বংসকারী আক্রমণের পরেও দেশের অপরূপ শিল্প-কীর্তি বিনষ্ট হয় নাই এবং দেবমন্দিরের পাষাণে মস্‌জিদের প্রাচীর নির্মিত হইবার সুযোগ পায় নাই। হিন্দুধর্মানুরাগী শিল্পরসিক বলেন্দ্রনাথ তাঁহার 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'উড়িষ্যা এখনও মন্দিরের দেশ। রাজধর্ম্ম যখন যাহা প্রবল হইয়াছে, আপনার উন্নত মহিমা প্রচার করিতে অভ্রভেদী পাষাণ-শির উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে, এবং এইরূপে ভারতবর্ষের বিলুপ্তপ্রায় পঞ্চবিংশতি শতাব্দী ভিন্ন ভিন্ন দেবতার চরণতলে উৎসৃষ্ট হইয়া পুরাতন দিনের জীবন-গৌরব রক্ষা করিতেছে। পুরীতে জগন্নাথ, ভুবনেশ্বরে শিব, যাজপুরে পার্ব্বতী, বিনায়কে গণেশ, কণারকে দেবতাহীন সূর্য্যমন্দির, খণ্ডগিরিতে পরিত্যক্ত বৌদ্ধ গুম্ফাবলী; নদীতীরে গিরি-শিখরে, সাগরবেলায়, যেখানে প্রকৃতিদেবী আপন সৌন্দর্য্য ঈষৎ উদ্‌ঘাটিত

করিয়াছেন, সেইখানেই নীল দিগন্তের গায়ে হয় দেবালয়, নয় অনুশাসন-স্তম্ভ প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে; সমস্ত উৎকলদেশ যেন দেবতার বিহারভূমি এবং মানবের তীর্থক্ষেত্র।'[১]

ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক স্থানসমূহের মাহাত্ম্য ও তাহাদের নয়নাভিরাম ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য-শিল্পের সৌন্দর্য বর্ণনাও বলেন্দ্রনাথের পরিণত শিল্পিসুলভ বাচনভঙ্গিতে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। শ্রুতিস্নিগ্ধ শব্দ-নির্বাচন ও দীর্ঘ বিসর্পী বাক্যগঠনে বলেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁহার শব্দ-চয়নের বিরল নৈপুণ্য ও কৃতিত্ব সম্পর্কে সমালোচকপ্রবর প্রিয়নাথ সেনের মন্তব্য যথাযথ ও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

'শব্দচয়নে বলেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ক্ষমতা—এক একটি কথা এক একটি চিত্র—এমন পূর্ণপ্রাণ পূর্ণ-অবয়ব কথা বাঙ্গালা গদ্যে কোথাও দেখি নাই।'[২]

বলেন্দ্রনাথ যথার্থই শব্দাহরণ, উপমা-অলংকরণ ও বাগ্‌বিন্যাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রূপশিল্পী। তাঁহার চিত্রাংকনী শিল্পনৈপুণ্যে প্রবন্ধে বর্ণিত দৃশ্য বা ঘটনা চিত্রবৎ উদ্ভাসিত হইয়া এক অনির্বচনীয় রূপমূর্তি গ্রহণ করিয়াছে। বলেন্দ্রনাথের 'কণারক' প্রবন্ধটি ইহার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

প্রাচীন উড়িষ্যার শিল্প-কীর্তির এক অবিস্মরণীয় নিদর্শন কণারকের সূর্যমন্দির। সৌন্দর্য-সন্ধানী শিল্পী বলেন্দ্রনাথ কণারকের অনিন্দ্য রূপৈশ্বর্য-নিকেতনে প্রবেশ করিয়া তন্ময়চিত্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার 'কণারক' প্রবন্ধে কয়েকটি সুনিপুণ রেখাপাতের মধ্য দিয়া সেই সুদূর অতীতের স্নিগ্ধ কমনীয় সৌন্দর্যরূপ সজীব ও মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কণারকের অতীতকালীন অভিজাত ধর্মীয় মাহাত্ম্য, সূর্যমন্দিরের অনবদ্য কারুকার্য এবং কালবৈগুণ্যে বর্তমান শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয়ের বর্ণনায় যে নিখুঁত চিত্ররূপের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দ্বারা বলেন্দ্রনাথের রূপদক্ষ শিল্পীমনের বিচিত্র রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বালুস্তূপে প্রোথিত অতীত ভারতের ঐশ্বর্যদীপ্ত ধর্মমন্দির কণারকের বিলুপ্ত, গৌরবময় ঐতিহ্যের চিত্রটি সৌন্দর্যসাধক শিল্পীর তুলিকায় এক অনবদ্য রূপ লাভ করিয়া মহিমময় হইয়াছে। বলেন্দ্রনাথের বর্ণাঢ্য অলংকৃত ভাষার যে শোভন-সংযত

১ 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী', (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৯), পৃঃ ৫১১

২ 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি', (কলিকাতা, ১৩৪০), পৃঃ ২২৬

ছন্দোস্পন্দ, গূঢ়-সৌন্দর্য ও বিরল মহিমা, তাহা বাংলা ভাষায় কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন্দ্রনাথের 'কণারক' প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জ্জন নিকেতনে নিশাচর বাদুড় বাসা বাঁধিয়াছে, ছিন্নশিলা খণ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রামসুখে মগ্ন হইয়া আছে; সম্মুখের ঝিল্লিমুখরিত প্রান্তবদেশ দিয়া গ্রাম্য পথিকজন যখন কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশে যাত্রা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না করিয়া আসন্ন সূর্যাস্তের পূর্ব্বেই দ্রুতপদে আবার পথ চলিতে থাকে।- কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত মায়ার মত; যেন কোন্ প্রাচীন উপকথার বিস্মৃত প্রায় উপসংহার শৈবাল শয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে—।'[১]

বলেন্দ্রনাথের গভীর ঐতিহ্য-প্রীতির স্পর্শ-চিহ্নিত এই 'কণারক' প্রবন্ধটির আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের 'মন্দির' নামক প্রবন্ধের প্রসঙ্গ স্মরণ হইতে পারে। যদিও প্রবন্ধদ্বয় ভারতের অতীত গৌরবোজ্জ্বল দুইটি বিশিষ্ট ধর্মমন্দির অবলম্বন করিয়া লিখিত; তথাপি দুই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবগত বিশেষ পার্থক্য ইহাদের মধ্যে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধে ভুবনেশ্বরের মন্দির উপলক্ষ্য করিয়া ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য রসসম্মতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। দার্শনিক জটিল ধর্ম্মতত্ত্ব কবির রসোজ্জ্বল ব্যাখ্যায় হৃদ্য ও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে প্রাচীন ঐতিহ্যে বিস্ময়-বিমুগ্ধ রোমান্টিক কবির অশ্রুনিবিড় বেদনার্দ্র কণ্ঠ কোথাও ধ্বনিত হয় নাই। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের 'কণারক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ধর্মীয় তত্ত্ব বা তথ্যনির্ভরতার সত্যতা ও যুক্তিনিষ্ঠার যথাযথ পরিচয় লাভ করা যায় না; পরন্তু বিগতদিনের কণারকের লুপ্ত বৈভব বা ধর্মীয় মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া কেবলমাত্র লেখকের আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস বা বেদনাই ইহাতে মুখ্যভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

বলেন্দ্রনাথ স্বয়ং একজন গীতি-কবিও (Lyrist) ছিলেন। 'মাধবিকা' ও 'শ্রাবণী' এই দুইটি কাব্যগ্রন্থ তাঁহার কবি-প্রতিভার সার্থক নিদর্শন। কিন্তু কবিতা অপেক্ষা মুখ্যতঃ গদ্যরচনা মধ্যেই যেন তাঁহার গীতিকাব্যোচিত ঐশ্বর্যের পূর্ণতম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আত্মভাবনিষ্ঠ বিচিত্র প্রবন্ধগুলিতেই (Personal Essays) তাঁহার ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ও গীতিময় কবিপ্রাণতার

---

১ 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী,' (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৯), পৃঃ ৫৩৫-৩৬

সুষমা সর্বাধিক প্রতিভাসিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রবন্ধ গীতিধর্মী হইলেও তাহা গীতিকাব্যের অসংযত উচ্ছ্বাস বা নিছক হৃদয়াবেগের অনন্তবিস্তারী মূর্চ্ছনায় আবিল হয় নাই; বরং কবি চিত্তের ভাবাবেগের মধ্যে এক সুদৃঢ় সংহতি বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রবন্ধের চমৎকারিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনা, অতি পরিচিত সাধারণ কোন অভিজ্ঞতা বা দর্শনীয় কোন স্থান কিংবা বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য-দৃশ্য এই সকল আত্মভাবনিষ্ঠ প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বিষয় হইয়াছে এবং কবি-শিল্পী বলেন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শে তাহা অভিনব রূপে ও ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। বলেন্দ্রনাথের এই জাতীয় প্রবন্ধে বিষয় বা ভাবের বিচার-বিশ্লেষণ কিংবা তাহার স্বরূপ-রহস্যের মীমাংসা-নিপুণ আলোচনা অপেক্ষা শিল্পিমনের একান্ত নিজস্ব রসমধুর ভাবনা ও ধ্যান-ধারণাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। যথার্থ শিল্পি-প্রাণের স্পর্শোত্তাপে ও পরিবেশনের শিল্প-সুন্দর কলাকৌশলে নীরস, প্রাণহীন বিষয়ও যে হৃদয়স্পর্শী, রসোজ্জ্বল ও রমণীয় হওয়া সম্ভব, তাহা বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রবন্ধসমূহ হইতে প্রমাণিত হয়। বলেন্দ্রনাথের আত্ম-ভাবনিষ্ঠ প্রবন্ধসমূহের কতকগুলি নিছক বর্ণনামূলক এবং কতকগুলি ভাব-কল্পনা বা স্মৃতিচারণের মৃদুস্নিগ্ধ সৌরভে পরিপূর্ণ। তাঁহার বর্ণনামূলক প্রবন্ধের মধ্যে 'একরাত্রি', 'চন্দ্রপুরের হাট', 'বনপ্রান্ত', 'পুলের ধারে', 'সন্ধ্যা', 'আষাঢ় ও শ্রাবণ', 'শরৎ ও বসন্ত', 'বোম্বায়ের রাজপথ' ইত্যাদি রচনা উল্লেখযোগ্য। বলেন্দ্রনাথের ভাবঘন কল্পনার সহিত যে সহৃদয় নাট্যকারের রসদৃষ্টির এক সার্থক সমন্বয় হইয়াছিল, তাঁহার অধিকাংশ বর্ণনামূলক প্রবন্ধগুলির দ্বারা তাহা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। এই প্রসঙ্গে 'বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রবন্ধে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য। রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন—

'বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে কোথায় কি দেখিবার, বুঝিবার, আস্বাদনের ও উপভোগের আছে, তাহা তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছে ও দেখাইতে হইয়াছে। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিশ্লেষণও করিয়াছেন ও বাহিরে দাঁড়াইয়া সমস্তটা দেখিয়াছেন। ফুলের ভিতর হইতে মধু আহরণ করিতে গিয়া বাহির হইতে ফুলের শোভাটা দেখিয়া লইতে ভুলেন নাই।'[১]

১ 'চরিত-কথা', (কলিকাতা, ১৩২০), পৃঃ ৯৯

কোন বিশেষ বিষয় বা ভাবচিত্রের উপর দৃষ্টিকে সংহত করিবার এক অনন্য-সাধারণ নাটকীয় দক্ষতার পরিচয়ে বলেন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধ সমুজ্জ্বল হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার 'চন্দ্রপুরের হাট' প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যায়। এই প্রবন্ধে হাটের বিস্তৃতি ও বিচিত্র দৃশ্যাদির মধ্যেও তোলা আদায়ের বিশেষ দৃশ্যচিত্রটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং ফলে, পল্লীর হাটের সমগ্র দৃশ্যটি তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া নিখুঁতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বলেন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর প্রবন্ধে তাঁহার বর্ণনা কৌশলের সহজ স্বচ্ছন্দ নৈপুণ্য ও নাটকীয় দৃষ্টির এক বিস্ময়কর সুক্ষ্মতা পরিলক্ষিত হয়।

বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ ও একান্ত নিবিড় ভাব-চিন্তা বা কল্পনা-মূলক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে 'সে', 'অতীত,' জানালার ধারে', 'দেয়ালের ছবি,' 'বিরহ,' 'তুজনায়,' 'হৃদয়াঞ্জলি,' 'ক্ষণিক শূন্যতা' 'নগ্নতার সৌন্দর্য্য,' 'পুরাতন চিঠি' প্রভৃতি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। বলেন্দ্রনাথের আত্মভাবমুগ্ধ নম্র-নিবিড় উষ্ণ স্পর্শোজ্জ্বল কবি-হৃদয়ের ব্যক্তিগত সুর প্রতিটি প্রবন্ধেই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার স্মৃতিবিলাসী রূপরসিক মন প্রতিটি বিষয় বা ভাবের উপর এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়াছে। জীবন্ ও জগতের সকল ক্ষেত্র হইতেই সৌন্দর্যাবিষ্কারের এক গভীর প্রবণতা বলেন্দ্রনাথের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বলেন্দ্রনাথের ভাব-চিন্তা বা কল্পনামূলক অধিকাংশ প্রবন্ধেই কল্পনার বা ভাবাবেগের প্রবলতা ও উদ্দামতার সহিত তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য-প্রবণতারও সমন্বয় রচিত হইয়াছে এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের সহায়তায় বলেন্দ্রনাথ সকল বিষয় বা ভাবের মূলগত সত্যের স্বরূপ সহজেই উদ্ঘাটন করিয়াছেন। কল্পনা-বিলাসী হইলেও তাঁহার কল্পচিত্তের মধ্য দিয়া অন্তঃসলিলা বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তাধারা প্রবহমাণ এবং সেইজন্য কল্পনা-বিলাসের সহিত তাঁহার ভাব বা চিন্তায় অর্থগত সুস্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ নিছক গদ্যে গীতিকবিতা নহে। মনুষ্য সমাজ-জীবনে সাধারণতঃ নগ্নতার কোন স্থান নাই এবং তাহা কুৎসিত ও অসুন্দর বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু সৌন্দর্যপ্রিয় বলেন্দ্রনাথ নগ্নতার মধ্যেও সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রখর সৌন্দর্যবোধের সহায়তায় এক গভীর জীবন-সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন্দ্রনাথের 'নগ্নতার সৌন্দর্য্য' প্রবন্ধ হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল—

'নগ্নতার চতুর্দ্দিকে একটা দীপ্ত লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, সেই সেই লাবণ্য-দীপ্তির মধ্যে সৌন্দর্য্যের আত্মা সন্নিবিষ্ট। নগ্ন প্রকৃতির হৃদয়ে ডুবিয়া দীর্ঘ জীবন-পথের কাতর কোলাহল আমরা যে বিস্মৃত হই, সে কেবলই এই দীপ্ত আত্মার সৌন্দর্য্যে। দূরদেশ হইতে নগ্নতার মধ্যে বিচরণ করিবার ক্ষেত্র আছে বলিয়া মনে হয় না, নয়নাতীত অতীন্দ্রিয় কিছু ঠাহরাইয়া উঠা যায় না। তাহার সৌন্দর্য্যে বিচরণ করিবার যত অবসর পাইতে থাকি, সে অনির্ব্বচনীয় রহস্য-মাধুরী মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাই, অনন্তের মুক্ত সৌন্দর্য্যসেবনে আকুল হইয়া উঠি। জীবনের মর্ম্মে মর্ম্মে সেই শুভ্র বিমল জ্যোৎস্না-নগ্নতা তড়িৎ কম্পনের মত স্পর্শ করিয়া যায়, চিরনবীন সৌন্দর্য্য-প্রবাহে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি লক্ষিত হয়। নগ্নতার সৌন্দর্য্যে প্রাণ সম্যক্ প্রস্ফুটিত।'[১]

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে অভিনব প্রবন্ধ রচনারীতি বা ধারার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, বলেন্দ্রনাথ তাহারই সার্থক অনুসরণে অথচ স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে ভূষিত হইয়া বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য-বর্ধনে যথাযোগ্য সহায়তা করিয়াছেন।

১ 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী,' (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৯), পৃঃ ২৭৪-৭৫

তৃতীয় অধ্যায়

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রবীন্দ্র-পর্বের প্রথম পর্যায়ে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ বিজ্ঞানের নীরস জটিল বিষয়কে সহজ চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে ও মনোজ্ঞ ভাষায় প্রকাশ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তত্ত্ব ও তথ্যের প্রাচুর্যে পূর্ণ হইলেও অভিনব পরিবেশনগুণে কোথাও আড়ষ্ট, দুর্বোধ্য বা অস্পষ্ট হয় নাই। রামেন্দ্রসুন্দরের সর্ববিধ প্রবন্ধই যেমন গভীর মননশীলতায় দীপ্তিময়, তেমনি কৌতুকরসের প্রসাদগুণে সরস ও উপভোগ্য হইয়াছে।

রমেন্দ্রসুন্দরের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকগণ কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রবন্ধ রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় তত্ত্ব-গভীর ও ব্যাখ্যা-নিপুণ হয় নাই। বিদ্যালয়ের ছাত্র-পাঠোপযোগিতার উদ্দেশ্যে বা সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধগত বিষয়-বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রেরণায় তাঁহারা প্রধানতঃ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন —বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের সুষ্ঠু বিচার-বিশ্লেষণে বা বিজ্ঞানের বিষয়গত বৈচিত্র্য সাধনে রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় তাঁহাদের গভীর সাধনা ও বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ছিল না। রামেন্দ্রসুন্দর স্বয়ং বিজ্ঞানসাধক ছিলেন এবং প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক সত্য-সন্ধানী মনের গভীর কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা হইতেই তাঁহার প্রবন্ধগুলি উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, প্রকৃতপক্ষে রামেন্দ্রসুন্দরই বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ও গবেষক ছিলেন। নীরস বিজ্ঞান-চর্চায় নিযুক্ত থাকিয়াও রামেন্দ্রসুন্দর এক দুর্লভ সাহিত্যিক মনের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-গুণসমৃদ্ধ ও সরস কৌতুকোজ্জ্বল রচনাভঙ্গি দ্বারা জটিলতম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও সাধারণের নিকট সহজ ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিবিধ বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের সুগভীর অনুরাগ, বিস্তৃত অধ্যয়ন

ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক দুরূহ তত্ত্ব সম্পর্কিত প্রবন্ধ রচনা করিয়াই রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং শেষ পর্যন্ত এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনা-কর্মেই তিনি অসাধারণ সফলকাম হইয়াছিলেন। যদিও রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান ব্যতীত দর্শন, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও জীবন-চরিতমূলক প্রবন্ধাদিও রচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের তুলনায় তাহা সংখ্যায় নগণ্য। রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের দর্শন এবং বিজ্ঞানের এক অপরূপ সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ, তাঁহার দার্শনিক প্রবন্ধসমূহে ভারতীয় দর্শনের বিশিষ্ট চিন্তাধারা ও তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক চিন্তার আলোকে অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যথাসম্ভব চিত্তাকর্ষক রচনাপ্রণালী আবিষ্কার করিয়া দর্শন ও বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বসমূহ পরিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দর যে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সাহিত্য-রসসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার প্রবন্ধগুলি হইতে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' মাসিক পত্রে প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা দ্বারা রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত হয়। পরবর্তী কালে তিনি 'জন্মভূমি,' 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', 'বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়)', 'প্রদীপ', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি বিশিষ্ট পত্রিকাসমূহে বিচিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং এই প্রবন্ধগুলিই পরে তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থ যথাক্রমে : ১। 'প্রকৃতি' (১৮৯৬), ২। 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪), ৩। 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬), ৪। 'মায়া-পুরী' (১৯১১), ৫। 'কর্ম্ম-কথা' (১৯১৩), ৬। 'চরিত-কথা' (১৯১৩), ৭। 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' (১৯১৪), ৮। 'শব্দ-কথা' (১৯১৭), ৯। 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০), ১০। 'যজ্ঞ-কথা' (১৯২০), ১১। 'নানা কথা' (১৯২৪) ও ১২। 'জগৎ-কথা' (১৯২৬) প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রামেন্দ্রসুন্দরের 'মায়া-পুরী' প্রবন্ধটি পরবর্তী কালে তাঁহার 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে স্থান লাভ করিয়াছে এবং 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' গ্রন্থটি রামেন্দ্রসুন্দর কর্তৃক বিবৃত ও অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত কর্তৃক নিজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে রামেন্দ্রসুন্দরের সমগ্র রচনা 'রামেন্দ্র-রচনাবলী' নামে ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান-নির্ভর বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ-সাহিত্যেরই একজন কৃতী শিল্পী। তথ্য বা তত্ত্বের সুসঙ্গত সমাবেশে এবং বিশ্লেষণী বুদ্ধির দীপ্তি ও সহাস্য-সুন্দর ব্যক্তিত্বের স্পর্শে তাঁহার প্রতিটি প্রবন্ধই ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। মানবীয় জ্ঞানবৃত্তির এক গভীর প্রেরণাবশেই রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা-কর্মে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। পূর্ববর্তী পর্বের প্রবন্ধকারগণের ন্যায় তাঁহার প্রবন্ধ রচনার ভিত্তিমূলে প্রত্যক্ষ সমাজ ও স্বদেশের কল্যাণ-চিন্তাই একমাত্র বা মুখ্য প্রেরণা স্বরূপ ছিল না। বিশুদ্ধ জ্ঞানস্পৃহা ও গভীর জ্ঞানানুশীলনই প্রধানতঃ রামেন্দ্রসুন্দরকে জগৎ ও জীবনের সকল বিষয়ের প্রতি কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু করিয়া তুলিয়াছিল। বিশ্বজগতের সর্ববিধ বস্তুকে তীক্ষ্ণ জ্ঞানের কষ্টিপাথরে বিচার করিবার এক দুর্দমনীয় মানস-প্রবণতা রামেন্দ্রসুন্দরের পূর্বে অপর কোন লেখকের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। রামেন্দ্রসুন্দর এই দুর্লভ জ্ঞানবৃত্তি বা বৈজ্ঞানিক মানসের অধিকারী ছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর বাংলাদেশের বিজ্ঞানানুরাগী বিশিষ্ট মনীষিগণের অন্যতম। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-জগতে মুখ্যতঃ কয়েকজন ইউরোপীয় বিজ্ঞানসাধকের অভিনব চিন্তা বা মতবাদ এক যুগান্তকারী আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। ডারউইন, ক্লিফোর্ড, হেলম্‌হোলৎজ, কেল্‌ভিন, লাপ্লাস, হাক্স্‌লী প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞান-বিশারদগণ নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষের চিন্তারাজ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। বিশ্বপ্রকৃতির বহু বিচিত্র রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটনে এই সকল বৈজ্ঞানিকের অক্লান্ত সাধনা বিজ্ঞানপ্রিয় মানুষ মাত্রকেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তিনি পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণ প্রবর্তিত মতবাদ বা তত্ত্বাদির ভিত্তিতেই তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসমূহ রচনা করিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের প্রথম সংকলনগ্রন্থ 'প্রকৃতি'। 'ভূ-বিদ্যা', 'জীব-বিদ্যা', 'জ্যোতির্বিদ্যা' প্রভৃতি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক চৌদ্দটি প্রবন্ধ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'প্রকৃতি'র প্রবন্ধগুলি মুখ্যতঃ চার্লস্‌ রবার্ট ডারউইন, টমাস্‌ হেনরী হাক্স্‌লী, উইলিয়ম কিংডন ক্লিফোর্ড প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতবাদ এবং তাঁহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্যাদি অবলম্বন করিয়া লিখিত। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সাধারণতঃ জটিল ও দুরূহ এবং অপেক্ষাকৃত নীরস হয়।

রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ আশ্চর্য-সুন্দর সরস ও উপভোগ্য হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন এবং সেইজন্য তাঁহার বিজ্ঞান-পরিশীলিত বুদ্ধির দ্বারা প্রাকৃত জগতের নিগূঢ় মর্ম-রহস্য সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্যাদি গভীরভাবে অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 'প্রকৃতি' গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহ অর্থাৎ 'সৌরজগতের উৎপত্তি', 'আকাশ-তরঙ্গ', 'পৃথিবীর বয়স', 'জ্ঞানের সীমানা', 'প্রাকৃত সৃষ্টি', 'প্রকৃতির মূর্ত্তি'. 'প্রলয়' প্রভৃতি প্রবন্ধ হইতে তাঁহাব বৈজ্ঞানিক চিন্তা বা উপলব্ধির সার্থকতা প্রমাণিত হয়। এই সকল প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর যদিও তাঁহার কোনও মৌলিক আবিষ্কৃত তত্ত্ব-চিন্তার পরিচয় প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ও সরস ব্যাখ্যার চমকপ্রদ নৈপুণ্যে প্রবন্ধগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধগত বিষয়ের জটিলতা তাঁহার কৌতুক-সুন্দর সাহিত্যিক রচনাকৌশলে সহজ স্বচ্ছতায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির সৃষ্টি সম্পর্কিত অর্থাৎ সৌরজগতের সমুদয় খুঁটিনাটির উৎপত্তি সংক্রান্ত তত্ত্ব-গভীর জটিল বিবরণ রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার প্রবন্ধে অতি সুবিন্যস্তভাবে ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার 'প্রাকৃত সৃষ্টি' প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'সূর্য্যমণ্ডলে স্থূলতঃ পার্থিব উপকরণই বর্ত্তমান; পার্থিব মশলাতেই সূর্য্যমণ্ডল নির্ম্মিত। সূর্য্য একটা প্রকাণ্ড তপ্ত ভয়াবহ পৃথিবী। তারাগুলাও তাই। সেই সকল উপকরণেই নির্ম্মিত। কোনটায় কোন দ্রব্য অধিক আছে, কোনটায় অল্প আছে, এইমাত্র প্রভেদ; কোনটা একটু বেশী গরম, কোনটা একটু কম গরম, এই পর্য্যন্ত প্রভেদ। আর নীহারিকা কি? নীহারিকা বস্তুতঃ নীহারিকা মাত্র; তাহাতেও পার্থিব উপকরণই বিদ্যমান; কিন্তু এখনও উহা জমে নাই; এখনও লোহা দস্তা কয়লা যাহা কিছু সেখানে আছে, সবই বায়ুর আকারে আছে, কালে জমিয়া যাইবে।'[১]

'প্রকৃতি' ব্যতীত 'বিচিত্র জগৎ' ও 'জগৎ-কথা' এই গ্রন্থদ্বয়ও রামেন্দ্রসুন্দরের বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলনেও কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'বিচিত্র জগৎ'-এর প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়া রামেন্দ্রসুন্দরের এক অভিনব

১ 'রামেন্দ্র-রচনাবলী' ১ম খণ্ড, (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৬), পৃঃ ৩৭

দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। বিজ্ঞানজগতের 'একটা মনগড়া আদর্শ বা মডেল মাত্র'কে ভিত্তি করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ যে জগতের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাই বিজ্ঞান-জগত। বৈজ্ঞানিক সৃষ্ট এই জগতে জড় ও জীবের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও চেতন বস্তুর স্বরূপ-ধর্ম অর্থাৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দরের বিচারনিষ্ঠ সরস আলোচনাই মুখ্যতঃ 'বিচিত্র জগৎ'-এর বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 'বিজ্ঞান-বিদ্যায় বাহ্য জগৎ', ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ', 'বাঙ্ময় জগৎ,' 'জড় জগৎ' প্রভৃতি প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক সৃষ্ট জগতের বিচিত্র গতি-প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। 'বিজ্ঞান-বিদ্যায় বাহ্য জগৎ' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর দুই প্রকার জগৎ অর্থাৎ ব্যাবহারিক জগৎ ও প্রাতিভাসিক জগৎ-এর স্বরূপ নির্ণয়ে অগ্রসর হইয়াছেন। বিজ্ঞান-বিদ্যা যে কেবলমাত্র ব্যাবহারিক জগতের রূপ-রহস্য অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত, রামেন্দ্রসুন্দর 'বিচিত্র জগৎ'-এর প্রবন্ধসমূহে তাহারই সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ' প্রবন্ধটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে প্রাতিভাসিক জগৎ প্রতি মানুষের নিজস্ব জগৎ, তাহা প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষলব্ধ। এই প্রত্যক্ষ প্রাতিভাসিক জগতের যে অংশকে সর্বসাধারণের সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তাহাই বাহ্য জগৎ। যখন তাহা সকলের, তখন তাহা কাহারও ব্যক্তিগত বা নিজস্ব নহে; অর্থাৎ কাহারও আন্তরও নহে, সকলেরই বাহ্য। মানুষের পারস্পরিক আদান-প্রদানের জন্য, পরস্পর ব্যবহারে জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সাধনের জন্য তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, অতএব তাহা ব্যাবহারিক জগৎ। রামেন্দ্রসুন্দর এই দুই জগতের স্বরূপ ব্যাখ্যায় যে সাহিত্যিক উপমা-অলংকার অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা যেমন অভিনব, তেমনি বক্তব্য বিষয়ের জটিল-গ্রন্থি উন্মোচনেও বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার 'ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ' প্রবন্ধ হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল—

'ব্যাবহারিক জগৎ যেন একখানা drama ;—উহার একটা Plot আছে, একটা end আছে, গোড়ায় একটা design আছে,—অঙ্কের পর অঙ্ক, একটা উদ্দেশ্য Purpose লইয়া আসে, কেহই নিরর্থক আসে না। আর প্রাতিভাসিক জগৎ যেন একটা Epic poem ; ঘটনাবহুল উচ্ছৃঙ্খল ; সর্ব্বত্রই একটা উলটপালট, বিপর্য্যয় ও বিপ্লবের কাণ্ড। দেখিলে তাক্ লাগে ; হাসিতে

হয়; কাঁদিতে হয়; অভিভূত হইতে হয়; পুলকিত হইতে হয়; - কিন্তু কোথায় কি উদ্দেশ্যে চলে, তাহা বলা যায় না।'[১]

'জগৎ-কথা' নামক সংকলনগ্রন্থেও রামেন্দ্রসুন্দরের বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সংক্রান্ত পঁচাত্তরটি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই পদার্থ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশের সংক্ষিপ্ত অথচ সরস আলোচনা। কয়েকটি প্রবন্ধে রামেন্দ্র-সুন্দর প্রাথমিক রসায়ন-বিদ্যারও আলোচনা করিয়াছেন। ইংরাজীতে Matter অর্থে সকল কিছুই, অর্থাৎ চুনা-পাথর হইতে জীব-দেহ পর্যন্ত সমস্তই জড় হিসাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণ অবলম্বিত ইংরাজী Matterকেই জড় অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন—ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ব্যাখ্যানুমোদিত জড় শব্দ তাঁহার আলোচনায় গৃহীত হয় নাই। 'জগৎ-কথা' যদিও রামেন্দ্রসুন্দরের পরিণত বয়সের রচনা, কিন্তু এই গ্রন্থের কোনও প্রবন্ধের মধ্য দিয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির গভীরতা বা অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয় না।

রামেন্দ্রসুন্দর কেবলমাত্র বিজ্ঞানের দুরূহ ও জটিল তত্ত্বালোচনার মধ্যেই তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করেন নাই। অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁহার পাণ্ডিত্য বা জ্ঞানের বহুমুখী বিস্তার ও গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিদৃশ্যমান্ বাহ্য জগতের সকল বিষয়ের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের এক গভীর কৌতূহল ছিল এবং প্রতি বিষয়েই অখণ্ড জ্ঞানার্জনের এক অদম্য প্রয়াস তাঁহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বিচিত্র বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানবৃত্তি বা বিদ্যাবত্তার অধিকার স্থাপন করিতে গিয়া তিনি বহুল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাননির্ভর ব্যাবহারিক সত্যের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেন নাই। বৈজ্ঞানিক সত্য যে চরম বা শাশ্বত সত্য নহে, এই সংশয় হইতেই তাঁহার মনে বিবিধ প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয় এবং তাহার পর হইতেই রামেন্দ্রসুন্দর দর্শন-শাস্ত্রানুমোদিত পথে মূল সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। দার্শনিক-চিন্তাপুষ্ট প্রবন্ধগুলি দ্বারা তাঁহার সত্য-সন্ধানী মন ও অন্তর্ভেদী ঋজু-দৃষ্টির পরিচয় লাভ করা যায়। বিজ্ঞানের পর দর্শন বিষয়ক আলোচনাতেই রামেন্দ্রসুন্দরের মনীষা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। সরস বর্ণনাভঙ্গি ও দুর্লভ শিল্পকুশলতায় তাঁহার দার্শনিক প্রবন্ধগুলিও সমৃদ্ধ হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠা, দার্শনিক প্রজ্ঞা ও সাহিত্যিক রস-গভীরতায় রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিটি প্রবন্ধই পরিপুষ্ট হইয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

[১] 'রামেন্দ্র-রচনাবলী' ৩য় খণ্ড, (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৬), পৃঃ ২৪৪-৪৫

রামেন্দ্রসুন্দরের 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থটি মুখ্যতঃ তাঁহার দার্শনিক প্রবন্ধের সমষ্টি। কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও এই সংকলনে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। চরম সত্যরূপের আবরণ উন্মোচনে, অজ্ঞাত রহস্যপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞানার্জনের প্রয়াসে এক অনন্ত জিজ্ঞাসা রামেন্দ্রসুন্দরকে সদাজাগ্রত ও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁহার অনন্ত কৌতূহলী মনের অসংখ্য প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রেও রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার জিজ্ঞাসা-কাতর ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন—

'পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব নিয়তির বিধানে আবর্ত্তসঙ্কুল জলপ্রবাহের উপবিস্তবে ক্ষণে ক্ষণে ভাসিয়া উঠে, বুঝিতে পারি ; জগন্নিয়ন্তার কোন্ নিয়মে তাহা স্বকার্য্যসাধন অসমাপ্ত রাখিয়া বুদ্বুদের মত অন্তর্হিত হয়, তাহা বুঝিলাম না।***জীবনদাতা, পিপাসামাত্র সম্বল দিয়া জীবনের পথে প্রেরণ করিয়াছিলে ; এই জিজ্ঞাসা সেই পিপাসারই মূর্ত্তিভেদ।[১]

'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থটি রামেন্দ্রসুন্দরের অনন্ত জ্ঞান-পিপাসারই যে অন্যতম পরিচয়, তাহা এই গ্রন্থে সংযোজিত প্রতিটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা যায়। জগতে ও জীবনে প্রচলিত কোন সত্য বা তত্ত্বকে তিনি কখনই অন্ধভাবে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক মন সকল বিষয়েরই গহনতম প্রদেশে অনুপ্রবেশ করিয়া যুক্তিসম্মত প্রকৃত সত্য-জ্ঞানানুসন্ধানে নিয়োজিত হইয়াছে। বাহ্যজগতে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব বা সত্যের পশ্চাতে অন্য কোন মৌলিক তত্ত্ব বা শাশ্বত সত্যের অস্তিত্ব বর্তমান কিনা, এই কৌতূহল বা জিজ্ঞাসাই রামেন্দ্রসুন্দরের 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধেরই মূল সুর।

রামেন্দ্রসুন্দর যেমন বিজ্ঞানানুরাগী, তেমনি একজন ভাববাদী দার্শনিকও ছিলেন। তাঁহার মধ্যে বিজ্ঞান ও দর্শন-চেতনার সম্যক্ পরিস্ফূর্তি লক্ষ্য করা যায়। জগতের বিচিত্র রহস্যের স্বরূপ নির্ণয়কল্পে রামেন্দ্রসুন্দর যেমন বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছেন, তেমনি দর্শন-শাস্ত্র হইতেও মীমাংসা-সূত্র আবিষ্কার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু উভয় বিদ্যার কোনটি দ্বারাই জাগতিক রহস্যের সার্থক মীমাংসা বা সমাধান সম্ভব হয় নাই। জগতের রহস্যময় রূপ-প্রকৃতি যুগে

১ 'জিজ্ঞাসা', (কলিকাতা, ১৩৫৩), পৃঃ ৶০-।০

যুগে বিশ্বের বিভিন্ন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মনীষীর চিত্ত ও চিন্তারাজ্য আচ্ছন্ন করিয়াছে। জগতের রূপ ও রহস্যের আদি কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব বা মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর সেই বৈজ্ঞানিক এবং বিশেষতঃ দার্শনিক মতবাদগুলিকে সংকলন করিয়া জগতের মূল অর্থাৎ চিরন্তন সমস্যাসমূহই অভিনবভাবে উপস্থাপনা করিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দর্শনেই তুল্য পারদর্শী ছিলেন। 'সুখ না দুঃখ ?', 'জগতের অস্তিত্ব', 'আত্মার অবিনাশিতা', 'এক না দুই ?' 'প্রতীত্য-সমুৎপাদ', 'মুক্তি' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁহার দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্যানুসন্ধানী মনন-চিন্তার গভীরতা লক্ষ্য করা যায়। জগতে সুখ অধিক না দুঃখ অধিক—এই প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে রামেন্দ্রসুন্দর 'সুখ না দুঃখ ?' নামক প্রবন্ধে বিভিন্ন মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত এই বিষয়ে যে কোন সুষ্ঠু সমাধান পাওয়া যায় না, তাহাও তাঁহার প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দরের কৃতিত্ব এই যে, নীরস জটিল দার্শনিক তত্ত্বসমূহ তাঁহার ঘরোয়া সংলাপাত্মক ভঙ্গিতে পরিবেশনের ফলে সহজবোধ্য ও রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। ডারউইনের অভি-ব্যক্তিবাদ, সোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যানের দুঃখবাদ, ভারতীয় দার্শনিকদিগের মুক্তিবাদ বা নির্বাণবাদ এবং সাহিত্যিক বা কবিগণের পরস্পরবিরোধী মতবাদসমূহের বিস্তৃত আলোচনায় রামেন্দ্রসুন্দরের 'সুখ না দুঃখ ?' প্রবন্ধটি সমৃদ্ধ হইয়াছে।

'জগতের অস্তিত্ব' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর দার্শনিক সমাজে জগতের স্থিতি বা রূপাবয়ব সম্পর্কে যে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে, তাহারই সুষ্ঠু ব্যাখ্যাপ্রদানে প্রয়াসী হইয়াছেন। দার্শনিকগণের এক সম্প্রদায়ের অভিমত এই যে, জগতের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের মতে তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক বা মায়া মাত্র। জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে স্বভাবতঃই তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় এবং দার্শনিকগণ জগৎকে বিশ্লেষণ করিয়া দুইটি অংশ স্থির করিয়াছেন। প্রথম অংশ 'আমি' এবং দ্বিতীয় অংশ 'আমি' ব্যতীত অন্যসকল বস্তু। 'আমার' অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, তাহা হইলে অন্য কাহারও অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে না। 'আমি' ব্যতীত জগৎ সম্পর্কেও মতান্তরের অবধি নাই। বাহ্যজগত প্রসঙ্গেও বহু মতভেদ বর্তমান।

কারণ, তাহাও সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষগোচর নহে। জড় জগত যে সদ্বস্তু (Noumenon) বা Thing-in-itself নহে, তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দার্শনিক সম্প্রদায়ই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু জড় জগৎ-রূপ দৃশ্যমান্ মায়াপটের অন্তরালে যে সৎ পদার্থ অর্থাৎ অজ্ঞেয়, অব্যক্ত প্রকৃতি বর্তমান, তাহাও কেহ কেহ স্বীকার করিয়া থাকেন—সাধারণ্যে এই দার্শনিক মত দ্বৈতবাদ নামে আখ্যাত হইয়াছে। সৎ পদার্থ বা সদ্বস্তু দুই—উভয়ই অনির্দেশ্য ও অজ্ঞেয়—একের নাম পুরুষ বা আত্মা বা জ্ঞ, অপরের নাম প্রকৃতি বা জ্ঞেয়। কিন্তু এই দ্বৈতবাদও সর্বজন সমর্থিত হয় নাই। বেদান্ত মতে 'ব্রহ্ম'ই এক এবং অদ্বিতীয় সদ্বস্তু। কিন্তু ইহার স্বরূপ অর্থাৎ আনন্দ-স্বরূপের প্রকাশ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা থাকিয়া যায়। অতএব জগতের অস্তিত্ব বিষয়ে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ হইতে লাভ করা যায় না।

রামেন্দ্রসুন্দরের 'আত্মার অবিনাশিতা' প্রবন্ধটি আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনশ্বরত্ব সম্পর্কিত আলোচনা। হিন্দু ও অহিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মতামত একত্র করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর তাহা সর্বসাধারণের উপযোগী ও মনোজ্ঞ ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে, প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে দেহাতিরিক্ত পদার্থ অর্থাৎ আত্মা বর্তমান। সেই পদার্থ দেহান্তেও পৃথক্ হইয়া বর্তমান থাকে এবং আত্মাই পরিশেষে জীবের সুখ দুঃখ ভোগ করে। অন্য সম্প্রদায় আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সুতরাং, ইহার অবিনাশিতা সম্পর্কেও কোন প্রশ্ন উঠে না। প্রাচীন কালে ভগবান বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন এবং আধুনিক কালেও হিউম্ হইতে হাক্স্‌লি প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। আত্মার অস্তিত্ব ও ইহার অবিনাশিতা প্রমাণ করিতে রামেন্দ্রসুন্দর বহু স্বপক্ষীয় ও বিরোধী পক্ষের বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন এবং বিবিধ যুক্তির সমাবেশে বক্তব্য বিষয়ের সত্যতা নিষ্পন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু মূল প্রশ্নের চরম মীমাংসা বা সমাধান অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। 'এক না দুই?' প্রবন্ধেও ব্রহ্ম ও জীবের ভিন্নত্ব বা অভিন্নত্ব বিবিধ দার্শনিক মতামত সংকলন করিয়া আলোচিত হইয়াছে। মূল প্রশ্নের স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের যুক্তি-তর্ক বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার এই প্রবন্ধের একাংশে লিখিয়াছেন—

'আমিই ব্রহ্ম ও আমিই জীব—যে জ্ঞাতা, সেই জ্ঞেয়—দুইই এক – একমেবাদ্বিতীয়ম্। অতএব এক না দুই এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব যে, এক—বই দুই নাই। সেই এক আমি। সেই আমি কে? বলিতে পারি না।'[১]

রামেন্দ্রসুন্দর অদ্বৈতবাদকে স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই। তাঁহার বিভিন্ন দার্শনিক প্রবন্ধে এইরূপ জিজ্ঞাসা-কাতর মনের পরিচয়ই প্রকাশিত হইয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের বিশুদ্ধ দার্শনিক প্রবন্ধেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যাদির সুসঙ্গত সমাবেশ হইবার ফলে বক্তব্য বিষয় অধিকতর সহজ ও প্রাঞ্জল হইয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'সৌন্দয্য-তত্ত্ব' ও 'সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি' প্রবন্ধদ্বয়ে রামেন্দ্রসুন্দর সৌন্দর্য-তত্ত্ব বা বোধের ব্যাখ্যায় মুখ্যতঃ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যাদিরই আশ্রয় লইয়াছেন। এই প্রবন্ধদ্বয় হইতে তাঁহার দুইটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির সহিত পরিচয় লাভের সুযোগ হয়। সৌন্দর্যবোধ ব্যক্তি বা সমাজ-জীবনের অগ্রগতি ও পরিপুষ্টি সাধনের অর্থাৎ মনুষ্যত্বের অপরিহার্য অঙ্গ। 'সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব' নামক প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ডারউইন প্রবর্তিত প্রাকৃতিক নিবাচন ও যৌন-নির্বাচন-তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া সৌন্দর্যবোধের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি' প্রবন্ধে তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ত্বকেই সৌন্দর্যবোধের একমাত্র ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। সৌন্দর্য-বুদ্ধি, বিশেষতঃ সূক্ষ্ম সৌন্দর্যচেতনা যে ডারউইনের মতবাদ দ্বারা চূড়ান্তভাবে বিচায নহে, তাহা শেষ পর্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দর স্বীকার করিয়াছেন। এবংবিধ জটিল তত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনা হইতে রামেন্দ্রসুন্দরের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও রসবোধের গভীরতা প্রমাণিত হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ও বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক হইলেও বিজ্ঞান প্রতিপাদিত তত্ত্ব বা সত্যকে চরম তত্ত্ব বা ধ্রুব সত্য হিসাবে স্বীকার করেন নাই। 'সত্য' 'অতিপ্রাকৃত—প্রথম প্রস্তাব,' 'অতিপ্রাকৃত—দ্বিতীয় প্রস্তাব,' 'মাধ্যাকর্ষণ,' 'নিয়মের রাজত্ব,' 'মায়া-পুরী,' 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' প্রভৃতি প্রবন্ধে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা সত্যের অবতারণা করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর তাহাদের বিচার-বিশ্লেষণে প্রয়াসী হইয়াছেন। 'সত্য' প্রবন্ধে তিনি

১ 'জিজ্ঞাসা', (কলিকাতা, ১৩৫৩), পৃঃ ১৬৫

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা সত্যের পরিধি সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞানের সত্য যে নিরপেক্ষ সত্য, পূর্ণ সত্য বা ধ্রুব সত্য নহে, তাহা বিভিন্ন সময়ে বহু বৈজ্ঞানিক সত্যের পরিবর্তন বা অসারতা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এক কালে সত্য বলিয়া প্রচারিত, অথচ পরবর্তী কালে মিথ্যা বা অসার প্রতিপন্ন হইয়াছে, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধে এবংবিধ বহু বৈজ্ঞানিক সত্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ জড় পদার্থের ধ্বংস নাই, এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু ইলেকট্রন আবিষ্কারের পর সেই সত্যের ভিত্তি শিথিল হইয়াছে। অতএব বিজ্ঞান যে নিছক ভূয়োদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিজ্ঞান-জাত সত্য যে পূর্ণ সত্য নহে, আংশিক সত্য, তাহা রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধে সরস ও সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'সত্য' নামক প্রবন্ধের একাংশে রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন—

'ভূয়োদর্শন ভূয়োদর্শন মাত্র; ভূয়ঃ শব্দের অর্থ ভূয়ঃ, চির নহে। ভূয়োদর্শন বহুকাল ব্যাপিয়া দর্শন ও বহু দেশ ব্যাপিয়া দর্শন; উহা চিরকাল ব্যাপিয়া দর্শন বা সর্ব্বদেশ ব্যাপিয়া দর্শন নহে। চিরের সহিত তুলনায়, সর্ব্বের সহিত তুলনায়, ভূয়ঃ ও বহু নগণ্য মাত্র! উভয়ের তুলনা হয় না।'[১]

বৈজ্ঞানিক সত্য মানুষকে শাশ্বত বা চিরন্তন সত্যের সন্ধান দান করিতে যে অক্ষম, রামেন্দ্রসুন্দর তাহা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বিজ্ঞানের সত্য কেবলমাত্র ব্যাবহারিক সত্য জীবনধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মানিয়া লওয়া সত্য। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার অধিকাংশ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধেই বৈজ্ঞানিক সত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তাহা অতি মনোজ্ঞভাবে পরিবেশন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'আমরা দশজনে মিলিয়া প্রত্যেকের বিশিষ্ট অংশ বর্জন করিয়া যে সাধারণ অংশটুকুমাত্র গ্রহণ করিয়া জগতের যে রূপ কল্পনা করি, বিজ্ঞানবিদ্যা কেবল সেই রূপেরই আলোচনা করে এবং তাহারই বিবরণ দিবার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানের আলোচিত বিশ্বজগৎ প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রত্যেকের পরিদৃশ্যমান প্রত্যক্ষ জগৎ হইতে ভিন্ন; বিজ্ঞানবিদ্যার জগৎ প্রকৃতপক্ষে

১ 'জিজ্ঞাসা,' (কলিকাতা, ১৩৫৩), পৃঃ ১৫

মানবসাধারণের জন্য কল্পিত একটা কাল্পনিক জগৎ; উহার কোনরূপ পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই বা থাকিতে পারে না।'[১]

রামেন্দ্রসুন্দরের রচনারীতির প্রসাদগুণে ও সরসতায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি-তত্ত্বের ন্যায় দুরূহ বৈজ্ঞানিক বিষয়ও সুখপাঠ্য ও সাহিত্য-গুণান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। 'মাধ্যাকর্ষণ' নামক প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর মহাকাশে গ্রহ-উপগ্রহাদির আবর্তনের পশ্চাতে যে নিয়ম বা শক্তি বর্তমান, তাহা কোপর্নিকস, কেপলার দেকার্তে, নিউটন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্যাদির ভিত্তিতে সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মাধ্যাকর্ষণের বশবর্তী হইয়া গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড সূর্যমণ্ডল ও সৌরজগতকে আবর্তন করে বটে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ কেন হয়-এই প্রশ্নের সদুত্তর রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধে পাওয়া যায় না এবং তিনি এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন। তাঁহার 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধেও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়মের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের বক্রোক্তি সংযোজনার নৈপুণ্যে তাঁহার অধিকাংশ নীরস বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ সরস ও পরিহাসোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। জটিল বক্তব্য বিষয়ও রামেন্দ্রসুন্দরের তীক্ষ্ণ শাণিত কৌতুকহাস্যের প্রসন্ন দ্যুতিতে ভাস্বর হইয়াছে। হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে তত্ত্ব বা তথ্য-সমৃদ্ধ বিষয় আলোচনার এক বিরল শক্তি রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বাংলা সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দরই প্রথম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধে বিশুদ্ধ হাস্যরসের সার্থক প্রযোগ করিয়াছেন। দুরূহ বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাও কিরূপ চিত্তাকর্ষক ও রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে, রামেন্দ্রসুন্দরের 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটি তাহার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। তাঁহার 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধ হইতে উদাহরণ স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'আরে মূর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝিলে না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে বা মন্ত্রদাতা গুরুও নহে; গুরু অর্থে অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী। লোহা গুরু, তার অর্থ এই যে লোহা বায়ু অপেক্ষা গুরু, জল অপেক্ষা গুরু; কাজেই বায়ু মধ্যে কি জল মধ্যে রাখিলে

১ 'জিজ্ঞাসা,' (কলিকাতা, ১৩৫৩), পৃঃ ৪১৮

লোহা না ভাসিয়া ডুবিয়া যায়। আর লোহা পারার অপেক্ষা লঘু; সমান আয়তনের লোহা ও পারা নিকতিতে ওজন করিলে দেখিবে, কে লঘু, কে গুরু। পারা অপেক্ষা লোহা লঘু, সেজন্য লোহা পারায় ভাসে।'[১]

সুমার্জিত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, গভীর বোধশক্তি ও কৌতুকোজ্জ্বল সহজ রচনারীতির প্রসাদগুণে 'জিজ্ঞাসা'র প্রবন্ধসমূহ সরস ও প্রাণবন্ত হইয়াছে। প্রতিটি প্রবন্ধই রামেন্দ্রসুন্দরের জিজ্ঞাসু মনের পরিচয়বাহী হইয়া গ্রন্থের 'জিজ্ঞাসা' নামকরণ সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। অতিকথন বা পুনরুক্তির ফলে 'জিজ্ঞাসা'র কোন কোন প্রবন্ধ ত্রুটিপূর্ণ হইলেও পরিবেশননৈপুণ্যে তাহা কোথাও ক্লান্তিকর বা মন্থরগতি হয় নাই।

রামেন্দ্রসুন্দরের 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থটি মুখ্যতঃ তাঁহার দার্শনিক মনীষার এক বিস্ময়কর পরিচয় প্রকাশ করিয়াছে। সংলাপাত্মক সরস বাগ্‌ভঙ্গি এবং ভাষাগত সৌষ্ঠব ও প্রাঞ্জলতাগুণে 'জিজ্ঞাসা'র প্রবন্ধগুলি তৎকালীন বিদ্বজ্জন সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, জার্মান ভাষায় অনূদিত হইয়া গ্রন্থটি তৎকালে বিদেশেও প্রচারিত হইয়াছিল।

রামেন্দ্রসুন্দরের গভীর দার্শনিক প্রজ্ঞার পরিচয় তাঁহার 'যজ্ঞ-কথা'র প্রবন্ধগুলি হইতেও লাভ করা যায়। বৈদিক দর্শনে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও মননশীলতা দ্বারা ভারতবর্ষের এক সুগম্ভীর মহিমময় মূর্তি নূতনভাবে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। 'যজ্ঞ-কথা'র বিভিন্ন প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর পৌরাণিক বেদপন্থী যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ', 'সোম-যাগ', 'পুরুষ-যজ্ঞ' প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রামেন্দ্রসুন্দর মানুষের জীবন-ধর্ম ও সামাজিক বিবিধ কর্মে মানুষের বিচিত্র ভূমিকা সম্পর্কেও কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধ তাঁহার 'কর্ম-কথা' গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় কর্মবাদই তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এবং রামেন্দ্রসুন্দর পাশ্চাত্ত্য সমাজ-বিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক যুক্তির সহায়তায় মানবজীবনের অস্তিত্ব-রক্ষা ও তাহার বহুমুখী কর্মধারার বিস্তৃত পরিচয়ই তাঁহার প্রবন্ধসমূহে প্রকাশ করিয়াছেন। মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিচিত্র কর্মপ্রবাহের

১ 'জিজ্ঞাসা', (কলিকাতা, ১৩৫৩), পৃঃ ২৭৩

মধ্য দিয়া মানবজীবনের যে বিস্ময়কর অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, রামেন্দ্রসুন্দরের 'জীবন ও ধর্ম্ম', 'স্বার্থ ও পরার্থ', 'ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি', 'আচার', 'ধর্ম্মের প্রমাণ', 'ধর্ম্মের জয়' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর জীবন-দর্শনের ক্ষেত্রেও ডারউইনের মতবাদকে অভিনবভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং মানুষের জীবন যে যথাযথ সামঞ্জস্য স্থাপনের এক বিশিষ্ট প্রয়াস মাত্র—পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্‌সারের এই প্রচারিত ব্যাখ্যাও তাঁহার ডারউইন-তত্ত্বানুসারী চিন্তার পরিপুষ্টি সাধনে অধিকতর সহায়ক হইয়াছে। 'কর্ম্ম-কথা'র প্রবন্ধসমূহে ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিত্ববোধ, তাহার কর্মগত স্বাধীনতা এবং সামাজিক চৈতন্য প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে যে অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে পরিলক্ষিত হয় নাই।

মানুষ যে কর্মাধীন ও বিভিন্ন কর্মের মধ্য দিয়াই যে তাহার অগ্রগতি এবং কর্মত্যাগ যে মানুষের মৃত্যু স্বরূপ অর্থাৎ কর্মত্যাগের কোন অধিকারই যে মানুষের নাই, 'কর্ম্ম-কথা' গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর মুখ্যতঃ তাহাই অতীব নৈপুণ্যসহকারে প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তিনি বেদপন্থী সমাজ-ধর্মের মূলে কর্মবাদের যে নিগূঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহার উপরও আলোকসম্পাত করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে 'যজ্ঞ' নামক প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন---

'ত্যাগই ভোগ—অতএব ত্যাগ দ্বারাই জীবের জীবত্বের সার্থকতা এবং ত্যাগাত্মক ধর্ম্মই ধর্ম্ম। এই ভিত্তির উপর বেদপন্থীর ধর্ম্মশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। জীবের পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগ করিবার উপায় নাই। অতএব "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"—কর্ম্ম করিতে করিতেই শতায়ুঃ হইবার ইচ্ছা করিবে।'[১]

বেদপন্থীর ধর্মশাস্ত্রে, মুখ্যতঃ 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'য় কর্মবাদের বিস্তৃত আলোচনা আছে। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের মতে বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে অনৈক্য বা বিরোধ বর্তমান; কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর তাহার বিরোধিতা করিয়া দৃঢ়তার সহিত প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে মূলগত কোন বিরোধ নাই; বরং এক সমন্বয়ের সূত্রে ইহারা পরস্পর সংযুক্ত এবং এই সমন্বয়ের সুষ্ঠু ব্যাখ্যাই 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'য় পরিলক্ষিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের 'কর্ম্ম-কথা'র

১ 'রামেন্দ্র-রচনাবলী' ২য় খণ্ড, (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৬), পৃঃ ১৭৪

প্রবন্ধগুলি আত্যন্ত যুক্তির সুসংগতিতে ও বিষয়-বিন্যাসের নিপুণ কৌশলে মনোজ্ঞ ও উপভোগ্য হইয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার 'চরিত-কথা' গ্রন্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, হর্ম্মান হেলম্‌হোলৎজ প্রমুখ দেশী ও বিদেশী কয়েকজন মনীষীর চরিত্রগত বিশেষত্ব সূক্ষ্ম দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তায় বিচার-বিশ্লেষণে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধে চরিত্র-বিশ্লেষণের জন্য বিবিধ তথ্যের পরিবেশনাই একমাত্র মুখ্য হইয়া উঠে নাই, বিশেষ বিশেষ সংবাদ বা তথ্য অবলম্বন করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার আলোচ্য মনীষিগণের চরিত্রগত মহত্ত্বের মূলসূত্র অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং প্রতিটি মনীষীর চরিত্রই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে এক অখণ্ড মহিমোজ্জ্বল মূর্তি গ্রহণ করিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর সাধারণ বাঙ্গালী চরিত্রের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম বিদ্যাসাগর-চরিত্র চিত্রণে এক অনন্যসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দান করিয়াছেন। সুদক্ষ শিল্পীর সামান্য রেখাপাতে যেমন বর্ণ-বৈচিত্র্যবহুল এক বৃহৎ শিল্প-কীর্তির রূপ আভাসিত হয়, তেমনি রামেন্দ্রসুন্দরের অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণ হইতেও বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক মহত্ত্ব বা বিরাটত্ব উপলব্ধি করা যায়। রামেন্দ্রসুন্দর 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'সেই দুর্দ্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ব্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই।'[১]

কুসুমের ন্যায় কোমল ও বজ্রের ন্যায় কঠোর—এই পরস্পরবিরোধী গুণের সমন্বয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের দুর্লভ ব্যক্তিত্ব বা পুরুষকার গঠিত হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধে দয়ার সাগর অথচ তেজস্বী বীর বিদ্যাসাগরের চিত্রটি কয়েকটি সুনির্বাচিত ঘটনার নিপুণ বর্ণনায় সজীব ও প্রাণোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

'চরিত-কথা' গ্রন্থে আলোচিত কোন কোন মনীষি-চরিত্রের মহানুভবতায়

১ 'রামেন্দ্র-রচনাবলী' ২য় খণ্ড, (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৬), পৃঃ ১৮৩

রামেন্দ্রসুন্দর বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়াছেন এবং ফলে, কোন কোন প্রবন্ধে তাঁহার অন্তরের গভীর অনুরাগ-জাত উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইলেও বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দরের যুক্তিনিষ্ঠ মনন সর্বত্রই সক্রিয় হইয়া তাহা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। উপমা-অলংকারের সুষ্ঠু প্রয়োগেও রামেন্দ্রসুন্দরের 'চরিত-কথা'র প্রতিটি প্রবন্ধই সরস ও রমণীয় হইয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের সুগভীর বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্য তাঁহার বহুমুখী জ্ঞানসাধনা ও মননশীলতা দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। আধুনিক ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের বেদ-উপনিষদ্ ও বিবিধ শাস্ত্র-পুরাণাদিতে তাঁহার কেবলমাত্র ব্যুৎপত্তিগত অধিকারই ছিল না—তিনি তাহা সম্যক্‌ভাবে অন্তরস্থ করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞসুলভ এক দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হইয়াছিলেন। 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' গ্রন্থটি রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিচিত্র বিদ্যার সার্থক ফলশ্রুতি। যদিও এই গ্রন্থটি রামেন্দ্রসুন্দরের নিজস্ব লেখনী-জাত নহে, তাঁহার মৌখিক আলোচনার প্রতিবেদন মাত্র। অর্থাৎ রামেন্দ্রসুন্দরের অসুস্থ অবস্থায় তাঁহার মৌখিক বক্তব্যের ভিত্তিতে অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত নিজ ভাষায় উক্ত গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ফলে, ইহাতে রামেন্দ্রসুন্দরের নিজস্ব ভাষাগত ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের অভাব হইলেও তাহা হইতে তাঁহার বহুমুখী চিন্তা ও রসিক মনের যে নিবিড় স্পর্শ লাভ করা যায়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি বিবিধ প্রসঙ্গ আশ্রয় করিয়া 'বিচিত্র প্রসঙ্গে'র পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ধর্মতত্ত্ব ও বিচিত্র সাধন-প্রণালী সম্পর্কে তাঁহার মনন-চিন্তা শাস্ত্রসম্মত অথচ বৈজ্ঞানিক যুক্তির দৃঢ়তা ও স্বচ্ছতায় সমৃদ্ধ হইয়া সমধিক বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর বেদ ও পুরাণ হইতে বহু প্রামাণ্য তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া যথাযথ দৃষ্টান্ত ও উপমার সাহায্যে তাঁহার ধর্মীয় চিন্তাধারা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্ব ও বৈষ্ণবধর্ম প্রসঙ্গে তাঁহার ভাব-চিন্তার মধ্যে অভিনবত্ব ও মৌলিকতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা ভাষা বা শব্দতত্ত্ব প্রসঙ্গে যে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন, সেইগুলি তাঁহার 'শব্দ-কথা' গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। 'ধ্বনি-বিচার', 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ', 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে নীরস ব্যাকরণগত

আলোচনাও রামেন্দ্রসুন্দরের সহজ-সাবলীল ব্যাখ্যাগুণে সুখপাঠ্য ও সরস হইয়া উঠিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ভাষার উপযোগিতা ও যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে তাহার মৌলিক চিন্তা ও বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয়ের বিভিন্নতা অনুসারে ভাষাগত পরিবর্তন যে অত্যাবশ্যক, তাহা রামেন্দ্রসুন্দর স্বীকার করিয়াছেন এবং বিশেষতঃ, বিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে ভাষাপ্রয়োগ সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্যসমূহ মূল্যবান্ ও প্রণিধানযোগ্য। রামেন্দ্রসুন্দর 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভূমি কর্ষণ করিতে গিয়া কৃষিযন্ত্রের সৌষ্ঠব অপেক্ষা কার্য্যকারিতার উপর অধিক দৃষ্টি রাখিতে হয়। যেখানে মাটি খুব দড়, সেখানে এমন অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে সেই শক্ত মাটিতে চাষ চলে। যখন শুষ্ক নিরেট জ্ঞানের আলোচনা লক্ষ্য করিতে হইবে, তখন ভাষার পূর্ণতার দিকেই বেশী দৃষ্টি রাখিতে হয়।'[১]

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চাকে অধিক প্রশস্ত ও ব্যাপক করিতে হইলে যথাযথ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার যে আবশ্যকতা, তাহা রামেন্দ্রসুন্দর গভীরভাবে অনুভব করিয়াছিলেন এবং বিজ্ঞানের সার্থক পরিভাষা প্রণয়নে তাহার অসামান্য সাফল্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর স্বভাবের সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া বিজ্ঞানের ভাষা সংকলনে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রশংসনীয় কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। পরিভাষার ক্ষেত্রে সরল, শ্রুতিমধুর ও সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ যে কোন ভাষা হইতেই গ্রহণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর তাহার 'শব্দ-কথা'র কয়েকটি প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অভিনব চিন্তা-স্বাতন্ত্র্যে প্রোজ্জ্বল ও মূল্যবান্ হইয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের 'নানা কথা' গ্রন্থে শিক্ষা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও সাহিত্য সম্পর্কিত মোট তেরটি প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ মুখ্যতঃ সংকলন-ধর্মী অর্থাৎ প্রচলিত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব বা তথ্যের সুনিপুণ ব্যাখ্যা মাত্র এবং তাহা দ্বারা স্বভাবতঃই ধারণা হয় যে, তাঁহার মধ্যে মৌলিক সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার অভাব ছিল। কিন্তু 'নানা কথা' গ্রন্থের বিশিষ্ট প্রবন্ধসমূহের

১ 'রামেন্দ্র-রচনাবলী' ১ম খণ্ড, (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৬), পৃঃ ১৩৬-৩৭

দ্বারা এইরূপ ধারণার অসারতা প্রমাণিত হয়। 'নানা কথা' গ্রন্থে সংকলিত 'ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম' 'সাহিত্য কথা', 'শিক্ষাপ্রণালী', 'অরণ্যে রোদন', 'মহাকাব্যেব লক্ষণ' প্রভৃতি রামেন্দ্রসুন্দরের শিক্ষা ও সাহিত্যমূলক প্রবন্ধে তাঁহার যে নিজস্ব চিন্তা ও সৃজনধর্মী মনের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যেমন বিস্ময়কর তেমনি প্রশংসনীয়।

রামেন্দ্রসুন্দরের 'সাহিত্য কথা' প্রবন্ধটি সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের মর্মোদ্‌ঘাটনের এক অভিনব সাহিত্যিক প্রয়াস। রামেন্দ্রসুন্দর যে সূক্ষ্ম কবিদৃষ্টি ও রসগ্রাহী মনোবৃত্তি লইয়া সাহিত্য-রসাস্বাদনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থের যথার্থ ট্র্যাজিডি ও উপন্যাসগত মূলসত্য আবিষ্কার করিয়া তিনি তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি-নাট্যকার শেক্সপীয়ারের 'ম্যাকবেথ' নাট্যগ্রন্থের সহিত তুলনা করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার সমালোচনা অধিকতর রসগভীর ও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি-জাত তুলনামূলক আলোচনানৈপুণ্যে, বিচার-বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় ও বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের 'সাহিত্য কথা,' প্রবন্ধটি সমুজ্জ্বল ও সার্থক হইয়াছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের নায়ক গোবিন্দলালের অধঃপতনের মূল কারণ নির্দেশ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার 'সাহিত্য কথা' প্রবন্ধের একাংশে লিখিয়াছেন—

'তাহার অধঃপতনের কারণই বা কি? অনুসন্ধানে দেখা যায়—তাহার দয়া, তাহার পরোপকার বৃত্তিও আর একটু সামান্য ছিদ্র মাত্র, যে ছিদ্রপথে দেবতা বিশেষ অব্যর্থ শর প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাবিয়া বুঝা উচিত যে, সেই দেবতার নিকট শার্দ্দূল-চর্ম্ম ব্যবধানবর্ত্তী দেবদারুদ্রুম-বেদিকায় উপবিষ্ট সংযমিশ্রেষ্ঠও সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ পান নাই। সুতরাং সুযোগক্রমে প্রেরিত শরের সন্ধানের সহিতই গোবিন্দলালের চিত্তটা সাম্যাবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইল।'[১]

সুনির্বাচিত উপমা ও অলংকার প্রয়োগনৈপুণ্যেও রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-মূলক প্রবন্ধ অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও শিল্প-সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধসমূহ প্রধানতঃ সাধু গদ্যরীতিতে রচিত হইয়াছে। একমাত্র 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' নামক প্রবন্ধ পুস্তিকায় তিনি চলিত গদ্যভাষা ব্যবহার

১ 'রামেন্দ্র-রচনাবলী' ৪র্থ খণ্ড, (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ), পৃঃ ৩৯

করিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' বিদেশী ইংরাজ সরকারের বঙ্গ-বিচ্ছেদ ঘোষণার প্রাক্কালে লিখিত হইয়াছে। বঙ্গভঙ্গের সরকারী নির্দেশ রহিতকল্পে এবং হিন্দু মুসলমানের পরস্পর মিলন-গ্রন্থি সুদৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যে উভয়ের কর্ম-ব্রতের যে ভূমিকা রামেন্দ্রসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই এই এই প্রবন্ধে বিধৃত হইয়াছে। 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' চলিত গদ্যরীতিতে লিখিত হইলেও রামেন্দ্রসুন্দরের বিষয়গত মাহাত্ম্য ইহাতে কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বরং পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত গদ্যভাষা প্রচারের পূর্বে তাঁহার সহজ-সাবলীল এবং অপূর্ব ভারসাম্যময় সুকথিত চলিত গদ্য-রীতির ব্যবহার বিস্ময়জনক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রামেন্দ্রসুন্দরের 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলাদেশ জুড়ে বস্‌লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগ্‌ল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি হ'ল। লোকে পরমসুখে বাস করতে লাগ্‌ল।'[১]

রামেন্দ্রসুন্দরের সর্ববিধ প্রবন্ধেরই বিষয়গত দুরূহতা তাঁহার রচনারীতির প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণে সহজ ও সুস্পষ্ট হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার সহজাত শিল্প-দৃষ্টির সহায়তায় প্রবন্ধের ভাষাকেও অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় ও রসমধুর করিয়া তুলিয়াছেন। বিশেষতঃ, তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভাষা অপূর্ব লাবণ্য-শ্রীতে অনন্যসুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অনস্বীকার্য যে, বাংলা সাহিত্যে রামেন্দ্র-সুন্দরই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার

১ 'রামেন্দ্র-রচনাবলী' ১ম খণ্ড, (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৬৬), পৃঃ ৪৮৫

চতুর্থ অধ্যায়

প্রমথ চৌ

রবীন্দ্র-পর্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী এক বিশিষ্ট আসন অলংকৃত করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যিক ছদ্মনাম বীরবল। তিনি স্বনাম অপেক্ষা এই ছদ্মনামেই সমধিক পরিচিত। প্রমথ চৌধুরী একাধারে কবি, গল্পলেখক ও প্রবন্ধকার এবং প্রধানতঃ তাঁহার প্রবন্ধের রূপ-রীতি ও অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছেন। কিন্তু সর্বোপরি প্রমথ চৌধুরীর মুখ্য কৃতিত্ব তাঁহার যুগান্তকারী মাসিক পত্রিকা 'সবুজ পত্র' সম্পাদনা ও বাংলা গদ্যের এক অভিনব রীতি আবিষ্কারের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার এই গদ্যরীতি 'বীরবলী ঢঙ্' নামে আখ্যাত হইয়াছে। তিনি 'বীরবলী ঢঙ্' অর্থাৎ 'এক প্রকারের শুষ্ক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তির্য্যক দ্যোতনা-বিশিষ্ট বিদগ্ধ মনের পরিচয়বাহী রচনারীতি'র প্রবর্তক। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ ও অন্যান্য সকল রচনার ক্ষেত্রেই এই নূতন 'স্টাইল' বা রচনারীতি অনুসৃত হইয়াছে এবং তাঁহার সর্বাধিক গৌরব এই যে, রবীন্দ্র-পর্বে আবির্ভূত হইয়াও তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনারীতির দ্বারা প্রভাবিত হন নাই। রবীন্দ্র-প্রতিভার সর্বব্যাপী আলোক-রশ্মি প্রমথ চৌধুরীর বলিষ্ঠ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি অনুজ্জ্বল বা ম্লান করিতে সক্ষম হয় নাই।

প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত 'বীরবলী ঢঙে্'র মুখ্য উপাদান কথ্য অর্থাৎ চলিত ভাষা। তিনি প্রচলিত সাধু গদ্যভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষাকে সাহিত্যের বাহন রূপে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছেন। জটিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় ও গভীর দার্শনিক প্রত্যয়ঘন চিন্তা প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগিতা যে চলিত ভাষার মধ্যেও বর্তমান, তাহা স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী বিবিধ জটিল, দুরূহ ও গুরুগম্ভীর বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে সার্থকভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। চলিত ভাষায় যুক্তি-বিচারনিষ্ঠ, মননশীল অথচ রসঘন প্রবন্ধের অন্যতম কৃতী লেখক যে প্রমথ চৌধুরী, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর পূর্বে চলিত ভাষাভিত্তিক রচনারীতি

টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' নামক গ্রন্থদ্বয়ে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই চলিত ভাষা ও রীতির মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্ট রচনাভঙ্গি-জাত শিল্প-সৌন্দর্যের অভাব ছিল। সাধু ভাষার ন্যায় আলালী বা হুতোমী ভাষার শিল্পরূপ রচনায় কোনরূপ সতর্ক অনুশীলন বা কলাশিল্পসম্মত উন্নত কোন প্রয়োগ-কৌশল লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু বীরবলী চলিত ভাষা প্রমথ চৌধুরীর একনিষ্ঠ সাধনা ও সৃজনধর্মী মনের আন্তরিক প্রেরণায় উদ্ভূত হইয়াছে। অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি, দৃঢ়প্রকৃতিস্থতা (sanity) ও বহিরবয়ব আঙ্গিক বিন্যাসে সমৃদ্ধ বীরবলী রীতি বাংলা সাধু গদ্যরীতি অপেক্ষা কোন অংশেই অপকৃষ্ট ও দুর্বল নহে। অতএব বাংলা সাহিত্যে বীরবলী গদ্যভাষাই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক চলিত ভাষার মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

প্রমথ চৌধুরীর পূর্বে চলিত ভাষার সাহিত্যিক রূপায়ণের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র পরেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্যায়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, পত্র-সাহিত্যে এবং স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন লেখকের কোন কোন রচনা মধ্যে চলিত ভাষা ও রীতির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আলালী বা হুতোমী ভাষা অপেক্ষা তাঁহাদের চলিত ভাষা অধিকতর সুকর্ষিত ও সংযত-শোভন হইলেও তাহা সাধারণ পাঠক-সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয় নাই এবং উল্লিখিত লেখকগণের মধ্যেও চলিত ভাষা ও রীতির ব্যাপক প্রচলনেও কোন অদম্য ঐকান্তিক প্রয়াস বা সুগভীর সাহিত্য-নিষ্ঠার পরিচয় লাভ করা যায় না। তাহাদের চলিত ভাষায় সাহিত্য-চর্চা সাময়িক উত্তেজনা বা খেয়াল-জাত বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও নিছক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে ভ্রমণ বা ডায়ারি জাতীয় কয়েকটি রচনায় মাত্র চলিত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। পরবর্তী কালে বিচিত্র বিষয়াশ্রিত তাঁহার অধিকাংশ রচনাই সাধু ভাষায় লিখিত হইয়াছে। প্রথম চৌধুরীর 'সবুজ পত্র' প্রকাশের পর হইতেই এবং মুখ্যতঃ তাঁহারই একান্ত উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিবিধ সাহিত্য-কর্মে চলিত ভাষা ও রীতি নিয়মিতভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের চলিত ভাষাভিত্তিক সুমার্জিত গদ্যরূপ ও রীতির মূলে প্রমথ চৌধুরীর প্রশংসনীয় কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

প্রমথ চৌধুরীর চলিত ভাষাভিত্তিক বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধের রচনা-সৌকর্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি প্রমথ চৌধুরীকে একটি পত্রে লিখিয়াছেন—

'তোমার গদ্যপ্রবন্ধ সবগুলিই পড়েছি। তোমার কবিতার যে গুণ তোমার গদ্যেও তাই দেখি—কোথাও ফাঁক নেই এবং শৈথিল্য নেই, একেবারে ঠাসবুনানি।'[১]

রবীন্দ্রনাথও চলিত ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কিন্তু বীরবলী প্রবন্ধের সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না। উভয় মনীষীর প্রবন্ধগত ভাব-বিন্যাস ও প্রকাশভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বতন্ত্র। রবীন্দ্র-প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে প্রমথ চৌধুরীর প্রাবন্ধিক বৈশিষ্ট্য অধিকতর স্পষ্টগোচর হয় অভিনব বীরবলী রীতির জন্য প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ একক ও অনন্যসাধারণ চারিত্রিক তাৎপর্য লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সাধারণ প্রথাসিদ্ধ প্রবন্ধের মানদণ্ডে যেমন রবীন্দ্র-প্রবন্ধের বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না, তেমনি প্রচলিত প্রবন্ধের সংজ্ঞানুসারে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধও বিচার্য নহে। কারণ, সাধারণ প্রবন্ধের বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ তাঁহার প্রবন্ধে যথাযথভাবে পরিস্ফুট হইবার অবকাশ পায় নাই। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও পরিধির বিস্তৃতি সাধনে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য অবদানের সমতুল্য না হইলেও প্রথম চৌধুরীর দানও উপেক্ষণীয় নহে। বিশেষতঃ, বাংলা প্রবন্ধের প্রথাসিদ্ধ আঙ্গিকের ক্ষেত্রে 'বীরবলী ঢঙ্' বা রীতি যে এক ব্যতিক্রম, তাহা অস্বীকার করা যায় না। প্রসঙ্গতঃ বিষয় নিরপেক্ষভাবে রবীন্দ্র-প্রবন্ধ-রীতি ও প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ রচনাশৈলী এই উভয়ের পারস্পরিক কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা স্বরূপ-ধর্মের আলোচনা করা যাইতে পারে। বীরবলী রীতি যে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে মহিমান্বিত ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত তাহা এবংবিধ আলোচনা হইতে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী উভয় মনীষীরই প্রবন্ধ রচনারীতিতে তাঁহাদের পরিশুদ্ধ বিদগ্ধ ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ, Style is the Man অর্থাৎ রচনাশৈলীতে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন—এই অর্থবহ মন্তব্যটি উভয়ের রচনাক্ষেত্রেই সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু বীরবলী ব্যক্তিস্পর্শযুক্ত

[১] ৫ম খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৩৫২), পৃঃ ১৬৯

রচনারীতি রবীন্দ্র-রীতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে মুখ্যতঃ বিদগ্ধ মনীষীর বুদ্ধিজাত চিন্তা-ভাবনার লঘু চপল খেয়ালীরূপের প্রকাশ ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি। অতএব, আত্মভাববিমুগ্ধ কবি-হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিসঞ্জাত যুক্তির মধ্যেই তাঁহার প্রবন্ধ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। বীরবলী রীতি বুদ্ধিপ্রধান, রবীন্দ্র-রীতি হৃদয়প্রধান। তথ্য-যুক্তিসমন্বিত বাক্-বৈদগ্ধ্যই বীরবলী গদ্যরীতিতে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধিজাত সামগ্রী বা উপকরণ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কবিমানসের স্নিগ্ধ-লাবণ্যে কমনীয় ও রসোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। রচনাকে যথাসম্ভব হৃদ্য ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে হইলে বক্রোক্তির ব্যবহার যে কিরূপ কার্যকরী, রবীন্দ্র-প্রবন্ধে বক্রোক্তি-প্রয়োগের চমৎকারিত্ব হইতে তাহা উপলব্ধি করা যায়। প্রমথ চৌধুরীর বক্রোক্তি-সমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থ-ব্যঞ্জনাবাহী না হইয়া নিছক বাক্য বা শব্দের কলাকৌশল মাত্রেই পর্যবসিত হইয়াছে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক ইত্যাদি বিবিধ অলংকার দ্বারা রবীন্দ্র-প্রবন্ধের কেবলমাত্র বাহ্যিক অঙ্গ-সৌষ্ঠবই গঠিত হয় নাই—এই সকল অলংকার তাঁহার প্রবন্ধগত বিচিত্র ভাব বা রসাভিব্যক্তির অচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে ব্যবহৃত অলংকারসমূহ অপেক্ষাকৃত বহিরঙ্গমূলক, রবীন্দ্র-প্রবন্ধের ন্যায় তাহা গভীরভাবে অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে নাই।

Paradox অর্থাৎ আপাত-অসম্ভব শব্দগুচ্ছের ব্যবহার বীরবলী রীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইহা দ্বারা বিদ্রূপাত্মক হাস্যরস সৃষ্টি বহুলক্ষেত্রে আয়াসসাধ্য হইলেও ইহার অভিনব প্রয়োগনৈপুণ্যেই 'বীরবলী ঢঙে'র স্বাতন্ত্র্য নিহিত। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে বীরবলসুলভ শ্লেষ-ব্যঙ্গাত্মক মনোভঙ্গির কোনরূপ উগ্রতা প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার হাস্যরস করুণ-মধুর সৌকুমার্যে স্নিগ্ধ হইয়া অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের অঙ্গগত বৈশিষ্ট্য ও ভাষার অন্তঃপ্রকৃতির পশ্চাতে তাঁহার ভাষা-শিক্ষা ও চর্চার এক গভীর প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণনগরের রাজকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অলংকারবহুল কাব্য-ভাষা ও রচনারীতি ছাত্রাবস্থা হইতেই প্রমথ চৌধুরীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি বাক্‌চাতুর্যে সুনিপুণ, বুদ্ধিজীবী কবির একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। প্রমথ চৌধুরী স্বয়ং যে ভারতচন্দ্রের ভাষাও অনুশীলন

করিয়াছিলেন, 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে তাঁহার অকপট স্বীকৃতি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রমথ চৌধুরী লিখিয়াছেন—

'ভাষামার্গে আমি ভারতচন্দ্রের পদানুসরণ করেছি।'[১]

প্রমথ চৌধুরীর বর্ণনা-বৈদগ্ধ্য, উপমা-অলংকরণ, চাতুর্যময় বাচনভঙ্গি ও ব্যঙ্গপ্রিয়তা যে কবি ভারতচন্দ্রের মনোধর্মেরই ছায়াতপে গঠিত, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যদিও সাহিত্যগত রসরুচির ক্ষেত্রে তিনি অপেক্ষাকৃত মার্জিত, সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান্ ছিলেন। ভারতচন্দ্রের পরেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায়ও বাগ্‌-বৈদগ্ধ্য ও লঘু ব্যঙ্গ-রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্রের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গরস, তীক্ষ্ণ স্পষ্ট ও শ্লেষ-বিদ্রূপাত্মক রচনাভঙ্গির প্রভাবও বীরবলী ভঙ্গিতে প্রচ্ছন্নভাবে অনুভূত হয়।

প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যানুরাগী মনস্বী ব্যক্তি। ইংরাজী ও ইউরোপীয় অন্যান্য সাহিত্যেরও তিনি উৎসাহী পাঠক ছিলেন। বিশেষতঃ, ফরাসী সাহিত্যের প্রতি তাঁহার সুগভীর প্রীতি ও অসামান্য ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ফরাসী গদ্যের সুমার্জিত রূপ ও প্রসাদগুণ এবং সংযম ও বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণতার মধ্যেই প্রমথ চৌধুরী তাঁহার স্বাভাবিক রুচি ও মানসপ্রবণতার যথাযথ উপাদান বা সামগ্রীর সন্ধান লাভ করিয়াছেন। ইহা অনস্বীকার্য যে, ফরাসী গদ্যভাষা ও রীতির বিশিষ্ট গুণগুলি আত্মস্থ করিয়া তিনি তাঁহার গদ্যভাষা ও প্রকাশভঙ্গি অধিকতর মার্জিত, প্রাঞ্জল ও সাবলীল করিয়া তুলিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপ্রধান পরিহাস-রসিকতা, ভাবালুতাশূন্য ও সংস্কারবিমুক্ত মননশীলতা বহুল পরিমাণে ফরাসী স্বভাবের সমধর্মী হইয়াছে। অতএব তাঁহার সুমার্জিত ও সংযত-সুন্দর গদ্যভাষা ও রীতি অর্থাৎ 'বীরবলী ঢঙে'র পশ্চাতে ফরাসী গদ্যের প্রভাবও উপেক্ষা করা যায় না। ফরাসী সাহিত্যের সহজ স্বাভাবিক স্বরূপ-ধর্ম ও সুস্পষ্টতা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী স্বয়ং তাঁহার 'ফরাসী সাহিত্যের বর্ণ পরিচয়' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'ফরাসী মনের চোখ চিরদিনই আলোর দিকে চেয়ে রয়েছে। দিনের আলোয় যা দেখা যায় না, ফরাসী মন স্বভাবতঃই তা দেখতে চায় না; এর ফলে যে

১ 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' ১ম খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৯৫২), পৃঃ ২৫২

মনোভাব অস্পষ্ট ও অস্ফুট, যে সত্য ধরা দেয় না, শুধু আভাসে ইঙ্গিতে আত্মপরিচয় দেয়, সে মনোভাবের, সে সত্যের সাক্ষাৎ ফরাসী সাহিত্যে বড়-একটা পাওয়া যায় না। * * * ফরাসি সাহিত্য এই অর্থে স্পষ্টভাষী যে, সে সাহিত্যের ভাষায় জড়তা কিংবা স্পষ্টতার লেশমাত্রও নেই। যে বিষয়ে লেখকের পরিষ্কার ধারণা আছে, সেই কথা অতি পরিষ্কার করে বলাই হচ্ছে ফরাসি সাহিত্যের ধর্ম।'[১]

ফরাসী সাহিত্যের এবংবিধ চারিত্রিক লক্ষণ প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধসমূহে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিনব 'বীরবলী ঢঙে'র প্রবর্তনা হইতে প্রমথ চৌধুরীর একনিষ্ঠ সাহিত্যচিন্তা এবং দেশী ও বিদেশী বিবিধ ভাষা-শিল্পের সহিত তাঁহার সুনিবিড় ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার এই স্বতন্ত্র অভিনব রচনাভঙ্গি বহুল ক্ষেত্রেই প্রবন্ধের বিষয়গত মহিমা খর্ব করিয়াছে এবং প্রমথ চৌধুরী যে নিছক রীতিবাদী (stylist) লেখক এই অভিধাও তাঁহার উপর আরোপিত হইয়াছে। যদিও প্রমথ চৌধুরী অপেক্ষাকৃত রীতিসর্বস্ব লেখক, তথাপি তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং চিন্তা-স্বাতন্ত্র্যেও অনন্যসাধারণত্ব লক্ষ্য করা যায়। তিনি তাঁহার চলিত ভাষাশ্রিত তির্যক রূপভঙ্গিতে বহু বিচিত্র প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙ্গালীর মানসক্ষেত্রে নূতন ভাব ও চিন্তার দিগন্ত উন্মোচন করিয়াছেন। কেবলমাত্র সাহিত্যালোচনা নহে, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস, ভাষা-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ই প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বস্তু হইয়াছে।

প্রমথ চৌধুরী প্রণীত প্রবন্ধ পুস্তিকা ও সংগ্রহ-গ্রন্থ যথাক্রমে : ১। 'তেল-নুন-লকড়ি' (১৯০৬), ২। 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭), ৩। 'নানা কথা' (১৯১৯), ৪। 'আমাদের শিক্ষা' (১৯২০), ৫। 'দু-ইয়ারকি' (১৯২১), ৬। 'বীরবলের টিপ্পনী' (১৯২১), ৭। 'রায়তের কথা' (১৯২৬), ৮। 'নানা চর্চা' (১৯৩২), ৯। 'ঘরে বাইরে' (১৯৩৬), ১০। 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' (১৯৪০), ১১। 'বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' (১৯৪৪), ১২। 'আত্ম-কথা' (১৯৪৬) ও ১৩। 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দুমুসলমান' (১৯৫৩)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য

১ 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' ১ম খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৯৫২), পৃঃ ১১৮-১৯

যে, প্রমথ চৌধুরীর একই বিষয়ক কোন বিশিষ্ট প্রবন্ধ তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ-সংকলনে গৃহীত হইয়াছে। সাম্প্রতিক কালে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের সুদক্ষ সম্পাদনায় প্রমথ চৌধুরীর বিভিন্ন প্রবন্ধ পুস্তিকায় সংকলিত ও বিবিধ সাময়িক পত্রে মুদ্রিত অথচ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ হইতে নির্বাচিত পঞ্চাশটি প্রবন্ধের সমষ্টি 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' নামে দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবলের টিপ্পনী' নামক প্রবন্ধ-সংগ্রহের পরিশিষ্টে মুদ্রিত দুইটি রচনা 'গুলিখোরের আবেদন-পত্র' ও 'গর্জন-সরস্বতী-সংবাদ' বিশুদ্ধ প্রবন্ধের সমগোত্রীয় নহে। এই দুইটি রচনায় মূল বক্তব্য বিষয়কে গৌণ বা ম্লান করিয়া দিয়া শ্লেষ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাশ্রিত তরল হাস্যরসই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। প্রমথ চৌধুরীর এবংবিধ লঘু পরিহাসমূলক রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোক-রহস্য' গ্রন্থের রচনারীতির (technique) প্রভাব অনুভব করা যায়।

প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ প্রবন্ধই তাঁহার বিরোধী দলের প্রচারিত মন্তব্য বা আলোচনার প্রতিক্রিয়া-জাত ও বিতর্কাশ্রয়ী। প্রতিপক্ষের বক্তব্য বিষয় সুদক্ষভাবে সমালোচনা করিয়া সম্পূর্ণ নিজস্ব এক বলিষ্ঠ অভিমত তিনি তাঁহার প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীর এই শ্রেণীর প্রবন্ধ যুক্তিগর্ভ সিদ্ধান্তে যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি বিভিন্ন বিষয়ানুগ প্রাসঙ্গিক তথ্য ও তত্ত্বে মূল্যবান্ হইয়াছে। প্রতিটি প্রবন্ধই বুদ্ধিধর্মী ও অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয়বাহী। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, নীরস জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাও তাঁহার অসংযত প্রগল্‌ভতায় বা পাণ্ডিত্য-মোহে আচ্ছন্ন ও নীরস হইয়া উঠে নাই। বিভিন্নমুখী সুগভীর পাণ্ডিত্য প্রচ্ছন্ন রাখিয়াও বিচিত্র জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের মহিমা যে সহজভাবে সাধারণ্যে পরিবেশন করা সম্ভব, প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধসমূহ তাহার সফল দৃষ্টান্ত। এই ক্ষেত্রে তিনি ফরাসী সাহিত্যের আদর্শই সার্থকভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্য প্রচার না করিয়াও গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাননিষ্ঠ দর্শন-বিজ্ঞানের যে সহজ-সুন্দর আলোচনা পাওয়া যায়, তাহারই ভিত্তিতে প্রমথ চৌধুরী তাঁহার 'ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়' প্রবন্ধের একাংশে লিখিয়াছেন—

'ফরাসি সাহিত্যের ভিতর সায়েন্স এবং আর্ট দুইই আছে। ফরাসি মনের এই প্রসাদগুণপ্রিয়তার ফলে সে দেশের দর্শন-বিজ্ঞানের ভিতরও

সাহিত্যরস থাকে। পাণ্ডিত্য না ফলিয়ে অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় একমাত্র ফরাসি লেখকেরাই দিতে পারেন।'[১]

মননশীল, যুক্তিপ্রিয় ও সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রমথ চৌধুরীর বিবিধ চিন্তা ও ভাবরাজি নূতনভাবে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে যে তাঁহার বলিষ্ঠ শিল্পিসুলভ ব্যক্তিপুরুষের অন্তরঙ্গ স্পর্শে প্রতিটি প্রবন্ধই অপূর্ব রসোজ্জ্বল হইয়াছে।

প্রমথ চৌধুরীর প্রায় সকল প্রবন্ধই তাঁহার স্ব-সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি তৎকালীন দেশের তথাকথিত সাহিত্য পত্র হইতে স্বতন্ত্র অর্থাৎ গতানুগতিক, প্রথাসিদ্ধ চিন্তাধারা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। প্রাচীন সংস্কারধর্মী অস্পষ্ট ভাব-চিন্তা ও অনুদার রক্ষণশীল মনোভাবপ্রসূত কোন রচনাই ইহাতে প্রকাশিত হইত না। 'সবুজ পত্র' যুগোপযোগী নূতন নূতন বিষয় এবং আন্তর্জাতিক বিদ্বজ্জন সমাজে প্রচারিত ও প্রচলিত বিভিন্ন সাহিত্যিক বা দার্শনিক তথ্য ও তত্ত্বের প্রগতিশীল আলোচনার একমাত্র বাহন হইয়াছিল। বাংলাদেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের বৈচিত্র্য ও রূপান্তর সাধনে 'সবুজ পত্রে'র দান কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। 'সবুজ পত্রে'র ন্যায় নির্ভীক শিল্প-রুচিসম্মত পত্রিকা সম্পাদনার মধ্য দিয়া প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য-জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

'সবুজ পত্র' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর প্রকৃত সাহিত্যিক জীবনেরও সূত্রপাত হইয়াছে। এই সময় হইতে তাঁহার নিজস্ব পত্রিকার অনিবার্য তাগিদেই প্রমথ চৌধুরী বিচিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় নিযুক্ত হন। 'সবুজ পত্রে'র আবির্ভাবের পূর্বেও প্রমথ চৌধুরীর কয়েকটি প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত প্রবন্ধসমূহের মধ্যেও বীরবলী চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও শ্লেষ-বক্রোক্তি-বিরোধাভাসের অসামান্য প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয়ও প্রকাশ পাইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, প্রমথ চৌধুরীর প্রথম দুইটি প্রবন্ধ 'জয়দেব' ও 'আদিম মানব' বিশুদ্ধ সাধু ভাষায় রচিত হইয়াছে। কিন্তু সাধু ভাষায় লিখিত হইলেও তাঁহার মৌলিক 'বীরবলী ঢঙে'র বৈশিষ্ট্যসমূহ উভয় প্রবন্ধেই বর্তমান। প্রমথ চৌধুরী স্বয়ং 'আত্ম-কথা'য় লিখিয়াছেন—

[১] 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' ১ম খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৯৫২), পৃঃ ১১৯

'ইতিপূর্ব্বে আমি বাঙ্গলা কখনো লিখিনি। আমি যখন এম, এ, পড়ি, তখন জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত নামক একটি যুবকের অনুরোধে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভায় যোগ দিই এবং সেই সভাতেই জয়দেবের গীতগোবিন্দের উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। * * * সেটি অবশ্য তথাকথিত সাধুভাষায় লিখিত। কিন্তু ঈষৎ মনোযোগ দিয়ে পড়লেই বুঝতে পারবেন যে, আমার লেখার সব দোষগুণই তাতে বর্ত্তমান।'[১]

'সবুজ পত্র' প্রকাশের পর হইতেই প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধসমূহে ক্রমান্বয়ে 'বীরবলী ঢঙে'র যথার্থ স্বরূপ ও প্রকৃতি-ধর্মের পরিস্ফূর্তি ঘটিয়াছে।

প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ প্রবন্ধগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং, গ্রন্থানুক্রমে প্রবন্ধের পর্যালোচনা করা হইলে বিষয়ের পুনরুক্তি দোষ ঘটিবার আশঙ্কা আছে। অতএব কালানুক্রমিক প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থাদির পর্যায়ক্রমে আলোচনা না করিয়া বিষয়ানুসারে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধসমূহের বিচার-বিশ্লেষণই অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক।

প্রমথ চৌধুরী একজন সূক্ষ্ম কলাকুশলী ভাষা-শিল্পী। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনিই সর্বপ্রথম সুপরিচ্ছন্ন সার্থক চলিত ভাষার ব্যাপক প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। চলিত ভাষার যোগ্যতা এবং তাহার সাহিত্যিক রূপ ও রীতি অবলম্বন করিয়া প্রমথ চৌধুরী কয়েকটি সুচিন্তিত সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'কথার কথা', 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাংলা ওরফে সাধুভাষা', 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা', 'বাঙ্‌লা ব্যাকরণ', 'আমাদের ভাষা-সংকট' ইত্যাদি প্রবন্ধে সাহিত্যে ভাষাগত সমস্যারই বিস্তৃত আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় যুক্তি ও তথ্যের সুষ্ঠু সমাবেশে সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হইয়া উঠিয়াছে। চলিত ভাষার পরিণত রূপ-গঠনে অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক ভাষার প্রসন্ন দীপ্তি ও সৌন্দর্যের জন্য বিচিত্র অথচ যথাযথ শব্দ আহরণের প্রয়োজনীয়তা প্রমথ চৌধুরী গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন। গভীর চিন্তা বা ভাবাবেগের সুস্পষ্ট রূপায়ণে চলিত ভাষায় শব্দ-সমৃদ্ধি প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি দেশী বা বিদেশী যে কোন ভাষা হইতেই উপযুক্ত শব্দ-গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন—এই ক্ষেত্রে তাঁহার ভাষাগত কোন অনুদার

১ 'আত্ম-কথা', (কলিকাতা, ১৩৫৩), পৃঃ ৯৩

মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। 'কথার কথা' প্রবন্ধে চলিত ভাষার উপযোগিতা ও গঠন-সৌষ্ঠব সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি 'কথার কথা' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়। * * * ভাষার এখন শানিয়ে ধার ধার করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়। যে কথাটি নিতান্ত না হলে নয় সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এস, যদি নিজের ভাষার ভিতর তাকে খাপ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশি ভিক্ষে ধার কিংবা চুরি করে এন না।'[১]

প্রমথ চৌধুরী 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধে সাধু ভাষার সহিত তুলনায় চলিত ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সাধু ভাষা আর্টের অনুকূল অর্থাৎ উপযোগী ভাষা এবং চলিত ভাষা অপেক্ষা তাহা হিন্দুস্থানী, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিগণের নিকট অধিক সহজবোধ্য বলিয়া সাধু ভাষার অনুকূলে প্রমথ চৌধুরীর বিরুদ্ধবাদিগণ যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তিনি এই প্রবন্ধে তাহা অতি নৈপুণ্য-সহকারে খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রমথ চৌধুরী 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধের একাংশে লিখিয়াছেন—

'তথাকথিত সাধুভাষা সম্বন্ধে আমার প্রধান আপত্তি এই যে, ওরূপ কৃত্রিম ভাষায় আর্টের কোনো স্থান নেই। * * * এ স্থলে এইটুকু বলে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে, "রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা"—লেখায় সেই গুণটি আনবার জন্য যথেষ্ট গুণপনার দরকার। আর্ট-হীন লেখক নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে কৃতকার্য হন না।'[২]

নীরস বিষয়াশ্রিত এবংবিধ বিতর্কমূলক প্রবন্ধও প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ণাগ্র বাক্‌চাতুর্য ও স্বভাবসিদ্ধ পরিহাস-রসিকতায় সরস, প্রোজ্জ্বল ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য, ধর্ম ও নীতি প্রসঙ্গেও প্রমথ চৌধুরী কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। 'সাহিত্যে খেলা', 'সাহিত্যে চাবুক', 'খেয়াল খাতা', 'কাব্যে

---

১ 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' ১ম খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৯৫২), পৃঃ ৩০৩-৩০৪

২ ঐ, পৃঃ ৩২২

অশ্লীলতা—আলংকারিক মত', 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' প্রবন্ধে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। 'সাহিত্যে খেলা' নামক প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের মাধ্যমে নীতি-ধর্ম বা নিছক ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য প্রচারের বিরোধিতা করিয়াছেন। সাহিত্য-শিল্প যে বিশুদ্ধ আনন্দধর্মী এবং ইহা যে সাহিত্যস্রষ্টার প্রসন্ন মনের পরিচ্ছন্ন প্রকাশ, এই প্রবন্ধে তিনি তাহাই বিবিধ যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্যে খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। * * * কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি।'[১]

সাহিত্যের ধর্ম বা রীতি-নীতি সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর যে বক্তব্য তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা তাঁহার চিন্তার কোন স্বাতন্ত্র্য বা অভিনবত্বের পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। কেবলমাত্র বীরবলী পরিবেশন-কৌশলের চমৎকারিত্বে বহুল প্রচলিত সাহিত্য-মীমাংসা সমন্বিত রচনাও পাঠোপভোগ্য ও আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

(সাহিত্য-শিল্পাদর্শের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী কলাকৈবল্যবাদের (Art for Art's sake) শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কয়েকটি প্রবন্ধে এই তত্ত্ব আশ্রয় করিয়াই তাঁহার সাহিত্যিক চিন্তা বা মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীর মতে, সাহিত্য বা শিল্প বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের সাধনা এবং তাহা প্রধানতঃ শিল্পী বা সাহিত্যিকের গভীর কল্পনাপ্রসূত—যথার্থ বাস্তবানুগ নহে। সাধারণতঃ কাব্যে প্রকৃতির যে বিচিত্র বর্ণনা পাওয়া যায়, বাস্তব জগতে তাহার যথাযথ পরিচয় লাভ করা যায় না। সুতরাং কাব্যের প্রকৃতি মুখ্যত মনঃকল্পিত এবং তাহার বর্ণনা-বৈচিত্র্যের মধ্যেই কবির রস-কল্পনা বা কবিত্ব নির্ভরশীল। ইহা অনস্বীকার্য যে, সার্থক কবিত্ব বা শিল্পত্ব কবি বা শিল্পীর বিশুদ্ধ আনন্দের

১ 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' ১ম খণ্ড (বিশ্বভারতী, ১৯৫২), পৃঃ ১০২-১০৩

লীলা-বৈচিত্র্য হইতেই উদ্ভূত হয়। কবিত্ব বা শিল্পত্ব জাগতিক স্থূল প্রয়োজন বহির্ভূত অতিরিক্ত একটি আনন্দচেতনা মাত্র এবং বিশুদ্ধ আনন্দসৃষ্টিই সাহিত্যের প্রকৃত আদর্শ। সাহিত্য-বিচারে রবীন্দ্রনাথও কলাকৈবল্যবাদ অর্থাৎ রস-সর্বস্বতা নীতিরই সমর্থক ও পরিপোষক ছিলেন এবং প্রমথ চৌধুরীও এই বিশিষ্ট সাহিত্য-মতবাদের অনুকূলেই তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' নামক প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যাদর্শ বা সাহিত্য-চিন্তার এক বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যে বাস্তব বা বস্তুতন্ত্রতা যে ইউরোপীয় সাহিত্যের 'রিয়ালিজম্', তাহা প্রতিপন্ন করিতে বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সমালোচকের অভিমত বিচার করিয়া বিস্তৃত আলোচনায় প্রয়াসী হইয়াছেন এবং সাহিত্যসৃষ্টির মূলপ্রেরণা সম্পর্কেও গভীর অর্থবহ ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ইউরোপের এক শ্রেণীর বস্তুতন্ত্রবাদী সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে কেবলমাত্র দেশকালের উপাদান এবং কবি বা শিল্পীর পারিপার্শ্বিকতাকে স্বীকার করিয়াছেন। তাহাদের মতে মাটি, আলো, বাতাস প্রভৃতির একত্র সংযোগে যেমন জীবের সৃষ্টি, তেমনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে মানব-মনেরও সৃষ্টি হইয়াছে। এই মতবাদ আশ্রয় করিয়া বস্তুতন্ত্রবাদিগণ দর্শন, ধর্ম, কাব্য, আর্ট, নীতি প্রভৃতি সকল আধ্যাত্মিক বিষয়েরই এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের এই ব্যাখ্যায় পারিপার্শ্বিক অবস্থাই প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে—দর্শন, কাব্য প্রভৃতির বিশিষ্ট ধর্ম ইহাতে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। তাঁহারা বাহ্য সমাজ-শক্তিতে বিশ্বাস করিয়াছেন, কবির আত্মশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই; অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক সমাজের বাহ্য শক্তিই যে কাব্য-সৃষ্টির মূল প্রেরণা স্বরূপ, বস্তু-তন্ত্রবাদিগণ এই অভিমতই মুখ্যতঃ পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী এবংবিধ ব্যাখ্যা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে কবির মন এক স্বতন্ত্র রসের উৎস এবং তাহা কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক সমাজের প্রভাব দ্বারাই পরিপুষ্ট হয় না—কবির আত্মা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগতের রূপ-রসেও গঠিত হয়। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে বস্তুতত্ত্ব অর্থাৎ 'রিয়ালিজম্' এবং আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ 'আইডিয়ালিজম্' এই উভয়ের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য ও তাহাদের পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক নির্দেশ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' নামক প্রবন্ধের শেষাংশে কয়েকটি বিশিষ্ট ছত্রের মধ্য দিয়া সুস্পষ্টভাবে

পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। প্রমথ চৌধুরী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বীরবলী ভঙ্গিতে লিখিয়াছেন—

'অর্থহীন বস্তু কিংবা পদার্থহীন ভাব, এ দুয়ের কোনোটাই সাহিত্যের যথার্থ উপাদান নয়। রিয়ালিজমের পুতুলনাচ এবং আইডিয়ালিজমের ছায়াবাজি উভয়ই কাব্যে অগ্রাহ্য। কাব্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ। এবং যেহেতু জীবে চিৎ এবং জড় মিলিত হয়েছে, সেকারণ যা হয় বস্তুহীন নয় ভাবহীন তা কাব্য নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই একাধারে রিয়ালিস্ট এবং আইডিয়ালিস্ট ; কি বহির্জগৎ, কি মনোজগৎ দুয়ের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।'[১]

প্রমথ চৌধুরীর দুরূহ বিতর্কমূলক সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধেরও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ তাঁহার প্রকাশভঙ্গি। বীরবলী ভাষা ও প্রকাশরীতি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবন্ধের বিষয়-গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ করিলেও তাহাতে সামগ্রিকভাবে বচনাগত গভীর আবেদন ব্যাহত হয় নাই।

কাব্যরসিক সাহিত্য-সমালোচক হিসাবেও বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। 'জয়দেব', 'চিত্রাঙ্গদা', 'ভারতচন্দ্র' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁহার গভীর রসগ্রাহিতা ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় লাভ করা যায়। 'চিত্রাঙ্গদা' প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্ট কাব্য-সমালোচনাত্মক প্রবন্ধসমূহের অন্যতম। এই প্রবন্ধে তাঁহার সুগভীর কাব্যানুভূতি ও বিচারধর্মী সূক্ষ্ম রসদৃষ্টির পরিচয় সম্যক্‌ভাবে প্রকাশ পাইযাছে। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যের বিরুদ্ধে সমসাময়িক সমালোচকগণের যে সকল অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহারই প্রতিবাদ স্বরূপে এবং প্রধানতঃ টম্‌সন সাহেবকৃত সমালোচনার প্রত্যুত্তরে প্রমথ চৌধুরীর 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে। টম্‌সন সাহেবের মতে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' একটি দুর্নীতিমূলক কাব্য এবং এই কাব্যে নারীজাতি সম্পর্কে কবির যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অতীব ঘৃণ্য। প্রমথ চৌধুরী তাঁহার প্রবন্ধে টম্‌সনের অভিযোগ অস্বীকার করিয়া অত্যন্ত সংযতভাবে অথচ যুক্তি সহকারে 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের সৌন্দর্য ও ভাবৈশ্বর্যের বিস্তৃত আলোচনায় প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁহার প্রবন্ধের প্রারম্ভেই কবি ও কবিত্বের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আলংকারিকগণের বিভিন্ন মতবাদের সারাংশ

১ 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' ১ম খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৯৫২), পৃঃ ৬৭

সংকলন করিয়া এক মনোজ্ঞ দার্শনিক ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়াছেন এবং পরিশেষে তিনি 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের উত্থাপিত অভিযোগসমূহ অতি নৈপুণ্য সহকারে খণ্ডন করিয়া রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তঃপ্রেরণা ও রসব্যঞ্জনার সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কাব্য-বিচার পদ্ধতিতে ও রস-বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতায় প্রমথ চৌধুরীর 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধটি অতীব সারগর্ভ ও মূল্যবান্ হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার 'চিত্রাঙ্গদা' নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'যদি কোনো কবির কল্পনায় দেহ-দেহীর ভেদাভেদজ্ঞান মূর্ত হয়ে ওঠে তাহলে সে কবির কল্পনাকে কি শুধু দৈহিক বলা চলে? যা কেবলমাত্র দৈহিক তার অন্তরে সত্য আছে কিন্তু সৌন্দর্য নেই। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন যে, কামলোকের উপরে রূপলোক বলে আর-একটি লোক আছে। যে ব্যক্তি তাঁব বর্ণিত বিষয়কে কামলোক থেকে রূপলোকে তুলতে পারেন তিনিই যথার্থ কবি। চিত্রাঙ্গদা যে রূপলোকের বস্তু কামলোকের নয় তা যাঁর অন্তরে চোখ আছে তিনিই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। * * * চিত্রাঙ্গদা একাধারে কাব্য, চিত্র ও সংগীত, অতএব তা চরম কাব্য। কেননা চিত্রাঙ্গদায় আর্টের ত্রিধাবাব পূর্ণ মিলন হয়েছে। আর্ট হিসাবে চিত্রাঙ্গদার আর-একটি মহাগুণ তার পরিমিত ও পরিচ্ছিন্ন আয়তন।'[১]

গভীর সত্যানুসন্ধিৎসা ও নিরপেক্ষ নির্ভীক স্পষ্ট ভাষণ সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণীর কলা-সমালোচকের স্বভাবগত ধর্ম এবং এই জাতীয় গুণাবলী দ্বারা যে প্রমথ চৌধুরীর মনন-চিন্তা সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধ হইতে তাহা সার্থকভাবে প্রমাণিত হয়। প্রমথ চৌধুরীর এই প্রবন্ধটির অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বিষয়োচিত গাম্ভীর্য অনুযায়ী বীরবলী বাক্‌চাতুর্য ও রস-রসিকতাও শিল্প-দেহ বিচ্ছুরিত লাবণ্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য-চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব তাঁহার 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধেও প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতচন্দ্র যে এক বিশুদ্ধ শিল্পিমনের অধিকারী ছিলেন এবং প্রকৃত শিল্পী হিসাবে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাঁহার যে শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য, তাহা প্রমথ চৌধুরী তাঁহার প্রবন্ধের প্রারম্ভেই প্রমাণ সহযোগে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের সাংসারিক জীবন

১ 'প্রবন্ধ-সংগ্রহ' ১ম খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৯৫২), পৃঃ ২০৯-৪০

অতিশয় দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইলেও তাঁহার কাব্যে দারিদ্র্যের বা বাস্তব দুঃখবাদের কোন ছায়াপাত কিংবা তাহার গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। বরং তাহার বিপরীত অর্থাৎ এক হাস্যোজ্জ্বল সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনধারার চিত্রই ভারতচন্দ্রের কাব্যে চিত্রিত হইয়াছে। যথার্থ শিল্পীর ক্ষেত্রেই ব্যক্তিজীবন ও শিল্পিজীবনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান বা বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের মধ্যে প্রকৃত শিল্পি-সত্তা আবিষ্কার করিয়া তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন।

'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের ভাষা ও কাব্যবিচার প্রসঙ্গেও প্রমথ চৌধুরীর আলোচনা যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তেমনি সরস ও মূল্যবান্ হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাব্য যে ঘৃণ্য ও অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট এই প্রচলিত অভিযোগের প্রত্যুত্তরে প্রমথ চৌধুরী যে নিজস্ব যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মৌলিক চিন্তা ও গভীর রসবোধের পরিচায়ক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদিরস নয়, হাস্যরস। এ রস মধুর রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়, মস্তিষ্ক, জীবন নয়, মন।'[১]

প্রমথ চৌধুরীর শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ হইতে তাঁহার শিক্ষা সম্পর্কিত নিজস্ব চিন্তা ও মতবাদের সহিত পরিচয় লাভ করিবার সুযোগ হয়। 'আমাদের শিক্ষা', 'বাংলার ভবিষ্যৎ', 'বই পড়া', 'আমাদের শিক্ষা ও বর্তমান জীবন সমস্যা', 'নব-বিদ্যালয়', 'নব-বিদ্যালয় (২)', 'নব-বিদ্যালয় (ভাষা-শিক্ষা)', 'শিক্ষার নব আদর্শ' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়া জাতীয় শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও শিক্ষা-সংস্কারের বিবিধ পন্থা মনোজ্ঞ দৃষ্টান্ত সহযোগে নির্দেশিত হইয়াছে। শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ-সমূহের অধিকাংশই প্রমথ চৌধুরীর 'আমাদের শিক্ষা' নামক প্রবন্ধ সংকলনগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

প্রমথ চৌধুরী দেশের শিক্ষাধারার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং মাতৃভাষা শিক্ষাজীবনে অন্যতম প্রধান বাহন না হইলে যে জাতির যথার্থ শিক্ষালাভ সম্ভবপর নহে, তাহা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি

'প্রবন্ধ সংগ্রহ' ১ম খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৯৫২), পৃঃ ২৫৫

করিয়াছেন। প্রকৃত শিক্ষাই মানুষের মনুষ্যত্ব গঠন করে এবং সত্যকার শিক্ষা যে সাহিত্য-চর্চার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, প্রমথ চৌধুরীর শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধে তাহাও সুচিন্তিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। 'বই পড়া' নামক প্রবন্ধটি তাঁহার গভীর শিক্ষা-চিন্তার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। প্রমথ চৌধুরীর মতে বই পড়া শিক্ষা ও সাহিত্য-চর্চার একমাত্র উপায় এবং বর্তমানে মানুষের মনের সর্বতোভাবে পরিপুষ্টি সাধনের দায়িত্ব সাহিত্যের উপরই ন্যস্ত হইয়াছে। কারণ, মানুষের বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম-নীতি, তাহার অন্তরের সর্ববিধ কামনা-বাসনা ও গভীর সত্য-সাধনার সার্থক সমন্বয়ের ফলেই সাহিত্যের উদ্ভব হয়। অন্যবিধ শাস্ত্রে মানুষের মনের অংশ মাত্রের সহিত পরিচয় লাভের সুযোগ হয় কিন্তু সাহিত্যে মানুষের অখণ্ড মনের পরিপূর্ণ রূপের সহিত পরিচয় হইয়া থাকে। অতএব প্রমথ চৌধুরীর মতে সাহিত্য-চর্চাই জাতীয় শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ এবং এই উদ্দেশ্যে দেশের মধ্যে বহু সংখ্যক লাইব্রেরী স্থাপনার আবশ্যকতা তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরী লাইব্রেরীকে স্কুল-কলেজ অপেক্ষাও উচ্চাসন দান করিয়াছেন। কারণ, লাইব্রেরী মানুষকে স্বশিক্ষিত ও আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইবার সর্ববিধ সুযোগ ও প্রেরণা দান করে। স্কুল-কলেজের ত্রুটিবহুল শিক্ষা দ্বারা দেশের সত্যকার উন্নতি যে ব্যাহত হইয়াছে এবং অগণ্য শিক্ষার্থীর মানসিক অপমৃত্যু যে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যর্থতাই প্রমাণ করিয়াছে, প্রমথ চৌধুরী তাঁহার বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রবন্ধে তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বর্তমানে স্কুল-কলেজের শিক্ষা যে মারাত্মক ও ভয়াবহ অর্থাৎ ইহাতে জাতির প্রাণশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে ও শিক্ষার্থিগণের স্বশিক্ষিত হইবার মানসিক উদ্যম বিনষ্ট করিয়াছে, তাহা প্রমথ চৌধুরীর প্রমাণ-নির্ভর তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'বই পড়া' প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। * * * যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্‌বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত-বিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক

মাত্র। আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উল্টো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে।'[১]

প্রমথ চৌধুরী তাঁহার রঙ্গ-রসিকতা ও অম্ল-মধুর মন্তব্যের মধ্য দিয়াও জাতীয় শিক্ষাদর্শ ও দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান্ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা তাঁহার গভীর চিন্তাশক্তি এবং যথার্থ শিক্ষানীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও ব্যাপক অভিজ্ঞতারই পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রমথ চৌধুরীর এই শ্রেণীর কোন কোন প্রবন্ধে বক্তব্য বিষয় অপেক্ষা বীরবলসুলভ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপ্রবণতা ও আপাত-অসম্ভব মন্তব্যের (paradox) বিস্ময়-চমকই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে এবং এই প্রাধান্য যে তাঁহার প্রবন্ধের অন্যতম ত্রুটি, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ✓

✓ প্রমথ চৌধুরীর 'তেল-নুন-লক্ড়ি,' 'দু-ইয়ার কি', 'রায়তের কথা,' 'ঘরে বাইরে প্রভৃতি প্রবন্ধ সংকলন হইতে প্রধানতঃ তাঁহার রাষ্ট্র ও সমাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধি ও সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় লাভ করা যায়। এই সকল প্রবন্ধে তাঁহার অনাবশ্যক ভাবপ্রবণতা বা অবান্তর প্রসঙ্গের বাহুল্য ঘটে নাই। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নানামুখী সমস্যা সম্পর্কে পরিহাস-রসিকতার আবরণে লেখকের নির্মম সত্যভাষণই তাহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'রায়তের কথা' প্রমথ চৌধুরীর একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে কৃষক-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগের তথ্যবহুল বিস্তৃত বিবরণের মধ্য দিয়া তাঁহার সুগভীর সহানুভূতি ও মমত্ববোধ প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষকদিগের দুরবস্থার মূল কারণসমূহের বিচার-বিশ্লেষণে প্রমথ চৌধুরী বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বের আশ্রয় লইয়াছেন এবং ফলে, তাঁহার আলোচনাটি নির্ভরযোগ্য ও সারগর্ভ হইয়া উঠিয়াছে। বক্তব্য বিষয় পত্রাকারে বিবৃতির মধ্যেও লেখকের নিজস্ব রচনাগত সৌষ্ঠবের অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রমথ চৌধুরী স্বয়ং জমিদার ছিলেন; অথচ জমিদারী প্রথার তীব্র ও তীক্ষ্ণ সত্যনিষ্ঠ সমালোচনায় তাঁহার নিরপেক্ষ, নিরাবেগ ও নির্ভীক দৃষ্টিভঙ্গি বিস্ময়কর।

১ 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' ১ম খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৯৫২), পৃঃ ১৬৮-৬৯

প্রাচীন কাল অর্থাৎ মনুর যুগ হইতে রায়তেরাই মুখ্যতঃ জমির মালিকানা স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের পর্ব হইতেই এই প্রচলিত নিয়মে ছেদ পড়িয়াছে এবং রায়তেরা জমির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয় জমিদারের অধীনস্থ হইয়াছে। রায়তদিগের জমির মালিকানা-স্বত্ব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রমথ চৌধুরী তাঁহার 'রায়তের কথা' প্রবন্ধে যে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে মূল্যবান্। কৃষকদিগের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা ও দাসত্বের মৌলিক কারণসমূহ উল্লেখ করিয়া ইতিপূর্বে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে যে সুদীর্ঘ আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, প্রমথ চৌধুরীও সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকদিগের জীবনযাত্রার সম্যক্ বিচার-বিশ্লেষণে ব্রতী হইয়াছেন। কৃষকদিগের দুঃখ-দুর্দশার মূলে আধুনিক তথাকথিত রাজনীতিবিদ্‌-গণের অদূরদর্শিতা ও স্বার্থমূলক প্ররোচনা যে অনেকাংশে দায়ী, তাহাও তিনি তাহার গভীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সহায়তায় উপলব্ধি করিয়াছেন এবং দেশের বর্তমান 'পলিটিশিয়ান'দের কৃত্রিম দেশসেবা ও সৌখীন রাজনীতি-চর্চার স্বরূপ-প্রকৃতিও তিনি তাঁহার প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। 'রায়তের কথা' প্রবন্ধের একাংশে প্রমথ চৌধুরী লিখিয়াছেন—

'বঙ্কিমের যুগে পলিটিশিয়ানদের অজ্ঞতার যা পরিমাণ ছিল, ইতিমধ্যে তা যে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য, কেননা ইতিমধ্যে বাংলার ভদ্রলোকের দল জমি থেকে ঢের বেশি আলগা হয়ে পড়েছে। এখন এ সম্প্রদায় টিঁকে আছে চাকরি ওকালতি ও ডাক্তারির উপর। ডাক্তারি-কেরানিগিরির সঙ্গে জমিজমার কোনোই সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে শুধু ওকালতির সঙ্গে। আমাদের উকিল সম্প্রদায়ের সম্পদ অবশ্য জমিদার ও রায়তের বিপদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বেঙ্গল টেনান্সি জানা এক কথা, আর বেঙ্গল টেন্যান্ট্রি জানা আর-এক কথা। * * * অথচ এই দলের লোকই হচ্ছেন আমাদের পলিটিক্সের ল্যাজা-মুড়ো দুইই।'[১]

প্রমথ চৌধুরী এই জাতীয় প্রবন্ধে যুক্তি ও তথ্যের সুশৃঙ্খল সমাবেশে তাঁহার বক্তব্য বিষয়কে যেমন সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন, তেমনি তাঁহার রঙ্গ-রসমধুর

১ 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' ১ম খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৯৫৪), পৃঃ ১২২-২৩

পরিবেশনগুণের ফলে তাহা সরস ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। প্রমথ চৌধুরীর এই সকল প্রবন্ধ সাধারণতঃ ইংরাজী সাহিত্যে প্রচলিত Treatise-জাতীয় রচনার সগোত্র।

ভারতবর্ষের বিচিত্র ইতিবৃত্ত ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সহিত প্রমথ চৌধুরীর নিবিড় পরিচয় ছিল। ইতিহাসের বিভিন্ন অন্ধকার অলিন্দে তাঁহার সদাজাগ্রত কৌতূহলী দৃষ্টির আলোকপাত হইয়াছে। দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যধারা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর নিরলস সুগভীর অধ্যয়ন ও অনুশীলনের পরিচয় তাহার বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রবন্ধে প্রকাশ পাইয়াছে। সাধারণ ইতিহাসের স্বরূপ বা প্রকৃতি মুখ্যতঃ প্রামাণ্য তারিখ-পঞ্জী ও নির্ভুল সত্যনিষ্ঠ ঘটনা-বিবৃতি দ্বারাই ভারাক্রান্ত ও সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সাধারণ প্রচলিত ইতিহাসের এই সংজ্ঞা দ্বারা বিচার্য নহে। ইতিহাসের নিখুঁত ঘটনা-বিবৃতিই তাঁহার ঐতিহাসিক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হয় নাই। প্রমথ চৌধুরী সাধারণতঃ ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাস্রোত হইতে চিত্তাকর্ষক অথচ রহস্যময় কোন ঘটনা নির্বাচন করিয়া তাহার উপরই নূতনভাবে আলোকসম্পাত করিয়াছেন এবং পেশাদারী ঐতিহাসিকের গবেষণাধর্মী দৃষ্টি অপেক্ষা রসসম্মত শিল্প-দৃষ্টিই তাঁহার প্রবন্ধসমূহের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বীরবলী অভিনব আঙ্গিকের গঠন-সৌষ্ঠবই প্রমথ চৌধুরীর ইতিহাসাশ্রিত প্রবন্ধের একমাত্র আকর্ষণ নহে। এই শ্রেণীর প্রবন্ধে প্রচলিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক মতবাদ সম্পর্কে তাঁহার মনে যে সংশয় বা প্রশ্ন জাগ্রত হইয়াছে, বিবিধ যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তাহারই নিরসনে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীর 'নানা চর্চা' গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবন্ধের অধিকাংশই ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে 'হর্ষচরিত,' 'পাঠান বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ', 'বীরবল' প্রভৃতি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

'হর্ষচরিত' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী রাজা হর্ষবর্ধন সম্পর্কে লিখিত বাণভট্ট ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাস গ্রন্থদ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার ইতিহাস-সন্ধানী দৃষ্টির নিকট যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য সংশয়জাল বিস্তার করিয়াছে, উপযুক্ত প্রমাণ সহযোগে তিনি তাহা সুস্পষ্ট করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীর ঐতিহাসিক প্রবন্ধের বিশেষত্ব এই যে, ইহা তাঁহার গভীর গবেষণা-জাত তথ্যাদির বাহুল্য অপেক্ষা সাধারণ বুদ্ধি-নির্ভর (Common

sense) বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারাই অধিক সমৃদ্ধ হইয়াছে এবং ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ শিল্পিজনোচিত কৌতুকের ভাষায় বিবৃত হইবার ফলে সাধারণের নিকট অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হইয়াছে।

মুসলমান যুগের কয়েকটি বিলুপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের পুনরুদ্ধারেও প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তিনি 'পাঠান বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ' নামক প্রবন্ধে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অনুরক্ত রাজকুমার বিজুলি খাঁ চরিত্রের ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে বিজুলি খাঁ নামে যে ব্যক্তির বর্ণনা পাওয়া যায়, ঐতিহাসিক অমৃতলাল শীল তাহারই যে প্রকৃত নাম আহম্মদ খাঁ, তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী অমৃতলালের মতের বিরোধিতা করিয়া ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি চৈতন্য সমকালীন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, 'চৈতন্যের যুগে বিজুলি খাঁ নামে একটি স্বতন্ত্র ও স্বনামখ্যাত রাজকুমার ছিলেন।' ইতিহাসসম্মত যুক্তি ও ব্যাখ্যার অপূর্ব কৌশলে প্রমথ চৌধুরীর 'পাঠান বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ' প্রবন্ধটি সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

প্রমথ চৌধুরী তাঁহার 'বীরবল' নামক প্রবন্ধে প্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের *'Akbar The Great Mogul'* নামক ইতিহাস গ্রন্থে বীরবল সম্বন্ধে যে কয়েকটি মিথ্যাবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাই খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বীরবল যে কেবলমাত্র সম্রাট্ আকবরের সুরসিক সভাসদই ছিলেন না,—একজন রাজনীতিবিদ্ সৈনিক ও সত্যভাষী সজ্জন হিসাবেও যে তাঁহার বিশিষ্ট পরিচয় ছিল, প্রমথ চৌধুরী বীরবলের জীবনী পর্যালোচনা করিয়া তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। বীরবল সম্পর্কিত ঐতিহাসিক স্মিথ বর্ণিত মিথ্যাবাদ খণ্ডন করিতে প্রমথ চৌধুরী যে ব্যঙ্গ-রসরসিকতার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা দ্বারা কোথাও তাঁহার অসংযত বা অমার্জিত মনোভাব প্রকাশ পায় নাই। বরং প্রমথ চৌধুরীর পরিশুদ্ধ ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরস সৃষ্টির দ্বারা তাঁহার বিদগ্ধ মননধর্মী রসিক মনেরই সুপ্রসন্ন প্রকাশ ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'বীরবল' নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'স্মিথ সাহেব বলেন যে, বীরবল যে আকবর বাদশার মন্ত্রী ছিলেন, একথা ভুল ; তিনি অনুমান করেন যে, বীরবল ছিলেন আকবরের আস্তাবলের জমাদার।

* * * কিন্তু এই অদ্ভুত অনুমানের কারণ আরও অদ্ভুত। আকবর ফতেপুর-শিক্রীতে বীরবলের বাসের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন, সে ইমারত আজও দাঁড়িয়ে আছে। সে বাড়ির বর্ণনা স্মিথ সাহেবের কথাতেই নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

The proximity of his beautiful house in the palace of fathpur-sikri to the stables has suggested the hypothesis that he may have been master of Horse.

* * * তাই আস্তাবলের পাশে যার বাড়ি, সেই যে সহিস এ কথা মেনে নিতে আমি কুণ্ঠিত। আলিপুরে লাটসাহেবের বাড়ির পাশেই আছে পশুশালা, এর থেকে লাট সাহেবকে পশুশালার অধ্যক্ষ বলে ধরে নেওয়াটা ঐতিহাসিক বুদ্ধির কাজ হতে পারে, কিন্তু সহজবুদ্ধির কাজ নয়।'[১]

প্রমথ চৌধুরী যদিও প্রচলিত অর্থে গভীর গবেষণাকুশল ঐতিহাসিক নহেন, কিন্তু ইতিহাসের নীরস তথ্য-সামগ্রী সম্পূর্ণ অভিনবভাবে রূপান্তরিত করিয়া পরিবেশনের এক অসামান্য শিল্পিসুলভ ক্ষমতার তিনি যে অধিকারী ছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

প্রমথ চৌধুরী প্রধানতঃ বুদ্ধিদীপ্ত, মননশীল লেখক। অনাবশ্যক ভাবালুতা বা নিছক কল্পনাতিশয্যে তাঁহার রচনা কখনও সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হয় নাই। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নিরিখে ও শ্লেষ-বিদ্রূপাত্মক তির্যক ভঙ্গিতে সকল বিষয়ের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর কয়েকটি রচনায় আত্মতন্ময় ভাব-কল্পনা ও হৃদয়াবেগের গভীর স্পন্দনও অনুভূত হইয়াছে। তাঁহার বিশুদ্ধ আত্মভাবনিষ্ঠ (subjective) প্রবন্ধসমূহেই প্রধানতঃ বিদ্রূপাত্মক তির্যক ভঙ্গির অন্তরালে কল্পনা-গভীর আবেগপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। 'বর্ষা', 'ফাল্গুন', 'বর্ষার দিন' প্রভৃতি প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীর সহজাত ব্যঙ্গ বা বুদ্ধিমত্তার বিশেষ প্রাখর্য বা ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায় নাই; বরং তাঁহার অন্তরঙ্গ অনুভূতির স্নিগ্ধতায় এই প্রবন্ধসমূহ অধিকতর রসোজ্জ্বল হইয়াছে। প্রমথ চৌধুরী সৌন্দর্যমুগ্ধ বিশুদ্ধ কবিমনেরও যে অধিকারী ছিলেন, তাহা এই সকল প্রবন্ধ দ্বারা প্রমাণিত হয়। তাঁহার এই শ্রেণীর প্রবন্ধে বিষয় বা বস্তু অপেক্ষা

---

১ 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' ১ম খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৯৫২), পৃঃ ১৯৫-৯৬

কল্পনানুভূতি ও ব্যক্তিগত ভাব-তন্ময়তাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। অপূর্ব কাব্যসম্মত ভাষায় আপন রসানন্দের স্নিগ্ধ প্রসন্নতার প্রকাশ তাঁহার 'বর্ষা' নামক প্রবন্ধে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রমথ চৌধুরীর 'বর্ষা' প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি যে, যেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমগ্র আকাশ বর্ষায় ভরে গিয়েছে। মাথার উপর থেকে অবিরাম অবিরল অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির ধারা পড়ছে। সে ধারা এত সূক্ষ্ম নয় যে চোখ এড়িয়ে যায়, অথচ এত স্থূলও নয় যে তা চোখ জুড়ে থাকে। আর কানে আসছে তার একটানা আওয়াজ; সে আওয়াজ কখনো মনে হয় নদীর কুলুধ্বনি, কখনো মনে হয় তা পাতার মর্মর। আসলে তা একসঙ্গে ও দুইই; কেননা আজকের জলের স্বর ও বাতাসের স্বর দুই মিলে-মিশে একসুর হয়ে দাঁড়িয়েছে।'[১]

প্রমথ চৌধুরীর একমাত্র আত্মজীবন-ভিত্তিক প্রবন্ধগ্রন্থ 'আত্ম-কথা'। 'আত্ম-কথা'য় তাঁহার শৈশবকাল হইতে ইংলণ্ড যাত্রার পূর্ব পযন্ত কয়েকটি বিচিত্র ঘটনা অতি ক্ষুদ্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রমথ চৌধুরীর এই সংক্ষিপ্ত আত্ম-বিবৃতি তাঁহার পূর্ণাঙ্গ আত্মচরিত রূপায়ণের পক্ষে যেমন যথেষ্ট নহে, তেমনি তাহা দ্বারা 'আত্ম-কথা'য় বর্ণিত বিষয়ও সম্যক্‌ভাবে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। এবংবিধ স্বল্প-বিবৃতি-মূলক 'আত্ম-কথা'য় প্রমথ চৌধুরীর বৈচিত্র্যবহুল জীবনের বহুবিধ প্রসঙ্গ এবং সমকালীন দেশের বিচিত্র পটভূমি ও বিশিষ্ট সামাজিকগণের পরিচয় অপ্রকাশিত রহিয়া গিয়াছে। আত্মসমাহিত, ধীর অচঞ্চল চিত্তে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ আত্মজীবনী রচনার যে ঐকান্তিক প্রয়াস ও পরিবেশ, তাহা প্রমথ চৌধুরীর ছিল না। সেইজন্য তাঁহার 'আত্ম-কথা' ক্ষণিক খণ্ড-বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল চিন্তার কয়েকটি রেখাচিত্রের সংকলন মাত্রেই পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর বিশেষত্ব যে এই ক্ষুদ্র খণ্ড চিত্রাবলীর মধ্যেও তাঁহার বিদগ্ধ মনের স্বাভাবিক দীপ্তি সম্পূর্ণভাবে নিষ্প্রভ হয় নাই। প্রমথ চৌধুরীর 'আত্ম-কথা'য় চিন্তার যে অসংলগ্নতা বা ঘটনার সংকোচন ও প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটিয়াছে, সে-সম্পর্কে তিনি স্বয়ং সচেতন ছিলেন এবং তাঁহার 'আত্ম-কথা'র 'কৈফিয়ত' অংশে লিখিয়াছেন—

'আত্ম-কথা লিখতে আরম্ভ করি অতি দুঃসময়ে। রবীন্দ্রনাথ তখন একটি কঠিন রোগে আক্রান্ত। পরে তিনি সে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলেন। তারপর ১৯৪১

১ 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' ২য় খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ১৩৫৪), পৃঃ ২৬১

সালে উপর্যুপরি আমার নানারকম দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল। প্রথমত উক্ত সালের জুন মাসে আমার প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র কালীপ্রসাদ বিমানযুদ্ধে মারা যায়। তারপর ৭ই অগস্টে আমার জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তার কিছুদিন পরে ২রা অক্টোবর তারিখে আমার শাশুড়ী ৺জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, যাঁর আশ্রয়ে বাস করতুম, তিনি ইহলোক ত্যাগ করে চলে যান। তার বছর খানেক পূর্ব্বে তাঁর একমাত্র পুত্র এবং আমার শ্যালক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর অপ্রত্যাশিত রূপে যন্ত্রণাদায়ক রোগভোগ ক'রে মারা যান। * * * তার কিছুকাল পরে আমি কলকাতা ত্যাগ ক'রে, পৌষমেলার অব্যবহিত পূর্ব্বে সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে চলে আসি—জাপানী আক্রমণের ভয়ে।'[১]

'আত্ম-কথা'র এই কৈফিয়ত হইতে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় যে, প্রমথ চৌধুরীর এইরূপ মানসিক অবস্থায় লিখিত আত্মজীবনী মধ্যে তাঁহার বিশৃঙ্খল চিন্তা ও অপ্রাসঙ্গিক ঘটনার সমাবেশ একান্তভাবেই সংগত ও স্বাভাবিক।

প্রমথ চৌধুরীর 'আত্ম-কথা'ও তাঁহার দৃষ্টিকোণের মৌলিকত্বে ও রচনারীতির স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। বীরবলী বুদ্ধি-মার্জিত বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, ক্ষুরধার শ্লেষ-কৌতুক ভঙ্গি দ্বারা তাঁহার আত্মজীবনের যে কয়েকটি ঘটনা 'আত্ম-কথা'য় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে সাহিত্য-গুণ অর্জন করিয়াছে। প্রমথ চৌধুরীর 'আত্ম-কথা' মুখ্যতঃ যশোহর, কৃষ্ণনগর ও কলিকাতায় অবস্থানকালীন তাঁহার বাল্য ও যৌবনে সংঘটিত কয়েকটি কৌতুক-মধুর প্রাণোচ্ছল ঘটনার সমারোহ। এই প্রসঙ্গে 'আত্ম-কথা'র সাহিত্য-গুণ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সাহিত্য-রসিক অতুলচন্দ্র গুপ্তের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য। অতুলচন্দ্র লিখিয়াছেন—

'সাহিত্যিকের আত্মকথা হিসাবেই এ বইএর আকর্ষণ নয়। এ আত্ম-কাহিনীতে যে সব ঘটনা ও লোকের বর্ণনা আছে তা এমন নিপুণ রেখায় আঁকা, এমন কৌতুক হাস্যে সমুজ্জ্বল যে নিজগুণেই তা সাহিত্য হয়ে উঠেছে। * * * এই আত্মকথা সাহিত্য হিসাবে তাঁর ছোট গল্পের মতই তীক্ষ্ণ ও রসাল।'[২]

প্রমথ চৌধুরীর মানস-চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও গদ্যভাষার স্বকীয় ধর্ম প্রসঙ্গেও 'আত্ম-কথা'য় যে সামান্য ইঙ্গিত আছে, তাহা দ্বারা তাঁহার অভিনব

১ 'আত্ম-কথা,' (কলিকাতা, ১৩৫৩), পৃঃ ৷৶৹-৸৹

২ 'আত্ম-কথা' গ্রন্থে অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখিত ভূমিকা, পৃঃ ৷৵৹

রচনারীতি ও ভাষার বনিয়াদ সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়। আলালী ভাষার গ্রাম্যতা পরিহার করিয়া বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ব্যাপক ভাবে বিশুদ্ধ সাহিত্য-গুণান্বিত চলিত ভাষা ও গদ্যরীতি প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে প্রমথ চৌধুরীর যে গভীর প্রস্তুতি ছিল, সেই সম্পর্কে 'আত্ম-কথা'য় তাঁহার নিজস্ব বিবৃতি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

প্রমথ চৌধুরী যে মুখ্যতঃ পরিহাস-রসিক ছিলেন, 'আত্ম-কথা'য় নির্বাচিত অধিকাংশ কৌতুকোজ্জ্বল ঘটনা-বিবৃতি দ্বারাও তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বক্র-রসিক ইঙ্গিত এবং পরিবেশনের চমৎকারিত্বে 'আত্ম-কথা' গল্পের ন্যায় বৈচিত্র্যময় ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থের সহিত প্রথম পরিচয়ের ভূমিকা স্বরূপ প্রমথ চৌধুরী যে ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যেমন এক নির্মল বিশুদ্ধ কৌতুকরসে উজ্জ্বল তেমনি উপভোগ্য। 'আত্ম-কথা' হইতে উক্ত প্রসঙ্গের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'হেয়ার ইস্কুলে আমি ক্রমে আবিষ্কার করি যে, অনেকের কাছে আমি 'ললিতা' বলে পরিচিত ছিলুম। আমি একটি ছোক্‌রাকে একদিন জিজ্ঞাসা করি এ নামের অর্থ কি?—সে বলে, "তুমি রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' পড়নি?" আমি বলি, "না।" "সে বলে, একখানি 'ভগ্নহৃদয়' কিনে পড়, তাহলেই জানতে পারবে যে, ললিতার সঙ্গে তোমার কি মিল আছে।" তার কথায় আমি 'ভগ্নহৃদয়' কিনে পড়ি। রবীন্দ্রনাথের পুস্তকের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।'[১]

'আত্ম-কথা' প্রথম শ্রেণীর সার্থক আত্মজীবনীর সমগোত্রীয় না হইলেও ইহাতে প্রমথ চৌধুরীর বাচনভঙ্গির মৌলিকত্ব ও চারুত্ব, মার্জিত পরিহাসবোধ এবং শাণিত বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দ্বারা ইহা এক অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী একজন প্রাজ্ঞ প্রবন্ধকার। আঙ্গিক-সচেতন শিল্প-দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু ব্যাপক চিন্তাশীলতায়, সূক্ষ্ম পরিহাস-মধুর বিচার-বিতর্কে ও প্রখর ব্যক্তিত্বের নিবিড় স্পর্শে তাঁহার প্রবন্ধসমূহ আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের গৌরবময় ধারা ও গতি অব্যাহত রাখিয়াছে।

১ 'আত্ম-কথা,' (কলিকাতা, ১৩৫৩) পৃঃ

পঞ্চম অধ্যায়

বিবিধ প্রবন্ধকার

রবীন্দ্র-পর্বের প্রবন্ধ-সাহিত্য রবীন্দ্র-প্রতিভার অপরিমিত দানে যেমন পরিপুষ্ট ও প্রসারিত হইয়াছে, তেমনি তাঁহার অভিনব সাহিত্যাদর্শ ও রূপ-রীতি বহু সংখ্যক লেখক লেখিকাকে প্রবন্ধ রচনা-কর্মে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। এই পর্বের অধিকাংশ প্রবন্ধকারই রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক ও গভীর প্রভাব অস্বীকার করিতে পারেন নাই এবং কৃতিত্বসম্পন্ন বহু প্রবন্ধকার ভাব ও রচনাভঙ্গির জন্য রবীন্দ্রনাথের নিকট নানা প্রকারে ঋণী হইয়াছেন। অন্যান্য পর্ব অপেক্ষা রবীন্দ্র-পর্বেই জাতি ও দেশ-কাল নিরপেক্ষ এক সার্বভৌম ভাব-মন্ত্রের প্রেরণা লাভ করিয়া বহু কৃতী প্রবন্ধকারই ভাবে, রূপে ও অসীম বৈচিত্র্যে এক বিশাল প্রবন্ধ-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পর্বেই প্রধানতঃ লেখকগণ নিজস্ব ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী এক একটি বিশেষ বিষয় নির্বাচন করিয়া তাহার যথার্থ অনুশীলন ও গভীর গবেষণায় নিয়োজিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের চিন্তা, রসবোধ ও প্রকাশনৈপুণ্য একটি বিশেষ বিষয়েই সর্বাধিক কৃতিত্ব অর্জন করিযাছে। সাহিত্য, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধকারগণের বৈশিষ্ট্য ও রচনানৈপুণ্য রবীন্দ্র-পর্বের বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যকেও যে যথাযোগ্য পরিমাণে বিকশিত হইবার সুযোগ দান করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

নবীনচন্দ্র সেন— নবীনচন্দ্র সেন একজন বিশিষ্ট কবি এবং বাংলা সাহিত্যে মুখ্যতঃ কবিরূপেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং জীবনী-কাব্যের মধ্যে নবীনচন্দ্রের কবিমানসের যথার্থ পরিচয় লাভ করা যায়। তাঁহার এই কবিমনের উষ্ণ স্পর্শ তাঁহার প্রবন্ধ রচনায়ও দুর্লভ নহে। যদিও নবীনচন্দ্রের প্রবন্ধের সংখ্যা পরিমাণে অল্প; তথাপি তাহা দ্বারাই তাঁহার স্বচ্ছ ভাব-চিন্তা এবং সাবলীল গদ্যভঙ্গির বিশিষ্টতা প্রকাশ পাইয়াছে।

নবীনচন্দ্রের 'প্রবাসের পত্র' (১৮৯২) কয়েকটি পত্রের একটি সংকলন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণকালে অর্থাৎ লক্ষ্ণৌ, অমৃতসর, দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে নবীনচন্দ্র তাঁহার স্ত্রীকে যে সকল পত্র

লিখিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সংকলিত হইয়া 'প্রবাসের পত্র' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কবির ভাবৈশ্বর্য বা অভিনব চিন্তার কোন পরিচয় ইহাতে প্রকাশ পায় নাই এবং তাঁহার 'প্রবাসের পত্র'কে যথার্থ সৃষ্টিধর্মী রচনা-শিল্পের মর্যাদায়ও ভূষিত করা যায় না। কিন্তু ইহার কয়েকটি পত্র উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনায় ও ঐতিহ্যগত মাহাত্ম্য প্রকাশনৈপুণ্যে অপেক্ষাকৃত প্রবন্ধধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। অতএব নবীনচন্দ্রের 'প্রবাসের পত্রে'র কোন কোন পত্র যে সার্থক পত্র-প্রবন্ধের মহিমা অর্জন করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

'প্রবাসের পত্র' ব্যতীত নবীনচন্দ্রের আত্মজীবন-চরিতমূলক একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'আমার জীবন'। ইহা পাঁচটি ভাগে সম্পূর্ণ এবং যথাক্রমে ইহার প্রথম ভাগ ১৯০৮, দ্বিতীয় ভাগ ১৯০৯, তৃতীয় ভাগ ১৯১০, চতুর্থ ভাগ ১৯১২ এবং পঞ্চম ভাগ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। 'আমার জীবনে'র ন্যায় সুবৃহৎ আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্যে অদ্যাপি লিখিত হয় নাই। নবীনচন্দ্র এই গ্রন্থে তাহার কাব্য-চর্চা, শিক্ষা ও কর্ম-জীবনের সর্ববিধ ঘটনারই বিস্তারিত পরিচয় দান করিয়াছেন। সরকারী কর্মোপলক্ষে তাঁহাকে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল এবং ফলে, বিভিন্ন জাতির সামাজিক জীবনযাত্রা ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্পর্কে নবীনচন্দ্র বহুল অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিচিত্র বিবরণ 'আমার জীবনে' লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সরল কবিত্বপূর্ণ ভাষা ও অভিনব পরিবেশন নৈপুণ্যে এই সুবৃহৎ আত্মজীবনীও সুখপাঠ্য ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ভাবাবেগোচ্ছল হৃদয়বান্ কবি নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' প্রসঙ্গে বিদগ্ধ সাহিত্য-রসিক প্রমথ চৌধুরী মন্তব্য করিয়াছেন—

'এই বইখানি সেন মহাশয়ের জীবনচরিত হলেও একখানি নভেল বিশেষ। আর সেন মহাশয় হচ্ছেন এ নভেলের একমাত্র নায়ক।'[১]

প্রমথ চৌধুরীর এই মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 'আমার জীবনে' পরিবার ও পরিবার-বহির্ভূত বিভিন্ন ব্যক্তির চরিত্র-চিত্রণে নবীনচন্দ্র যে নিপুণ শিল্প-সৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার আত্মকাহিনী অপেক্ষাকৃত উপন্যাসধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। পরিপাটি ও সুষ্ঠুভাবে ঘটনা ও চরিত্র-বিশ্লেষণ

১ 'আত্ম-কথা', (কলিকাতা, ১৩৫৩), পৃঃ ৬

সাধারণতঃ ঔপন্যাসিকেরই সহজ ধর্ম। নবীনচন্দ্র তাঁহার জীবনীতে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল ব্যক্তি-চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা অতি উজ্জ্বল-বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ বিদ্যাসাগরের চরিত্র-চিত্রটির উল্লেখ করা যায়। বিদ্যাসাগরের স্নেহার্দ্র হৃদয়, বিপন্নের প্রতি তাঁহার করুণাসিক্ত অন্তরের মহত্ত্ব, নবীনচন্দ্র অপূর্ব নৈপুণ্য সহকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের সহিত প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তে নবীনচন্দ্রের যে স্বগতোক্তি, তাহা দ্বারাই বিদ্যাসাগরের ব্যক্তি-চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ রূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। চরিত্র-বিশ্লেষণের অসামান্য কৃতিত্বে 'আমার জীবন' যে বহুল ক্ষেত্রেই উপন্যাসের মহিমা অর্জন করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

নবীনচন্দ্র 'আমার জীবন' গ্রন্থের সূচনায় পাশ্চাত্ত্য কবি Longfellow-র মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

Life is real, life is earnest.

সম্ভবতঃ, ইংরাজ কবির এই বাণীমন্ত্র আশ্রয় করিয়াই নবীনচন্দ্র তাঁহার নিজ জীবন-অলিন্দের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। পরিমিত আয়তনের মধ্যে নিরাসক্ত শিল্পীর যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যদৃষ্টি, নবীনচন্দ্রে তাহা তত অধিক ছিল না। সেইজন্য তাঁহার আত্মজীবনী মধ্যে তিনি এমন বহুবিধ ঘটনা অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহা দ্বারা তাঁহার শিল্পবোধ ও মাত্রাজ্ঞান অতীব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যে অপূর্ব পরিমিতিবোধ ও রসজ্ঞান আত্মজীবনী রচনার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক, নবীনচন্দ্রের মধ্যে তাহার যথার্থ অভাব ছিল বলিয়াই 'আমার জীবন' প্রথম শ্রেণীর শিল্প-সৃষ্টির গৌরব অর্জন করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, 'আমার জীবনে'র রচনারীতি আদ্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল এবং বর্ণনার মনোহারিত্বে ও পরিহাস-রসিকতায় ইহা সর্বজনোপভোগ্য ও সরস হইয়া উঠিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের সহজাত পরিহাসপ্রিয়তা যেমন তাঁহার আত্মজীবনীমূলক সুদীর্ঘ রচনাকে রসমধুর করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে তাঁহার সৌন্দর্যবোধের মহান্ উদাত্ত গাম্ভীর্য রচনা মধ্যে অতিরিক্ত এক সাহিত্যিক লাবণ্য এবং শ্রী দান করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্র বর্ণনা প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রের রচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'বাস্তবিকই শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রশোভা স্বর্গীয় শোভা বিশেষ। নগরের প্রান্তের পর প্রায় অর্দ্ধক্রোশব্যাপী অনন্ত অমল শ্বেত বালুকারাশিপূর্ণ সাগরবেলা। তাহার

পর অনন্ত নীল লীলাময় অনন্ত সাগর সুদূর আকাশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সেই শোভা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। * * * তরঙ্গের পর তরঙ্গ, আবার তাহার পর তরঙ্গ, লহরে লহরে বেলায় আসিয়া প্রহৃত হইতেছে এবং ফেনরাশি উদ্গীর্ণ করিয়া দিবসে যূথিকামালার এবং নিশিতে অনন্ত নক্ষত্রমালার দীর্ঘ কণ্ঠভূষণে বেলাভূমিকে ভূষিত করিতেছে।'[১]

যথার্থ শিল্পসম্মত আত্মজীবনীর সমগোত্রীয় না হইলেও 'আমার জীবনে' নবীনচন্দ্রের ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং অভিরুচির সহিত তৎকালীন বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের যে বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দ্বারা ইহা এক স্বতন্ত্র মহিমায় মহিমান্বিত হইয়াছে।

দীনেশচন্দ্র সেন—দীনেশচন্দ্র সেন ছোটগল্প, উপন্যাস ও কবিতা রচনা করিলেও বাংলা সাহিত্যে মুখ্যতঃ গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনার জন্যই প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট গবেষক হিসাবেই তিনি সুধীসমাজে সমধিক পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার আবেগপ্রবণ, রসগ্রাহী কবিমনের সহিত যুক্তিবাদী, বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির এক দুর্লভ সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। দীনেশচন্দ্রের প্রায় সকল প্রবন্ধেরই প্রতিপাদ্য বিষয় প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি। ঐতিহাসিক তথ্যপঞ্জীর আনুবীক্ষণিক বিশ্লেষণ এবং সাহিত্য-বিচার ও বিন্যাস-মাধুর্যে তাঁহার প্রতি প্রবন্ধগ্রন্থই সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

দীনেশচন্দ্রের প্রবন্ধের প্রধান আকর্ষণ তাঁহার কবিত্বময় ভাষা। পণ্ডিতসুলভ গবেষণা-মনোবৃত্তির অন্তরালে দীনেশচন্দ্রের এক উদার, মহৎ কবিপ্রাণের স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। তাঁহার সর্ববিধ চিন্তাগর্ভ রচনার মধ্যেও এই কবিপ্রাণের গভীর স্পন্দন সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। নীরস ঐতিহাসিক গবেষণা-নির্ভর প্রবন্ধও দীনেশচন্দ্রের অপূর্ব কাব্যধর্মী ভাষার সহায়তায় সহজ ও সরস হইয়া উঠিয়াছে। দীনেশচন্দ্রের কবিত্বপূর্ণ ভাষা প্রশংসার যোগ্য হইলেও তাঁহার গবেষণামূলক সকল প্রবন্ধের ক্ষেত্রে সর্বত্রই সার্থক ও উপযোগী হয় নাই—কোন কোন প্রবন্ধে রচনাগত গাম্ভীর্য ও ওজস্বিতা বিসর্জিত হইয়া অহেতুক মাধুর্য ও উচ্ছ্বাসই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং ফলে, প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুত্ব ও মহিমা যে কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। দীনেশচন্দ্রের ভাষা অপেক্ষাকৃত সংস্কৃতানুসারী

১ 'আমার জীবন' ৩য় ভাগ, (কলিকাতা, ১৩১৭), পৃঃ ১৯-২০

হইলেও সরস ও বেগবান্। সহজ-স্বচ্ছন্দ ও খরদীপ্ত ভাষার জন্য তাঁহার গবেষণাধর্মী আলোচনা কোথাও জটিল বা মন্থরগতি হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের সহায়তায় গভীর ব্যঞ্জনাবাহী ভাবচিত্র অঙ্কনেও দীনেশচন্দ্র অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। ভাষাকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক করিতে তাঁহার শব্দ ও অর্থালঙ্কারের সার্থক প্রয়োগও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দীনেশচন্দ্র যে একজন প্রথম শ্রেণীর ভাষা-শিল্পীও ছিলেন, তাহা ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়।

দীনেশচন্দ্রের প্রকাশিত প্রবন্ধ-সংগ্রহ ও পুস্তিকা যথাক্রমেঃ ১। 'রেখা' (১৮৯৫), ২। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬), ৩। 'রামায়ণী কথা' (১৯০৪), ৪। 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' (১৯২২), ৫। 'বৃহৎ বঙ্গ' ১ম-২য় খণ্ড, (১৯৩৫), ৬। 'আশুতোষ স্মৃতিকথা' (১৯৩৬), ৭। 'পদাবলী মাধুর্য্য' (১৯৩৭) ও ৮। 'প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান' (১৯৪০)। এই প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এবং 'বৃহৎ বঙ্গ' দীনেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি। এই গ্রন্থদ্বয় সমগ্র বাংলাদেশের ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সাধনার সম্যক্ পরিচয় উদ্ঘাটন করিয়াছে। দীনেশচন্দ্র বিবিধ ঐতিহাসিক প্রমাণ, তাম্রশাসনের উৎকীর্ণ লিপি, প্রস্তর-মূর্তির গঠন-সৌষ্ঠব ও নির্ভরযোগ্য বিচিত্র পুঁথি-পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ যেমন বহু প্রাচীন গ্রন্থের ভাষা ও বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃত এবং রসসম্মত আলোচনায় সমৃদ্ধ, তেমনি দীনেশচন্দ্রের 'বৃহৎ বঙ্গে' প্রাগৈতিহাসিক পর্ব হইতে পলাশীর যুদ্ধ-পর্ব পর্যন্ত বাংলা ও বাঙ্গালী জাতির সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দীনেশচন্দ্রের অসীম ধৈর্য, গভীর অধ্যবসায়, বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও গবেষণার এবংবিধ নিদর্শন বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। তাঁহার বিদগ্ধ মনন-চিন্তাসম্মত দীপ্ত জিজ্ঞাসার পরিচয় উক্ত গ্রন্থ দুইটির সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে।

দীনেশচন্দ্র নিছক তথ্যবিলাসী নীরস ঐতিহাসিক ছিলেন না। তাঁহার ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও রসরুচি সাধারণ তথাকথিত ইতিহাসবিদ্ হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র। তিনি একজন বিশিষ্ট রসবেত্তা এবং নিরাসক্ত, সংস্কারমুক্ত এক উদার মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। রসিকজনোচিত শিল্প-দৃষ্টি দ্বারা দীনেশচন্দ্র ইতিহাসের যাবতীয় প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার বক্তব্য বিষয় সহৃদয় আন্তরিকতায় সর্বত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ শিল্পিসুলভ প্রাণের রস

স্পর্শেই তাঁহার তথ্যবহুল ঐতিহাসিক প্রবন্ধও অপরূপ সাহিত্য-গুণে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

দীনেশচন্দ্র সেন সার্থক সাহিত্য-সমালোচকরূপেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সাহিত্য-বিচারে তিনি মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-রীতিরই অনুসরণকারী ছিলেন। দীনেশচন্দ্রের সমালোচনা-পদ্ধতি প্রধানতঃ সাঙ্গ্লেটিক বা সংশ্লেষাত্মক (synthetic)—বিশ্লেষণাত্মক (analytical) নহে। তাঁহার সমালোচনায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের অবতারণা বা বুদ্ধিসঞ্জাত বিচার-বিশ্লেষণ অপেক্ষা হৃদয়াবেগমিশ্রিত সুসংগত মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনাই অধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দীনেশচন্দ্রের 'রামায়ণী কথা'র প্রবন্ধসমূহের উল্লেখ করা যায়। 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে দীনেশচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনার স্বরূপ-ধর্ম সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন। এইরূপ পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা, এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। * * * যথার্থ সমালোচনা পূজা—সমালোচক পূজারি পুরোহিত—তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।'[১]

দীনেশচন্দ্র প্রধানতঃ বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক হিসাবেই সমধিক পরিচিত। তাঁহার সাহিত্যের ইতিবৃত্ত অর্থাৎ গবেষণাধর্মী আলোচনামূলক প্রবন্ধগ্রন্থের সবত্রই এক কবিসুলভ রসাত্মক ব্যাখ্যায় অধিকতর সমৃদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। মুখ্যতঃ প্রাচীন বাংলা কাব্য-সাহিত্যের আলোচনায় দীনেশচন্দ্রের মৌলিক রস-দৃষ্টির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। গভীর রসবোধ, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যচেতনা, সুকুমার রচনাভঙ্গি প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্য-রসিকের সকল গুণই দীনেশচন্দ্রে বর্তমান ছিল। দীনেশচন্দ্রের রসসম্মত সুনিপুণ আলোচনা তাঁহার সাহিত্যের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। তাঁহার কবিত্বসুলভ ভাষা ও সরস ব্যাখ্যা সমন্বিত রচনার নিদর্শন স্বরূপ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে কবিকঙ্কণ সম্পর্কিত কাব্যালোচনার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল—

'এই কবির লেখনীর বড় চমৎকার গুণ এই যে, ইঁহার মন্ত্রপূত স্পর্শে পশুজগতে

১ 'প্রাচীন সাহিত্য', (বিশ্বভারতী, ১৩৫৬), পৃঃ ৭-৮

মানবীয়-তত্ত্বের বিকাশ পায়। কবি প্রকৃতির পুষ্প-পল্লবের বর্ণনাগুলিও মানুষী উপমা দ্বারা সজীব ও উপভোগযোগ্য করিয়া তুলেন। * * * কবির চিত্তে মনুষ্যসমাজ এত স্পষ্ট উজ্জ্বল ও গাঢ়বর্ণে মুদ্রিত ছিল যে,—জলে, স্থলে, গুল্ম লতায় এবং ইতর জীবনসমূহের মধ্যেও তিনি সতত মানবীয় ভাবই প্রত্যক্ষ করিতেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ সুখের কথায় বড় নহেন, দুঃখের কথায় বড়। বড় বড় উজ্জ্বল ঘটনার মধ্যে অবিরত ফল্গু নদীর ন্যায় এক অন্তর্বাহী দুঃখ-সংগীতের মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তধ্বনি শুনা যায়।'[১]

দীনেশচন্দ্রের পূর্বে নিয়মানুগ (Systematic) ও সুষ্ঠু বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিত হয় নাই। বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞাননিষ্ঠ, নিয়মানুগ অথচ রসসম্মত সাহিত্য-ইতিহাস রচনায় নিঃসন্দেহে পথিকৃতের সম্মান তাঁহারই প্রাপ্য।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যে প্রধানতঃ ছোটগল্প ও কবিতা রচনা করিয়াই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। গল্প ও কবিতা ব্যতীত তিনি প্রবন্ধ রচনা-কর্মেও প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। যদিও সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সংখ্যা পরিমাণে অল্প, কিন্তু তাহা দ্বারাই তাঁহার রচনাগত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যমূলক প্রবন্ধে তাঁহার নিজস্ব চিন্তা ও যথার্থ রসোপলব্ধির পরিচয় লাভ করা যায় সুধীন্দ্রনাথের ভাব বা মনন-চিন্তায় অভিনবত্ব বা অসাধারণ কোন বিশিষ্টতা প্রকাশ না পাইলেও আলোচ্য বিষয়ের প্রতি সযত্ন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা তাঁহার রচনাকে আবেদনগ্রাহ্য ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। সুধীন্দ্রনাথ যে সমাদৃত প্রবন্ধকার, পাঠকসমাজে তাঁহার জনপ্রিয়তা হইতে তাহা প্রমাণিত হয়।

সুধীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গি সরল ও সংযত—অনাবশ্যক বাহুল্যে তাঁহার রচনা পল্লবিত হয় নাই। সাহিত্য-সমালোচনাত্মক কোন কোন প্রবন্ধে তাঁহার কাব্যোচ্ছ্বাস আছে সত্য; কিন্তু তাহা অসংযত ভাবাবেগে আবিল নহে। তাঁহার ভাব ও ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সুগভীর প্রভাব অনুভব করা যায়। শব্দ-প্রয়োগের সুনিপুণ কৌশল এবং বাক্যপ্রবাহের স্বচ্ছ অনাহত গতি ও শ্রুতিমাধুর্যে সুধীন্দ্রনাথের সর্ববিধ প্রবন্ধই চিত্তাকর্ষক ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সুধীন্দ্রনাথ বিবিধ প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার

১ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', (কলিকাতা, ১৩০৪), পৃঃ ৩৭২

অধিকাংশ প্রবন্ধই 'সাধনা', 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'প্রবাসী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। 'সাধনা' নামক মাসিক পত্র সম্পাদনা-কর্ম্মেও সুধীন্দ্রনাথ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন এবং অতি অল্প বয়সেই অর্থাৎ বাইশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি এই বিশিষ্ট সাহিত্য-পত্রের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথের মাত্র দুইটি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে—১। 'ধর্ম্মের অভিব্যক্তি এবং ব্রাহ্মসমাজ' (১৮৯৬) ও ২। 'প্রসঙ্গ' (১৯১২)। 'ধর্ম্মের অভিব্যক্তি এবং ব্রাহ্মসমাজ' নামক প্রবন্ধপুস্তিকায় সুধীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার এক বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার নিকট ধর্ম্ম কখনই নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় কোন জড় ভাবমাত্র ছিল না—ধর্ম্ম এক সজীব সক্রিয় মঙ্গলময় চেতন-শক্তিরূপেই সুধীন্দ্রনাথের নিকট অভিব্যক্ত হইয়াছে।

সুধীন্দ্রনাথের 'প্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থে তাঁহার কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক। 'কপালকুণ্ডলা ও মিরাণ্ডা' এবং 'সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী' নামক তাঁহার দুইটি সাহিত্য-বিচারমূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হওয়ায় এই সংকলনটির মূল্য অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট উপন্যাসদ্বয়ের প্রধান নারীচরিত্রসমূহের বিচার-বিশ্লেষণ ও তাহাদের যথার্থ মূল্য নির্ধারণে সুধীন্দ্রনাথের বিচক্ষণ রসবোধ ও সমালোচনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সুধীন্দ্রনাথের 'সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী' নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'একদিকে সূর্য্যমুখীর প্রবল, অবিরাম, অবিরল, অপ্রতিহত দাম্পত্যপ্রেম, অন্যদিকে কুন্দর রূপজ মোহ না হউক, স্বাভাবিক পূর্ব্বরাগ। বঙ্কিমবাবু যাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলেন, অর্থাৎ যে ভালবাসায় অন্যের সুখের জন্য আত্মবলিদান দেওয়া যায়, সেই ভালবাসার পূর্ণতা আমরা সূর্য্যমুখীতে দেখিতে পাই। সূর্য্যমুখী স্বামীর সুখে আত্মহারা, স্বামীর চরণে লুণ্ঠিতপ্রাণা, স্বামীর মঙ্গলার্থে সর্ব্বসহা। কুন্দর ভালবাসা স্বার্থ-বিজড়িত না হউক, কিন্তু, নিঃস্বার্থপরতার পূর্ণ বিকাশ নহে। * * * কুন্দ নয়ন দিয়া দেখিবার সামগ্রী—হৃদয় দিয়া অনুভব করিবার সামগ্রী নহে। কুন্দ বাহিরের সৌন্দর্য্য, তাহাকে লইয়া ঘরকন্না চলে না। কুন্দ মানবী, বালিকা,—আমরা তাহাকে স্নেহ করি, ভালবাসি, তাহার জন্য অশ্রু ফেলি। সূর্য্যমুখী দেবী, সংসারী, তাঁহাকে ভালবাসি, ভক্তি করি, প্রণাম করি।'[১]

১ 'প্রসঙ্গ', (কলিকাতা, ১৯১২), পৃঃ ৯৬-৯৭

উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রবীন্দ্র-পর্বের বাংলা সাহিত্যে উমেশচন্দ্র বটব্যাল অন্যতম বিশিষ্ট দার্শনিক প্রবন্ধকাররূপেই সুপরিচিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রে তিনি গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। দুরূহ জটিল দার্শনিক তত্ত্বের সুষ্ঠু মীমাংসা সাধনে উমেশচন্দ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গভীর গবেষণা-শক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক প্রবর্তিত সূত্রসমূহকে মুখ্যতঃ ভিত্তি করিয়া বাংলা ভাষায় দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী-স্বভাবসুলভ ভাবপ্রবণতা উমেশচন্দ্রের যুক্তিবাদী দার্শনিক মনীষাকে কখনও আচ্ছন্ন করে নাই এবং তাঁহার আলোচনা যুক্তি-তর্কনির্ভর নৈয়ায়িক পন্থা অবলম্বন করিয়াই সর্বত্র অগ্রসর হইয়াছে। তত্ত্ব-গভীর মৌলিক চিন্তায় এবং নির্ভীক বলিষ্ঠ মতামত প্রকাশের ফলে উমেশচন্দ্রের প্রবন্ধ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধ সম্পর্কে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। রামেন্দ্রসুন্দর 'উমেশচন্দ্র বটব্যাল' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'তাঁহার উদ্যত অস্ত্রে কেবল ঔজ্জ্বল্য ও ক্ষমতা ছিল না; তাহাতে ধার ছিল; যে বাহুতে তিনি সেই অস্ত্র ধারণ করিতেন, তাহাতে অস্থি ও পেশী বর্ত্তমান ছিল। কেবল পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিরক্তি জন্মাইতেন না। তিনি প্রায়ই নূতন কথা বলিতেন ও পুরাতন কথাকেও নূতন ভাষায় বলিতেন। নূতন সামগ্রীর আস্বাদনে আমাদের রসনা নিত্য নিত্য পরিতৃপ্ত হইত; নূতন নূতন তথ্যের আভাস পাইয়া আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় বহির্ম্মুখে আসিত ও তন্দ্রা ত্যাগ করিয়া জাগিয়া উঠিত।'[১]

উমেশচন্দ্র প্রধানতঃ 'সাধনা' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং জীবিতাবস্থায় তাঁহার কোন প্রবন্ধের সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। পরবর্তী কালে উমেশচন্দ্রের প্রকাশিত প্রবন্ধ-সংকলন যথাক্রমে: ১। 'সাংখ্য-দর্শন' (১৯০০), ২। 'বেদ-প্রবেশিকা' (১৯০৫, এবং ৩। 'প্রেমশক্তি ও জননী' (১৯২২) এতদ্ব্যতীত উমেশচন্দ্রের অন্য বহু সংখ্যক প্রবন্ধ 'সাধনা' ও অন্যান্য প্রাচীন সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাতেই রহিয়া গিয়াছে, তাহারা অদ্যাপি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইবার সুযোগ লাভ করে নাই।

উমেশচন্দ্রের গবেষণামূলক সকল দার্শনিক প্রবন্ধেরই বক্তব্য বিষয় অতি সহজ

---

১ 'চরিত-কথা', (কলিকাতা, ১৩২০), পৃঃ ৭৪

সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ভাষার প্রাঞ্জলতাগুণে ও পরিবেশন নৈপুণ্যে দর্শনশাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব-কণ্টকিত বিষয়ও সাধারণের নিকট সহজবোধ্য ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। উমেশচন্দ্র গভীর অনুরাগ এবং অধ্যবসায় সহকারে বেদ ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়াছেন। বেদের বিচিত্র তত্ত্ব ও তথ্যাদি তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধেরই আলোচ্য বস্তু হইয়াছে। অন্যান্য বহু প্রাচ্য পণ্ডিতগণের ন্যায় উমেশচন্দ্রও বেদের বহুদেববাদ সমর্থন করেন নাই এবং তিনি একনিষ্ঠভাবে একেশ্বরবাদেরই পরিপোষক ছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠারই প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। উমেশচন্দ্রের গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধিমত্তাব পরিচয় তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলীতে সম্যক্‌ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

উমেশচন্দ্র মুখ্যতঃ সাংখ্যদর্শনের মূলতত্ত্বসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া পণ্ডিত ও দার্শনিক সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছেন। সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যায় তাঁহার নিজস্ব এক বলিষ্ঠ চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। উমেশচন্দ্র সাংখ্য-মতানুসারে দ্বৈতবাদী ছিলেন। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের নেপথ্যে দুই স্বতন্ত্র অনির্বচনীয় সত্তা অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কোন এক অনিবার্য কারণে প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনের ফলে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি হইয়াছে। উমেশচন্দ্র এই সৃষ্টি-কর্মকে 'দার্শনিক সৃষ্টি' নামে আখ্যাত করিয়া বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন প্রসঙ্গে যে প্রাচীন ও অর্বাচীন মতবাদ প্রচলিত, তাহা তিনি সুষ্ঠুভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার নিজস্ব বক্তব্য যথাযোগ্য প্রমাণ সহকারে প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উমেশচন্দ্রের 'মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্ব, পুরুষ হইতে অভিব্যক্ত হয় না প্রকৃতি হইতে?' নামক প্রবন্ধের অংশ বিশেষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত হইল—

'জ্ঞান মাত্রই মূলে একজাতীয় পদার্থ বলিয়া ধরা যায়, এবং যদি "জ্ঞ" নামক স্বতন্ত্র স্বাধীন নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জ্ঞানকে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলা যায় না। আমার বিবেচনায় প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যদের মতে "মহৎ" প্রভৃতি প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ জন্য পুরুষ হইতে আবির্ভূত জ্ঞান; প্রকৃতি হইতে নহে। সংসারের সৃষ্টি (অর্থাৎ দার্শনিক সৃষ্টি) প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগবশতঃ পরস্পরের ক্রিয়াবশতঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে। ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ, এই তিনের মধ্যে, অব্যক্ত ও জ্ঞ নিত্য পদার্থ, ব্যক্ত অনিত্য ও জন্য পদার্থ।

এই অনিত্য পদার্থ, যাহাকে সাধারণতঃ জগৎ বা সংসার বলিয়া লোকে পরিগ্রহ করে, তাহা অপর দুই নিত্য পদার্থের এক আশ্চর্য্য সম্পর্কবশাৎ, তাহার মধ্যে একটি (জ্ঞ) হইতে অভিব্যক্ত হয়, ইহাই সমীচীন সাংখ্যমত।'[১]

দর্শনের দুরূহ তত্ত্বসমূহের সহজ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ উমেশচন্দ্রের প্রবন্ধসমূহ বাংলা ভাষায় দার্শনিক প্রবন্ধের পরিধি বিস্তারে যে অধিক সহায়ক হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ—জগদ্বরেণ্য বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের পিতৃদত্ত পূর্বনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ করেন এবং এই বিশিষ্ট নামেই তিনি স্বদেশবাসী, তথা বিশ্ববাসীর নিকট সুপরিচিত হইয়াছেন। ধর্মবীর বিবেকানন্দ বাংলা সাহিত্যে একজন শক্তিমান লেখকেরও মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার রূপটি ধর্মবীর বিবেকানন্দের কর্মকৃতির গৌরবে ম্লান হইয়া গিয়াছে।

বিবেকানন্দ বাংলাদেশের অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনীষিগণের অন্যতম। সংস্কৃত, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য ছিল এবং বিশেষতঃ বেদ, উপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিবেকানন্দ প্রধানতঃ ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার গ্রন্থাদি রচনা করেন। ইংরাজী রচনার তুলনায় তাহার বাংলা ও সংস্কৃত রচনার সংখ্যা পরিমাণে অল্প। সংস্কৃত ভাষায় তিনি কয়েকটি ধর্মীয় কবিতা রচনা করেন। বাংলা ভাষায়ও বিবেকানন্দ গল্প, কবিতা ও সংগীত ব্যতীত কিছু সংখ্যক প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন।

বিবেকানন্দের মৌলিক প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমে: ১। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' (১৯০২), ২। 'বর্ত্তমান ভারত' (১৯০৫) ও ৩। 'পরিব্রাজক' (১৯০৫)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বিবেকানন্দের বিবিধ বিষয়ক রচনার সংকলন 'ভাববার কথা' (১৯০৭) গ্রন্থেও তাঁহার কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাংলা ভাষায় লিখিত বিবেকানন্দের বহু সংখ্যক পত্রও সংকলিত হইয়া সম্প্রতি 'পত্রাবলী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বিবেকানন্দের কতকগুলি পত্র তাঁহার ধর্ম-চিন্তার ঐশ্বর্য এবং বিশাল বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের অন্তরঙ্গ স্পর্শে প্রবন্ধ-সাহিত্যগত

১ 'সাংখ্যদর্শন', (কলিকাতা, ১৯০০), পৃঃ ৭১-৭২

গুণে মহিমান্বিত হইয়াছে। তাঁহার 'বিলাত যাত্রীর পত্র' পর্যায়ের অধিকাংশ পত্রই প্রবন্ধধর্মী। বিবেকানন্দের প্রায় সর্ববিধ রচনাই 'উদ্বোধন' নামক পাক্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' এই দুই সাময়িক পত্রের পরিচালন-কর্মেও তাঁহার প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দের বিভিন্ন প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ধর্ম ও সামাজিক অবস্থাই প্রধানতঃ আলোচিত হইয়াছে। ভাষা ও রচনারীতির স্বকীয়ত্বে তাঁহার সকল প্রবন্ধই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিবেকানন্দের গদ্যভাষা কখনও গুরুগম্ভীর, ওজস্বী; কখনও বা লঘু চপল অথচ দ্রুত গতিশীল। তিনি বিশেষণবহুল সমাসাকীর্ণ বাক্য-বিন্যাসে যেমন সুদক্ষ, তেমনি অনাড়ম্বর সহজ চলিত ভাষার ব্যবহারেও তুল্য সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিবেকানন্দের প্রবন্ধ যেমন ভাব-গভীরতায়, পাণ্ডিত্যে ও বিচার-বিতর্কে দীপ্তিময়, তেমনি বিষয় বিশেষে বিদ্রূপ, শ্লেষ বা রঙ্গ-রসিকতায় সরস ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সাহিত্য-কর্মে সর্বদাই চলিত রীতি ও ভাষা প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধই চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। চলিত ভাষার প্রকৃষ্ট রূপ ও শিল্প-নৈপুণ্য সম্পর্কে বিবেকানন্দ তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছেন—

'চলিত ভাষায় কি আর শিল্প-নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার ক'রে কি হবে? * * * স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই,—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে ক'র্তে হবে—যেন সাফ্ ইস্পাৎ, মুচ্ড়ে মুচ্ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।'[১]

বিবেকানন্দের ভাষা সম্পর্কিত মূল পত্রের অংশ বিশেষ তাঁহার 'ভাববার কথা' নামক গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে এবং গ্রন্থের সংকলক পত্রাংশটির নামকরণ করিয়াছেন 'বাঙ্গলা ভাষা'। বিবেকানন্দের অধিকাংশ পত্রই যে বিষয় বিশেষের আলোচনায় এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, এই পত্রাংশটি তাহার অন্যতম প্রমাণ।

১ 'ভাববার কথা', (কলিকাতা, ১৩২০), পৃঃ ৯-১০

বিবেকানন্দ বিশুদ্ধ শিল্প-সৃষ্টির প্রয়াসী হইয়া কোন রচনা-কর্মে নিযুক্ত হন নাই ; অর্থাৎ নিছক সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য যে সচেতন নিষ্ঠা ও একাগ্রতা প্রয়োজন, তাহা তাঁহার কর্মবহুল স্বল্পপরিসর জীবনে সম্ভব ছিল না। স্বদেশপ্রেম, স্বজাতি ও স্বধর্ম-প্রীতি তাঁহার সমগ্র রচনারই মূল প্রেরণাস্বরূপ ছিল। বিবেকানন্দ তথাকথিত সাধারণ পর্যায়ের সন্ন্যাসী বা ধর্মপ্রচারক ছিলেন না। ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণকর সমৃদ্ধিই তাঁহার জীবনের একমাত্র কাম্য হইয়াছিল। বেদান্ত প্রতিপাদ্য হিন্দুধর্মের সারবস্তু ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাঁহার যে আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা দ্বারা তাঁহার যেমন গভীর পাণ্ডিত্য ও স্বধর্ম-প্রীতি, তেমনি তাঁহার প্রাঞ্জল অথচ ওজস্বিনী ভাষায় জটিল দার্শনিক ও ধর্মীয় তত্ত্বের সুনিপুণ ব্যাখ্যা-শক্তির পরিচয় লাভ করা যায়। বিবেকানন্দের ধর্মভিত্তিক বিশিষ্ট দার্শনিক প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ প্রধানতঃ ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। তাঁহার বাংলা ভাষায় লিখিত প্রবন্ধগ্রন্থগুলি ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুবিস্তৃত বর্ণনায় মহিমোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দেশ ও জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান যে সুগভীর ধর্মচেতনা ও সত্যনিষ্ঠ ধর্মাদর্শের সহায়তায় সম্ভবপর, বিবেকানন্দ তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে তাহারই যুক্তিসম্মত আলোচনায় প্রয়াসী হইয়াছেন।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থে বিবেকানন্দের গভীর মননশীলতা, বিশ্লেষণ-শক্তি, ও ভূয়োদর্শিতার বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য এই উভয় জাতির সভ্যতা, জীবনাদর্শ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা ইহা এক মূল্যবান্ ঐতিহাসিক গরিমায় ভূষিত হইয়াছে। প্রতিপাদ্য বিষয় বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ ভাষা এবং ঋজু ও ওজোগুণসম্পন্ন প্রকাশভঙ্গিতে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালীন অপ্রচলিত চলিত ভাষা ও রীতিতে গুরুগম্ভীর বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিয়াও বিবেকানন্দ অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' গ্রন্থটি ভ্রমণ-কথা বিষয়ক হইলেও তাহা ভ্রমণ-বিলাসীর আত্মবিবরণী ও ভাবোচ্ছ্বাস হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। বিবেকানন্দ পৃথিবীর বহু স্থান পর্যটন করিয়াছেন এবং বিভিন্ন দেশের সমুন্নতি ও সমৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়াছেন। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থটি মুখ্যতঃ ভারতবর্ষের পূর্বতন সম্পদ ও রূপ-সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক গৌরব

পুনরুদ্ধারের ঐকান্তিক চিন্তা ও ভাবনায় সমৃদ্ধ। বিবেকানন্দ তাঁহার এই গ্রন্থে চলিত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। চলিত ভাষার সরসতা, লালিত্য ও গাম্ভীর্যে তাঁহার এই ভ্রমণাত্মক বিবরণও রসোজ্জ্বল ও উপভোগ্য হইয়াছে। বিবেকানন্দ সৌন্দর্যসন্ধানী এক কবিমনেরও অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সহজাত কবিপ্রাণের স্নিগ্ধ স্পর্শে উক্ত প্রবন্ধের বহুল অংশই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-গুণে ভূষিত হইয়াছে।

বিবেকানন্দের রাষ্ট্রনৈতিক ও ঐতিহাসিক চেতনার সম্যক্ পরিচয় তাঁহার 'বর্ত্তমান ভারত' গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাবে ভারতবর্ষে এক দ্বন্দ্ব-জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় ; অর্থাৎ ভারতীয় সনাতন জীবনধারা ও নীতিধর্ম এবং ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শের মধ্যে কোন্‌টি দেশ ও জাতির নিকট গ্রহণীয়—মুখ্যতঃ এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানেরই প্রয়াস বিবেকানন্দের 'বর্ত্তমান ভারত' গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। বিবেকানন্দ এই গ্রন্থে বৈদিক যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে সমাগত সমুদয় জাতির স্বরূপ-পরিচয়, ভারতীয় হিন্দুত্বের বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন যুগের ধর্মনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবরণ প্রদান করিয়া অখণ্ড ভারতবর্ষের এক মহান্ বিশাল রূপচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ইহাতে বিবেকানন্দের গভীর মনস্বিতা, স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি ও মোহমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি তাঁহার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের দিব্য বিভায় সমগ্র প্রবন্ধটি সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বিবেকানন্দ সাধারণতঃ চলিত ভাষারই পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার 'বর্ত্তমান ভারত' গ্রন্থটি বিশেষণবহুল সমাসযুক্ত সাধুভাষায় লিখিত হইয়াছে। ভাব বা বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির সামঞ্জস্য বিধানেও তাঁহার উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘর্ষে বর্ত্তমান ভারতের দ্বিধা-দ্বন্দ্বসঙ্কুল রূপ বিবেকানন্দের সংযত-গম্ভীর সাধুভাষার বর্ণনায় অধিকতর মহিমান্বিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার 'বর্ত্তমান ভারত' নামক গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'বাহ্যজাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগরুকতার ফলস্বরূপ, স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে প্রত্যক্ষ শক্তিসংগ্রহরূপ-প্রমাণ-বাহন, শতসূর্য্য জ্যোতি, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি প্রতিঘাতি প্রভা ; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহু মনীষী উদ্ঘাটিত, যুগ-যুগান্তরের সহানুভূতিযোগে

সর্ব্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্ব্বপুরুষদিগের অপূর্ব্ব বীর্য্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্ল্লভ অধ্যাত্মতত্ত্ব কাহিনী। একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী স্বরে, পূর্ব্বদেবদিগের আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে।'[১]

চলিত ও সাধু উভয় প্রকার গদ্যভাষা ও রীতিই বিবেকানন্দের প্রবন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তিনি এই উভয় ভাষা ও রীতিতেই সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। বিবেকানন্দের কোন প্রবন্ধই কান্তকোমল ভাবরসে নিষিক্ত নহে, তাহা মহান্ আদর্শ প্রচারক তেজোদৃপ্ত বীর সন্ন্যাসীর দৃঢ়প্রত্যয়-গম্ভীর ভাবরাজিতে সমৃদ্ধ। শব্দ-বিন্যাসের পারিপাট্যে, ভাব ও ভাষার সহজ সামঞ্জস্যে এবং স্বল্পাক্ষরে গভীর ভাবপ্রকাশের ক্ষমতায় বিবেকানন্দের সর্ববিধ প্রবন্ধই সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশ্ববিখ্যাত রসায়নবিদ্ এবং বাংলাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট সমাজসেবী হিসাবেই সাধারণের নিকট সুপরিচিত। কিন্তু ইহা দ্বারা তাঁহার বিভিন্নমুখী মনীষার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ পায় না। প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানের গভীর গবেষণা ও সমাজ-সংগঠনমূলক বিবিধ কর্মকৃতির সহিত বাংলার জাতীয় সাহিত্যেরও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহার আশৈশব গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল এবং তিনি এই প্রাঞ্জল মাতৃভাষায় বহুসংখ্যক প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্রের রসানুভূতিশীল গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত বৈজ্ঞানিক চেতনা ও তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধির এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। প্রফুল্লচন্দ্রের বুদ্ধিদীপ্ত মনীষার পরিচয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন, তার গুহাহিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয় কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।'[২]

১ 'বর্ত্তমান ভারত', (কলিকাতা, ১৩১৫); পৃঃ ৫১

২ 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়', (প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৯), পৃঃ ৪৫২

বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের গভীর সহৃদয়তা ও প্রীতি-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্যান্য বিশিষ্ট জাতির ন্যায় বাঙ্গালীকেও এক গৌরবময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি আজীবন প্রয়াস পাইয়াছেন। বাঙ্গালী জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কুশল সাধনই তাঁহার সমগ্র জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়াছিল। স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের ঐকান্তিক প্রেরণাবশেই প্রফুল্লচন্দ্র বিবিধ প্রবন্ধ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁহার প্রবন্ধ যেমন গভীর চিন্তাগর্ভ, তেমনি জাতীয় জীবন-গঠনের মূল্যবান্ বস্তু বা উপকরণে সমৃদ্ধ হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্র বিভিন্ন জনসভায় দেশের বিবিধ সমস্যা প্রসঙ্গে যে সকল সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাও ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়া জাতির চরিত্র-গঠনে সহায়ক হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক হইয়াও প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ অপেক্ষা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা অবলম্বন করিয়াই অধিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ অধিকাংশই ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্র প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমে ঃ ১। 'প্রাণী-বিজ্ঞান' (১৯০৩), ২। 'নব্য রসায়নীবিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি' (১৯০৬), ৩। 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' (১৯০৮), ৪। 'অন্নসমস্যা' (১৯২০), ৫। 'জাতিভেদ ও পাতিত্যসমস্যা' (১৯২০), ৬। 'অধ্যয়ন ও সাধনা' (১৯২১, ৭। 'জাতিগঠনে বাধা—ভিতরে ও বাহিরে' (১৯২১), ৮। 'বস্ত্রসমস্যা' (১৯২২), ৯। 'মিথ্যার সহিত আপোষ ও শান্তিক্রয়' (১৯২৫), ১০। 'চা-পান ও দেশের সর্ব্বনাশ' (১৯৩২), ১১। 'অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার' (১৯৩৬) ও ১২। 'আত্মচরিত' (১৯৩৭)। এতদ্ব্যতীত প্রফুল্লচন্দ্রের অন্যান্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ও লিখিত ভাষণসমূহ পরবর্তী কালে 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী' (১৯২৭) এবং 'আচার্য্য বাণী' (১৯৪৮) নামক সংকলন-গ্রন্থদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

প্রফুল্লচন্দ্র এক গভীর দূরদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন এবং বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনে তাঁহার দূরদর্শিতার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইয়াছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি, সমাজ ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন সমস্যা প্রফুল্লচন্দ্রের অধিকাংশ প্রবন্ধেরই প্রতিপাদ্য বিষয়। তাঁহার এই সকল প্রবন্ধ এক উচ্চ আদর্শসঞ্জাত এবং মুখ্যতঃ জাতীয় সুখ-সমৃদ্ধিরই দিগ্‌নির্ণায়ক। সাধারণতঃ

সংস্কার বা উপদেশমূলক রচনা সাহিত্য-পদবাচ্য হয় না। জাতীয় কল্যাণ ও সুখ-সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর রচনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইলেও রসোত্তীর্ণ বা কালোত্তীর্ণ সাহিত্য হিসাবে তাহা উচ্চ আসনের দাবী করিতে পারে না। প্রফুল্লচন্দ্রের অধিকাংশ প্রবন্ধই এই পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ উপদেশধর্মী। তথাপি তাঁহার কোন কোন প্রবন্ধ গভীর আন্তরিকতা ও সহানুভূতিগুণে সাহিত্য-স্তরে উন্নীত হইয়াছে।

প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ তাঁহার নিরাড়ম্বর সহজ পরিচ্ছন্ন ভাষা। যে কোন বিষয় সম্পর্কেই তাঁহার সুস্পষ্ট, তীক্ষ্ণ ও নির্ভীক মতামত সাবলীল ও স্বচ্ছ গদ্যরীতিতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব এই যে, দ্বন্দ্ব-জটিল বা গম্ভীর (serious) বিষয়ও তিনি অনায়াসবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিটি প্রবন্ধই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার পরিচায়ক। প্রফুল্লচন্দ্রের কোন প্রবন্ধই কবি বা ভাবুকের উচ্ছ্বাসমাত্রে পর্যবসিত হয় নাই, বরং তাহা 'বৈজ্ঞানিকের নিক্তিতে তৌল করা সিদ্ধান্তে' সারগর্ভ ও মূল্যবান্ হইয়াছে।

বাংলাদেশের সমাজ, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ হইতে তাঁহার বহুমুখী চিন্তাধারার সহিত পরিচয় লাভ করা যায়। দেশের বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে তিনি তাঁহার বলিষ্ঠ অভিমত অকপটে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্রের কোন কোন প্রবন্ধ আলস্যপরায়ণ, আদর্শভ্রষ্ট বাঙ্গালী জাতির প্রতি নির্মম শ্লেষ-বিদ্রূপে পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার বিদ্রূপ বা রূঢ় বক্তব্যের মধ্য দিয়াও স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি ঐকান্তিক গভীর সহানুভূতি ও মমতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্রূপ ও সমবেদনার আশ্চর্য-সুন্দর যুগ্ম মিশ্রণে তাঁহার এই শ্রেণীর প্রবন্ধ এক স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে।

প্রফুল্লচন্দ্র দেশের সমুদয় অকল্যাণকর প্রথা ও কুসংস্কারের প্রবল বিরোধী ছিলেন এবং জাতীয় জীবন ও চরিত্রের অনিষ্টকারী প্রচলিত বিবিধ কুপ্রথার বিলোপ সাধনে তিনি আজীবন আন্দোলন করিয়াছেন। জাতিভেদ দেশের প্রচলিত কুপ্রথা-সমূহের অন্যতম এবং এই অকল্যাণকর সামাজিক প্রথা জাতীয় সমৃদ্ধি কীভাবে ব্যাহত করিয়াছে, তাহা প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধে যুক্তি ও প্রমাণ সহযোগে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জাতিভেদ প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের সুচিন্তিত আলোচনার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল—

'জাতির গঠন ও বিকাশে এই জাতিভেদ অনেক পরিমাণে বাধা দিয়েছে। পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান প্রদান নেই, তার উপর ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না এই রব করতে করতে সকলেই এক-একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছে। * * * চরক ও সুশ্রুত দেশীয় চিকিৎসাপ্রণালীর দুখানি মহাগ্রন্থ। এতে অবস্থা বিশেষে এমন কি গোমাংস খাবারও কথা আছে। সুশ্রুতে শবব্যবচ্ছেদের রীতিমত ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু মনু মহাশয় বলেন শবস্পর্শ হ'লে জাতিচ্যুত হ'তে হবে। সুতরাং ব্যবস্থা হ'য়ে গেল শবব্যবচ্ছেদের স্থানে অতঃপর লাউ ব্যবচ্ছেদ হবে; অর্থাৎ লাউ কেটে মনুষ্য-শরীরের শিরা-উপশিরা প্রভৃতির সংস্থান জানতে হবে। ব্যবস্থাটা কতকটা সেই কলাগাছ বিয়ে কর্‌বার মত নয় কি? জাতিচ্যুতির ভয় দেখিয়ে এমনি ক'রে যখন স্বাধীন চিন্তার গলা টিপে মারা হ'ল, তখন ৬৪ কলা বিদ্যা লোককে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। বিজ্ঞানের যা কিছু রইল—তা Surgeonপরামাণিক, Botanist বেদে আর Metallurgist ভীল কোল সাঁওতালের হাতে। * * * সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে স্বাধীন চিন্তা ও কর্মশক্তি লুপ্ত হ'য়ে গিয়ে বিদ্যা ও বিজ্ঞান-চর্চ্চার যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছে তার জন্য জাতিভেদ বড় কম দায়ী নয়।'[১]

প্রফুল্লচন্দ্রের ঐতিহাসিক চেতনা যেমন তীব্র, তেমনি গভীর ছিল। তাঁহার ইতিহাসনিষ্ঠ মননশীলতার পরিচয় প্রায় সমুদয় প্রবন্ধের মধ্যেই অল্পাধিক প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ প্রফুল্লচন্দ্রের 'আত্মচরিতে' তাঁহার ইতিহাসবোধের স্বাক্ষর সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার এই 'আত্মচরিতে' আত্ম-কথা অপেক্ষা সমকালীন বাংলাদেশের সমস্যাসঙ্কুল বিচিত্র পরিস্থিতির যুক্তিগর্ভ আলোচনাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। যথার্থ সাহিত্যের উপকরণে সমৃদ্ধ আত্মজীবনীর মানদণ্ডে প্রফুল্লচন্দ্রের 'আত্মচরিত' বিচার্য নহে।

বিপিনচন্দ্র পাল—বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক নেতা ও বিশিষ্ট বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল সাহিত্যক্ষেত্রে চিন্তাশীল প্রবন্ধকাররূপেও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল এবং তিনি এই দুই ভাষায় যে কোন বিষয় সম্পর্কে যেমন অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন, তেমনি সুশৃঙ্খল ও যুক্তিসম্মতভাবে যে কোন প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনার

১ 'জাতিভেদ ও পাণ্ডিত্য সমস্যা', (কলিকাতা, ১৯২০), পৃঃ ১৮-১৯

ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। বিপিনচন্দ্র কয়েকটি ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদনা করিয়াও খ্যাতি লাভ করেন এবং এই পত্রিকাসমূহেই তাঁহার বিভিন্ন প্রসঙ্গাত্মক অধিকাংশ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিপিনচন্দ্রের সকল প্রবন্ধেরই গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভের সুযোগ হয় নাই। ক্ষণজীবী সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তাঁহার বহু সংখ্যক প্রবন্ধই বর্তমানে লুপ্ত হইয়াছে।

বিপিনচন্দ্র রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, দর্শন, জীবনচরিত ও সাহিত্য-বিচার প্রসঙ্গে বহু সংখ্যক চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। প্রতিটি প্রবন্ধই তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য, বুদ্ধির প্রখর দীপ্তি ও ভাষার উপর অসাধারণ পটুত্বের পরিচয়ে সমৃদ্ধ হইয়াছে। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস ও সমাজের সহিত গভীরভাবে ঘনিষ্ঠতার ফলে বিপিনচন্দ্রের সকল প্রবন্ধেই তাঁহার প্রখর ঐতিহ্য চেতনা ও সমাজবোধ পবিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধগত বক্তব্য বিষয় মুখ্যতঃ যুগ ও সমাজের পর্যালোচনার মধ্য দিয়াই সুস্পষ্টতা লাভ করিয়াছে। বিপিনচন্দ্রের সর্ববিধ চিন্তাধারার মধ্যে এক মোহমুক্ত উদার প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে, বিশেষতঃ শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাব-চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তিনি স্বদেশী সমাজের এক বৃহৎ পটভূমি রচনায় উদ্বুদ্ধ হইযাছিলেন। বিপিনচন্দ্রের মতে, দেশের স্বাধীনতা কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় শাসনগত স্বাধীনতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে—সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য প্রভৃতি সর্ববিধ চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিই তাঁহার নিকট যথার্থ স্বাধীনতার আদর্শ ছিল। বিপিনচন্দ্রের এই আদর্শ-চিন্তার উন্মেষ ও পরিণতি তাঁহার প্রবন্ধসমূহেব মধ্য দিয়া সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধের ভাষা ও রচনারীতির মধ্যে কোনরূপ অস্পষ্টতা বা জড়তা নাই। রবীন্দ্র-পর্বের লেখক হইয়াও এই পর্বের প্রবন্ধগত শিল্পকলা-বৈশিষ্ট্য তাঁহার রচনায় লক্ষ্য করা যায় না। বিপিনচন্দ্রের ভাষা অলংকার-ব্যঞ্জনায় দ্ব্যর্থময় নহে—অলংকারহীন প্রাঞ্জল ভাষা ও সহজ পবিবেশনকৌশলে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যও স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট হইয়াছে।

বিপিনচন্দ্র প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'রাজ্ঞীমাতা ভিক্টোরিয়া' (১৯০৪), ২। 'জেলের খাতা' (১৯১০), ৩। 'চরিত কথা' (১৯১৬), ৪। 'আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ' (১৯২২), ৫। 'প্রবর্ত্তক বিজয়কৃষ্ণ' (১৯৩৫), ও ৬। 'নবযুগের বাংলা' (১৯৫৩)। এতদ্ব্যতীত বিপিনচন্দ্রের 'মার্কিণে চারিমাস

ও বিলাতের কথা' (১৯৫৪) মুখ্যতঃ ভ্রমণকাহিনী হইলেও ইহার বিভিন্ন অংশ বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রবন্ধধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনায় তাঁহার বিচার-পন্থা অতিশয় সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানসম্মত হইয়াছে। যুক্তি উপস্থাপনায় ও নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রকাশে তাঁহার সতর্কতা ও নিরাবেগ বিবৃতি প্রবন্ধসমূহকে এক অপূর্ব ভারসাম্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কোন বিষয়েরই বিচার-বিশ্লেষণে বিপিনচন্দ্র কোথাও বিধিবদ্ধ নীতি-নির্দেশ অনুসরণ করেন নাই এবং তাঁহার প্রবন্ধের সর্বত্রই অপ্রাসঙ্গিক আতিশয্য বর্জিত হইয়াছে। বিপিনচন্দ্রের অল্প সংখ্যক কয়েকটি প্রবন্ধ তাঁহার ব্যক্তিহৃদয়ের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা ও গভীর ভাবুকতায় সমুজ্জ্বল। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'জেলের কথা' গ্রন্থে সংকলিত 'সাকার ও নিরাকার', 'প্রাণের কথা', 'জীবনের হিসাব নিকাশ', 'আভাষ ও আকাঙ্ক্ষা' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করা যায়।

বিপিনচন্দ্র মুখ্যতঃ বাঙ্গালীপ্রেমিক এবং তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাদেশের অন্যতম প্রখর ধী-শক্তিসম্পন্ন চিন্তানায়কের সম্মান লাভ করেন। বাংলার নবজাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণে তিনি তাঁহার অসামান্য কর্মকৃতির দ্বারা দেশ ও জাতিকে নিজস্ব.মহিমায় প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বিপিনচন্দ্রের বহু সংখ্যক প্রবন্ধের মধ্যেই বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির বিচিত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়, প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্য ও চারিত্রিক বিশেষত্ব অতীব নিষ্ঠা সহকারে আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর ধর্মোপলব্ধি ও সমন্বয়-চেতনা এবং গূঢ় ধর্মীয় তত্ত্বগত দেববাদের মধ্যে মানবতার লীলা প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালী-চরিত্রের যে এক অপরূপ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে, বিপিনচন্দ্রের আলোচনায় তাহা সার্থকভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিপিনচন্দ্রের 'বাংলার বৈশিষ্ট্য' নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'বাংলার সনাতন সাধনার আর একটা বিশেষত্ব—ইহার মানবতা—ইহাকে আর কি বলিব, সহসা ভাবিয়া পাই না। বাংলায় দেব-বাদ আছে সত্য, কিন্তু বাংলায় যে সকল দেবদেবীর পূজা প্রচলিত তাঁহাদের সকলের মধ্যেই একটা অদ্ভুত মানবতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালী, দুর্গা, সরস্বতী, ইঁহাদের কাহারও বা দশ, কাহারও চারি হাত আছে বটে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এ সকল যে অপূর্ব্ব মাতৃ-মূর্ত্তি ইহা আশ্চর্য্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়। এই অতিপ্রাকৃত হাতগুলি

বাদ দিলে ইঁহাদিগকে ম্যাডোনার সঙ্গে তুলনা করা যায়। দুর্গা ও সরস্বতীর মুখের অণুতে অণুতে আমরা যে মাতৃঅঙ্কে লালিত পালিত, সেই সার্ব্বজনীন মানবীয় মাতৃভাব যেন ফাটিয়া পড়ে।'[১]

বিপিনচন্দ্র সাহিত্য-বিচার প্রসঙ্গেও কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। সমকালীন যুগ ও সামাজিক পরিবেশের ভিত্তিতেই তিনি প্রধানতঃ তাঁহার সাহিত্যিক চিন্তা বা মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। মুখ্যতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থালোচনাই তাঁহার অধিকাংশ সাহিত্য-প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়াছে। বিশ্লেষণ ও বিন্যাস-নৈপুণ্যে এবং যথার্থ রসগ্রাহিতায় বিপিনচন্দ্রের সাহিত্য-বিচারমূলক প্রবন্ধগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দীনেন্দ্রকুমার রায়—দীনেন্দ্রকুমার রায় অসংখ্য রহস্য-রোমাঞ্চকর বাংলা উপন্যাসের রচয়িতা। ইংরাজী সাহিত্য হইতে বহু বিচিত্র রহস্য-কাহিনীর ভাবানুবাদ করিয়া তিনি এক শ্রেণীর বাঙ্গালী পাঠকের নিকট বিশেষ জনপ্রিয় ও সমাদৃত হন। কিন্তু ইহা দ্বারা তাঁহার যথার্থ সাহিত্যিক-মানস বা রসসত্তার পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। মৌলিক রসসম্মত প্রবন্ধ রচনার জন্য বাংলা সাহিত্যে অন্যতম প্রবন্ধকার হিসাবেও দীনেন্দ্রকুমার এক স্বতন্ত্র আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। দীনেন্দ্রকুমার তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধে পল্লী-জীবনের রূপচিত্র অতীব নিখুঁত ও নৈপুণ্য সহকারে অঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহার এবংবিধ পল্লীচিত্ররসাত্মক প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে লিখিত হয় নাই।

বাংলাদেশের পল্লীসমাজ ও সংস্কৃতি অবলম্বন করিয়া দীনেন্দ্রকুমার বহু সংখ্যক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। পল্লী-সংস্কৃতির পরিচয়বাহী তাঁহার প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'পল্লীচিত্র' (১৯০৪) ও ২। 'পল্লীবৈচিত্র্য' (১৯০৫)। দীনেন্দ্রকুমারের এই শ্রেণীর অধিকাংশ প্রবন্ধই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। পল্লীসমাজ বা সংস্কৃতি প্রসঙ্গ ব্যতীত দীনেন্দ্রকুমার 'অরবিন্দ প্রসঙ্গ' (১৯২৩) নামে ঋষি অরবিন্দের জীবন অবলম্বন করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দের বাল্য হইতে যৌবন পর্যন্ত শিক্ষাজীবনের কিয়দংশ অতি চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে দীনেন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন এবং ফলে, শ্রীঅরবিন্দ

'নবযুগের বাংলা', (কলিকাতা, ১৩৬২), পৃঃ ১৪-১৫

সম্পর্কিত তাঁহার এই গ্রন্থটি অপেক্ষাকৃত প্রামাণ্য ঘটনা দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে।

'পল্লীচিত্র' ও 'পল্লীবৈচিত্র্য' গ্রন্থদ্বয়ে দীনেন্দ্রকুমার বাংলার গ্রামীণ জীবনধারা ও তাহার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। পল্লীর সমাজ-জীবন সম্পর্কে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যেমন গভীর, তেমনি ব্যাপক ছিল। বাংলাদেশের পল্লীর সাংস্কৃতিক রূপ-বৈশিষ্ট্য ও অখণ্ড জীবন-সৌন্দর্যের মহিমা তিনি অভিনবভাবে পর্যালোচনা করিয়াছেন। ভগবতী যাত্রা, দশহরা গঙ্গাপূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, নবান্ন প্রভৃতি পল্লী-উৎসবগুলির তাৎপর্য ও সার্থকতা দীনেন্দ্রকুমারের বিভিন্ন প্রবন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দীনেন্দ্রকুমারের প্রবন্ধগত বক্তব্য বিষয় কোনরূপ কৃত্রিমতা বা ভাবালুতার দ্বারা অতিরঞ্জিত হয় নাই; বরং সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা ও যথার্থ ব্যাখ্যানের সহায়তায় বাংলাদেশের সমগ্র গ্রামীন্ সংস্কৃতিব এক পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ই প্রকাশ পাইয়াছে।

দীনেন্দ্রকুমারের ভাষা ও রচনারীতি সরস ও সহজবোধ্য। তাঁহার প্রবন্ধে ব্যবহৃত বাক্যসমূহ অনাবশ্যক দীর্ঘ বা জটিল সমাসে ভারাক্রান্ত নহে। উপমা-অলংকারের সুমিত ও সংহত প্রয়োগে দীনেন্দ্রকুমারের প্রকাশভঙ্গির মধ্যে এক সহজ-সৌন্দর্য ও লালিত্য প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বা সামান্য রেখাপাতেও গূঢ় ব্যঞ্জনাময় চিত্ররূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

পল্লী-রূপরসিক দীনেন্দ্রকুমারের প্রবন্ধের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে মনঃকল্পিত গ্রাম্য চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়া পল্লী-উৎসবগুলির বর্ণনা ও ব্যাখ্যানে যেমন এক মধুর ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি তাহা চিত্তাকর্ষক উপাখ্যানের ন্যায় সহজ সাবলীল গতি লাভ করিয়াছে। প্রকাশ-ভঙ্গির এবংবিধ বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বই দীনেন্দ্রকুমারের পল্লী-সংস্কৃতিমূলক প্রবন্ধসমূহকে এক স্বতন্ত্র মহিমা দান করিয়াছে।

পল্লী-জীবনের রূপ বর্ণনায় যে দীনেন্দ্রকুমার প্রত্যক্ষদর্শী নিষ্ঠাবান্ শিল্পী ছিলেন, তাহা তাঁহার পল্লী সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ হইতে উপলব্ধি করা যায়। গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতির বিচিত্র রূপৈশ্বর্য তিনি আশ্চর্য সচেতনভাবে ও সযত্নে নিরীক্ষণ করিয়াছেন এবং তাঁহার রচনার উজ্জ্বল সুষমায় পল্লীর সমুদয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হইয়াছে। পল্লীর সামগ্রিক চিত্ররূপ উদ্ঘাটনে দীনেন্দ্র-কুমারের রূপদক্ষ শিল্পিমানসের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। দীনেন্দ্রকুমারের সূক্ষ্ম বাস্তবদৃষ্টির সহিত এক গভীর কবিদৃষ্টিরও সমন্বয় সাধিত হইয়াছে এবং ফলে,

তাঁহার প্রবন্ধের বহুল অংশই কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। দীনেন্দ্রকুমারের 'দশহরা গঙ্গাপূজা' নামক প্রবন্ধে গ্রাম্য প্রাকৃতিক পরিবেশের যে অপূর্ব কবিত্বসুলভ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে আকাশে নবীন মেঘের সঞ্চার দেখিয়া যুগান্তর পূর্ব্বে যেমন রামগিরির নিভৃত উপত্যকায় অভিশাপক্লিষ্ট প্রবাসী 'অবলা-বিপ্রযুক্ত' যক্ষের হৃদয়ে সুগুরু বিরহবেদনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, একালেও তেমনি গগনবিলম্বী ধূসর মেঘচ্ছায়া নববর্ষাগমে প্রত্যেক প্রবাসীর ব্যথিত মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া, প্রিয়জন মিলনহীন তৃষিত বিরহি-হৃদয়ে এক অতৃপ্ত কম্পনের সঞ্চার করে। আষাঢ়ের এই বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত মেঘের জটা, নিদাঘের দীর্ঘ সঞ্চিত উত্তাপ-কান্তিহরা প্রাবৃটের এই ঘনবর্ষণ, জলাশয়ে নবজাগ্রত ভেকের সহর্ষ মকধ্বনি, ধারাপাতপুষ্ট তৃণাঙ্কুর ও বৃক্ষলতার স্নিগ্ধ শ্যামসৌন্দর্য্যময় শাখাপল্লবের প্রচুরোদ্গমের সহিত পল্লীবাসিগণের হৃদয়ে নববর্ষার একটি প্রাচীন উৎসব কাহিনী স্বতঃই জাগিয়া উঠে ; সেই মধুর গ্রাম্য উৎসবটি দশহরা গঙ্গাপূজা।'[১]

বাংলা সাহিত্যে রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনীকার দীনেন্দ্রকুমার বিস্মৃতি-গর্ভে বিলীন হইলেও পল্লী-রূপরসিক প্রবন্ধকাররূপে যে তাঁহার আসন নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্র-পর্বের একজন অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন প্রবন্ধকার। তাঁহার একনিষ্ঠ সারস্বত সাধনা বহুধা বিকীর্ণ হইয়া বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য বিধানে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অল্পাধিক রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি সাহিত্যের যে বিভাগের প্রতি সর্বাধিক মনোযোগী হইয়া সাহিত্য-কর্মে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহা বাংলা অনুবাদ-সাহিত্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিশেষতঃ ইংরাজী, ফরাসী, সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষায় তিনি গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধনের ফলে অনুবাদ-সাহিত্যে তাঁহার আশানুরূপ সাফল্য একান্ত স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ

[১] 'পল্লীচিত্র', (কলিকাতা, ১৩১১), পৃঃ ৭৮

অনুবাদক ও নাট্যকার হিসাবে প্রথিতযশা হইলেও তাঁহাব সুচিন্তিত প্রবন্ধরাজি দ্বারাও তিনি এক স্বতন্ত্র আসন অধিকার করিয়াছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সমাজ, সাহিত্য-তত্ত্ব, সংগীত, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিচিত্র প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। 'ভারতী', 'বালক' ও 'সাধনা' নামক মাসিক পত্রে নিয়মিতভাবে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশই সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধের একটিমাত্র সংকলনগ্রন্থ 'প্রবন্ধমঞ্জরী' ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সংগ্রহ-গ্রন্থের শেষভাগে সন্নিবিষ্ট কয়েকটি রচনা অতি সংক্ষিপ্ত ও সংবাদধর্মী—তাহারা পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের মর্যাদা লাভ করে নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'প্রবন্ধমঞ্জরী' তাঁহার বহুমুখী পাণ্ডিত্যের সার্থক নিদর্শন। বিচিত্র বিষয় সম্পর্কিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবন্ধসমূহ বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশে ও সুতীক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ হইয়াছে। প্রতি প্রবন্ধেই তাঁহার পরিশীলিত বিদগ্ধ মনের বহুবিধ প্রশ্ন ও কৌতূহল এবং তৎসমুদয়ের সুশৃঙ্খল ও সুস্পষ্ট সমাধানের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধে নূতন ভাব ও চিন্তার ধারা উন্মুক্ত করিয়া অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার 'ইংরেজী ও হিন্দুসভ্যতা', সৌন্দর্যতত্ত্ব', 'সঙ্গীত-কলা' 'ভারতে নাট্যের উৎপত্তি', 'সমাজ-বিজ্ঞান', 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রভৃতি প্রবন্ধ গভীর চিন্তাশীলতা, ঔচিত্যবোধ এবং বিশ্লেষণ-শৈলীর অভিনবত্বে দীপ্তিময়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবন্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার সুপরিচ্ছন্ন প্রকাশ-নিপুণতা ও ভাষার প্রসাদগুণে জটিল তত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয়ও সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সঙ্গীত-কলা' নামক প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'প্রত্যেক ললিত-কলার বিশেষ বিশেষ সৌন্দর্য্য এক একটি বিশেষ আকারে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই আকার-রচনা—এই রূপ-কল্পনা প্রত্যেক কলার মধ্যে নিতান্তই প্রয়োজনীয়। যখন কোন কলা-কবি স্বকীয় কোন সুন্দর মানস-প্রতিমাকে বাহিরে মূর্ত্তিমান করিয়া প্রকাশ করেন, তখনই তাহা ললিত-কলার অন্তর্গত হয়। চিত্রকলা, মূর্ত্তিকলা, কিম্বা বাস্তুকলার রূপ-কল্পনা ও গঠন-প্রণালী কিরূপ, তাহা সচরাচর লোকে সহজে বুঝিতে পারে। কিন্তু সঙ্গীতের উপকরণ সামগ্রী

অপেক্ষাকৃত আরো সূক্ষ্ম বলিয়া, তাহার রচনা-প্রণালী বুঝিয়া ওঠা তত সহজ নহে। কেননা, চিত্রকলা প্রভৃতির উপকরণ প্রধানতঃ বহির্জগৎ হইতে, এবং সঙ্গীতের উপকরণ প্রধানতঃ অন্তর্জগৎ হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। সঙ্গীতের উৎপত্তির খুব গোড়া ধরিলে দেখা যায়, হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করিতে গিয়া যে অস্পষ্ট ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাহাই সঙ্গীতের মূল উপকরণ।'[১]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিচিত্র বিষয়াত্মক প্রবন্ধসমূহ হইতে তাঁহার যে বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও মৌলিক চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা বাংলা সাহিত্যে অন্যতম কুশলী ও বিশিষ্ট প্রবন্ধকারের আসন তাঁহার অবশ্যই প্রাপ্য।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—রবীন্দ্র-পর্বের বাংলা সাহিত্যে দর্শন বিভাগের অবি-সম্বাদিত মনীষীর আসনে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয়বিধ দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গভীর জ্ঞানানুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায়। হীরেন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান-তত্ত্ব তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধে অতি প্রাঞ্জল ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদর্শনের সুষ্ঠু পর্যালোচনায় তাঁহার অসামান্য মনস্বিতা প্রকাশ পাইয়াছে এবং তিনি পাশ্চাত্ত্য দর্শনের আধুনিকতম ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে এক তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ দর্শনের মধ্যে এক সামঞ্জস্য বা ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করিয়া হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত প্রবন্ধসমূহের অধিকাংশই প্রাচীন ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা অবলম্বনে লিখিত; কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রলব্ধ উপাদান তাঁহার স্বকীয় চিন্তা-নিয়ন্ত্রিত যুক্তির দ্বারা গ্রথিত হইয়া প্রতিটি বিষয়ের উপরই নূতনভাবে আলোকসম্পাত করিয়াছে।

হীরেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনারীতি এক নিপুণ পারিপাট্যে ও সৌকর্যে রমণীয় হইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধ মধ্যে কোথাও শব্দের অনাবশ্যক বাহুল্য বা বাক্যের অসংলগ্নতা পরিলক্ষিত হয় না। দর্শনশাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বসমূহের বিচার-বিশ্লেষণে হীরেন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্র আবেগোচ্ছ্বাস প্রকাশ পায় নাই—বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে তাঁহার প্রবন্ধের সর্বত্রই সমুদ্ভাসিত; অথচ সহজ প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণান্বিত ভাষায় লিখিত জটিল দার্শনিক প্রবন্ধসমূহ এক বিরল সৌন্দর্য-সুষমার অধিকারী হইয়াছে।

১ 'প্রবন্ধমঞ্জরী', (কলিকাতা, ১৯০৫), পৃঃ ৫৫৬-৫৭

হীরেন্দ্রনাথ প্রণীত ধর্ম ও দার্শনিক প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমে: ১। 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' (১৯০৫), ২। 'উপনিষদ—ব্রহ্মতত্ত্ব' (১৯১১), ৩। 'জগদ্গুরুর আবির্ভাব' (১৯১৬), ৪। 'বেদান্ত পরিচয়' (১৯২৪), ৫। 'কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর' (১৯২৫), ৬। 'অবতার-তত্ত্ব' (১৯২৮), ৭। 'যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ' (১৯৩৬), ৮। 'বুদ্ধদেবের "নাস্তিকতা"' (১৯৩৬), ৯। 'প্রেমধর্ম্ম' (১৯৩৮) ১০। 'রাসলীলা' (১৯৩৮), ১১। 'সাংখ্য পরিচয়' (১৯৩৯), ১২। 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' (১৯৪০), ১৩। 'বুদ্ধি ও বোধি' (১৯৪০) এবং ১৪। 'উপনিষদ—জড় ও জীবতত্ত্ব' (১৯৫২)। প্রতিটি গ্রন্থই দার্শনিক, বৈদান্তিক পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথের মনস্বিতা ও প্রজ্ঞালোকের গভীর সত্যানুভূতির সম্যক্ পরিচয়ে সমৃদ্ধ। এই গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত হীরেন্দ্রনাথের অন্যান্য বিষয়ক বহু সংখ্যক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধও বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহা অদ্যাপি একত্র সংকলিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। হীরেন্দ্রনাথের এই সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি সারগর্ভ সাহিত্য-সমালোচনাত্মক প্রবন্ধেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ১২৯৯ ও ১৩০২ বঙ্গাব্দের মাসিক 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার 'কালিদাস ও সেক্সপীয়র' এবং 'কুরুক্ষেত্র' নামক প্রবন্ধদ্বয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হীরেন্দ্রনাথের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ হইতে তাঁহার গভীর রসজ্ঞান ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের সম্যক্ পরিচয় লাভ করা যায়।

হীরেন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' এবং ইহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ হিসাবে কীর্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অভিনবত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই তাঁহার এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। হীরেন্দ্রনাথ উপনিষদ ও পৌরাণিক যুগে প্রচলিত তত্ত্বসমূহের মধ্যে এক সুষ্ঠু সংগতি বা সামঞ্জস্য বিধানে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার দার্শনিক তত্ত্ব-গভীর অন্যান্য গ্রন্থসমূহও 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' নামক গ্রন্থেরই পরিপোষক ও পরিপূরক হিসাবে উল্লেখযোগ্য। হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' গ্রন্থে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা অর্থাৎ ভারতীয় ষড়্দর্শনের সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ষড়্দর্শনের ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা তাঁহার গভীর গবেষণায় আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং হীরেন্দ্রনাথ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'কেই অন্যতম

শ্রেষ্ঠ দর্শনরূপে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ষড়্‌দর্শনের যেখানে ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা, গীতায় সেই ত্রুটি নাই অর্থাৎ গীতায় এক অপূর্ব তত্ত্ব সংযোজিত হইয়াছে তাহা ঈশ্বরবাদ এবং এই ঈশ্বরবাদই গীতাকে ত্রুটিশূন্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ (perfect) করিয়া তুলিয়াছে। হীরেন্দ্রনাথের দার্শনিক আলোচনা যেমন পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ, তেমনি অভিনব ও মৌলিক। প্রসঙ্গানুগ বহু শাস্ত্রশ্লোক উদ্ধৃত করিয়া হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার আলোচনা অধিকতর প্রামাণ্য ও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

হীরেন্দ্রনাথ উপনিষদের একজন বিশিষ্ট ভাব-রসগ্রাহী পণ্ডিত ছিলেন। উপনিষদের বৃহৎ পটভূমিকায় তিনি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অধিক সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার 'উপনিষদ—ব্রহ্মতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য এই দুই ভাব-স্বরূপের বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উভয় ভাবেরই মূর্ত প্রতীক অর্থাৎ ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের দৈব রাসায়নিক মিশ্রণ যে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে ঘটিয়াছে, তাহাই প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে উপনিষদের পটভূমিতে হীরেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম তাঁহার প্রবন্ধের মধ্য দিয়া এবংবিধ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের ব্যাখ্যায় সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে যাহা সম্ভব হয় নাই, হীরেন্দ্রনাথ তাহাই সার্থকভাবে সম্পূর্ণ করিয়া প্রশংসনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

হীরেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ তথ্যপূর্ণ ও ক্ষুরধার যুক্তিনিষ্ঠ এবং প্রতিপাদ্য বিষয় শাস্ত্রীয় শ্লোক দ্বারা সমর্থিত ও সুস্পষ্ট। প্রবন্ধগত বিষয়-গাম্ভীর্যের সহিত তাঁহার লিপি-চাতুর্যের অপূর্ব সুষমায় হীরেন্দ্রনাথের জটিল তত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধও এক বিরলদৃষ্ট মহিমা লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' নামক তাঁহার বিশিষ্ট প্রবন্ধগ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শন ও গীতার তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'গীতা ঈশ্বরবাদে সমুজ্জ্বল। ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিয়া গীতা এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন না। সাংখ্যশাস্ত্রে কৈবল্য-লাভের যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর ত নাই-ই; যদিই বা থাকিতেন, তাহা হইলেও সাংখ্যদর্শনের উদ্ভাবিত প্রণালীর অনুসরণ করিবার জন্য তাঁহার সহিত জীবের কোনও রূপ সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজন

হইত না। কারণ সাংখ্যদর্শনোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের (ঈশ্বর যাহার অন্তর্ভূত নহেন) প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিলেই জীব অত্যন্ত দুঃখের অধিকার ছাড়াইয়া কৈবল্যলাভ করিবে। ইহাই সাংখ্য-প্রদর্শিত মুক্তিপথ। বলা বাহুল্য, গীতার অনুমোদিত পথ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া, সে পথে পর্য্যটন করিতে হয়।'[১]

হীরেন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া বাংলা সাহিত্যে অন্যতম বরিষ্ঠ দার্শনিক প্রবন্ধকারের সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সন্ন্যাসাশ্রমের পূর্বনাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীচরণ সন্ন্যাস গৃহীত 'ব্রহ্মবান্ধব' নামেই স্বদেশে ও বিদেশে সুপরিচিত ছিলেন। এই কর্মবীর সন্ন্যাসী বাংলাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট দার্শনিক ও বহুভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবেও খ্যাতি লাভ করেন। ইংরাজী, ল্যাটিন, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দু, সিন্ধী, মারাঠী প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিভিন্ন ভাষায় তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব, বেদান্ত, সাংখ্য, সুফী প্রভৃতি বিবিধ ধর্মভিত্তিক দার্শনিক তত্ত্বে ব্রহ্মবান্ধবের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম, দর্শন, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষারীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়াশ্রিত প্রবন্ধসমূহ তাহার গভীর মননশীলতা ও বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক। বেদান্ত দর্শনের ভিত্তিতে খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন তত্ত্বসমূহের বিচার-ব্যাখ্যান দ্বারা ব্রহ্মবান্ধবের অভিনবত্ব ও নিজস্ব মৌলিক চিন্তার পরিচয় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

ব্রহ্মবান্ধব ঈশাপন্থী রোমান্ ক্যাথলিক সন্ন্যাসী হইয়াও আজীবন ভারতবাসী, বিশেষতঃ বাঙ্গালী পরিচয় দ্বারা স্বয়ং গৌরববোধ করিয়াছেন। তাঁহার বিচিত্র প্রবন্ধ ও বিবিধ কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া ভারতীয় হিন্দু দর্শনের একনিষ্ঠতা এবং বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ-ধর্ম ও গভীর তাৎপর্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে লিখিত বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রবন্ধ হইতে ব্রহ্মবান্ধবের প্রগাঢ় দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বজাতির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং স্বদেশবাসীর মধ্যে আত্মপ্রত্যয় বা জাতীয়তাবোধের উজ্জীবনে তাঁহার

১ 'গীতায় ঈশ্বরবাদ', (কলিকাতা, ১৩১২), পৃঃ ৯৬-৯৭

ঐকান্তিক প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা' (১৯০৪) নামক দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করিয়াছেন। 'সন্ধ্যা' পত্রিকা তাঁহার সুষ্ঠু সম্পাদনায় তৎকালীন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দৈনিকের মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। এই পত্রিকাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইহা বাংলার জনগণের কথ্য ভাষার অনুগ সহজবোধ্য চলিত ভাষায় প্রকাশিত হইত। বাংলা চলিত ভাষাকে সহজ ও মনোজ্ঞ করিয়া তুলিতেও ব্রহ্মবান্ধব বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যদিও তিনি স্বয়ং তাঁহার গুরুগম্ভীর দার্শনিক প্রবন্ধে সাধু ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু প্রয়োজনানুসারে, বিশেষতঃ সংবাদপত্রে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি চলিত ভাষা-প্রয়োগেরই পক্ষপাতী ছিলেন। সাধু ও চলিত উভয় প্রকার ভাষা ও রচনারীতিতেই ব্রহ্মবান্ধবের সমান দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রহ্মবান্ধব প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'ব্রহ্মামৃত' (১৯০৯), ২। 'সমাজ-তত্ত্ব' (১৯১০), ৩। 'আর্য্যধর্ম্ম ও তদ্ব্যাখ্যাতৃগণ' (১৯১৬) ও ৪। 'পাল-পার্ব্বণ' (১৯২৫)। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মবান্ধবের 'আমার ভারত উদ্ধার' নামক একটি আত্মজীবনী পর্যায়ের অসমাপ্ত রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ ব্যতীত ব্রহ্মবান্ধবের কয়েকটি সুলিখিত পত্রও প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাঁহার 'বিলাত যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি' (১৯০৬) নামক পত্র-সংকলনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সংকলনে সন্নিবিষ্ট ব্রহ্মবান্ধবের অধিকাংশ পত্রই প্রবন্ধ-লক্ষণাক্রান্ত। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, ব্রহ্মবান্ধবের 'সমাজ-তত্ত্ব' গ্রন্থটি পরবর্তী কালে কেবলমাত্র 'সমাজ' এই শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছে।

দর্শন, ধর্ম ও সমাজ-তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় ব্রহ্মবান্ধবের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ন-দীপ্ত বুদ্ধির চাতুর্য লক্ষ্য করা যায়। ধর্মান্তরিত হইলেও হিন্দু দর্শন, ধর্ম বা সমাজের প্রতি ব্রহ্মবান্ধবের কখনই অশ্রদ্ধেয় মনোভাব প্রকাশ পায় নাই। হিন্দু দর্শন এবং বাঙ্গালীর সমাজ-বিন্যাসে যেখানে শ্রেষ্ঠত্ব বা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে, ব্রহ্মবান্ধব তাহার প্রতি নূতনভাবে আলোকপাত করিয়াছেন। হিন্দু সমাজ-তত্ত্ব যে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ দ্বারা প্রভাবিত, এই চরম সত্য তিনি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। হিন্দু সম্প্রদায় যে বহুর মধ্যে একের অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দের অস্তিত্ব অনুভব করেন, তাহা ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার বিভিন্ন দার্শনিক প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যুক্তি-তথ্যনির্ভর

পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয় তাঁহার সরস প্রাঞ্জল ভাষায় সহজবোধ্য হইয়াছে। দার্শনিক জটিল প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত সরস ও উপভোগ্য করিয়া তুলিতে ব্রহ্মবান্ধব বহু ক্ষেত্রে লঘু পরিহাসপ্রিয়তার আশ্রয় লইয়াছেন ; কিন্তু ইহা দ্বারা তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়গত মাহাত্ম্য কোথাও বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

ব্রহ্মবান্ধবের 'সমাজ-তত্ত্ব' গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহ তাঁহার দার্শনিক মনীষার অভ্রান্ত স্বাক্ষরে বিশেষ মূল্যবান্ হইয়াছে। এই সংকলনে 'হিন্দু জাতির এক-নিষ্ঠতা' প্রবন্ধটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মবান্ধব হিন্দুর হিন্দুত্ব প্রসঙ্গে যে গভীর দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার চিন্তার প্রৌঢ়ত্ব, মননশীলতা ও অপূর্ব বিশ্লেষণ-দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে প্রচলিত দার্শনিক চিন্তা-প্রণালী ও বিভিন্ন ধর্মীয় মত-বিশ্বাসের পার্থক্য ব্রহ্মবান্ধব-তাঁহার প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ভারতীয় দর্শন-চিন্তার বৈশিষ্ট্য কোন ধর্মমতের উপর নির্ভরশীল নহে, একনিষ্ঠতাই হিন্দু দর্শনের বিশেষত্ব। এই একনিষ্ঠ চিন্তাপ্রবণতা শুদ্ধাদ্বৈতবাদে সম্পূর্ণতা অর্থাৎ পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। অন্যান্য সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়েও ইহার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। হিন্দুর হিন্দুত্ব বিভিন্নতার মধ্যে অভিন্নতা এবং বহুত্বের মধ্যে একত্বের উপলব্ধি বা সাধনার উপর নির্ভরশীল। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, জৈন, শিখ যেমন হিন্দু, তেমনি সাংখ্য, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শাঙ্কর, অদ্বৈত প্রভৃতি সকল ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে একই হিন্দুত্বের বিভিন্ন রূপের বিকাশ ঘটিয়াছে। এবংবিধ জটিল দার্শনিক তত্ত্বও ব্রহ্মবান্ধবের আলোচনাকৌশলে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'হিন্দু জাতির একনিষ্ঠতা' নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈতবাদে হিন্দুর একনিষ্ঠতার পরম তৃপ্তি হইয়াছে। বস্তু এক ভিন্ন পরমার্থতঃ দুই হইতে পারে না। এবং সেই বস্তুর মধ্যে বহুত্বের বীজ অসম্ভব। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্, অখণ্ড, অপরিণামী, আপ্তকামি ; সম্বন্ধ নিরপেক্ষ, আত্মরত, অসঙ্গ, শুদ্ধ কৈবল্যময়। তিনি জগতের কারণ বটেন, কিন্তু সেই কারণ-বীজ তাঁহার সত্তাতে পাওয়া যায় না। তাঁহার জগৎ কারণত্ব বা স্রষ্টৃত্ব স্বরূপগত নহে। তাঁহার স্বরূপ কেবল সচ্চিদানন্দময়। * * * একনিষ্ঠ চিন্তাপ্রবণতা, বস্তুর বস্তুত্বদর্শন, কর্ত্তা এবং কার্য্যের পারমার্থিক অভেদানুভূতি, বহুত্বের মায়িকতা-জ্ঞানই হিন্দুর হিন্দুত্ব।'[১]

১ . 'সমাজ,' (কলিকাতা, ১৯২৩), পৃঃ ১৫-১৬

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্যাতি ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক হিসাবে নহে, মুখ্যতঃ প্রবন্ধকাররূপেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বিবিধ সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনায় তাঁহার প্রখর মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। পাঁচকড়ি অসাধারণ কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনশাস্ত্রেই তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য-সমালোচনা, ধর্ম, দর্শনতত্ত্ব, বিশেষতঃ বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক দর্শন প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি বহু সংখ্যক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা ও নিরপেক্ষতাগুণে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠক মহলে প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছিল। পাঁচকড়ি কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করিয়া সাংবাদিক জগতেও খ্যাতি অর্জন করেন। 'বঙ্গবাসী', 'বসুমতী,' 'রঙ্গালয়,' 'সাহিত্য,' 'হিতবাদী,' 'প্রবাহিণী' প্রভৃতি পত্রিকা তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিয়াও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

সূক্ষ্ম পরিহাসরসিকতার ক্ষেত্রেও পাঁচকড়ির অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। বস্তুতঃ, তাঁহার পরিহাসরসিকতা সর্ববিধ প্রবন্ধেই এক নূতন রস সঞ্চার করিয়াছে এবং ফলে, গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধও সাধারণের নিকট উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় হইয়াছে। পাঁচকড়ির ভাষা ও রচনারীতিতে যে অনায়াসলব্ধ সারল্য ও সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায়, তাহা সমকালীন অন্যান্য প্রবন্ধকারের রচনায় দুর্লভ ছিল।

পাঁচকড়ি বিস্মৃতপ্রায় বহু অজ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে 'সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস' (১৯০৯) নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া ঐতিহাসিক সুনাম অর্জন করিয়াছেন বটে; কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশিষ্ট প্রবন্ধ রচনা-কর্মেই তাঁহার তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি ও মৌলিক চিন্তার সম্যক্ বিকাশ ঘটিয়াছে। পাঁচকড়ি 'অনুসন্ধান,' 'সাহিত্য,' 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', 'বিজয়া,' 'প্রবাহিণী,' 'নারায়ণ', 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি তৎকালীন প্রায় সকল প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সাহিত্যপত্রেই বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। পাঁচকড়ির জীবিতাবস্থায় তাঁহার এই সকল প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রচেষ্টায় সাময়িক পত্রসমূহ হইতে পাঁচকড়ির বিচিত্র বিষয়ক রচনা সংগৃহীত হইয়া 'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী' নামে দুইখণ্ডে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই সংকলনদ্বয়ে তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অনতিদীর্ঘ অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রবন্ধসমূহেই যে পাঁচকড়ির মনীষার

চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছে, তাহা তাঁহার বিবিধ বিষয়াশ্রিত প্রবন্ধ পর্যালোচনা করিয়া উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

পাঁচকড়ির সকল রচনার পশ্চাতেই এক উচ্চ জীবনাদর্শ এবং স্বধর্ম ও স্বজাতি-প্রীতির প্রেরণা অনুভব করা যায়। সর্বক্ষেত্রেই 'বাঙ্গালীত্ব চেতনা' তাঁহাকে 'খাঁটি বাঙ্গালী'র সম্মানে ভূষিত করিয়াছে। বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালী সমাজ ও বাঙ্গালীর ধর্ম তাঁহার একান্ত প্রিয় ছিল। পাঁচকড়ির অধিকাংশ প্রবন্ধই বাঙ্গালীর সাধনা, সংস্কার, ধর্ম-কর্ম, ভাষা, সাহিত্য ও শিল্প অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। পাঁচকড়ি তাঁহার 'বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব', 'বাঙ্গালীর প্রত্নতত্ত্ব,' 'বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা', 'বাঙ্গালীর জাতি-পরিচয়', 'বাঙ্গালার উপাসক সম্প্রদায়', 'বাঙ্গালার সমাজ-বিন্যাস' প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহে সর্বভারতীয় সংস্কৃতি হইতে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীর যে বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য, তাহা বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা ও বিচারভঙ্গি দ্বারা প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতা, বিশ্লেষণের নিপুণতা ও জাতীয় চেতনার গভীরতায় পাঁচকড়ির এই শ্রেণীর প্রবন্ধসমূহ বিশেষ সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

পাঁচকড়ির বিবিধ দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধেও তাঁহার গভীর অধ্যয়ন-জাত নিজস্ব চিন্তা ও উপলব্ধির পরিচয় লাভ করা যায়। তান্ত্রিক দর্শনেই তাঁহার পারদর্শিতা ও নৈপুণ্য সর্বাধিক প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান অবলম্বন তন্ত্র বা শক্তিতত্ত্ব। বাংলাদেশের বিচিত্র ধর্মীয় তত্ত্ব অর্থাৎ বৈষ্ণব, শৈব ও শক্তিধর্মের পর্যালোচনায় তন্ত্রের স্বরূপ-রহস্য সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞানোপলব্ধি অবশ্যম্ভাবী। পাঁচকড়ি তাঁহার প্রবন্ধে তন্ত্র বা শক্তিতত্ত্বের ন্যায় জটিল বিষয়ও সহজবোধ্য ও মনোজ্ঞ ভাষায় পরিবেশন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'শিব ও শক্তি,' 'তন্ত্রে মূর্তিপূজা', 'তন্ত্রের দেহতত্ত্ব,' 'তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব,' 'পঞ্চ "ম" কার' প্রভৃতি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তত্ত্ব-গভীর চিন্তা ও উপলব্ধির আন্তরিকতায় পাঁচকড়ির দার্শনিক প্রবন্ধগুলিও সরস ও রমণীয় হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার 'পঞ্চ "ম" কার' নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'আত্মশক্তি, উন্মেষ সাধনই তন্ত্রসাধন। তন্ত্র নিজের দেহস্থ আত্মা ছাড়া অন্য কোন বাহ্যশক্তিকে দেবতা, ঈশ্বর বলিয়া মানে না। তন্ত্র বলেন যে, আমার দেহমধ্যে যে একজন বিরাজ করিতেছেন, তাহা আমি বুঝি; তিনি জগৎকে বুঝিতে চাহেন, সৃষ্টি-প্রহেলিকাকে উদ্ঘাটন করিতে চাহেন। তাই অনুমান

করিতে হয় যে, যিনি আমার ভিতরে আছেন, তিনিই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে আছেন। আমার ভিতরের ঠাকুরকে আমি চিনিতে পারিলে বাহিরের ঠাকুরটি আপনি আসিয়া ধরা দিবেন।'[১]

পাঁচকড়ির প্রবন্ধের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাঁহার সহজ-স্নিগ্ধ রমণীয় ভাষা। বাংলা ভাষার উপর তাঁহার যে নিরঙ্কুশ আধিপত্য ছিল, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত কয়েকটি ইংরাজী প্রবন্ধের তৎকৃত বাংলা অনুবাদ দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে। 'হিন্দু পূজোৎসবের উৎপত্তি কথা,' 'বাঙ্গালীর জনসাধারণের সাহিত্য' প্রভৃতি অনুবাদ-প্রবন্ধ ভাষা ও রচনাকৌশলে পাঁচকড়ির মৌলিক প্রবন্ধেরই ভ্রমোৎপাদন করে।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানতঃ শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনার জন্যই খ্যাতি লাভ করেন। 'পঞ্চানন্দ' এই ছদ্মনামেও তিনি বিখ্যাত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক বিপুল বিপর্যয়ের ফলে সর্বক্ষেত্রে যে অসংগতি ও অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই ইন্দ্রনাথের পরিহাসরসিকতার মুখ্য ভিত্তি বা লক্ষ্য ছিল। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি, অন্যায় বা দুর্নীতি ইন্দ্রনাথ তাঁহার ব্যঙ্গ-রসাত্মক রচনাসমূহে প্রকাশ করিয়া আত্মচেতনাহীন স্বধর্মভ্রষ্ট বাঙ্গালী জাতির চৈতন্য উজ্জীবনে প্রয়াসী হইয়াছেন। ব্যঙ্গপ্রধান রচনা ব্যতীত ইন্দ্রনাথ বিবিধ প্রসঙ্গে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধেও তাঁহার স্বদেশ এবং স্বধর্মের কল্যাণচিন্তা বা সমৃদ্ধির নানামুখী পথ-নির্দেশের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

ইন্দ্রনাথ ইংরাজী শিক্ষিত 'খাঁটি বাঙ্গালী' ছিলেন। ইংরাজী এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হইয়াও ইন্দ্রনাথ কখনই হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্র, সভ্যতা বা ঐতিহ্যের প্রতি অসম্মান প্রকাশ করেন নাই। বরং প্রচলিত দেশীয় সামাজিক বিধি ব্যবস্থার প্রতি তাঁহার গভীর আনুগত্য বা অনুরক্তির পরিচয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। সামাজিক আচার-আচরণে ইন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল

১ 'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী' ২য় খণ্ড, (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৮), পৃঃ ৩১৯

মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধেই নিষ্ঠাব্রতী আচার-পরায়ণ হিন্দুর গরিমা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ইন্দ্রনাথ সমাজনীতি, রাজনীতি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গেই মুখ্যতঃ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে মুদ্রিত তাঁহার সকল প্রবন্ধই সংকলিত হইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ইন্দ্রনাথের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সমাজ-তত্ত্বমূলক একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'জাতিভেদ' (১৯১০)। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ পরবর্তী কালে মুদ্রিত 'ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী'র (১৯২৫) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রতি প্রবন্ধেই ইন্দ্রনাথের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রখরতা লক্ষ্য করা যায়। গভীর মনন-চিন্তার দীপ্তিতে ও ভাষার পরিচ্ছন্নতায় তাঁহার সর্ববিধ প্রবন্ধই ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা তাঁহার চিন্তাগর্ভ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধেও এক রস-মধুর পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে।

ইন্দ্রনাথ তাঁহার 'জাতিভেদ' নামক প্রবন্ধগ্রন্থে ভারতীয় বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার কল্যাণকর রূপ ও বৈশিষ্ট্য অতি নৈপুণ্য সহকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, জাতিভেদ নিছক সামাজিক বা লৌকিক বিভাগই সূচিত করে না ; জাতিভেদের সহিত ধর্মের যোগও সুনিবিড় এবং তাহার উপরই মানুষের অদৃষ্ট অর্থাৎ পরকালের শুভাশুভ নির্ভরশীল। ইন্দ্রনাথ বিভিন্ন পৌরাণিক শাস্ত্র হইতে নির্ভরযোগ্য উক্তি উদ্ধৃত করিয়াও তাঁহার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইন্দ্রনাথের এই বর্ণ বা জাত্যাভিমানী হিন্দুত্ববোধ তাঁহার রক্ষণশীল মনোভাবেরই পরিচায়ক। ইহা অনস্বীকার্য যে, ব্রাহ্মণ্য বর্ণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশের ফলে তাঁহার 'জাতিভেদ' গ্রন্থটির সাহিত্যিক আবেদন বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

ইন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা ও বর্ণমালা বিষয়ক কয়েকটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ 'ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী'তে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা অর্থাৎ শুদ্ধ প্রয়োগ-বিধির প্রতি ইন্দ্রনাথের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। খাঁটি বাংলা ভাষার যে এক স্বতন্ত্র স্বরূপ বা প্রাণৈশ্বর্য আছে, তাহা তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করিয়াছিলেন। ভাষা সম্পর্কে ইন্দ্রনাথের গভীর অনুধ্যান ও অনুশীলনের পরিচয় তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা,' 'বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার,' 'ভাষান্তরে বিড়ম্বনা,' 'ভাষায় বড় গোল' প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহ হইতে প্রমাণিত হয়। খেয়ালীচিত্তবশতঃ উদ্ভট বাক্য রচনা বা আকস্মিক চমক্ দিবার জন্য ভাষায় অদ্ভুত শব্দ-প্রয়োগের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী

ছিলেন। বাংলা ভাষার অন্তঃপ্রকৃতির সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয়ের অভাবে ভাষার ক্ষেত্রে তৎকালীন বাঙ্গালী লেখকগণের যথেচ্ছাচারিতা সুরু হইয়াছিল এবং এই ভাষাগত বিকৃতির কারণ নির্দেশ করিয়া ইন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধসমূহে যে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইন্দ্রনাথের 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'সংবাদপত্র চালাইতে এবং বিবিধ প্রবন্ধ সকল রচিতে আজি কালি কিছু কিছু বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার হইতেছে বটে, কিন্তু সে যেন সৌখীনের সখ মিটান গোছের। শব্দপ্রয়োগ বা রচনার রীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি কি ধরাধরি নাই; স্বাধীনভাবে যাহার যেমন ইচ্ছা, তিনি তেমনই লিখিয়া বসেন। এইসব লেখকদেরও বিড়ম্বনার এক প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ভাষান্তর করা। যাঁহারা লিখেন বাঙ্গালায়, তাঁহারা শিখেন প্রায় ইংরেজীতে। লিখিবার সময়ে ইংরেজী শব্দটা যেমন মনে উদিত হয়, অমনি তাহার একটা অবিকল বাঙ্গালা প্রতিরূপ খুঁজিতে বসেন। অনেকেই ভাবেন না যে, জাতিভেদে সমাজভেদে, দেশভেদে, নীতিভেদে রীতিভেদ এবং ভাবভেদ হইয়া থাকে। অনেকেই বুঝিতে পারেন না বা বুঝিরার চেষ্টা করেন না যে জাতির সঙ্গে জাতীয় ধর্ম্মের সঙ্গে সেই জাতীয় ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।'[১]

ইন্দ্রনাথ প্রবন্ধ রচনায় বহুল ক্ষেত্রেই এক সহজ সংলাপাত্মক ভঙ্গি অনুসরণ করিয়াছেন এবং ফলে, তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধ গূঢ়বক্তব্যপূর্ণ হইয়াও সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

অজিতকুমার চক্রবর্তী—অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম সমালোচকগোষ্ঠীর অন্যতম। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিদগ্ধ সমালোচক হিসাবেই তিনি বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক পরিচিত হইয়াছেন। সাহিত্য-সমালোচনা ব্যতীত অজিতকুমার অন্যান্য প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়াও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও জীবন-চরিত বিষয়ক প্রবন্ধসমূহেও তাঁহার অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু অজিতকুমার মুখ্যতঃ সাহিত্য-সমালোচনা-কর্মেই তাঁহার যথাসম্ভব শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং বস্তুতঃ, বাংলা সাহিত্যের এই উপেক্ষিত ও অপরিণত বিভাগটি তাঁহার মূল্যবান্ রচনা দ্বারা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়াছে।

১ 'ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী,' (কলিকাতা, ১৩৩২), পৃঃ ৮৩

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব-পুষ্ট হইলেও অজিতকুমারের গদ্যভাষা ও রচনারীতিতে তাঁহার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হইয়াছে। গভীর চিন্তা-চেতনা ও রস-কল্পনায় তাঁহার প্রবন্ধ যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি স্বভাবসিদ্ধ সহজ কাব্যসুলভ ভাষার সারল্যে ও সরসতায় তাহা প্রাঞ্জল এবং চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। অজিতকুমারের লেখনীকৌশলে তাঁহার সাহিত্য-বিচারমূলক গম্ভীর (serious) প্রবন্ধও এক অসামান্য প্রসাদগুণে মহিমান্বিত হইয়াছে। অজিতকুমার সাহিত্য-বিচারে রবীন্দ্রনাথেরই সহধর্মী অর্থাৎ রবীন্দ্র-সমালোচনরীতি তিনি সার্থকভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনা সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ন্যায় নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে ও সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। সমালোচনা যে একটি স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্যিক সৃষ্টি এবং সত্য ও সুন্দরের অনন্ত রূপ-ব্যঞ্জনা পরিস্ফুটন-কর্মেই যে সমালোচনার সার্থকতা নিহিত, তাহা অজিতকুমার গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্নভাবে ভাল ও মন্দ এই দুই স্থূল বাটখারায় সাহিত্যের ওজন অর্থাৎ বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। অজিতকুমার সামগ্রিক অর্থাৎ অখণ্ড দৃষ্টির আলোকেই সাহিত্য-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সাহিত্য-বিচার প্রসঙ্গে তাঁহার নিজস্ব মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। অজিতকুমার স্বয়ং লিখিয়াছেন—

'বড় সাহিত্যিকের বা কবির সকল রচনার মধ্যে অভিব্যক্তির একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র থাকে; সেই সূত্র তাহার পূর্বকে উত্তরেব সঙ্গে গাঁথিয়া তোলে, তাহার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে বাঁধিয়া দেয়। অপূর্ণতা-অস্ফুটতা হইতে ক্রমে ক্রমে তাহা সুস্পষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়--সেইজন্য কবির বা সাহিত্যিকের রচনার মন্দ মানে অপরিণামের মন্দ এবং ভালো মানে পরিণতির ভালো। কবির বা সাহিত্যিকের সেই পরিণতির আদর্শের মানদণ্ডেই তাঁহার রচনার ভালোমন্দকে মাপিতে হইবে, তা বই ভালো এবং মন্দকে প্রত্যেকের আপন আপন সংস্কারানুসারে দুই টুকরা করিয়া নিক্তির মাপে ওজন করিলে চলিবে না।'[১]

অজিতকুমারের সাহিত্য-সমালোচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে সমালোচ্য বিষয় বিশিষ্ট সৌন্দর্য ও মাধুর্যে মহিমমণ্ডিত হইয়া এক অভিনব রস-জগতের তোরণ-দ্বার উন্মোচন করিয়াছে। তাঁহার অখণ্ড সাহিত্য-দৃষ্টি ও

১ 'রবীন্দ্রনাথ', (বিশ্বভারতী, ১৩৫৩), পৃঃ ৵০

সৌন্দর্যবোধ এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছে। অজিতকুমার স্বয়ং গীতিকবি-প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন। ফলে, তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধের পদলালিত্য ও শব্দঝংকার যেমন কাব্য-সুষমায় চিত্তহারী, তেমনি শ্রুতিমধুর হইয়াছে।

অজিতকুমার প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ যথাক্রমেঃ ১। 'খৃষ্ট', (১৯১১), ২। 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' (১৯১১), ৩। 'রবীন্দ্রনাথ' (১৯১২), ৪। 'বাতায়ন' (১৯১৩), ৫। 'লোকহিতের আদর্শ' (১৯১৪), ৬। 'কাব্য পরিক্রমা' (১৯১৫), ৭। 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', (১৯১৬) ও ৮। 'রাজা রামমোহন' (১৯১৭)। অজিতকুমারের প্রতি প্রবন্ধই সারগর্ভ ও মৌলিক চিন্তার পরিচয়বাহী।

অজিতকুমার যে একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন, তাহা তাঁহার কাব্য-রসাস্বাদনে এবং কাব্য-মূল্য বিচারের অপূর্ব ক্ষমতা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যের অভিনব ব্যাখ্যা বা ভাষ্য রচনায় তাঁহার রসবোধের গভীরতা, ব্যাপ্তি ও ধ্রুবত্ব এবং সূক্ষ্ম বিচারনৈপুণ্যের পরিচয় সম্যক্‌ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। অজিতকুমার সৌন্দর্য, অভিরুচি ও মিতাচারণেও যে অসাধারণ সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার বিভিন্ন সাহিত্য-সমালোচনায় প্রত্যক্ষ করা যায়।

রবীন্দ্র-কাব্যের প্রতি অজিতকুমারের প্রগাঢ় অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তাঁহার সমালোচনা-দৃষ্টি কিয়ৎ পরিমাণে আচ্ছন্ন করিলেও রবীন্দ্র-কাব্যের মূল তাৎপর্য নির্ণয়ে তিনি বিভ্রান্ত হন নাই। সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও নির্ভীকতা সহকারে অজিতকুমার রবীন্দ্র-বিরোধীপক্ষের সম্মুখীন হইয়া রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কিত সকল প্রকার অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছেন। বিভিন্ন বৈচিত্র্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার মধ্যে এক অখণ্ড ধারাবাহিকতা নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া তাঁহার বিচিত্র-ধর্মী সাহিত্য-ভূখণ্ডকে একত্র গ্রথিত করিয়াছে এবং অচঞ্চল স্থির পরিণামের অভিমুখী হইয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যগত এই সত্যের প্রতি অজিতকুমার তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধে যথাযথ অথচ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অজিতকুমারের 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'সমস্ত অংশকে খণ্ডকে অসম্পূর্ণকে যখন সেই পরিপূর্ণ সমগ্রের মধ্যে অখণ্ড করিয়া উপলব্ধি করা যায়, তখন বেশ বুঝিতে পারা যায় যে সব বিচিত্রতা এক জায়গায় গিয়া মিলিয়াছে, সব ভাঙাচোরা এক জায়গায় অক্ষতসুন্দর হইয়া

আছে। আমাদের জীবনের মধ্যে এই দ্বিতীয় জীবন এই অন্তরতর জীবনকে কি কোনো শুভ মুহূর্তে আমরা অনুভব করি নাই? নহিলে এত বার বার আঘাত কিসের জন্য? যেখানেই বিচ্ছিন্নতা সেখানেই ক্রন্দন। সেই কান্না যে কবির সমস্ত জীবন ভরিয়া। সেই পরিপূর্ণ সব-মেলানো আনন্দময় গভীরতর জীবন-সৃষ্টির মধ্যেই বিষাদের অশ্রুলীলাও এমন সুমধুর হইয়া ফুটিয়াছে। সেই পূর্ণ জীবন যাঁহার অখণ্ড আনন্দ অনুভূতির মধ্যে রহিয়াছে তিনিই জীবনদেবতা।'[১]

অজিতকুমারের 'কাব্য পরিক্রমা' গ্রন্থে সংকলিত 'জীবনদেবতা' নামক প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-কাব্য পাঠের অন্যতম ভূমিকা হিসাবে উল্লেখ করা যায়। তিনি তাঁহার এই প্রবন্ধে রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতির এক সুস্পষ্ট রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাব-সত্য অনুসন্ধানে অজিতকুমার কোন কোন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রে প্রচলিত তত্ত্বেরও আশ্রয় লইয়াছেন। সাহিত্য-সমালোচনা ক্ষেত্রে এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তনাও অজিতকুমারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

অজিতকুমারের 'বাতায়ন' নামক গ্রন্থটি তাঁহার দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের একটি বিশিষ্ট সংকলন। ইহার বিভিন্ন প্রবন্ধে সাহিত্য, সমাজ ও ধর্মবোধ সম্পর্কে অজিতকুমারের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার 'সৌন্দর্য্য ও মহিমা,' 'মেটারলিঙ্ক,' 'ধর্ম্ম ও স্বাজাত্য', 'কবিতা,' 'শিল্প' প্রভৃতি প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত হইলেও চিন্তা-স্বাতন্ত্র্যে ও গভীর ভাব-ব্যঞ্জনায় সমুজ্জ্বল। অজিতকুমারের 'বাতায়ন' গ্রন্থে সংগৃহীত বিভিন্ন প্রবন্ধের ভাবধর্ম ও রচনাকৌশল যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি চিত্তাকর্ষক। তাঁহার এই গ্রন্থের পরিকল্পনায় পাশ্চাত্ত্য প্রবন্ধকার James Russell Lowell প্রণীত *My Study Windows* গ্রন্থটির প্রভাব অনুভূত হয়।

অজিতকুমার যীশুখ্রীষ্ট, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও রাজা রামমোহন এই তিন মহানুভব ব্যক্তিচরিত্র অবলম্বন করিয়াও প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' শীর্ষক গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও শ্রেষ্ঠ হিসাবে কীর্তিত হইয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেমন একনিষ্ঠ ব্রহ্মসাধক, ঋষি ও কবি, তেমনি দেশপ্রাণ, কর্তব্যনিষ্ঠ

১ 'রবীন্দ্রনাথ' (বিশ্বভারতী, ১৩৫৩), পৃঃ ৪৬-৪৭

গৃহস্থ পুরুষ ছিলেন। অজিতকুমারের ব্যাখ্যাকৌশলে মহর্ষি চরিত্রের বহুমুখী পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ঠাকুর পরিবারের সহিত অজিতকুমার ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং ফলে, তিনি বহু অপ্রকাশিত অথচ প্রামাণ্য তথ্য তাঁহার গ্রন্থে পরিবেশনের সুযোগ লাভ করিয়াছেন। মহর্ষির সান্নিধ্যে যে সকল শ্রুতকীর্তি বাঙ্গালী মনীষীর সমাগম হইয়াছিল অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণের চরিত্রগত নানা বৈশিষ্ট্য ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়া গ্রন্থটির ভাবৈশ্বর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমকালীন দেশ ও সমাজের বৃহৎ পটভূমিকায় দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবন ও ধর্মচিন্তার যে ক্রমবিকাশের ধারা, তাহা অজিতকুমার অভাবনীয় নৈপুণ্য সহকারে প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় নির্মলচেতা পুরুষপ্রবরের জীবন-ব্যাখ্যানে তাঁহার সংযত-শোভন নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও মনোভাব অবশ্যই প্রশংসনীয়। অজিতকুমারের এই সুদীর্ঘ চরিত্রগ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে মহর্ষির ঘটনাবহুল জীবন-বর্ণনা বহুভাষণে কোথাও তরল, অসংযত ও শিথিলগতি হয় নাই।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— বাংলা সাহিত্যে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লঘুরস-রচনাকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার লেখনী মুখ্যতঃ ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ বা শ্লেষাত্মক রচনা-কর্মেই নিয়োজিত হইয়াছিল। রঙ্গ-রসাত্মক রচনা ব্যতীত ললিতকুমার সাহিত্য-সমালোচনামূলক বিবিধ প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। বিশিষ্ট বাংলা উপন্যাসের চরিত্র-বিশ্লেষণে, বিশেষতঃ নায়িকা-চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক আলোচনায় তিনি সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধগ্রন্থে বঙ্কিম-উপন্যাসের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য অতি নৈপুণ্য সহকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ললিতকুমার ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞান বিচিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ হইতে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। নির্ভীক, স্পষ্টবাদী অথচ সহৃদয় সমালোচকরূপেও ললিতকুমার বাংলা সাহিত্যে এক উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন।

ললিতকুমার প্রণীত সাহিত্য-সমালোচনাত্মক প্রবন্ধগ্রন্থ যথাক্রমে : ১। 'সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র' (১৯১২), ২। 'কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব' (১৯১৬), ৩। 'কাব্যসুধা' (১৯১৬), ৪। 'প্রেমের কথা' (১৯২০) ৫। 'সখী' (১৯২১) ও ৬। 'কৃষ্ণকান্তের উইল-এর আলোচনা' (১৯২৮)। সাহিত্য-বিচারমূলক এই গ্রন্থসমূহ

ললিতকুমারের বিদ্যাবত্তা, চিন্তাশীলতা ও সূক্ষ্ম রসদৃষ্টির পরিচায়ক। তাঁহার অভিনব সমালোচনা-নৈপুণ্যে আলোচ্য বিষয়ের ভাব-মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য সার্থক-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ললিতকুমারের সমালোচনা পাঠকচিত্তে সৌন্দর্যানুভূতি সঞ্চারে যেমন বিশেষ সহায়ক হইয়াছে, তেমনি সাহিত্য ক্ষেত্রে অসত্য, অকল্যাণ ও অসৌন্দর্যের প্রভাব সম্পূর্ণ খর্ব করিতেও প্রয়াস পাইয়াছে।

ললিতকুমার প্রধানতঃ পরিহাসপ্রিয় লেখক। গুরুত্বপূর্ণ ভাব বা বিষয় লঘু রসিকতার সহায়তায় পরিবেশনের এক অসামান্য ক্ষমতার তিনি অধিকারী ছিলেন। নীরস ব্যাকরণ সংক্রান্ত বিষয়ের নির্দেশ ও বিন্যাসে তাঁহার সহজ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'ব্যাকরণ বিভীষিকা' (১৯১১), 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' (১৯১৩), 'বানান সমস্যা' (১৯১৩), 'অনুপ্রাস' (১৯১৩) ও 'ক-কারের অহঙ্কার' (১৯১৫) নামক গ্রন্থসমূহ উল্লেখযোগ্য।

ললিতকুমারের 'ফোয়ারা' (১৯১১), 'পাগলা ঝোরা' (১৯১৭) ও 'সাহারা' (১৯২৭) এই তিনটি গ্রন্থ তাঁহার বিচিত্র রচনার সংকলন। এই গ্রন্থসমূহে সংকলিত অধিকাংশ রচনারই বক্তব্য বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হইলেও তাহা সংযত ও সংহতভাবে পরিবেশিত হয় নাই। পরিহাসরসিকতার আতিশয্যে এই সকল রচনা যেমন তরলায়িত, তেমনি বক্তব্য বিষয়ের অসংলগ্ন বিন্যাসে সুপ্রণালীবদ্ধ কেন্দ্রানুগ ভাবের নিজস্ব এক অচঞ্চল প্রভায় তাহা দীপ্তোজ্জ্বল নহে। অতএব প্রবন্ধের সাধারণ সুশৃঙ্খলাবদ্ধতা, সংযম-শোভনতা এবং ভাব-গাঢ়তা এই রচনাসমূহে লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং ললিতকুমারের উক্ত রচনাসমূহ যথার্থ প্রবন্ধের মর্যাদা লাভ করে নাই।

ললিতকুমারের বিশুদ্ধ সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধের প্রধান গুণ সরল প্রকাশক্ষম মার্জিত ভাষা ও ভাব-গভীরতা। তাঁহার গদ্যভাষা ও ভঙ্গির মধ্যে কোথাও জড়তা নাই এবং অনাবশ্যক সমাস বা অলংকার বাহুল্যে রচনা কোথাও দুর্বোধ্য নহে। সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণাত্মক জটিল প্রবন্ধও তাঁহার সহজ সাবলীল গতিসম্পন্ন ভাষার লাবণ্য-সুষমায় রসোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

ললিতকুমারের সাহিত্য-বিচারনিষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থসমূহের মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব'ই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। তাঁহার সমালোচনা-পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব ও মৌলিক। কপালকুণ্ডলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ-প্রকৃতি এবং উপন্যাসগত উপাখ্যানের অনুরূপ চরিত্র ও ঘটনার অ[illegible]; ললিতকুমার গভীরভাবে

ইউরোপীয় এবং ভারতীয় সাহিত্য অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়াছেন। বিভিন্ন ভাষা-সাহিত্য হইতে সাদৃশ্যমূলক চরিত্র ও উপাখ্যান আবিষ্কার করিয়া তুলনামূলক সমালোচনায় তিনি বিচক্ষণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা নামের বিচার, নায়িকার পরিবেষ্টনী (environment), উপন্যাসের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে ললিতকুমারের আলোচনা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও মূল্যবান্ হইয়া উঠিয়াছে। ললিতকুমারের গভীর রসগ্রাহিতা ও অভিনব পরিবেশননৈপুণ্যের পরিচয়-স্বরূপ 'কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব' নামক গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'এই রত্নহারের মধ্যমণি নায়িকা কপালকুণ্ডলা। তাঁহার জীবনের ইতিহাস বিস্ময়কর; কৌতূহলাবহ এবং মনোহারী, তাঁহার শেষ পরিণাম হৃদয়বিদারক, তাঁহার চরিত্র কবির অপূর্ব্ব, অদ্ভুত, অদ্বিতীয় (unique) সৃষ্টি। আর এই চরিত্রসৃষ্টিব্যপদেশে কবি মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের একটি কঠিন প্রশ্ন, দার্শনিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টির সহিত বিচার করিয়াছেন; অথচ এই বিচারে কিঞ্চিন্মাত্র নীরসতা, কর্কশতা, জটিলতা বা অস্পষ্টতা নাই। তিনি দার্শনিক প্রশ্ন কল্পনার বিচিত্র তুলিকাস্পর্শে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন, দার্শনিক তত্ত্ব হৃদয়দ্রাবী কাব্যরসে অভিষিক্ত করিয়া ভাবুক-সমাজে উপস্থাপিত করিয়াছেন। * * * এ ক্ষেত্রে পূর্ব্বগামী কবিগণের কাব্য হইতে কোন কোন ভাব ও উপাদান গ্রহণ করিলেও তাঁহার মৌলিকত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই।'[১]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্র-সমসাময়িক একজন কবি ও নাট্যকার। বাংলা সাহিত্যে তিনি মুখ্যতঃ নাট্যকার হিসাবেই উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। কাব্য ও নাট্য বিভাগ ব্যতীত বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগও দ্বিজেন্দ্রলালের অল্পবিস্তর রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধই 'আর্য্যদর্শন,' 'নব্যভারত,' 'ভারতী,' 'সাহিত্য' প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবন্ধসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র 'কালিদাস ও ভবভূতি' (১৯১৫) তাঁহার মৃত্যুর পর স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনানৈপুণ্য, মানস-প্রকর্ষ ও মোহমুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গির

১ 'কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব', (কলিকাতা, ১৩২২), পৃঃ ২-৩

পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের রসাস্বাদনে, বিচার-বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় ও বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে সমুজ্জ্বল তাঁহার এবংবিধ আলোচনা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সমালোচনার সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্য-বিচারমূলক প্রবন্ধ ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রলাল অন্যতর প্রসঙ্গেও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশই স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের বিচিত্র বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ তাঁহার অন্যান্য গদ্য রচনার সহিত 'চিন্তা ও কল্পনা' নামে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত 'দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলী'র (২য় ভাগ) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের বহু সুলিখিত পত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার ইংলণ্ড হইতে লিখিত পত্রসমূহই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিলাতের পত্র' নামক পত্র-সংগ্রহটিও বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত 'দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী'তে (৩য় ভাগ) স্থান লাভ করিয়াছে। ইংলণ্ডের সমাজ ও সংস্কৃতির সুষ্ঠু বর্ণনায় তাঁহার কোন কোন পত্র প্রবন্ধধর্মী হইয়াছে। ভাবের সংহতি ও গভীরতা-গুণে দ্বিজেন্দ্রলালের অধিকাংশ পত্রই সুখপাঠ্য ও উপভোগ্য।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবন্ধের ভাষা তাঁহার বলিষ্ঠ ব্যক্তিপুরুষের শৌর্যে ও গাম্ভীর্যে মহিমান্বিত এবং তাহা কোথাও কষ্টকল্পিত বা দুর্বোধ্য হয় নাই। যথাযথ শব্দ-নির্বাচন দ্বারা তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয় সহজ ও সরসভাবে পরিস্ফুট করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এক স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্ব-শক্তি ভাষায় সঞ্চারিত হইয়া তাঁহার ভাষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও অনবদ্য করিয়া তুলিয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রেও দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কবিত্বগুণে তাঁহার ভাষা কোথাও অপেক্ষাকৃত উচ্ছ্বাসময়, কোথাও বা তাঁহার বিচার-বিশ্লেষণী মনীষায় তাহা বুদ্ধিদীপ্ত, সংযত ও মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'কালিদাস ও ভবভূতি' প্রবন্ধে মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' ও কবি-নাট্যকার ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটকদ্বয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। উভয় কবির ভাব ও রচনাবৈশিষ্ট্য দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনায় অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টির সহিত যেমন অনুভূত হইয়াছে, তেমনি অনবদ্য পরিবেশননৈপুণ্যে তাহা সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিশিষ্ট সংস্কৃত নাট্য-দ্বয়ের বিচার প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন মহাকাব্য, নাটক ও উপন্যাসের পারস্পরিক পার্থক্য ও স্বরূপ-ধর্মের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তেমনি সাহিত্যের

ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভাষা, ছন্দ ও উপমার যথাযথ অনুশীলন সম্পর্কেও তাঁহার সুচিন্তিত আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উচ্চাঙ্গ নাটকের সাধারণ লক্ষণ নির্ণয়-কল্পে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার প্রবন্ধে যে আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যতত্ত্বে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবন্ধগ্রন্থ হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল—

'বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য উচ্চ অঙ্গের নাটকে বহুল পরিমাণে থাকে; যেমন সাহস, অধ্যবসায়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দয়া ইত্যাদি গুণের সমবায়। কিংবা দ্বেষ, জিঘাংসা, লোভ ইত্যাদি বৃত্তিসমূহের সমবায় একটি চরিত্রে থাকিতে পারে। অনুকুল বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নাটক লেখা তত শক্ত নহে। তাহাতে মনুষ্যহৃদয় সম্বন্ধে নাটককারের জ্ঞানেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না; * * * বিপরীত বৃত্তিসমূহের সমবায় দেখানো অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব্যাপার; এখানে নাটককারের কৃতিত্ব বেশী। যিনি মনুষ্যের অন্তর্জগৎ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত দার্শনিক কবি। বল ও দৌর্ব্বল্য, জিঘাংসা ও করুণা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, গর্ব্ব ও নম্রতা, ক্রোধ ও সংযম—এক কথায় পাপ ও পুণ্যের সমাবেশে প্রকৃত উচ্চ অঙ্গের নাটক হয়।'[১]

সাহিত-সমালোচনার সর্বত্র দ্বিজেন্দ্রলালের গভীর রসানুভূতি ও বলিষ্ঠ চিন্তার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি সূক্ষ্ম নাটকীয় দৃষ্টি অনুসারে নাটকদ্বয়ের সুনির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া সীতা ও শকুন্তলা এবং রাম ও দুষ্মন্ত চরিত্রের অন্তর্গূঢ় রূপচিত্র তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনায় সূক্ষ্ম বিচারনৈপুণ্য প্রকাশ পাইলেও তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি কখনও কখনও কবিত্বের ভাবাতিশয্যে ও আবেগচাঞ্চল্যে আচ্ছন্ন হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-সমালোচনার ইহা যে অন্যতম ত্রুটি, তাহা অনস্বীকার্য।

শশাঙ্কমোহন সেন—রবীন্দ্র-পর্বের বাংলা সাহিত্যে শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার কবি-পরিচয় অপেক্ষা সাহিত্য-সমালোচকরূপেই প্রধানতঃ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। উদার অথচ সূক্ষ্ম রসবোধ, ভূয়োদর্শিতা এবং অন্তঃপ্রবেশকুশল

১ **'কালিদাস ও ভবভূতি', (কলিকাতা, ১৩২২), পৃঃ ১৪-১৫**

এক দুর্লভ সমালোচনা-দৃষ্টির তিনি অধিকারী ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য ভাষা ও সাহিত্যের সহিত সুগভীর পরিচয় সাধনের ফলে তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনায় পাণ্ডিত্য, মনস্বিতা এবং তথ্য-যুক্তির অপূর্ব সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।

শশাঙ্কমোহন বিরচিত সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধগ্রন্থ যথাক্রমে: ১। 'বঙ্গবাণী' (১৯১৫), ২। 'মধুসূদন' (১৯২২), ও ৩। 'বাণীমন্দির' (১৯২৮)। শশাঙ্কমোহনের 'বঙ্গবাণী' ও 'বাণীমন্দির' গ্রন্থদ্বয় পরস্পরের পরিপূরক। তিনি এই দুই গ্রন্থে সাহিত্যতত্ত্ব এবং সাহিত্যাদর্শের রূপ ও রীতি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়া সমগ্র বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় সাহিত্য গভীরভাবে অনুধ্যান ও অনুশীলন দ্বারা শশাঙ্কমোহন বিশ্বসাহিত্যের গতি-প্রকৃতিও সম্যক্‌ভাবে অনুধাবন করিয়াছিলেন। বিশ্বসাহিত্যবোধে উদ্বুদ্ধ শশাঙ্কমোহন এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও স্বাধীন বিচার-পদ্ধতি দ্বারা তাঁহার গ্রন্থদ্বয়ে যেমন বাংলার অগ্রণী লেখক সম্প্রদায়েয় সাহিত্য-কর্ম সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তেমনি সভ্য মানুষের প্রাথমিক সাহিত্য-প্রচেষ্টার কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বসাহিত্য কি ভাবে বিবর্তিত হইয়াছে, তাহার তথ্য-নির্ভর পরিচয়ও প্রদান করিয়াছেন। শশাঙ্কমোহনের বিশ্লেষণধর্মী সমালোচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তথ্য-যুক্তির সহিত সূক্ষ্ম-রসব্যঞ্জনার অপূর্ব মিলনে তাহা উচ্চ শিল্প-সৌন্দর্যের মহিমা অর্জন করিয়াছে।

শশাঙ্কমোহনের গদ্যভাষা ও রচনারীতির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয়তাও লক্ষণীয়। রবীন্দ্র-প্রতিভার ছায়াতলে বর্ধিত হইয়াও তাঁহার সাহিত্যিক প্রয়াস রবীন্দ্র-মনীষা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয় নাই। সূক্ষ্ম-গভীর ভাবপ্রকাশে তাঁহার শব্দ-নির্মাণ নৈপুণ্য ও বাক্য-বিন্যাস কৌশলের ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। শশাঙ্ক-মোহনের গদ্যভাষার সুকঠিন ঋজুতা ও ওজোগুণ তাঁহার প্রবন্ধগত প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনায় বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। তথাপি ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শশাঙ্কমোহনের স্বভাবসিদ্ধ কবি-শক্তি ও আবেগপ্রবণতা বহুলক্ষেত্রেই তাঁহার সমালোচনাত্মক প্রবন্ধের ভাষাকে কবিত্বময় করিয়াছে এবং ফলে, প্রবন্ধের বিষয়োচিত গাম্ভীর্য কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

শশাঙ্কমোহন স্বয়ং একজন বিশিষ্ট গীতি-কবি এবং সুরসিক সমালোচক ছিলেন। কবি শ্রীমধুসূদনের অসাধারণ কবিমানস ও কাব্যধর্ম তাঁহার সহজাত সূক্ষ্ম কবি-দৃষ্টির নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাসিত হইয়াছে। শশাঙ্কমোহন তাঁহার

'মধুসূদন' গ্রন্থে মুখ্যতঃ কবি শ্রীমধুসূদনের অন্তর্জীবন ও কাব্য-প্রতিভার অন্তর্নিহিত স্বরূপ সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রচনার মাধুর্য ও বিশ্লেষণের চাতুর্যে তাঁহার সাহিত্যালোচনা উচ্চাঙ্গের শিল্পকৃতির মর্যাদায় ভূষিত হইয়াছে। শশাঙ্ক-মোহন দেশী ও বিদেশী সাহিত্য একনিষ্ঠভাবে পরিক্রমা করিয়া কবি শ্রীমধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অন্তরশায়ী শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার সমালোচনা-শক্তির স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিক রস-চিন্তার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শশাঙ্কমোহনের 'মধুসূদন' গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'রাবণ বিলাপ করিতেছে অসহ্য পীড়া-ধর্ম্মে—দেহিধর্ম্মে, ভুলেও ত রামের নিকট পরাভব স্বীকারের কথাটুকুন ভাবিতেছে না। মধুসূদন তাহাকে কাঁদাইয়াছেন। তাহার আত্মার ঐ বিজয়শ্রী উজ্জ্বল করিবার উদ্দেশ্যে। এই অনম্য মেরুদণ্ডী রাবণ! সংসারে মেরুদণ্ডী মহাপুরুষগণ কি এইরূপে অবস্থার অসহনীয় নিষ্পেষণেও চিরকাল সত্যের জন্য, ভাবের জন্য, আত্মমর্যাদার জন্য সংগ্রাম করিয়া চলিয়া যান না—মরিয়া যান না? এই স্থানেই মেঘনাদবধ কাব্যের Moral শক্তি—রাবণ চরিত্রের নৈতিক ভিত্তি। মনুষ্যের জন্য দৃষ্টান্ত বা আশ্বাস খুঁজিতে হয়, তাহাও এইস্থানে। এই ত মেঘনাদবধ কাব্যের শিল্পাত্মা—গ্রীক শিল্পাত্মা—অথচ সার্ব্বজনীন রসনিষ্পত্তি। মানবজীবনের সুগহন নৈতিক দ্বন্দ্বকে বাস্তব মূর্ত্তি প্রদান করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি বরীষ্ঠ শিল্পসিদ্ধি।'[১]

শশাঙ্কমোহন প্রধানতঃ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের 'রসবাদ' এবং 'সত্য শিব ও সুন্দরে'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সাহিত্যের মূল্যায়ণে ব্রতী হইলেও তাঁহার তুলনামূলক ও বিশ্লেষণপ্রধান সাহিত্য-প্রবন্ধে পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা-রীতির গভীর প্রভাবও অনুভব করা যায়।

চিত্তরঞ্জন দাশ—বাংলাদেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অন্যতম বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও সমাজসেবী হিসাবেই সমধিক সুপরিচিত। কিন্তু তিনি যে একজন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যসেবী ছিলেন, তাহা প্রায় সাধারণের নিকট অবিদিত। বহুমুখী কর্মময় জীবনে চিত্তরঞ্জন একান্তভাবে সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী না হইলেও যে স্বল্প পরিমাণ সাহিত্য-কর্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার সাহিত্যাদর্শ

১ 'মধুসূদন', (কলিকাতা, ১৯২২), পৃঃ ১২৩

ও রসরুচির পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। চিত্তরঞ্জন প্রধানতঃ গভীর আধ্যাত্মিক ভাবমূলক কবিতা এবং সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা-কর্মেই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জন ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও অনুরাগ ছিল। 'নারায়ণ' (১৩২১) নামক মাসিক পত্র সম্পাদনায় তাঁহার সাহিত্যিক কৃতিত্ব ও সাংবাদিক দক্ষতার সম্যক্ পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে যখন 'সবুজ পত্রে'র আবির্ভাব হয় এবং বাংলা গদ্যভাষা ও রচনারীতিতে চলিত ভাষা ও রীতির ব্যাপক অনুশীলনের সূত্রপাত হয়, তখন অর্থাৎ সেই সন্ধিক্ষণে সাধু ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ' পত্রিকার অভ্যুদয় নিঃসন্দেহে এক উল্লেখজনক ঘটনা। সার্বভৌম প্রতিভাধর কবি রবীন্দ্রনাথ যে 'সবুজ পত্রে'র প্রভাব অস্বীকার করিতে পারেন নাই, সেই প্রভাব হইতে চিত্তরঞ্জন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। 'সবুজ পত্রে'র সঙ্গে একই বৎসরে প্রকাশিত 'নারায়ণ' পত্রিকা পরিচালনার মাধ্যমে চিত্তরঞ্জন তাঁহার সাধু ভাষার নিজস্ব রীতি-বৈশিষ্ট্য যথাযথ অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গদ্যভাষার এক স্বতন্ত্র শক্তি ছিল। চিত্তরঞ্জন খাঁটি সাধু বাংলা ভাষারই অনুশীলন করিয়াছেন এবং সর্বদাই ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তৎকালীন ইংরাজী গদ্যের অনুকরণ-জাত কৃত্রিম বাংলা গদ্যকে তিনি কখনই সমর্থন করেন নাই। চিত্তরঞ্জনের সকল প্রবন্ধই বিশুদ্ধ সাধু গদ্যভাষায় লিখিত। তাঁহার ভাষা সরল ও সহজ হইলেও কোথাও তরল বা লঘু হয় নাই এবং তাঁহার আড়ম্বর ও অলংকার-বর্জিত ভাষায় মাধুর্য ও গাম্ভীর্য দুইই সমভাবে বর্তমান।

চিত্তরঞ্জনের প্রবন্ধগ্রন্থ তাঁহার কাব্যগ্রন্থের তুলনায় সংখ্যায় অল্প। বিবিধ সাময়িক পত্রে তাঁহার বিভিন্ন সময়ে লিখিত কয়েকটি সাহিত্য এবং সমাজনীতি বা রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ একত্র সংগৃহীত হইয়া যথাক্রমে 'কাব্যের কথা' (১৯২০) ও 'দেশের কথা' (১৯২২) নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে এই প্রবন্ধগ্রন্থদ্বয় বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে 'দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী'র (১৯২৫) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। চিত্তরঞ্জনের সকল প্রবন্ধেই তাঁহার মৌলিক চিন্তার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা হইতে তাঁহার বিচার-বিশ্লেষণশক্তি এবং রস-গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় লাভ করা যায়।

চিত্তরঞ্জনের সহজ সুন্দর ও মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা দ্বারা জটিল তত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনাও সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও রস-বিচারে তাঁহার বিস্তৃত ও সরস আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব প্রেমধর্মের প্রতি চিত্তরঞ্জনের সুগভীর অনুরাগ ও আকর্ষণ ছিল এবং এই প্রেমধর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি দেশসেবা ও ভগবৎসেবা এই উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করেন নাই। চিত্তরঞ্জনের অধিকাংশ প্রবন্ধ ও কবিতায় এই বৈষ্ণব ভাব-চিন্তারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

চিত্তরঞ্জন মুখ্যতঃ বাঙ্গালীপ্রেমিক লেখক ছিলেন। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি চিত্তরঞ্জন সুগভীর আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন। 'দেশের কথা' গ্রন্থে সংকলিত 'বাঙ্গালার কথা', 'কৃষকের কথা', 'আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁহার স্বদেশপ্রীতির পরিচয় বিবিধ ভাবে ও বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। চিত্তরঞ্জনের 'কাব্যের কথা' তাঁহার তিনটি বিশিষ্ট সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। 'কবিতার কথা,' 'বাঙ্গালার গীতিকবিতা' ও 'রূপান্তরের কথা' নামক প্রবন্ধে চিত্তরঞ্জন প্রাসঙ্গিকভাবে সাহিত্য-রসতত্ত্বেরও সুনিপুণ আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার এই সকল প্রবন্ধে গভীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন রূপরসিক এবং সত্য ও সুন্দরের পূজারী ছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধে সত্য ও সুন্দরের সার্থক সমন্বয় ঘটিয়াছে।

চিত্তরঞ্জন কল্পকলা ও কলাবিদের (Art and Artist) স্বরূপ-ধর্ম প্রসঙ্গে তাঁহার প্রবন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন এবং এই আলোচনা তাঁহার গভীর মননশীলতা, রসোপলব্ধি ও বিশ্লেষণনৈপুণ্যের অন্যতম নিদর্শন। চিত্তরঞ্জন তাঁহার 'রূপান্তরের কথা' নামক প্রবন্ধে মুখ্যতঃ রসের স্বরূপ ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হইয়াছেন। সাধারণতঃ গভীর কল্পনা হইতেই রসের উদ্ভব এবং সত্যের উপরই তাহার সার্থক প্রতিষ্ঠা। সুন্দর ও সত্যের সুষ্ঠু রূপায়ণেই কল্পকলার সৃষ্টি। সুন্দরের স্বরূপ-তত্ত্ব চিত্তরঞ্জনের ব্যাখ্যানৈপুণ্যে সহজ ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চিত্তরঞ্জনের 'রূপান্তরের কথা' নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ত জড় নয়, জড়তা আমার মনের মধ্যে, তাই এই

'চিন্ময় ধামের রূপ-মাধুর্য্যের ভিতর সুন্দরকে ব্যভিচারী দোষে দুষ্ট করিয়া জড় বলি।' অঙ্গসমূহের যখন অঙ্গাঙ্গিভাবে যাহার যথাযোগ্য সন্নিবেশে রূপসৃষ্টি হয়, আর সেই রূপের ভিতর তাহার আত্মার মধুর রসটি জাগিয়া উঠে, তখনই তাহা সুন্দর। তাই সুন্দরের জন্য প্রাণ এমন ব্যাকুল হয়। কাব্য সুন্দর হইতে হইলে কাব্যের প্রাণের রসেই তেমনই স্বাভাবিক ভাবের মিলন হওয়া চাই। যখন মনকে রসের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, তখনই সুন্দর, সুন্দর হয়। এই সুন্দরকে প্রকাশ করিবার জন্যই কল্পকলার সৃষ্টি।'[১]

প্রবন্ধ রচনায় চিত্তরঞ্জন তাঁহার নিজস্ব 'স্টাইল' আনুপূর্বিক রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশভঙ্গি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল এবং ভাষা প্রাঞ্জল ও কবিত্বময়। চিত্তরঞ্জনের প্রবন্ধের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রবন্ধগত যে কোন বক্তব্য বিষয় তাঁহার সহজাত কবিমানসের অন্তর্নিহিত প্রেরণায় অপেক্ষাকৃত সরস ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

জগদীশচন্দ্র বসু—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তাঁহার বৈজ্ঞানিক কর্মকৃতি দ্বারা বাংলাদেশে বিজ্ঞান-সাধনার দুরূহ পথ অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুগম হইয়াছে। বিজ্ঞানের গভীর গবেষণা-কর্মেই জগদীশচন্দ্র সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এবং মৌলিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবিষ্কার হইতে তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সাধনার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ এবং উদ্ভিদে প্রাণ ও জড়ে প্রাণশক্তি আবিষ্কারই বিজ্ঞান-জগতে জগদীশচন্দ্রের মৌলিক দান। বিজ্ঞানসাধক হইলেও তিনি এক উচ্চাঙ্গের কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বাংলা ভাষায় জগদীশচন্দ্রের যে অল্পসংখ্যক রচনার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা দ্বারাই তাঁহার পরিণত সাহিত্যবোধ ও রচনাশক্তি সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা করা সম্ভব হয়। জগদীশচন্দ্র তাঁহার এই সামান্য রচনা-সম্ভার অবলম্বন করিয়া বাংলা সাহিত্যে অন্যতম কৃতী লেখকের সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।

জগদীশচন্দ্রের সমুদয় বাংলা রচনার একমাত্র সংকলন 'অব্যক্ত' ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁহার এই গ্রন্থে বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। জগদীশচন্দ্রের এই সকল প্রবন্ধ গ্রন্থভুক্ত হইবার পূর্বে 'সাহিত্য', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি বিশিষ্ট মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। জগদীশচন্দ্র

১ 'কাব্যের কথা', (কলিকাতা, ১৯২০), পৃঃ ১২৮

তাঁহার গ্রন্থের 'অব্যক্ত' নামকরণেও সার্থক বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহা সাধারণের নিকট রহস্যময় অর্থাৎ অব্যক্ত। 'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ', 'অদৃশ্য আলোক', 'নির্ব্বাক জীবন', 'স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা প্রবাহ' প্রভৃতি প্রবন্ধে বিশ্বজগৎ অর্থাৎ প্রকৃতিরাজ্যের অব্যক্ত বিষয়গুলি জগদীশচন্দ্র ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

জগদীশচন্দ্রের রচনায় বিজ্ঞানীর বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান-স্পৃহা, কবির ভাব-গভীর কল্পনা ও সাধকের ধ্যান-তন্ময় অন্তর্দৃষ্টির এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞান বিষয়ক তাঁহার সমুদয় প্রবন্ধ বিজ্ঞানী, কবি ও ঋষি—এই ত্রিশক্তির স্নিগ্ধ-দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। জগতের জড় এবং চেতন বস্তুর স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র যে সত্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-জাত নহে, কবি-হৃদয়ের গভীর অনুভূতি দ্বারাও অনুরঞ্জিত। তাঁহার কবিত্বসুলভ বর্ণনাগুণে নীরস এবং জটিল বিষয়ও মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের অন্তরে যে কবিত্ব ছিল, বিভিন্ন প্রবন্ধেই তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বস্তুতঃ, জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক মন তাঁহার অন্তরের প্রচ্ছন্ন কবিত্বরসে পরিপুষ্ট। বৈজ্ঞানিক ও কবি এই উভয়েরই অন্তরসত্তা সাধারণতঃ অভিন্ন এবং ইহাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। কবিতা ও বিজ্ঞান যে পারস্পরিক সুনিবিড় ঐক্যসূত্রে বিধৃত, তাহা জগদীশচন্দ্র গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্ত্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন।'[১]

১ 'অব্যক্ত', (কলিকাতা, ১৩৫৮), পৃঃ ১০০-১০১

জগদীশচন্দ্রের নিজস্ব গবেষণা-চিন্তা ও মৌলিক আবিষ্কারের সরস বর্ণনা দ্বারাই প্রধানতঃ তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসমূহ সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞান বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধকারের সহিত জগদীশচন্দ্রের প্রধান পার্থক্য এই যে, অন্যান্য প্রবন্ধকারগণ মুখ্যতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিবিধ বিজ্ঞানগ্রন্থ হইতে বৈজ্ঞানিক তথ্য বা তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া তাহারই ভিত্তিতে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র নিজস্ব গবেষণা-জাত বৈজ্ঞানিক সত্যকেই তাঁহার প্রবন্ধে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধে যে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি, মৌলিক গবেষণা ও গভীর জ্ঞানানুশীলনের পরিচয় লাভ করা যায়, তাহা প্রচলিত সাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে দুর্লভ।

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সগোত্র নহে। প্রচলিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে সাধারণতঃ যুক্তি-পরম্পরা ও বিচার-বিশ্লেষণ অবলম্বন করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয় চরম সিদ্ধান্তমুখী হয় এবং নিরাসক্ত বস্তুনিষ্ঠ ভাবই তাহাতে প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধে তাঁহার গভীর সৌন্দর্যবোধ ও ভাবুকতা বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা ব্যাখ্যাকে গৌণ করিয়া প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' নামক প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যায়। এই প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও তত্ত্ব অতিক্রম করিয়া তাঁহার কল্পনা-শক্তি ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যদৃষ্টির মহিমাই মুখ্যতঃ প্রোজ্জ্বল হইয়াছে। জগদীশচন্দ্রের উক্ত প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'দেখিলাম, অনন্ত প্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। সেই নিবিড় নীলস্তর ভেদ করিয়া দুই শুভ্র তুষার মূর্তি শূন্যে উত্থিত হইয়াছে। একটি গরীয়সী রমণীর ন্যায়, মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার বিশাল বক্ষে বহু জীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে। এই মূর্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইহার অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল স্থাপিত। এই ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মেদিনী বিদারণপূর্ব্বক শাণিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে গ্রথিত।'[১]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-পর্বের বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রধানতঃ অপরাজেয় ঔপন্যাসিক হিসাবেই খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু কেবলমাত্র ঔপন্যাসিক-প্রতিভা বিশ্লেষণ দ্বারাই তাঁহার সাহিত্যিক-পরিচয় সম্পূর্ণ

১ 'অব্যক্ত', (কলিকাতা, ১৩৫৮), পৃঃ ৮৮-৮৯

শেষ হয় না। উপন্যাস ব্যতীত শরৎ-প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন তাঁহার প্রবন্ধ-সাহিত্য। শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বহু সংখ্যক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং এই সকল প্রবন্ধে তাঁহার চিন্তার স্বচ্ছতা ও তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধ কেবলমাত্র মূল্যবান্ ভাব-সম্পদ ও সুনিপুণ বিচার-বিশ্লেষণধর্মিতার জন্যই আকর্ষণীয় নহে, তাঁহার ভাষাগত সারল্য ও সৌন্দর্য এবং উপলব্ধ ভাব বা বিষয়ের সহজবোধ্য প্রকাশভঙ্গি দ্বারাও তাহা অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে।

শরৎচন্দ্র সাধারণতঃ প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে 'অনিলা দেবী' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ ছদ্মনামেই প্রকাশিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থ যথাক্রমে : ১। 'নারীর মূল্য' (১৯২৩), ২। 'তরুণের বিদ্রোহ' (১৯২৯) এবং ৩। 'স্বদেশ ও সাহিত্য' (১৯৩২)। পরবর্তী কালে বিভিন্ন ছাত্রসভায় পঠিত শরৎচন্দ্রের লিখিত ভাষণ সমূহ একত্র গ্রথিত হইয়া 'শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ' (১৯৩৭) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।. সাম্প্রতিক কালে সাহিত্য-গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা হইতে শরৎচন্দ্রের প্রায় সর্ববিধ খণ্ড-বিক্ষিপ্ত রচনা সংগ্রহ করিয়া 'শরৎচন্দ্রের রচনাবলী' নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংকলনগ্রন্থে শরৎচন্দ্রের বিস্মৃতপ্রায় কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবন্ধও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের গদ্যভাষার স্বচ্ছতা ও মাধুর্য অবিসংবাদিত। ভাষাগত এই দুর্লভ গুণ কেবলমাত্র তাঁহার কথা-সাহিত্য বিভাগেই প্রযোজ্য নহে, তাঁহার প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রয়োগ করা যায়। রবীন্দ্র-গদ্যের অনতিক্রমণীয় প্রভাবে শরৎচন্দ্রের গদ্যভাষা ও রীতি বিকাশপ্রাপ্ত হইলেও তাহা সম্পূর্ণভাবে বৈশিষ্ট্য-বর্জিত হয় নাই। শরৎচন্দ্রের ভাষায় তাঁহার নিজস্ব স্বভাবগত এক সহজ সারল্য ও সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায়। সারল্য ও সৌন্দর্যের প্রতি গভীর প্রবণতাই তাঁহার ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ বা বাক্যে এক অনুপম মাধুর্যের মহিমা দান করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধগত ভাষার অন্যতম বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার ভাষা কোথাও অসার ফেনিলতা বা অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসে তরল ও অসংযত হয় নাই। শরৎচন্দ্রের পরিচ্ছন্ন গদ্যভাষা স্বচ্ছ নদীধারার ন্যায় সর্বত্র প্রবাহিত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতি প্রসঙ্গেই অধিক প্রবন্ধ রচনা

করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের ব্যাপক বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গভীর জ্ঞানানুশীলনের পরিচয় মুখ্যতঃ তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধসমূহ হইতে লাভ করা যায়। শরৎচন্দ্র অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। সমাজে প্রচলিত বিবিধ অনাচার, স্বৈরাচার ও কুসংস্কারের তিনি বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছেন। সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে শরৎচন্দ্রের মোহমুক্ত উদার চিন্তাধারা ও বলিষ্ঠ অভিমত তাঁহার বিভিন্ন সামাজিক প্রবন্ধে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বদেশ ও স্ব-সমাজের প্রচলিত ভাবধারার সহিত শরৎচন্দ্র যেমন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, তেমনি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিভিন্ন সামাজিক বিধি-বিধান সম্পর্কেও তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' নামক প্রবন্ধ পুস্তিকা তাঁহার বহু পঠনশীল সমাজ-চিন্তার পরিচায়ক। এই প্রবন্ধগ্রন্থে তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্নধর্মী সামাজিক পটভূমির বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজ-জীবনে নারী জাতির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও উচ্চ পদমর্যাদা সম্পর্কে গভীর তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। নারীশক্তি যে সমাজের অন্যতম প্রধান শক্তি এবং এই শক্তির বিচ্যুতি ঘটিলে অর্থাৎ সমাজে নারীর মূল্য হ্রাস পাইলে সমগ্র সমাজ-জীবনের যে অবনতি ঘটে, তাহা বিভিন্ন দেশের সমাজতাত্ত্বিক মনীষিগণ অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়াছেন। বিভিন্ন সমাজ-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই শরৎচন্দ্রের সামাজিক-চিন্তা পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধগ্রন্থে তিনি তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'সমাজে নারীর স্থান অবনত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের স্থান আপনি নামিয়া আসে। কেন হয়, এবং হওয়া স্বাভাবিক কিনা, একথা বুঝিতে পারা কঠিন নহে। * * * শিশুর জননীর সহিত যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পিতার সহিত তত নয়। এই কারণেই সংসারে কৃতী লোকের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহারা সকলেই এমন মা পাইয়াছিলেন যাহাতে সংসারে উন্নতি করা অসম্ভব হইয়া উঠে নাই। কিন্তু, এই মায়ের অবস্থাটা সাধারণতঃ যদি দিন দিন নামিয়া পড়িতে থাকে, এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে দেশের কৃতী সন্তানের সংখ্যা কমিয়া আসিতেই থাকে, এই প্রতিযোগিতার দিনে সে জাতি, আর জাতির মত জাতি হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।'[১]

---

১ 'নারীর মূল্য', (কলিকাতা, ১৩৫৯), পৃঃ ৭৯

'নারীর মূল্য' ব্যতীত শরৎচন্দ্রের অন্যান্য সামাজিক প্রবন্ধের মধ্যে 'সমাজধর্মের মূল্য' নামক প্রবন্ধটি তাঁহার ভূয়োদর্শিতা ও গভীর মননশীলতার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধের ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত উভয় প্রকার গদ্যভাষাই প্রয়োগ করিয়াছেন এবং এই উভয় ভাষাই তাঁহার পরিবেশনকৌশলে সমান উপভোগ্য হইয়াছে। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধ রচনায় শরৎচন্দ্র আনুপূর্বিক সাধু ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধই এই সাধু ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের বিবিধ বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধই বিভিন্ন সভায় অভিভাষণ দানের অনিবার্য তাগিদে লিখিত। বক্তৃতাকারে লিখিত হইলেও এই সকল প্রবন্ধে বক্তার অসংযত উচ্ছ্বাস বা চিন্তার শৈথিল্য প্রকাশ পায় নাই। 'তরুণের বিদ্রোহ' এবং 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত বিভিন্ন প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র শিক্ষা, সাহিত্য ও রাজনীতি সম্পর্কে সুচিন্তিত ও স্বাধীন অভিমত নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

'তরুণের বিদ্রোহ' গ্রন্থে 'তরুণের বিদ্রোহ' এবং 'সত্য ও মিথ্যা' নামক প্রবন্ধদ্বয়ে রাজনীতি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের গভীর দূরদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে। 'স্বরাজ সাধনায় নারী' তাঁহার এই শ্রেণীর আর একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক জটিল পরিচয় শরৎচন্দ্রের এই সকল প্রবন্ধ হইতে লাভ করা যায়। শরৎচন্দ্র স্বয়ং হাওড়া-জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন এবং ফলে, তাঁহাকে সাময়িকভাবে রাজনীতির চর্চাও করিতে হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধের অন্যতম বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে অধিক মূল্যবান্ হইয়া উঠিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধও বিচার-বিতর্কের ভিত্তিতে ও প্রতিপক্ষের আক্রমণের প্রত্যুত্তরে লিখিত। ইহা অনস্বীকার্য যে, বাদ-প্রতিবাদের জটিলতায় তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়োচিত সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য অপেক্ষাকৃত ম্লান হইয়াছে। শরৎচন্দ্র সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের অধিকারী এবং মাত্রা-সচেতন সুদক্ষ শিল্পী ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার সমালোচনামূলক প্রতি প্রবন্ধেই সৌন্দর্য ও সংযমের স্বতোৎসার লক্ষ্য করা যায়। বিতর্কমূলক বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে

তিনি কোথাও কাহারও প্রতি অমূলক বিদ্বেষ বা কটূক্তি প্রকাশ করেন নাই। শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এই যে, ইহাতে জটিল বিষয়ের আলোচনাও ঘরোয়া সংলাপ এবং সরস বর্ণনায় সহজ ও উপভোগ্য হইয়াছে।

সাহিত্যাদর্শের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র কলাকৈবল্যবাদের (Art for Art's Sake) সমর্থক ছিলেন। প্রধানতঃ এই আদর্শের মানদণ্ডেই তিনি সাহিত্য-বিচার ও পর্যালোচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের বিশুদ্ধ সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে 'সাহিত্য ও নীতি', 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি', 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি', 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ' প্রভৃতি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যালোচনার পরিচয় স্বরূপ তাঁহার 'সাহিত্য ও নীতি' প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'Art জিনিষটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে, —এবং অনেক নোঙ্‌রা জিনিষই ঘটে,—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতির বা স্বভাবের হুবহু নকল করা Photography হতে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হবে? দৈনিক খবরের কাগজে অনেক কিছু রোমহর্ষণ ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে কি সাহিত্য? * * * সুনীতি দুর্নীতির স্থান এর মধ্যে আছে, কিন্তু বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই,—এ বস্তু এদের অনেক উচ্চে। এদের গণ্ডগোল করতে দিলে যে গোলযোগ বাধে যে কাল তাকে ক্ষমা করে না। নীতি-পুস্তক হ'বে, কিন্তু সাহিত্য হ'বে না। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয় তাও হবে, কিন্তু কাব্য সৃষ্টি হ'বে না।'[১]

শরৎচন্দ্রের এই 'সাহিত্য ও নীতি' প্রবন্ধটি চলিত ভাষায় লিখিত। চলিত ভাষার স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা তাঁহার এই শ্রেণীর আলোচনা অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। শরৎচন্দ্রের বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, বাংলা সাহিত্যে কেবল জনপ্রিয় কথাশিল্পী হিসাবে নহে, অন্যতম প্রবন্ধকার-রূপেও তিনি এক স্বতন্ত্র আসনের অধিকারী।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাংলাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও একনিষ্ঠ সারস্বত সাধক ছিলেন। শিক্ষায় ও জ্ঞানে

১ 'স্বদেশ ও সাহিত্য', (কলিকাতা, ১৯৩২), পৃঃ ৭০-৭১

বাঙ্গালী বিশ্বসভায় যে বরেণ্য ও নমস্ত হইবার যোগ্য অধিকারী, তাহা আশুতোষের অনন্যসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি, মেধা ও মনীষা প্রমাণ করিয়াছে। আশুতোষ ইংরাজী, ফরাসী, সংস্কৃত, পালি, আরবী, পারসী, উর্দু, হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন। ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রসমূহেও তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আশুতোষের সুগভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতিবোধ ছিল। বাংলা ভাষা আজীবন তাঁহার নিকট পূজ্য ও আরাধ্য বস্তুরূপে সমাদৃত হইয়াছে। বহুমুখী কর্মব্যস্ত পুরুষ আশুতোষ স্বয়ং বাংলা ভাষায় আশানুরূপ সাহিত্য-সৃষ্টির অবকাশ পান নাই, কিন্তু তিনি সাহিত্যিক সৃষ্টির পথ সুপ্রশস্ত করিয়াছেন। মাতৃভাষার প্রতি আশুতোষের গভীর নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা তাঁহার বিভিন্ন কর্মকৃতির মাধ্যমে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক পরীক্ষার (examination) প্রবর্তন করেন এবং তাঁহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তন্নিম্ন অন্যান্য পরীক্ষাসমূহেও বাংলা সাহিত্য অন্যতম আবশ্যিক বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। 'বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ' নামক প্রবন্ধে আশুতোষের গভীর মাতৃভাষা-প্রীতির পরিচয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। আশুতোষ স্বয়ং লিখিয়াছেন—

'প্রথম যৌবনে যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তারপর যখন ক্রমে কার্যাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, আমার সতত ধ্যান ছিল যে, কি উপায়ে আমার জননী বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিব। মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার ঐ একই স্বপ্ন ছিল। একটা ধারণা আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতির মাতৃভাষা যত সম্পন্ন, সে জাতি তত উন্নত ও অক্ষয়। আমার মাতৃসমা মাতৃভাষাকে যদি কোনমতে সম্পত্তিশালিনী করিতে পারি, আমার জীবন ধন্য হইবে।'[১]

আশুতোষ পাঁচবার বাংলাদেশে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সভার সভাপতিরূপে তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি তিনবার যথাক্রমে ১৯১৫, ১৯১৬ ও ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য-সম্মিলনে এবং দুইবার যথাক্রমে ১৯১৫ ও ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে দুই বিশিষ্ট বাঙ্গালী কবি অর্থাৎ কৃত্তিবাস ও মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতি-বাসরে ভাষণ-দান

১ 'জাতীয় সাহিত্য', (কলিকাতা, ১৩৪৯), পৃঃ ৭১

উপলক্ষে যে বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সংকলিত হইয়া পরবর্তী কালে 'জাতীয় সাহিত্য' (১৯৩২) নামে প্রকাশিত হইয়াছে। 'জাতীয় সাহিত্য' বাংলা ভাষায় লিখিত আশুতোষের একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ।

'জাতীয় সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত 'ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ', 'কৃত্তিবাস', 'মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত', 'জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি' ও 'বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ' নামক পাঁচটি প্রবন্ধই সুলিখিত ও সারগর্ভ হইয়াছে। এই প্রবন্ধসমূহে আশুতোষের সুদূরপ্রসারী কল্পনাপ্রবণ মনের পরিচয় প্রকাশ পাইলেও তাঁহার বক্তব্য বিষয় সম্পূর্ণ যুক্তি ও তথ্য-বর্জিত হয় নাই। সর্বোপরি তাঁহার আন্তরিক স্বদেশপ্রীতি ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনে প্রবন্ধসমূহ এক স্বতন্ত্র মহিমা অর্জন করিয়াছে। আশুতোষের প্রতিটি প্রবন্ধই সাহিত্য সংক্রান্ত। সকল প্রবন্ধেরই প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে আশুতোষের ধারণা বা উপলব্ধি গভীর ও সুস্পষ্ট ছিল বলিয়া তাঁহার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি কোথাও আড়ষ্ট বা দুর্বোধ্য হইয়া উঠে নাই। বরং কবিত্বসুলভ ভাষার মাধুর্যে তাঁহার প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত সরস ও সুষমামণ্ডিত হইয়াছে। আশুতোষের রচনারীতি ও ভাষায় কবি-গবেষক দীনেশচন্দ্র সেনের গভীর প্রভাব অনুভূত হয়।

আশুতোষের 'জাতীয় সাহিত্য' গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'। এই প্রবন্ধের অংশ বিশেষে বক্তৃতাসুলভ স্বাভাবিক বাহুল্য বা উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হইলেও সমগ্র প্রবন্ধে আশুতোষের যে প্রখর মনস্বিতা ও চিন্তার গভীরতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা উপেক্ষণীয় নহে। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য ও ভবিষ্যৎ অবস্থার পর্যালোচনাই আশুতোষের এই প্রবন্ধের মুখ্য বিষয় হইয়াছে। বৈদিক যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির এক মনোজ্ঞ পরিচয় তিনি তাঁহার প্রবন্ধে সংক্ষেপে প্রদান করিয়াছেন এবং ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্যসমূহের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও তাহাদের স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ ও পূর্ণতা লাভের সর্বোত্তম পন্থা আবিষ্কার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে একটি সুনিবিড় ভাবগত ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব, তাহা আশুতোষ গভীরভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। প্রাদেশিক সাহিত্যসমূহ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত হইয়াও এক অখণ্ড ভারতের জাতীয়তাবোধের সহিত যে ঐক্য রক্ষা করিতে পারে এবং এক ভাবগত ঐক্য সৃষ্টির দ্বারা যে সমগ্র ভারতের

ঐশ্বর্যদীপ্ত ভবিষ্যৎ-গঠন সম্ভবপর, তাহা আশুতোষ তাঁহার প্রবন্ধে গভীর মননশীলতা ও বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিসহকারে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ভারতের ভাষা ও সাহিত্যগত সমস্যা প্রসঙ্গে তাঁহার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত অভিনন্দন-যোগ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আশুতোষের 'ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'যে প্রদেশে যে ভাষা চিরদিন প্রচলিত, তথায় তাহা সেইরূপই থাকুক—সেই ভাষায় সেই প্রদেশের জাতীয় সাহিত্য ক্রমে বর্দ্ধিত হউক, শ্রীসম্পন্ন হউক। সেপক্ষে কোন বাধার প্রয়োজন নাই। কেন-না যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, তাহারা বড়ই দুর্ভাগ্য। * * * সুতরাং, তাহাদের জাতীয় ভাষার বিলোপ না ঘটাইয়া অন্য প্রদেশবাসীদিগেরও সেই ভাষা শিখিবার পথ সুগম করিয়া দেওয়া হউক। প্রত্যেক প্রদেশ স্ব স্ব জাতীয় ভাষায় সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসম্পন্ন হইয়াও অন্য প্রদেশের ভাষার যাহা গ্রহণযোগ্য, তাহা স্ব স্ব ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লউক। এইরূপ করিতে পারিলে কিছুকাল পরে ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে একটা ভাবের একতা, চিন্তার একতা, এবং ক্রমে মনের একতা জন্মিবে—নানা ভাষা থাকা সত্ত্বেও এক ভাবে ভাবিত হইয়া ভারত একই লক্ষ্যের দিকে সমবেতভাবে অগ্রসর হইবে।'[১]

প্রিয়নাথ সেন—প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যের প্রথম রসবিদগ্ধ সমালোচকবর্গের অন্যতম। তিনি অসামান্য মনীষা ও স্বাধীন চিন্তার অধিকারী ছিলেন। বিবিধ ভাষা ও সাহিত্যের গভীর অনুশীলনে তাঁহার শিল্পদৃষ্টি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ও পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত, পারসী, ইতালী, ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় প্রিয়নাথের সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দেশের বিচিত্র সাহিত্যের সহিত অন্তরঙ্গ সংযোগ সাধনের ফলে তাঁহার বিচার-বুদ্ধি ও রসগ্রাহিতায় অসাধারণ তীক্ষ্ণতা ও চাতুর্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলা কাব্য-সমালোচনায় প্রিয়নাথ গতানুগতিকতা বা প্রথাবদ্ধতার ব্যর্থ অনুসরণ না করিয়া নিজস্ব এক স্বতন্ত্র পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুরসিক সাহিত্য-সমালোচকের সকল দুর্লভ গুণই তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। 'জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত-মনীষী প্রিয়নাথের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা প্রিয়নাথের

১ 'জাতীয় সাহিত্য', (কলিকাতা, ১৯৪৯), পৃঃ ১৬

বুদ্ধির দীপ্তি, বিচিত্রমুখী পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞ মনের গভীরতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল সাহিত্যের বড় রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্ব্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূর দিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়।'[১]

কবি-সমালোচক প্রিয়নাথ অসাধারণ শক্তিধর কৃতবিদ্য ব্যক্তি হইয়াও যে সাহিত্য-কর্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ক্ষমতার পূর্ণ পরিচায়ক নহে। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার রচনার সংখ্যা পরিমাণে অতি অল্প। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রিয়নাথের বিবিধ বিষয়ক রচনার একটি মাত্র সংকলন তাঁহার মৃত্যুর পর প্রমোদনাথ সেনের সম্পাদনায় 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' (১৯৩৩) নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে প্রিয়নাথের একটি মাত্র গল্প ব্যতীত অবশিষ্ট অন্যান্য রচনা বিভিন্ন কাব্য বা নাট্যগ্রন্থ বিশেষের আলোচনা। এই সকল সমালোচনামূলক প্রবন্ধে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম রসানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রিয়নাথ পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা-সাহিত্যে যেমন অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, তেমনি ভারতীয় সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রেও প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-বিচারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় সমালোচনা-পদ্ধতির মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য-বিধানের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সাধারণতঃ বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যা ও বিচারের সুষ্ঠু সমন্বয়ে সার্থকতা লাভ করে। সাহিত্য-সমালোচনায় এবংবিধ ব্যাখ্যা ও বিচারের সমন্বয়-সাধনকল্পে প্রিয়নাথের ঐকান্তিক প্রয়াস বা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং এই ক্ষেত্রে তিনি অভাবনীয় সাফল্যও অর্জন করেন।

প্রিয়নাথের বিদগ্ধ সমালোচনামূলক প্রবন্ধের ভাষাও নিজস্ব এক স্বতন্ত্র মহিমায় মহিমমণ্ডিত হইয়াছে। এইরূপ বর্ণাঢ্য, রূপাঢ্য ও মধুর লালিত্যপূর্ণ ধ্বনিসুন্দর ভাষা বাংলা গদ্যে বিরল দৃষ্ট হয়। প্রিয়নাথ স্বয়ং কবি ছিলেন এবং ফলে, তাঁহার ভাষার মধ্যে স্বতস্ফূর্ত কবিত্বরস সঞ্চারিত হইয়াছে। প্রিয়নাথের ভাষায় কাব্য-সুষমা এবং ধ্বনি-ব্যঞ্জনাশক্তির এক অভিনব পরিচয় অর্থাৎ অলংকৃত ভাষার সর্বময় রূপসিদ্ধির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রিয়নাথের রচনারীতি ও ভাষার

১ 'জীবন-স্মৃতি,' (কলিকাতা, ১৩:৯), পৃঃ ১৫৩

কারুকৃতি এবং শিল্পদক্ষতা যে কিরূপ নিপুণ, তাহা তাঁহার আলোচনার ভঙ্গি ও প্রবন্ধগত বিষয়-বিন্যাসে সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রিয়নাথ বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত তুলনামূলক সাহিত্য-বিচার-পদ্ধতিরই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন সমালোচনাত্মক প্রবন্ধে এই বিশ্লেষণী রীতি অনুসৃত হইয়াছে। প্রিয়নাথের প্রবন্ধসমূহের মধ্যে 'চিত্রাঙ্গদা,' 'মানসী,' 'সনেট-পঞ্চাশৎ,' 'রস্কিন' ও 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমকালীন খ্যাতনামা কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্র-নাট্যকাব্য 'চিত্রাঙ্গদা'র বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু 'চিত্রাঙ্গদা' যে দুর্নীতিমূলক অশ্লীল কাব্য নহে, বরং রসসম্মত ধ্রুপদী কাব্যগ্রন্থেরই পর্যায়ভুক্ত, তাহাই প্রিয়নাথ তাঁহার 'চিত্রাঙ্গদা' নামক প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই প্রবন্ধে প্রিয়নাথ প্রতিপক্ষের যুক্তিসমূহ আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত খণ্ডন করিয়াছেন এবং কাব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া তিনি যে প্রশান্ত সৌন্দর্যরসের সন্ধান দান করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার অভিনব সৌন্দর্যদৃষ্টি ও শাশ্বত সত্যানুভূতির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। প্রিয়নাথের আলোচনার অংশ বিশেষে আতিশয্য ও ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইলেও, তাহা দ্বারা তাঁহার অখণ্ড রসদৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় নাই। শিল্পসম্মত প্রখর মাত্রা-সচেতনতাবোধ প্রিয়নাথের প্রবন্ধের সর্বত্রই তাঁহার হৃদয়াবেগ যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

প্রিয়নাথ রবীন্দ্র-কাব্যের সমালোচনায় যেমন প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি রবীন্দ্র-কাব্যের বিপরীতধর্মী কাব্য-সৃষ্টিরও প্রেরণা ও উৎস যথার্থ অনুসন্ধান করিয়া কৃতকার্য হইয়াছেন। 'সনেট-পঞ্চাশৎ' প্রবন্ধে প্রিয়নাথের কাব্যরসাস্বাদন-বৈচিত্র্যের এক অভিনব পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রকৃত সমালোচক কখনও কোন সীমাবদ্ধ রুচি বা সংস্কারের অধীন হইয়া থাকেন না। প্রচলিত রুচি বা সংস্কার হইতে বিচ্ছিন্ন অথচ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোন সাহিত্য-কর্মের সন্ধান লাভ করিলে তিনি তাহার স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তাহা সাধারণ পাঠক সমাজে পরিবেশন করেন। প্রকৃত সমালোচকের এই মোহমুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হইয়া প্রিয়নাথ সাহিত্য-বিচারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সাহিত্য-সমালোচনামূলক সকল প্রবন্ধেই তাঁহার রস-দৃষ্টির ঔদার্য ও সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে বীরবল অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরী তাঁহার নিজস্ব চিন্তা ও

রচনা-রীতিতে যেমন গদ্যরচনায়, তেমনি কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। 'সনেট-পঞ্চাশৎ' প্রমথ চৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ অর্থাৎ তাঁহার পঞ্চাশটি নির্বাচিত সনেটের একটি বিশিষ্ট সংকলন। প্রচলিত সনেটের রূপভঙ্গি বা ভাব-বিন্যাস প্রমথ চৌধুরী তাঁহার সনেটে অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার এই অভিনব সনেটের পদ-বিন্যাস ও রোমান্টিকতাবিরোধী ভাব-কল্পনার স্বরূপ প্রিয়নাথের সূক্ষ্ম সমালোচনা-দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রিয়নাথ তাঁহার 'সনেট-পঞ্চাশৎ' নামক প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীর কবিদৃষ্টি ও রূপরীতির মৌলিকতা অতি নৈপুণ্য সহকারে প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য বিভিন্নধর্মী সনেটের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ রসগ্রাহী আলোচনা অধিকতর উপাদেয় ও মূল্যবান্ হইয়াছে।

প্রিয়নাথ প্রমথ চৌধুরীর সনেটের রূপ-সৌন্দর্য ও প্রকৃতি বিশ্লেষণের অভিপ্রায় লইয়া তাঁহার প্রবন্ধের প্রারম্ভেই সাধারণ সনেটের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য ও অন্তঃপ্রকৃতি সযত্ন-নিষ্ঠায় আবিষ্কার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। পেত্রার্কা, সেক্সপীয়র, মিল্টন প্রমুখ প্রখ্যাত ইউরোপীয় সনেট-রচয়িতাগণের রচনারীতি ও শিল্প-সৌন্দর্যের মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা দ্বারা তাহা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রচলিত সনেটের ভাব-গাম্ভীর্য, সংহত আবেগানুভূতি ও গীতি-সৌন্দর্য প্রমথ চৌধুরীর সনেটে অনুপস্থিত এবং তাঁহার সনেটে যে রচনাগত শৈথিল্য প্রকাশ পাইয়াছে, প্রিয়নাথের প্রবন্ধে তাহা সুন্দরভাবে নির্দেশিত হইয়াছে। রীতিগত পার্থক্যের জন্য প্রমথ চৌধুরীর সনেটে অর্থাৎ কাব্যগত ভাব-পরিণতিতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে, প্রিয়নাথ তাহাও বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

কবি এবং কাব্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ-বিশ্লেষণে, বিশেষতঃ রবীন্দ্র-কাব্যবিচারেই প্রিয়নাথের রসগ্রাহিতা, বিচার-বিশ্লেষণকুশলতা ও সৌন্দর্যবোধের গভীরতা প্রমাণিত হয়। রবীন্দ্র-কাব্যের সমুন্নত ভাবাদর্শ ও অভিনবত্ব যে সময়ে বাংলার সাহিত্য-সমাজে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং রবীন্দ্র-কাব্যের ভাব-তাৎপর্য ও মর্মগত সৌন্দর্য যথার্থভাবে উপলব্ধি না করিয়া যখন সমালোচকবর্গ রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, প্রিয়নাথ তখন শাশ্বত রসাদর্শের মানদণ্ডে আত্মপ্রত্যয়দৃপ্ত বলিষ্ঠ সমালোচনা দ্বারা রবীন্দ্র-কাব্যের নির্গলিতার্থ সুস্পষ্ট করিয়াছেন এবং বাংলা কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত স্থান ও

পর্যায় নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে প্রিয়নাথের রসোজ্জ্বল আলোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'বিশাল সমুচ্চ বা সুগভীর ভাব—মনের ভাষা যেখানে পৌঁছিতে পারে না—অতি সূক্ষ্ম কোমল মৃদুভাব—কথায় যাহাকে ধরিতে পারা যায় না, হৃদয়ান্তঃপুরচারিণী কল্পনার সেই লাজময়ী কুসুম সুকুমার মূর্ত্তি—ভাষার রূঢ় স্পর্শে যাহা মলিন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, এই সকলই কি চমৎকার, কি অনির্ব্বচনীয় সুন্দররূপেই ব্যক্ত হইয়াছে। কখন কখন তাঁহার একটি সমগ্র কবিতা এইরূপ একটি ভাবেই পরিপূর্ণ। অথচ তিনি উচ্চ প্রতিভাবলে তাহাদিগকে এমনি কবিত্বময় অথচ পরিমিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, একদিকে যেমন ভাবের নৈসর্গিক গৌরব এবং সুষমা রক্ষিত হইয়াছে, অপরদিকে পাঠকের হৃদয়ে তাহারা শৈশব সুহৃদের ন্যায় অতি সহজে প্রবেশ লাভ করে।'[১]

কাব্য-সৌন্দর্যদৃষ্টির সূক্ষ্মতা, গভীর রসানুভূতির তীব্রতা প্রিয়নাথের প্রবন্ধে পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করা যায়। রসগ্রাহী সমালোচক, বিশেষতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম রসবোদ্ধা পথিকৃৎ হিসাবে বাংলা সাহিত্যে প্রিয়নাথ নিঃসন্দেহে এক গৌরবময় আসনের অধিকারী।

১ 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি', (কলিকাতা, ১৯৩৩), পৃঃ ২৭

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

(ক)

শব্দসূচী

[প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশক]

উ

ঋ

এ

ঐ

ও

ক

খ

গ

প

ফ

ব

পরিশিষ্ট

(খ)

পাঠ-নির্দেশ

অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত—'বঙ্কিমচন্দ্র', ১৯২০

অক্ষয়কুমার রায়—'অক্ষয়কুমার দত্ত', ১৯৩০

অজরচন্দ্র সরকার—'বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা', ১৯৪৯

অনঙ্গমোহন রায়—'রাজর্ষি রামমোহন', ১৯৩৩

অনুরূপা দেবী—'ভূদেব চরিত', ১৩৩০

অমরেন্দ্রনাথ রায়—'রবিয়ানা', ১৯১৬

'বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও ভাষাপ্রীতি', ১৯৫২

অমলেন্দু দাশগুপ্ত—'ঋষি রবীন্দ্রনাথ', ১৩৬১

অরবিন্দ পোদ্দার—'ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক', ১৩৬২

" 'বঙ্কিম-মানস', ১৯৫৫

" 'রবীন্দ্র-মানস', ১৩৬৩

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য', ১৩৬৩

আশুতোষ বাজপেয়ী—'রামেন্দ্রসুন্দর', ১৩৩০

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—'দ্বিজেন্দ্রলাল', ১৩২৬

কাজী আবদুল ওদুদ—'শাশ্বত বঙ্গ', ১৩৫৮

" 'বাংলার জাগরণ', ১৩৬৩

কালিদাস রায়—'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' (২য় ও ৩য় খণ্ড), ১৯৪৯

কুমারদেব মুখোপাধ্যায়—'ভূদেব-চরিত', ১৩২৪

কেদারনাথ মজুমদার—'গদ্য সাহিত্য', ১৯০৮

" 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' (১ম খণ্ড), ১৩২৪

কৈলাশচন্দ্র ঘোষ—'বাঙ্গালা সাহিত্য', ১২৯২

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'আর্ট ও সাহিত্য', ১৩২৯

ক্ষিরোদবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত—'শরৎচন্দ্রের শিল্পচাতুর্য', ১৯৪১

খগেন্দ্রনাথ মিত্র—'পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু', ১৩১৭
গণপতি সরকার—'হরপ্রসাদ জীবনী', ১৩৪৩
গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী', ১৩৩৪
গিরিশচন্দ্র নাগ—'রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার মহত্ব', ১৯৩৩
গোপাল হালদার—'বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপরেখা' (২য় খণ্ড), ১৩৬৫
গৌরগোবিন্দ রায়—'আচার্য্য কেশবচন্দ্র', ১৯৩৮
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—'বিদ্যাসাগর', ১৮৯৫
চন্দ্রশেখর কর—'পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর', ১৯১০
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—'রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিচিতি', ১৩৪৯
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত—'জয়ন্তী-উৎসর্গ', ১৩৩৮
জগন্নাথ চৌধুরী—'রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত', ১৮৯২
জহরলাল বসু—'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস', ১৯৩৬
জীবেন্দ্র সিংহ রায়—'প্রমথ চৌধুরী', ১৯৫৪
তামসরঞ্জন রায়—'স্বামী বিবেকানন্দ', ১৩৫৬
ত্রিপুরাশঙ্কর সেন—'সাহিত্যের নবজন্ম ও যুগচেতনা', ১৩৫৬
" 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য', ১৩৬০
দুর্গাদাস লাহিড়ী—'আদর্শ চরিত (কৃষ্ণমোহন)', ১২৯২
দিলীপকুমার রায়—'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল', ১৯৪৫
দেবকুমার রায়চৌধুরী—'দ্বিজেন্দ্রলাল', ১৩২৪
নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস—'অক্ষয় চরিত', ১২৯৪
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', ১৮৯৭
নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—'বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ' (১ম ভাগ), ১৩৪৪
নগেন্দ্রনাথ বসু—'বিশ্বকোষ' (১৮শ ভাগ), ১৩১৪
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—'অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ', ১৩৫২
" 'শতাব্দী ও সাহিত্য', ১৩৪৮
নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত—'শরৎ-বন্দনা', ১৩৩৯
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত—'আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর', ১৩২৭
পাঁচকড়ি ঘোষ—'বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-সৌন্দর্য্য', ১৩৪৭
প্রবাসজীবন চৌধুরী—'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ', ১৩৫৬

প্রবোধচন্দ্র সিংহ—'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব', ১৯২১
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—'রবীন্দ্র-জীবনী' (১ম খণ্ড), ১৩৫৩
" ঐ (২য় খণ্ড), ১৩৫৫
" ঐ (৩য় খণ্ড), ১৩৫৯
" ঐ (৪র্থ খণ্ড), ১৩৬৩
প্রমথনাথ বিশী—'চিত্র চরিত্র', ১৩৫৬
" —'বাংলার লেখক', ১৯৫০
" —'রবীন্দ্র-বিচিত্রা', ১৩৬১
প্রিয়রঞ্জন সেন—'বাংলা সাহিত্যের খসড়া', ১৩৫৬
ফণীন্দ্রনাথ বসু—'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র', ১৩৩৩
বিনয় ঘোষ—'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' (১ম খণ্ড), ১৩৬৪
বিপিনবিহারী গুপ্ত—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১৩২০
বিহারীলাল সরকার—'বিদ্যাসাগর', ১৩০২
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ', ১৩৩৮
" —'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস' (১ম খণ্ড), ১৩৪২
" —'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' (১ম—৪র্থ খণ্ড), ১৯৪৬
" — " ৫ম খণ্ড, ১৯৪৭
" — " ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৪৮
" — " ৭ম খণ্ড, ১৯৫০
" — " ৮ম খণ্ড, ১৯৫১
" —'শরৎ-পরিচয়', ১৩৫৭
" —'বাংলা সাময়িক পত্র' (১ম খণ্ড), ১৩৫৪
" — " (২য় খণ্ড), ১৩৫৯
ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত—'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী', ১৯৫৮
ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য—'রবীন্দ্র-শিক্ষা-দর্শন', ১৩৬৪
ভূদেব চৌধুরী—'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' (২য় পর্ব), ১৯৫৭
মনোমোহন ঘোষ—'সাহিত্য-শিল্প', ১৯৪৫
" —'বাংলা গদ্যের চারযুগ', ১৯৪৯
" —'বাংলা সাহিত্য', ১৩৬১

মন্মথনাথ ঘোষ—'কালীপ্রসন্ন সিংহ', ১৩২২
" —'রঙ্গলাল', ১৩৩৬
" —'মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়', ১৯৩৩
মহেন্দ্রনাথ রায়, বিদ্যানিধি—'অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত', ১২৯২
মুকুন্দ মুখোপাধ্যায়—'ভূদেব-চরিত', ১৯১৭
মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত—'বঙ্কিম-স্মৃতি', ঢাকা, ১৩৪৭
মোহিতলাল মজুমদার—'সাহিত্য বিতান', ১৩৫৬
" —'বঙ্কিম বরণ', ১৩৫৬
" —'সাহিত্য বিচার', ১৩৪৯
" —'বাংলার নবযুগ', ১৯৪৫
" —'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', ১৩৫৩
" —'রবি-প্রদক্ষিণ', ১৩৫৬
" —'বাংলা প্রবন্ধ ও রচনারীতি', ১৯৫১
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—'কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য', ১৯৩৬
যোগেশচন্দ্র বাগল—'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা', ১৯৪১
রথীন্দ্রনাথ রায়—'বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী', ১৩৬৪
রমেন চৌধুরী—'বাঙ্‌লা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক', ১৩৬১
রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—'বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য', ১৯২৮
ললিতমোহন দাশ—'চিত্তরঞ্জন দাশ', ১৯২৫
শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'বঙ্কিম জীবনী', ১৩৩৮
শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত', ১২৯৮
শরৎকুমার রায়—'মহাত্মা অশ্বিনীকুমার', ১৯২৬
শরচ্চন্দ্র কাব্যরত্ন—'বিদ্যাসাগর চরিত' ১৮৯০
শশিভূষণ দাশগুপ্ত—'বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ', ১৩৫১
" —'বাঙ্‌লা সাহিত্যের একদিক', ১৩৫৫
শশিভূষণ বসু—'শিবনাথ শাস্ত্রী', ১৯২২
শিবরতন মিত্র—'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক', ১৩৩৮
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', ১৩৪৫
" 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা', ১৯৪৬

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত – 'সমালোচনা সাহিত্য', ১৩৫৭
শ্রীশচন্দ্র দাস—'সাহিত্য সন্দর্শন', ১৯৫৭
সজনীকান্ত দাস—'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', ১৩৫৩
সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—'বিদ্রোহী রাজা রামমোহন', ১৯৩৪
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—'বিবেকানন্দ চরিত', ১৯১৯
সুকুমার সেন—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড), ১৩৬২
" " (৩য় খণ্ড), ১৩৫৩
" 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' ১৩৫৬
সুকুমাররঞ্জন দাশ—'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন', ১৯৩৬
সুধাকৃষ্ণ বাগ্‌চি সম্পাদিত—'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন', ১৩৩৩
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য', ১৩৪৫
সুনীতি দেবী—'শিবনাথ', ১৩২৮
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—'বঙ্কিমচন্দ্র', ১৩৫২
" 'রবীন্দ্রনাথ', চট্টগ্রাম, ১৩৪১
" 'শরৎচন্দ্র', ১৩৫৬
সুরেন্দ্রনাথ সেন—'অশ্বিনীকুমার দত্ত', ১৯২৩
সুশীলকুমার দে—'নানা নিবন্ধ', ১৩৬০
সোমেন বসু—'বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী', ১৯৫৬
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'শরৎচন্দ্র—দেশ ও সমাজ', ১৯৫৭
হরপ্রসাদ মিত্র—'সাহিত্য পাঠকের ডায়ারি' (১ম পর্যায়), ১৯৫১
" ঐ (২য় পর্যায়), ১৯৫৩
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (৩য় ভাগ), ১৩৪৪
হরিদাস মজুমদার সম্পাদিত—'আচার্য্য জগদীশ প্রসঙ্গ', ১৩৪০
হারাণচন্দ্র রক্ষিত—'ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য', ১৩১৮
" 'বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম', ১৮৯৯
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়—'রবীন্দ্র-দর্শন', ১৩৫৭
হেমলতা দেবী—'পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত', ১৯২০
হেমেন্দ্রকুমার রায়—'সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র', ১৯৩৮
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—'ধর্ম্মানুশীলনে বঙ্কিমচন্দ্র', ১৯৫৪

Bose, Buddhadeva, *An Acre of Green Grass*, Calcutta, 1948.

Chambers's *Encyclopaedia*, Vol. 5. London, 1950.

Collet, Sophia Dobson, ed., *The Life and letters of Rammohun Roy*, London, 1900.

Dasgupta, S. N., *Philosophical Essays*, University of Calcutta, 1951.

Davis, William Hawley, *English Essayists*, Boston, 1916.

De, Susil Kumar, *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century*, Calcutta, 1919.

Dobree, Bonamy, ed., *English Essayists*, London, 1946.

Dutt, Romesh Chunder, *The Literature of Bengal*, Calcutta, 1895.

Ghosh, J. C., *Bengali Literature*, London, 1948.

Ghosh, Ram Chandra, *A biographical Sketch of the Rev. K. M. Banerjee*, Calcutta, 1893.

Hudson, William Henry, *An Introduction to the Study of Literature*, London, 1958.

Long, J. *A Descriptive Catalogue of Bengali Works*, Calcutta, 1855.

Lobban, J. H. *The English Essays*, London, 1896.

Lockitt, C. H. ed., *The Art of the Essayist*, London, 1954.

Majumder, Jatindra Kumar, *Raja Rammohan Roy and Progressive movements in India*, Calcutta, 1941.

Mitra, Subal Chandra, *Isvar Chandra Vidyasagar*, Calcutta, 1902.

Modern Literary Essays, University of London, 1932

Mukharji, Dhurjati Prosad, *Tagore ; a study*, Bombay, 1943.

Priestley, J. B., *Essayists Past and Present*, London, 1932.

Pritchard, F. H. ed., *Great essays of all nations*, London, 1929.

Radhakrishnan, Sarvepalli, *The Philosophy of Rabindranath Tagore*, London, 1918.

Rhys, Ernest, ed., *Modern English essays*, London, 1922.

Sen, Dinesh Chandra, *Bengali Prose Style*, Calcutta, 1921.

Sen, Priyaranjan, *Western Influence in Bengali Literature*, Calcutta, 1932.

Sen, Sachin, *The Political thought of Tagore*, Calcutta, 1947.

Shah, C. R. ed., *(Selected) English Essays*, Bombay, 1933.

Shipley, J. T. ed., *Dictionary of World Literature*, London, 1955.

Sinha, Sasadhar, *Tagore's approach to social problems*, Calcutta, 1947.

Stewart, John L. ed., *The Essay*, New York, 1952.

Takakhev, N. S. ed., *Bacon's Essays*, Bombay, 1954.

The Encyclopaedia Americana, Vol. 10. U. S. A. 1951.

Walker, Hugh, *The English Essay & Essayists*, London, 1915.

Williams, W. E. ed., *A Book of English Essays*, Great Britain, 1957.